বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা

(Health Policy of Bangladesh Government 2011: A Study in the light of Islam)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ফেব্রুয়ারি ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা

(Health Policy of Bangladesh Government 2011: A Study in the light of Islam)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ মাসুদ আলম
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

গবেষক
মোঃ আশরাফুল হক মিয়া
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি নং - ১২৪/ ২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

ফেব্রুয়ারি ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আশরাফুল হক মিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা, শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি গবেষকের একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশবিশেষ ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয় নি। অভিসন্দর্ভটি ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হলো।

(ড. মোঃ মাসুদ আলম)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা, শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে, এই শিরোনামে ইতিপূর্বে কোন গবেষণা হয়নি। পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

(মোঃ আশরাফুল হক মিয়া)
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি নং - ১২৪/ ২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি জগৎসমূহের মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যার অশেষ মেহেরবানীতে আমি বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা, শীর্ষক পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভটি যথাসময়ে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অগণিত দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবেন তাঁদের প্রতি।

যথাযথ সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদ আলম এর প্রতি যিনি আমাকে হাতে কলমে গবেষণাকর্ম শিখিয়েছেন। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও যিনি আমার গবেষণাকর্মের তদারকি করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে আমি এম. ফিল. ডিগ্রীও লাভ করেছি এবং এই গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে সম্পন্ন করতে পেরেছি। যিনি নিরলস পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে এ অভিসন্দর্ভটির প্রতিটি লাইন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটি প্রাণবন্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি, অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যাস এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁরই আন্তরিক সহযোগিতার কারণে; আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল শিক্ষকের প্রতি।

গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম আজিজুল হক মিয়া, দাদী মরহুমা আয়েশা বেগমকে যাদের অকৃত্রিম ত্যাগ ও ভালবাসায় আজ আমি গবেষকের মর্যাদা পেয়েছি। সর্বাত্মক শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ জহুরুল হক মিয়া ও মাতা কামরুন্নাহারকে যাদের অপরিসীম আত্মত্যাগ ও দু'আর বরকতে মহান আল্লাহ আমাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। আমি তাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সহধর্মিনী রোকসানা পারভীন (রিপা)কে যার অকৃত্রিম ত্যাগ, ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা আমার এ গবেষণাকর্মকে সুন্দর করেছে। গবেষণাকর্মের সময়ে কন্যা আতিকা মাহ্জাবিন ও পূত্র ইমাম আশরফের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমার গবেষণাকর্ম নির্বিঘ্ন করার ক্ষেত্রে তার ত্যাগ অতুলনীয়।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি যে সকল দেশী-বিদেশী লেখকগণের রচনার সাহায্য নিয়েছি তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। অভিসন্দর্ভের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থ্যাগার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরীসহ একাধিক গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবশেষে আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।

মোঃ আশরাফুল হক মিয়া

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল-কুরআন ১০:২০	প্রথম সংখ্যা সূরা ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াত
আ.	‘আলাইহিস্ সালাম
ইমাম বুখারী	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	আবূ‘ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ‘ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহমদ ইব্ন শু‘আইব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমাদ	আহমাদ ইব্ন হাম্বল
ইমাম ত্বাহাবী	আবূ জা‘ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আ-ত্বাহাবী
ইব্ন কাছীর	আবূল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবূ জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী
ই. ফা. বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কুরতুবী	আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন ফার্‌রাহ আল-কুরতুবী
তাবারানী	আবুল কাশেম সুলায়মান ইব্ন আহম্দ আত-তাবারানী
বায়হাকী	আহমাদ ইব্ন হুসাইন আল-বায়হাকী
যাহাভী	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ‘উছমান আয-যাহাভী
রাযী	আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ‘উমর ইবনুল হুসাইন আত-তামিমী ফখরুদ্দীন আর-রাযী
শাওকানী	মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী
খ্রি. পূ.	খ্রিস্ট পূর্ব
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
হি	হিজরি
ব.	বঙ্গাব্দ
তা. বি.	তারিখ বিহীন
রহ. / র.	রহমাতুল্লাহ আলাইহি
রা.	রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু/ ‘আনহুম/ ‘আনহা/ ‘আনহুমা/ ‘আনহুন্না
সা.	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বি. দ্র.	বিস্তারিত দ্রষ্টব্য
ed.	Ediotor (s) / Edited
Ibid	ibidem
N.B	Note bene
N.D	No Date

সূচীপত্র		
প্রত্যয়ন পত্র		৩
ঘোষণা পত্র		৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		৫
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা		৬
ভূমিকা		৯ - ১১
প্রথম অধ্যায় :	স্বাস্থ্য বিজ্ঞান : পরিচিতি ও ইতিহাস	১২ - ৪৪
	স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পরিচিতি, প্রাচীন যুগ, প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ, বৈদিক যুগ, গ্রীক ও রোমান যুগ, ইসলামী যুগ, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশ ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস।	
দ্বিতীয় অধ্যায় :	ইসলাম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান	৪৫ - ১০২
	স্বাস্থ্য; সুস্থতা ও অসুস্থতার ধারণা; হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাস্থ্য সর্ম্পকে দিক নির্দেশনা; নামাযের স্বাস্থ্য সুবিধা; রোযা রাখার স্বাস্থ্য সুবিধা; স্বাস্থ্য সুরক্ষার ইসলামী বিধি-বিধান ও সুস্থ থাকার সহজ উপায়।	
তৃতীয় অধ্যায় :	প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুসলিম স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীর পরিচয়	১০৩ - ১৩১
	ক্লাডিয়াস গ্যালেন; জাবির বিন হাইয়ান; আল-কিন্দি; আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর রাযী; আবু রায়হান আল বিরুনী; আবু আলী আল-হুসাইন বিন আবদুল্লাহ ইবনে সীনা; ফকরুদ্দীন আর রাযী; আবুল কাসেম।	
চতুর্থ অধ্যায় :	স্বাস্থ্যনীতি ও ইসলাম	১৩২ - ২১১
	স্বাস্থ্যনীতি ও ইসলাম, রোগের প্রকারভেদ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য, সংক্রামক ব্যাধি ও অসংক্রামক ব্যাধি, রোগ-ব্যাধি প্রতিকারের উপায় ও ইসলাম, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের ভূমিকা, প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে তিব্বে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তুলনা মুলক আলোচনা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও আদর্শ পরিবার গঠন পদ্ধতি।	
পঞ্চম অধ্যায় :	বাংলাদশ পরিচিতি, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ	২১২ - ২৩০
	বাংলাদশ পরিচিতি, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, সবার জন্য সমতার ভিত্তিতে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে মূল লক্ষ্যসমূহ ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ।	

ষষ্ঠ অধ্যায় :	বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর মূলনীতি : ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ	২৩১ - ২৪৩
সপ্তম অধ্যায় :	বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ: ইসলামের আলোকে উত্তোরণের উপায়	২৪৪ - ২৭৬
অষ্টম অধ্যায় :	বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের কর্মকৌশল : ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ	২৭৭ - ৩১৫
নবম অধ্যায় :	অভিসন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা	৩১৬ - ৩৪৮
উপসংহার :		৩৪৯ - ৩৫১
গ্রন্থপঞ্জি :		৩৫২ - ৩৬১
পরিশিষ্ট :		৩৬২ - ৩৮১

ভূমিকা

ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণ ও বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সুসমন্বিত ও বিজ্ঞানসম্মত দিক নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। এ কারণে আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকেই ইসলাম তার সত্য ও ন্যায়ের শাশ্বত সৌন্দার্যের আলোকে সমগ্র মানব জাতিকে সুপথ দেখিয়ে চলেছে। মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও অনুসন্ধানী, কেবল তারাই খুঁজে পেয়েছেন সত্যের ও শান্তির সন্ধান, খুঁজে পেয়েছেন একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহকে। স্বাস্থ্য মানুষকে প্রদত্ত মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত। স্বাস্থ্য ভালো না হলে মানুষ কোন কাজই করতে পারেনা। এ কারণে স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানুষের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। ইসলামে রয়েছে স্বাস্থ্য সুরক্ষার উত্তম নীতি ও পদ্ধতি। ইসলামের যৌক্তিক বিধি-বিধান, সরলতা, পাপের প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা; রোগ ও অশুচিতা, ক্ষতিকারক পানাহার, অন্ধবিশ্বাস ও অবাস্তববাদিতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা, মনকে আল্লাহভীরু করে ইবাদতের দিকে মনোযোগ এনে মানসিক প্রশান্তি প্রদানের ক্ষমতা। এক কথায় ইসলামের সৌন্দর্য আজ ভোগবিলাসী বস্তুতান্ত্রিক অশান্ত অপরিতৃপ্ত বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করছে, তাদেরকে আকর্ষণ করছে ইসলামের দিকে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন; সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা, সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম, নিয়মিত হাঁটা, দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও মনমেজাজ নিয়ন্ত্রণ; অবৈধ যৌন সম্পর্ক ত্যাগ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; রোগ প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলাম মানব জাতির স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করেছে। ইসলামী জীবন দর্শনে বর্ণিত স্বাস্থ্যনীতি ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ কার্যকর করা গেলে দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি আরো সুদৃঢ় হতে পারে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি রাষ্ট্রের নিকট জনগণের অন্যতম চাহিদা। স্বাস্থ্যসেবাকে রাষ্ট্রের অন্যতম করণীয় চিহ্নিত করার মাধ্যমে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) অনুসারে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এবং অনুচ্ছেদ ১৮ (১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। চিকিৎসা সেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিটি জেলা, থানা, এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের যুগান্তকারী উদ্যেগ নেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত হয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন কমিটি। এ বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা এবং আন্তরিক ইচ্ছায় প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১; এই স্বাস্থ্যনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে: সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহীতাকেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপতা বৃদ্ধি ও বিস্তার করা; রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। জনগণের নিজস্ব অর্থ হতে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় কমিয়ে আনা এবং বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় হতে জনগণকে সুরক্ষা দেয়া। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও

আন্তর্জাতিক সনদ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাও এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই সাথে সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা, জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশে বর্তমান শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করা, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা, ২০২১ সালের প্রতিস্থাপন পর্যায়ে জনউর্বরতা (Replacement leval of Fertility) অর্জন করার লক্ষ্য পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা, তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার, চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবার মান নিশ্চিত করা, চিকিৎসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ইত্যাদি মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির কার্যক্রম ইসলামের নীতি-দর্শন ও আদর্শের আলোকে সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশের গণমানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি অধিকতর সহজ ও সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, মানব জীবনের সকল কর্মকেই ইসলাম ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেছে যদি তা মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নীতি আদর্শ অনুসরণে হয়। আর মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নীতি আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আশানুরূপ নয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য দক্ষ লোকের অভাব, চিকিৎসক-নার্স-টেকনিশিয়ানের অপ্রতুলতা, অনিয়ম, প্রতিষ্ঠানসমূহের নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগী সেবার প্রতি আন্তরিকতা ও সহানুভূতির অভাব, পানি-বিদ্যুৎ সংকট, ওষুধ চুরি, নিম্নমানের খাবার, হাসপাতালে দালাল-টাউট-সন্ত্রাসীদের অবস্থান, কোথাও কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের দৌর্দণ্ড প্রতাপ, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির অভাব এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক দূর্বলতা পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। এহেন অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উক্ত স্বাস্থ্যনীতির সাথে ইসলামের স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর সফল ও সর্বাত্মক বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

"বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ইসলামী জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির অবয়ব সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য এর বিষয়বস্তুকে নয়টি অধ্যায়ে সুবিন্যাস্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: পরিচিতি ও ইতিহাস' শিরোনামে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পরিচিতি; স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; প্রাচীন যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান; স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি; ইসলামী যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান; স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ইতিহাস; স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা; বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্যনীতিসমূহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: 'ইসলাম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে স্বাস্থ্য; সুস্থতা ও অসুস্থতার ধারণা; হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য সর্ম্পকে দিক নির্দেশনা; নামাযের স্বাস্থ্য সুবিধা; রোযা রাখার স্বাস্থ্য সুবিধা; স্বাস্থ্য সুরক্ষার ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: 'প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুসলিম স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীর পরিচয়' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বোখরাত বা হিপোক্রীটিস; এ্যারিষ্টোটল; ক্লাডিয়াস গ্যালেন; জাবির বিন হাইয়ান; আল-কিন্দি; আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর রাযী; আবু রায়হান আল বিরুনী; আবু আলী আল-হুসাইন বিন আবদুল্লাহ ইবনে সীনা; ফকরুদ্দীন আর রাযী; আবুল কাসেমসহ প্রসিদ্ধ মুসলিম স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: 'স্বাস্থ্যনীতি ও ইসলাম' শিরোনামে স্বাস্থ্যনীতি ও ইসলাম; রোগের প্রকারভেদ; ইসলামে রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়; স্বাস্থ্য-গবেষণা পদ্ধতি; জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের ভূমিকা; ওষুধ ব্যতিত আদর্শ পরিবার গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশ পরিচিতি, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর মূলনীতি : ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের বক্তব্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ : ইসলামের আলোকে উত্তোরণের উপায়' নামে অভিসন্দর্ভের বক্তব্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়: 'বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে কর্মকৌশল : ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ' শিরোনামে স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে কর্মকৌশলের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়: অভিসন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সবশেষে একটি সুবিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জিতে গবেষণাকর্মে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে এমন বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী ও পত্র-পত্রিকার বিস্তারিত তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং পরিশিষ্ট আকারে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ সংযুক্ত করা হয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের পরিধিভুক্ত তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভকে গবেষণার স্তরে উন্নীত করার যথার্থ চেষ্টা করা হয়েছে। অত্র গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের গণমানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন ও জানার পরিধিকে যেমন বিস্তৃত করবে তেমনি জ্ঞানের জগতে এটি একটি নতুন সংযোজন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি আরো বিশ্বাস করি যে, ইসলামের নীতি ও দর্শনের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ পরিচালিত হলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে। অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর সফল বাস্তবায়ন এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ইসলামী নীতি ও দর্শনের আলোকে স্বাস্থসেবা সম্পর্কিত এমন কিছু বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে যা দ্বারা শারীরিক ও মানসিক বহুবিধ রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থেকে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: পরিচিতি ও ইতিহাস

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পরিচিতি

Health is man's most valuable possession because it influences all the activities. A man's happiness rest on the solid foundation. Health is a resource in which the whole community has a stake and it is desirable to maintain and promote it.[১]

স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা; শুধু কোন রোগ বা অক্ষমতার অনুপস্থিতিই নয়। অর্থাৎ কোন ব্যাক্তির শরীরে কোন রোগ বা অক্ষমতা না থাকলেই যে তিনি স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ, তা ঠিক নয়। সুস্থ হতে হলে তাঁকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে হবে। এর সাথে আধ্যাত্মিক দিকের কথাও বলা হয়। কিভাবে আমরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকতে পারি? শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাবার, ব্যায়াম, বিশ্রাম ইত্যাদি। মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য চায় সুস্থ শরীর, সুস্থ সমাজ।

বাংলা একাডেমীর 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'- এ স্বাস্থ্য শব্দের অর্থ করা হয়েছে- সুস্থতা; নিরাময়তা; শরীরের নীরোগ অবস্থা।[২] বাংলা একাডেমীর 'Bengali-English Dictionary'- তে স্বাস্থ্য শব্দের অর্থ করা হয়েছে- Health; hygiene; ease; comfort; peace; sound state of body.[৩] আর Health শব্দের অর্থ করা হয়েছে- স্বাস্থ্য এবং Healthy শব্দের অর্থ করা হয়েছে- স্বাস্থ্যবান; স্বাস্থ্যবতী; নীরোগ; নিরাময়; স্বাস্থ্যকর; স্বাস্থ্যপ্রদ; স্বাস্থ্যসূচক; সুস্থ; স্বাস্থ্যপ্রদভাবে; সুস্থ্যভাবে।[৪] সুস্থ বলতে কেবল রোগমুক্ততাই বোঝায় না, স্বাভাবিক কাজকর্ম করার জন্য দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাও (fitness) বুঝিয়ে থাকে।[৫] স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা; শুধু কোন রোগ বা অক্ষমতার অনুপস্থিতিই নয়।

'শারীরিক ও মানসিক সুস্থ অবস্থার নামই স্বাস্থ্য'। 'স্বাস্থ্য' মহান আল্লাহর দেওয়া একটি বিশেষ নিয়ামত।[৬] মহান আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের মধ্যে ঈমানের পরেই স্বাস্থ্যের স্থান। অতএব এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। অপরদিকে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থ অবস্থার নাম রোগ-ব্যাধি। Disease is a disordered condition of mind or body.[৭] A disease is an abnormal condition affecting the body of an

---

১. S. Dheer, Dr. Mitra Basu, *Indruction to Health Education,* Frends publications, 6, Mukherjee Tower, Mukherjee Nagar, com. Complex, Delhi: 110009, India. N.D, P.4

২. ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), evsjv GKv‡Wgx e¨enwiK evsjv Awfavb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: পরিমার্জিত সংস্করণ, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১১ খ্রি. পৃ. ১১৮৯

৩. Professor Mohammad Ali and others (editors), *Bangla Academy Bengali-English Dictionary,* Ibid, P. 854

৪. Zillur Rahaman Siddiqui (editors), *Bangla Academy English-Bengali Dictionary,* Ibid, P. 348

৫. ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, †gŠwjK cwó cwiPwZ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ২০০৩ খ্রি. পৃ. ৭১

৬. প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুয্ যমান, wZ‡eŸ beex (m), ঢাকা: হক লাইব্রেরী, বাইতুল মুকাররম, মার্চ ২০০২ খ্রি. পৃ. ১৫

৭. Prof. Md. Nur nobi, *Oxford Dictionary of contemporary English,* Joneki prokashani, Dhaka: March 2012

Dhaka University Institutional Repository

organism. It is often construe to be a medical condition associated with specific symptoms and signs. It may be cause by factors originally from an external source, such as infectious disease, or it may be cause by internal dysfunctions, such as autoimmune diseases. In humans, "disease" is often used more broadly to refer to any condition that causes pain, dysfunction, distress, social problems or death to the person afflicted or similar problems for those in contact with the person. In this broader sense, it sometimes includes injuries, disabilities, disorders, syndromes, infections, isolated symptoms, deviant behaviors, and atypical variations of structure and function, while in other contexts and for other purposes these may be considered distinguishable categories. Diseases usually affect people not only physically, but also emotionally, as contracting and living with many diseases can alter one's perspective on life, and their personality.[৮]

A disordered or incorrectly functioning organ, part, structure or system of the body resulting from the effect of genetic or developmental errors, infection, poisons, nutritional deficiency or imbalance, toxicity or unfavorable environmental factors; illness; sickness; ailment.[৯]

স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক নীতিমালাসমূহ মেনে চলা যেমন প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব তেমনি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা সরকারের জন্য একান্ত কর্তব্য। মহান আল্লাহ এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাহি ওয়া সাল্লাম স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যের হিফাযত ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে অত্যন্ত সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক ও উপকারী বস্তুনিচয় এবং সে সকল বিষয়াবলী চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যা স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরী। সুস্থ থাকার চেষ্টা থাকতে হবে নিরন্তর। কারণ অসুস্থ হলে কষ্ট এবং খরচ দুই’ই বৃদ্ধি পায়। সুস্থ থাকার চেষ্টা করা খুব কঠিন কাজ নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার, সুস্থ অভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, পরিমিত আহার, প্রাকৃতিক বিধান এবং সময় সময় হেলথ চেকআপ এভাবে সুস্থ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। যদি আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং আমি সুস্থ থাকি তবে আমি শোকর আদায় করি। এই অবস্থাটি আমার নিকট সেই অবস্থার চেয়ে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় যা আমি অসুস্থতার দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হলে অনুভব করি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও এমনিভাবে স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে পছন্দ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার

---

৮ . *Wikipedia, the free encyclopedia,* en.wikipedia.org/wiki/Disease N.B.

9. Define ***Disease*** at Dictionary.com, *dictionary. reference.com/browse/disease, N.B.*

চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন নিয়ামত দান করেননি।[১০] স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ মহান রাব্বুল আলামীনের নিয়ামত সমূহের মধ্যে দুটি বিশেষ নিয়ামত। অধিকাংশ লোক এই দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে ক্ষতি ও ধোঁকায় রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নাই যে, পার্থিব ভোগ-বিলাসের লালসার কারণে অধিকাংশ লোক এই দুইটি নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয়। তারা ভাবে স্বাস্থ্য সব সময় অটুট থাকবে এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা কোন দিন শেষ হবে না। তারা শারিরীর ও মানসিক বিভিন্ন প্রকার চাহিদার প্রতি অনিয়ম করে তাদের শরীরকে নানা ধরনের রোগ-ব্যাধির আবাসস্থল রূপে গড়ে তোলে। আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এক দিনের সৃষ্টি নয়। এর রয়েছে অতিত ইতিহাস।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস

প্রাচীন যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: প্রাচীন স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শুরু আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে। মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টির সূচনাতেই চিকিৎসা বিষয়ে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আদিম মানুষ রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য দুর্যোগকে স্রষ্টার অভিশাপ, শরীরে ভূতপ্রেতের অশুভ আছর বা দুষ্টগ্রহের কুপ্রভাবের ফল মনে করত। তারা স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য সংগ্রহ এবং রোগ-ব্যাধি মোকাবেলার জন্য যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তা থেকেই চিকিৎসা শাস্ত্রের সূত্রপাত। তখনকার চিকিৎসা পদ্ধতি তাদেরই সৃষ্টি ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি। এরপর লতা-পাতা, গাছ-গাছড়ার ব্যবহার। পরবর্তী কালের মানুষ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি ঘটায় এবং বিভিন্ন দ্রব্যদি রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করে।[১১] ওষুধ হিসেবে যা প্রথম ব্যবহৃত হয় তা বার্লিনের Museum of Ethonology-তে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রাচীন মানুষের একটি খুলিতে রক্ষিত পোয়া ইঞ্চি গর্ত দেখে অনুমান করা হয় এ গর্ত হয়েছে মাথার খুলিতে তুর্পিন (এক প্রকার চিকিৎসা) করার জন্য। ফ্রান্সে প্রাপ্ত এবং পশ্চিম ইউরোপ ও বোহেমিয়ায় নব্য প্রস্তর যুগের (Neolithic) অনেক খুলিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। মনে করা হয় শির পাড়া, মৃগীরোগ প্রভৃতি রোগ চিকিৎসায় এই শল্য বিদ্যার আশ্রয় নেয়া হত।[১২]

প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও গবেষণার মাধ্যমেই বর্তমান স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও বিস্তার লাভ করে। প্রাক সভ্যতার যুগে বাইজেন্টাইন, মিশর, ভারত উপমহাদেশ এবং চীনের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ও মৌলিকত্ব সুবিদিত। ৩০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে প্রাচীন চীন দেশে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সূচনা হয়।[১৩] সে সময়ের অনেক চিকিৎসক বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিকিৎসা করতেন। তারা কাউচিং পদ্ধতিতে চোখের ছানিরও অপরেশন করতেন। চৈনিক সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা দেখা যায়, খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে চীনা চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। Shen Nung এবং Lung ছিলেন এর পুরোধা। Shen Nung (2838-2698 B.C) প্রখ্যাত চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।পুরাকালে চীনে ৩ পদ্ধতির চিকৎসা প্রচলিত ছিল। ১. একুপাংচার (Acupuncture), ২. মেক্সা (Moxa) এবং ৩. মাসিজ (Massag). চীনে একুপাংচার (Acupuncture) আজও জনপ্রিয়। চীনে তাং বশের রাজত্বকালে (Dynasty 619-908 A.D) চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাদান

---

১০. প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, cÖ¸³, পৃ. ১৬

১১. http://bn.banglapedia.org/index.php?title=

১২. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, weÁv‡b gmjgvb‡`i Ae`vb, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, চতুর্থ প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ খ্রি. পৃ. ৫৪

১৩. ডাক্তার এম.এ. ওয়াহেদ, P¶ wPwKrmvi weKv‡k Bmjv‡gi Ae`vb, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮০ খ্রি. পৃ. ১

শুরু হয়। কনফুসিয়াসের বাণী “রোগ মুখ দিয়ে প্রবেশ করে; ভালোভাবে পাক না হলে তোমরা সে খাবার খাবে না”। তখনকার সময় চীন দেশে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে

Chi Mir wong এবং Lien Teh wn.তাঁদের History of Chinese Medicine গ্রন্থে বলেন, While The Chinese have acquired a lot of experience, accumlated a mass of information, Collected a great variety of fact’s formulated some Fundamantal principles, anticipated many discoveries yet they have never pursued a single in a way calculated to lead them to final success.[১৪]

২৩০৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে বাইজেন্টাইনের স্বাস্থ্যবিদরা সাধারণ চিকিৎসার বিভিন্ন ওষুধ-পত্র, তার গুনাগুণ লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও বিভিন্ন রোগের ছোট-খাট অপারেশণের বর্ণনা করেন। সে যুগে তাদের একটি চিকিৎসা সংস্থাও ছিল। ১৭০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে পাপিরাসে (পাপিরাস-প্রাচীন কালে ব্যবহৃত কাগজের মত এক প্রকার গাছের বাকল) শৈল্য চিকিৎসার বিশদ ব্যাখ্যা ও চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি জানা যায়।

ঐ সময়ে মিশরে অনেক খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন। ১৫৭০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসকরাও পাপিরাসে চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন।[১৫]

ওষুধের প্রথম আবিষ্কারক কে ছিলেন, তা নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। আল কিফতি তাঁর ‘তারীখুল হুকামাতে’ লিখেছেন, নবী ইদরিস (আ.) প্রথম স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী এবং এ সম্পর্কে তাঁর কাছে ‘ওহী’ আসে। বিজ্ঞানী ইসহাক বিন হোনায়েন তাঁর ‘কিতাবু তারীখুল আতীব্বা’-এ বর্ণনা করেন, মিশরীয়রাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের আদি জন্মদাতা। ইরাকীরা মনে করেন তারাই প্রথম স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের জন্ম দেন। ভারতবর্ষের হিন্দুরা মনে করতো, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ভগবানের প্রত্যাদেশ। ঋকবেদে স্বাস্থ্য, জীবনরক্ষা, ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ের ব্যাপারে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে।

বস্তুবাদী চিন্তাধারার পন্ডিতগণ চিকিৎসার প্রথম উদ্ভব স্থান হিসেবে ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রীস নদীর প্রদেশটিকে চিন্তা করেন। প্রথম সভ্যতার আলো এখানেই উদিত হয়। পৃথিবীর ৩টি বড় ধর্মের মতে, আদম হাওয়া বেহেশতের যে জায়গায় বসবাস করতেন সেটা ব্যাবিলনেই অবস্থিত। সুমেরীয়রা কোথা হতে ব্যাবিলনে এসেছিল তা জানা যায় না। তবে তাদের সভ্যতা যে উন্নত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা পৃথিবীর পরবর্তী সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে। এখান থেকেই উদ্ভূত হয় জ্যোতির্বিদ্যা, অংক, ব্যাকরণ, ইতিহাস ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

উদ্ধারকৃত ফলক থেকে অনুমান করা হয় মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। নিনেভের উদ্ধারকৃত ৩০ হাজার ফলকের মধ্যে ১ হাজার ফলকই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কীয়। তাদের বিজ্ঞান একাধারে যাদুবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র ও খাঁটি বিজ্ঞানের সমন্বয়। তখনকার দিনে অন্যান্য জাতির চাইতে তারা খ্যাতিমান ছিল।

মিশরীয় সভ্যতা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। গ্রীক কবি হোমার তাঁর বিখ্যাত ‘ওডেসা’-এর এক বর্ণনায় বলেন, মিশরের লোকেরা চিকিৎসা বিষয়ে অন্যসব দেশের

---

[১৪]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, cÖ¸³, পৃ. ৫৪-৫৬

[১৫]. এম আকবর আলী, weÁv‡b gmjgvb‡'i 'vb, ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, অষ্টম খন্ড, সন ১৯৮১, পৃ. II

লোকের চেয়ে অধিক পারদর্শী। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে পারস্য নৃপতি সাইরাস (Cyrus the Great 530 B.C) এবং দারিয়ুস উভয়েরই ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন মিশরীয়। মিশরীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে সবচেয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন 'হারমেস'। তাঁর বলেন, গ্রন্থাবলী অনুসরণে ৪ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কোন ফল পাওয়া না গেলে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মিশরীয় দেবতা 'টথ' হারমেসের বিকল্প। মিশরীয় 'মমি' সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান তাদের উন্নতির অন্যতম স্বীকৃতি। সাধারণ রাজা বাদশাহদের মৃত্যুর পর দেহকে অবিকৃত রাখার নিমিত্তে এক শ্রেণীর লোক এ কাজ করত। খৃষ্টপূর্ব অব্দে মিশরীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মাধ্যে 'The Papyrus Ebers (1553-1550 B.C)`, 'The Berlin Medical papyrus ( 1909 AD)`, এবং 'The Hearst Medical Papyrus' অন্যতম।

অনেকের মতে ইরানীদের কাছ থেকেই গ্রীকরা চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখেছিল। এর ৩০০ বছর পর গ্রীকরা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি করে। এই সময়ে হিপোক্রেটস (খৃষ্টপূর্ব ৪৬০ অব্দ) চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

জোরোস্তারের আভেস্তাসহ অনেক পারসীয় পুরনো গ্রন্থে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণে পারসীক সভ্যতা তছনছ হয়ে যায়। পুরনো ধর্মশাস্ত্র থেকে জানা যায়, হযরত ঈসা (আ.) জন্মের সময় যে তিন ব্যক্তি বেথেলহেমে আসেন তাদের তিনজনই পারসীক পুরোহিত চিকিৎসক।

ভারতে যে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রচলিত এর মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ আরবরা অনুবাদ করে। ফিহরস্তি ১২টি ভারতীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত বইয়ের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে 'কিতাব সুসরদ', 'কিতাব আসতানকর,' কিতাব সিরাক', 'কিতাব তুকালতল, 'কিতাব সাকর লিল হিন্দ', আসমায়ে অকাফেরুর হিন্দ' ও 'এলাজাতু হার্বালি লিল হিন্দু', অন্যতম।

বৈদিক যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস মানবেতিহাসের ন্যায় প্রাচীন। সুদূর অতীতে মানব প্রজাতির বিকাশের সাথে সাথেই চিকিৎসাবিদ্যাও বিকশিত হয়েছে।[16] বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ অর্থাৎ প্রাণবিজ্ঞান নামে অভিহিত। আত্রেয় (প্রায় ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে), চরক, সুশ্রুত ও ভগবত ছিলেন আয়ুর্বেদের বিশ্রুত বিশেষজ্ঞ। প্রথম ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও শিক্ষকরূপে পরিগণিত আত্রেয় ছিলেন বর্তমান পাকিস্তানের তক্ষশীলার বাসিন্দা। বর্তমানকালেও আয়ুর্বেদের অন্যতম জনপ্রিয় 'চরক' ছিলেন বৌদ্ধরাজা কণিষ্কের রাজচিকিৎসক (২০০ খ্রিস্টাব্দ)। চরকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম চরক-সংহিতা। বারাণসীর বাসিন্দা সুশ্রুত ভারতীয় শল্যচিকিৎসার গ্রন্থ সুশ্রুত-সংহিতা লিখেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ ভগ্ন বা স্থানচ্যুত অস্থিসন্ধির চিকিৎসা, শরীরের অর্বুদ (টিউমার), হার্নিয়া ও চোখের ছানি অপসারণে দক্ষ ছিলেন। ভারতে মুসলমান বিজয়ের পর থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ক্রমে অবনতি ঘটে। পাঠান ও মুগল রাজাদের আনুকূল্যে বিকশিত ইউনানি তিব্বি চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদের স্থান দখল করতে থাকে। এভাবে আঠারো শতকে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনাকাল পর্যন্ত ইউনানি চিকিৎসার প্রসার

---

[16]. **https://bn.wikipedia.org/s/ooo**

অব্যাহত থাকে। দিল্লি, আগ্রা, আলীগড়, লক্ষৌণ, হায়দ্রাবাদ এসব নগরকে কেন্দ্র করে ইউনানি চিকিৎসা বিকশিত হয়।

গ্রীক ও রোমান যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: গ্রীক বিজ্ঞানীদের মধ্যে Aristotle (384-322), Polybas (340 B.C), Prannagoras (340 B.C), Herophilus of Chalcedon (300-250 B.C), এবং Eudemos প্রমুখ চিকিৎসা শাস্ত্রে অবদান রেখেছেন। রোমান স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে Dioscorides (40-90 A.D), Andromachos, Ruphos, (100 A.D), Soranos (98-138 A.D), ও Galen (130-199 A.D) বিখ্যাত। রোমীওরা গ্রীকদের চাইতে আরেক ধাপ অগ্রসর হয়। কিছু কিছু রোমীও চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন করেন। ইসলামের আগমনের পর গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণ-যুগের অবসান ঘটে। গ্রীক সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতার শুরু হয় ইসলামের আশ্চর্য রকম গৌরবদীপ্ত যুগে।

ইসলামী যুগে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি

৫৭০ ঈসায়ী সালে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তিনি যাযাবর ও কালিমালিপ্ত আরব জাতিকে সভ্য ও সুসংহত জাতিতে পরিণত করেন। মুসলমানদের তিনি এক সাধনালিপ্ত জাতিতে পরিণত করার পথে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করেন। জীবনবোধ ও সঠিক পদক্ষেপে মুসলমানগণ এক জ্ঞান উদ্বুদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। আরবী ভাষা সমৃদ্ধি ও বিস্তারের এক আন্তর্জাতিক সীমারেখা নির্ধারিত হয়। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবনে, হাতে কলমে এক আদর্শ, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপরেখা দিয়ে যেতে সমর্থ হন। ফলে পূর্ণাঙ্গতা আসে সৃজনশীল জীবন বিন্যাসে। ইসলামের দাওয়াত কবুল করে চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন জাতি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে থাকে এবং বিস্ফোরণের মত ইসলাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তম শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তাঁরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দর্শনে স্বর্ণ-যুগের সৃষ্টি করেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের এই অবস্থা ও পটভূমিতে সপ্তম শতাব্দীতে আরবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আল কুরআন, মহানবী (সা.) এর বাণী জ্ঞান সাধনায় সম্পূর্ণ নতুন দিক নির্দেশনা প্রদান করে আরব সমাজে। এই উত্তরাধিকার আরবদের মাধ্যমে তাদের বিজিত বিশ্বের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে; ফলে, বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় মুসলিম যুগ ও সভ্যতার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। মুসলিম সভ্যতায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানও উন্নতি লাভ করে। ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে রোগ মহান আল্লাহর নিকট থেকে আসে এবং চিকিৎসাও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই। চিকিৎসা গ্রহণ করা খোদায়ী বিধান। অসুস্থতায় চিকিৎসা গ্রহণ করা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।[১৭] মহানবীর (সা.) যুগে আরবে চিকিৎসক হিসেবে যার খ্যাতি ছিল তিনি হারেস বিন কালাদা। রোগ ও চিকিৎসার ব্যাপারে নবী (সা.) তাঁর নিকট পরামর্শ নেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে পাঠাতেন। তিনি পারস্যে চিকিৎসা শিক্ষা লাভ করেন এবং প্রথমে সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে তায়েফ এসে বসবাস ও চিকিৎসা ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি কালামুল হারেস মা'আ কিসরা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। হারেসের চিকিৎসা বিধির অন্যতম হলো 'অত্যাধিক আহারই সকল রোগের কারণ; যদি নীরোগ জীবন যাপন করতে চাও তা হলে

[১৭]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সকালে ঘুম থেকে উঠবে; ঋণমুক্ত থাকবে এবং স্ত্রীলোকের সংসর্গ যতদুর সম্ভব পরিত্যাগ করবে। যতদূর সম্ভব ওষুধ পরিহার করবে, পেটের অসুখে জোলাপ ব্যবহার করবে, পানীয় হিসেবে মদের চেয়ে পানি বেশী উপকারী' ইত্যাদি। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা.)-এর সময়, ভিন্নমতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকালে হারেস মৃত্যুবরণ করেন।

উমাইয়া খলীফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের চাইতে সামরিক শক্তি এবং রাজ্য বিস্তার ও প্রশাসনিক উন্নতিকল্পে বেশী সময় ব্যয় করেছেন। কুরআনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উন্নতি ও মুসলিম সভ্যতার সূচনা প্রকৃতপক্ষে আব্বাসীয় আমলেই সংগঠিত হয়। অধ্যাপক কে. আলী বলেন, 'আরবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় আব্বাসীয় আমলে। গ্রীক, ইরানীয়, সিরীয় এবং কিছু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র ও শিক্ষক জুন্দিশাপুরের কলেজে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। গ্রীক হতে সিরীয় ও পাহ্লভী ভাষায় অনুবাদের কাজ পঞ্চম শতাব্দীতে শুরু হয় এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্যালেন ও হিপোক্রোটের গ্রন্থগুলি সিরীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এ যুগে গ্রীক, ইরানী ও ভারতীয় অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়। জুন্দিশাপুরের কলেজটি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিজ্ঞান কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম উন্নতির যুগকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়।

১. ৭৫০-৯০০ খৃ. সময়কাল অনুবাদের যুগ;
২. ৯০০-১১০০ খৃ. মুসলিম স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ;
৩. ১২৫০-১৬৫০ খৃ. মুসলিমদের পতন ইউরোপের উত্থান যুগ;
৪. ১৬৫০ খৃ. হতে চলমান সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের সাফল্য।

বিজ্ঞানময় ধর্ম ইসলামের অনুপ্রেরণায় আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বার উন্মোচিত হয়। এ সম্পর্কে ১৯৬৮ খৃ. প্রকাশিত An Introduction to the History of Medicine গ্রন্থে Chales Green Cumston বলেন, When they (Mahometans) Came in contact with the debris of ancient civilizations they showed their aptitude by putting into practice the beautiful precepts of the Prophet, Who said to his followers "Teach science which teachers fear of God Science protects from error and sin. The study of science protects from error and sin. The study of science has the value of a fast; in a noble heart they inspire the highest feelings and they correct and humanize the pervered Unfortunately during the cen-turies of decadence the heads of religious brotherhood limited the obligations to pxrely religious studies."[18]

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে অনুবাদের যুগ

মুসলিম বিজ্ঞানীদের চিকিৎসা শাস্ত্রে নিজেদের অবদান যুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ পূববর্তী বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থসমূহ আরবী-সিরিয়াক প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করা। নিজস্ব উদ্যোগ ও সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ও এক দল অনুবাদক এ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে, মুসলমান ছাড়াও অংশ গ্রহণ করেছেন ইহুদী, খৃষ্টান প্রমুখ ধর্মের বিশিষ্ট অনুবাদক। এ কাজে কোন

[১৮]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C৷¸ ³, পৃ. ৬২

ভেদ টানা হতো না। মুসলিম শাসকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে ধর্মীয় উদারতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। মুসলিম খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম বিজ্ঞানের যে ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয় তা হলো চিকিৎসা শাস্ত্র। উমাইয়া খলিফাগণ চিকিৎসা শাস্ত্রকে উৎসাহিত করলেও মূলত আব্বাসীয় আমলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি হয়। এ যুগে অনেক অনুবাদক ও চিকিৎসক চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর নতুনভাবে আলোকপাত করেন। এভাবে তারা তাদের মৌলিক চিন্তা-ধারার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।[১৯]
নিম্নে বিশিষ্ট কয়েকজন অনুবাদকের নাম তুলে ধরা হলো:

১. জুরজিস
২. হোনায়েন বিন ইসহাক
৩. ঈসা হাক বিন হোনায়েন
৪. হুবায়ন আল আসম
৫. ঈসা বিন ইয়াহিয়া বিন ইবরাহীম
৬. কুস্তা বিন লুফা বলোবাক্কী
৭. আইয়ুব আল মারুফ বিল আবরল
৮. ইসা বিল মাসারজিস
৯. শহীদ আল ফারখী
১০. মাসরজিস
১১. ইবনে শহীধ আল ফারখী
১২. আল হাজ্জাজ বিন মাতার
১৩. জারওয়া বিন মানাওয়া আন্নামী আল হিমসী
১৪. হিলাল বিন আবী হিলাল আল্ হিম্সী
১৫. ফসীয়ুন আত্ তারজামান
১৬. আবু নসর বিন নারী বিন আইয়ুব
১৭. বাসিল আল মাতরান
১৮. ইসতাফান বিন বাসিল
১৯. মুসা বিন খালেদ
২০. ইসতাছ
২১. জিরুন ইবনে রাবিতা
২২. তদরস আস্ সনকল
২৩. সারজিস আর রাসী
২৪. আইয়ুব আর রাহাবী
২৫. ইউসুফ আন্ নাকেল
২৬. ইবরাহীম বিন সালাত
২৭. সাবেত আন্ নাকেল
২৮. আবু ইউসুফ আল কাতিব
২৯. ইউহান্না বিন বখতইস্ত

[১৯]. https://ourworld797.wordpress.com/2016/05/12/

৩০. আল্ বাতরিক
৩১. ইয়াহিয়া বিন আল্ বাতরিক
৩২. কুস্তা আর রাহাবী
৩৩. মনসুর বিন বানাস
৩৪. আবদ্ ইস্ত বিন বাহারিজ
৩৫. আবু উসমান সাঈদ বিন ইয়াকুব আদ্ দামিস্ক
৩৬. আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন বক্স
৩৭. আবুল হাসান আলী বিন ইব্রাহীম বিন বকস
৩৮. শিরস্তয়া বিন কুতরুব
৩৯. মোহাম্মদ বিন মুসা আল্ মুনাজ্জম
৪০. আলী বিন ইয়াহিয়া আল মারূফ
৪১. ছাদরেস আল উসকাফ্
৪২. মোহাম্মদ বিন মুসা বিন আব্দুল মালেক
৪৩. ঈসা বিন ইউনুছ আল্ কাতিব আল হাসিব
৪৪. আলী আল মারুফ বিল কাইয়ুম
৪৫. আহম্মদ বিন মোহাম্মদ আল মারূফ ইবনুল মোদাব্বের
৪৬. ইব্রাহীম বিন মোহাম্মদ বিন মূসা আল্ কাতিব
৪৭. আবদুল্লাহ বিন ইসহাক
৪৮. মোহাম্মদ বিন আবদুল মালেক জাইয়াত প্রমুখ।

বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদের উপর মুসলিম চিন্তাধারা ও গবেষণার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞান। চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানের সাবিক মূল্যায়ন সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "চিকিৎসা বিজ্ঞান আর শৈল্য চিকিৎসার কৌশল হচ্ছে একটি জাতির প্রতিভার লক্ষণ আর ধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক মানসিকতার কঠোর পরীক্ষা, মুসলমানেরা এ দুটির চরম উন্নতি সাধন করে। চিকিৎসা শাস্ত্র গ্রীকদের হাতে নিঃসন্দেহে উচ্চ পর্যায়ের উন্নতি লাভ করেছিল, কিন্তু গ্রীক সভ্যতা এই শাস্ত্রকে যেখানে রেখে যায়, আরবরা তার উপর বহুতর উচ্চ পর্যায়ের উন্নতি সাধন করে প্রায় আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে আসে। ওষুধের বস্তুগুলির পরীক্ষার কথা আলেকজান্দ্রিয়ার স্কুলে ডাইস্কোরাইডসের মনে উদিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক আকার আরবদের সৃষ্টি। তারা রাসায়নিক ওষুধ প্রস্তুতকরণ আবিষ্কার করেন। বর্তমানে যাকে 'ডিসপেনসারী' বলে, তার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা তাঁরা। তাঁরা প্রত্যেক নগরীতে সাধারণ হাসপাতাল স্থাপনা করেন, যাকে বলা হতো 'দারুণ শিফা' বা আরোগ্য নিকেতন অথবা 'মারিস্তান' বা রোগী নিকেতন। মুসলমানরা এই উভয় বিদ্যাই এক একটি প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানে উন্নতি করে। সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি পৃথিবীর সর্বত্র গবেষণা আর অনুসন্ধানের সুবিধা দান করে। ফলে, প্রচলিত ওষুধ প্রস্তুত প্রণালীকে অসংখ্য নতুন নতুন মূল্যবান সংযোজনের দ্বারা তারা সমৃদ্ধ করে তোলে।"[২০]

[২০]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, CV¸ ³, পৃ. ৬০-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

প্রকৃতপক্ষে ৭ম শতাব্দীতে মুসলিম স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মূল অভিযাত্রা শুরু হয়। আরবের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের পটভূমিতে মুসলিম দুনিয়ায় যে বহুমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি দেখা দেয় তা ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসকে মহিমাময় করেছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের এতো অবদান যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে মুসলিম শব্দটি আপনা-আপনি চলে আসে। তাঁরা ছিলেন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকপাল। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা রোগীর রোগ নির্ণয়ে যে বিষয়গুলো নিরীক্ষণ করতেন তা হলোঃ ১. বাহ্যিক অবস্থা, ২. মল মুত্রাদির অবস্থা, ৩. গায়ের গন্ধ ৪. বেদনার স্থান, ৬. শরীরের স্ফীতির স্থান ইত্যাদি। এজন্য দেখতে হতো রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশের অবস্থা, রং, গন্ধ, চক্ষু গহ্বর, মুখের আকার-ভঙ্গী, অবসন্নতা, রোগীর আচরণ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি বিষয়।

অষ্টম শতকে বাগদাদকে কেন্দ্র করে এক বিরাট ইসলামী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ব্যাপকতার সীমা কাঠামোর এ যুগ মহান সাধনার ক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। এই যুগকে ঐতিহাসিকগণ জ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন। বাগদাদ সভ্যতার শিখরে উঠে যায়। বাগদাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়। দর্শন, সাহিত্য, ললিতকলা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে উন্নীত হয়। খলিফা আল-মনসূর (৭৫৪-৭৭৫), খলিফা হারুন-অর রশীদ (৭৮৬- ৮০২), খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩) এবং পরের খলিফাদের সময়ে অর্থাৎ ৭৫৪ থেকে ১২৫৮ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণযুগ ছিল।[২১] তখন থেকেই সাধনা ও অনুশীলনের ক্রম-বিকাশ ঘটে। এ সময়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উন্নতি ও চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য বড় বড় হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। হাসপাতাল বিন্যাস ও পরিচর্যায় উৎকর্ষতা লাভ করে, যার নিদর্শন আজও বর্তমান।

এ যুগে আরবরা প্রাগৈতিহাসিক গ্রীক ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি উদ্ধার করে এবং সেগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদ করে। আরবী ভাষার তখন পুরা যৌবন। তখন পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ এলাকার লোক এই ভাষায় কথা বলে। যে অবদান অন্ধকারে ছিলো, মানব কল্যাণে মুসলমানগণ তা বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেন। তাঁরা বিরাট খেলাফতের বিভিন্ন স্থানের পন্ডিতগণের নিকট সাধনালব্দ এই সব আরবী অনুবাদ বিলিয়ে দেন জ্ঞান চর্চার জন্য। গবেষক, জ্ঞানী-গুণী ও পন্ডিতগণ চমকিত হন। আকৃষ্ট হন নব নব জ্ঞান অনুশীলনে। জ্ঞান-বিজ্ঞান নতুন রূপ লাভ করে। মানুষ জ্ঞান পিপাসা নিবারণার্থে ভীড় জমাতে থাকে। মুসলমান এক উদর জাতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে পৃথিবী এ নজীর-বিহীন উদারতা আর দেখেনি। তখন মুসলমানগণ নব নব গবেষণার মাধ্যমে অনেক মৌলিক তথ্য ও উপাদান সংযোজন করে নতুন বিজ্ঞান সৃষ্টি করেন। ১০ শতাব্দীর প্রথম দিকে খলিফা মুকতাদির চিকিৎসকদের উপযুক্ততা সম্বন্ধে পরীক্ষা করে লাইসেন্স প্রদানের প্রথা প্রবর্তন করেন। প্রথম বৎসরেই ৮৬০ জন চিকিৎসক লাইসেন্স প্রাপ্ত হন। বাগদাদের মতো অন্যান্য স্থানেও এমনি সনদ দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং এ প্রথা অন্তত ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[২২] আরব তথা মুসলিম বৈজ্ঞানিক মধ্যস্থতায় ইউরোপের রেনেসাঁর যুগে তথাকার বিজ্ঞানীরা গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানকেই হাতের কাছে পেয়েছিলেন এবং তারই উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা বিজ্ঞান তথা সমস্ত দর্শন

[২১]. ডাক্তার এম. এ. ওয়াহেদ, C৺, 3, পৃ. ৩

[২২]. এম আকবর আলী, C৺, 3, পৃ. xv

বিজ্ঞান নতুন করে গড়ে তোলেন। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীর পর থেকে আজকের দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান তারই ফলাফল।

গ্রীক চিকিৎসা ছিল অনেকটা তাত্ত্বিক বিষয়, মুসলিম সাধনার মধ্যে এর পার্থক্য হল মুসলমানরা হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন ও পেতেন। গ্রীকদের অন্ধ অনুকরণ থেকে আররাজী, ইবনে সীনা, আবদুল লতিফ, সাঈদ বিন বিশর প্রমুখ চিকিৎসক বেরিয়ে এসেছেন। হাম ও বসন্ত দুটি পৃথক রোগ আররাজী সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এ সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থ কিতাব 'হাসবাতি ওয়াল জুদরি' ইউরোপের প্রায় ১২টি ভাষায় অনূদিত হয়। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'Sherringtons, Conditional Reflex Theory' নামে আর রাজীর মতবাদটি পরিচিত। শিশুরোগ সম্পর্কে আররাজীর মতবাদ সম্পূর্ণ নিজস্বতা দান করেছে। তাঁকে Pharmacologhy-এর জনক বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম Internal বা Ventriculla Huydrocephalus সম্বন্ধে বর্ণনা করেন এবং Hydrocephalus নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে আবু আলী হোসাইন ইবনে সিনা সবচেয়ে বিখ্যাত। মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর মূল অবদান ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রে। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশ্বকোষ আল-কানুন ফিত-তীব রচনা করেন যা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠ ছিল। আরবিতে ইবনে সীনাকে আল-শায়খ আল-রাঈস তথা জ্ঞানীকুল শিরোমণি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পশ্চিমে তিনি অ্যাভিসিনা নামে পরিচিত। তাঁকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিসেবে সম্মান করা হয়ে থাকে।[২৩]

মুসলিম ফার্মাকোলজী তথা 'ওষুধ বিজ্ঞানে' বিদেশী প্রভাব অন্যান্য বিষয়গুলোর মত কাজ করেছে। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করে জেনেছেন যে, বর্তমানের Materia Medica, Therapy Pharma Centics ইত্যাদি ওষুধের দ্রব্য গুণাবলী এক সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

আরব বিজ্ঞানীরা Pharmacology বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বিন্যাসে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তা মোটামুটি ৭ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. সমার্থ শব্দের গ্রন্থ (Synonymatic Trealises);
২. ব্যবস্থাপত্র সংকলিত গ্রন্থ (Medical Formularise);
৩. ব্যবহারিক ওষুধ বিজ্ঞানের তালিকা (Materia Medica);
৪. বিকল্প ওষুধ (Substitute Drugs);
৫. ফলাকারে সাজানো সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ (Tabular, Synoptic Texts);
৬. বিষ ও বিষক্রিয়া সম্পর্কে আলোচিত গ্রন্থ;
৭. চিকিৎসার কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ (Works on Medical Specialities);

আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ওষুধ সাধরণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন : ১. মুফরাদা থেকে তথা অযৌগিক; ২. মুরাক্কাব তথা যৌগিক। অযৌগিক ওষুধগুলোকে ৪১ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। মূলাত্তিক (Raifying), মুহাল্লিল (Loosening), জালি (Polishing), মুখাশশিন (Making

[২৩]. https://bn.wikipedia.org/wiki

rough), মুসখি (Relasing), মুফাত্তিই (Opening), মুয়াফফিল (Digestive), কাবী (Purga-tive) কাসীরুহ রিয়াহ (Wind breaking), মুকাত্তি (Cutting off), জাযিব (Pulling), লাজী (Biting), মুহায্যির (Epispastics), মুহাক্কিক (Consuming), মুকাররিহ (Wiping off Hard), মুবাররিদ (Cooling), (Fortifying), (Repellent), (Incrasstive), (Repellent), (Narcotic), (Moistening), মুনাফফিখ (Making Odorous), গাসসাল (Washer), মুওয়াস্সিখ লিল করা (Making the ulcers filthy), মাজজাক (Tearing), মুমল্লিস (Emollient), মুজাফফিক (Desicative), কাবিদ (Astringent), আসিব (Compressing), মুসাদ্দিদ (Comstipating), মুরগী (Agglutinas) মুদামিল (Cicatrizing), মুনবিত লিল লাহম (Making flesh grow), খাতীম (Covering).

ওষুধ তৈরী ও ব্যবহার পদ্ধতি[২৪] :

১. শুররা (Syrup): কোন কিছুর রস হলো এই শুররা। গোলাপ, নেনুফার ভায়লেট ইত্যাদি ফুল থেকে রস তৈরী করতে হলে ফুলের পাতা ফেলে দিয়ে ৪ আউন্স পরিমাণ ফুল নিয়ে খুব গরম পানিতে যতক্ষণ না রস বেরিয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত পাত্রের মুখ বন্ধ করে ডুবিয়ে রাখা হতো। এর পর ১ রাতল চিনি, কমলা ফুলের রস যোগ করে মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিলে ঘন হওয়ার পর ব্যবহার করা হতো।
২. রব (Rob): সিরাপ তথা রস ও রবের মধ্যে পার্থক্য হল রব সাদামাটা ঘন রস আর সিরাপ চিনির সাথে জ্বাল দিয়ে তৈরী ঘন রস। যেমন সিট্রন লেবুর 'রস' তৈরী করতে সিট্রনের মধ্যেকার জিনিস বের করে একটি পাথরের পাত্রে চটকে রস বের করা হতো, তারপর মৃদু জ্বাল দিতে হতো যতক্ষণ পর্যন্ত এক চতুর্থাংশে না দাঁড়ায়। এ 'রস' সাধারণত ঠান্ডা, শুষ্ক, বিষ প্রতিষেধক, পিত্ত ঠান্ডা কারক, কোষ্ঠবদ্ধতা নিরাময় কারক ও হৃদপিন্ড সবলকারীরূপে ব্যবহৃত হতো।
৩. লোহোক (Lohochs): কাশি ও ফেরিণজাইটিসের জন্য এই ওষুধ প্রয়োজন হয়। ৬ দেরহাম আকাকিয়া, কাছিয়া, নাশাজাতিজ, যষ্ঠিমধুর রস, চিনি এবং হালুয়া, ৫ দেরহাম করে কুইনসের খোসা ছড়ানো বীজ, চিনি মাখানো কদুর বীজ, মিষ্টি বাদামের খোসা ভেঙ্গে গুড়ো করে ছেঁকে ঘন ফেনাসহ জোলাপের সাথে মিশিয়ে সবগুলো একত্রে না মেশা পর্যন্ত জ্বাল দিতে হতো।
৪. তাবাখ (Decoction): সাধারণত ক্বাথ তৈরীকরণ প্রথাকে বুঝায়। কোন কোন জিনিস এককভাবে বা অনেকগুলো জিনিস একত্রিত করে সেগুলোর ক্বাথ বের করে সবগুলো একত্রে না মেশা পর্যন্ত জ্বাল দিতে হতো ।
৫. নাকু (Infusion): বিনা জ্বালের ক্বাথ। পানির মধ্যে শিকড়, বীজ, ছাল, গাছপালা, জীবজন্তু ও খনিজ দ্রব্যদির কোন অংশ থেকে এ ওষুধ তৈরী করা হতো।
৬. সাফূফ (Dry drug): সাধারণত গুড়ো হিসাবে এই ওষুধ ব্যবহার করা হতো। মুসলিম জগতে এটি তেমন জনপ্রিয় হয়নি।
৭. নাতুল (Forment): সেকঁ দেয়ার জন্য তৈরী হতো এ ওষুধ। এটা গাছ গাছড়ার উপাদান দিয়ে তৈরী অল্প গরম ক্বাথ। মাথা ব্যথা ও শরীরের কোন অংশের বেদনায় সংশ্লিষ্ট অংশটি এ

[২৪]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C//¸ ³, পৃ. ৮৮

দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হতো বা মুছে দেয়া হতো। অনেক সময় সুগন্ধ করা হয় এবং অনেকক্ষণ ফুটিয়ে তৈরী করা হয়। এছাড়া নানা প্রকার মোরব্বা, মিষ্টান্ন, মধু, দারিয়াক ওষুধ হিসাবে এবং কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হতো।

ইউহান্না ইবনে মাসুবিয়াঃ জন্ম ৭৭৭ খ্রি. মৃত্যু ৮৫৭: তিনি ৫৭ খানা চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২৫] স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে শারীরবিদ্যা (Physiology), এনাটমী ও সার্জারী চিকিৎসায় মুসলিম চিন্তাধারার নতুনত্ব আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে গতি সঞ্চারে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগতি সাধন করেছেন চক্ষু চিকিৎসায়। এ বিষয়ে তাঁদের মৌলিক অবদান স্বীকৃত হয়েছে। ড. এলগুড বলেন, 'Glaucoma under the name headache of pupil was first described by an Arab, Phlyetenulae and the 'string of pearls vesicles on a blanched eye-ball appear for the first time in Arab literature.

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় হাসপাতাল

তৎকালীন যুগের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কেবল চিকিৎসা গবেষণা, উদ্ভাবন এবং এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত থাকেনি; এই সময়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অসংখ্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে উঠে। চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে মহানবী (সা.) যে স্বাস্থ্য নিকেতন বা হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন সেটিই ইসলামের প্রথম হাসপাতাল। এই হাসপাতাল জিহাদের ময়দানের অনতিদূরে অবস্থিত। প্রিয়নবী (সা.) প্রত্যেক যুদ্ধেই ময়দানের নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যোপযোগী স্থানে চিকিৎসার জন্য আলাদা তাঁবু স্থাপন করতেন। এছাড়া মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় ছিল রোগীর চিকিৎসা এবং সেবা শুশ্রুষার জন্য তৈরী মিনি হাসপাতাল। এই হাসপাতালে মুসলমান এবং বিধর্মীদের সাথে সংঘাতে আহত মুসলমানদের চিকিৎসা হতো। সাইয়্যেদা নাসীবা বিনতে কা'ব আল্ আনসারী (রা.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। তিনিই ছিলেন প্রধান ডাক্তার যিনি ইসলামের এই প্রথম হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা আঞ্জাম দিতেন।

উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সময়কালের পূর্ব পর্যন্ত এধরনের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়। এসময়ে অনেক ভ্রাম্যমান হাসপাতাল তৈরী করা হয়। মুলতঃ ইসলামের এসব ভ্রাম্যমান হাসপাতালই পরবর্তীকালে মূল হাসপাতাল স্থাপনের সুতিকাগার। এ ধারায় খলীফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম বিপুল অর্থ ব্যয় করে অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত এক বিশাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন প্রথিতযশা চিকিৎসকগণকে তথায় চিকিৎসা সেবায় নিয়োগ করা হয়। হাসপাতালে রোগের শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী পৃথক বিভাগ ছিল। প্রত্যেক বিভাগে থাকতো আলাদা চিকিৎসক। উন্মাদ এবং স্বল্পবুদ্ধির লোকের জন্যও পৃথক বিভাগ ছিল।

পরবর্তীতে ইসলামী শাসনের বিভিন্ন সময়ে বাগদাদ, কার্ডোভা, দামিশ্ক, কায়রো প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরে অনেক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব হাসপাতালে যুগশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদগণ চিকিৎসা করতেন। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগসহ চর্ম, কলেরা ও বসন্ত রোগের চিকিৎসার জন্য এসব হাসপাতালে ছিল স্বতন্ত্র বিভাগ। তাছাড়া রোগীদের চিত্তবিনোদনের জন্যও আলাদা বিভাগ পরিচালিত হতো। চিকিৎসা সচেতনতা, রোগ সচেতনতা ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতি

[২৫]. এম আকবর আলী, C৷¸ ³, পৃ. ১৭

ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতার জন্য হাসপাতালের আলাদা হলে বক্তৃতা মঞ্চের ব্যবস্থা থাকতো। গোসলখানাসমূহে রোগীদের উপযোগী ঠান্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক রোগীকে হাসপাতালে অবস্থানকালীন দেয়া হতো জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার পরিধেয় এবং তোয়ালে।

এসব হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সাথে আজকের অত্যাধুনিক হাসপাতাগুলোরও তুলনা করা যায় না। সেসব হাসপাতালসমূহে রোগীদের প্রয়োজন এবং চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন হালাল পশু-পাখীর গোশ্ত ফল-ফলাদিসহ বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য সরবরাহ করা হতো। কুলীন-অকুলীন, গরীব-ধনী, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই হাসপাতালসমূহ হতে সমানভাবে সুবিধা ভোগ করতো। অভিজ্ঞ চিকিৎসকমন্ডলীর ব্যবস্থাপনায় এবং খুব মনোযোগ এবং হৃদ্যতা সহকারে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হতো। এ কারণে অতি দ্রুত রোগীরা আরোগ্য লাভ করতো।

ইসলামী যুগে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় শুধু শাসকদেরই অবদান না এ কাজে সমকালীন চিকিৎসকরা ক্ষমতাসীনদের সাহায্য সহযোগিতা দাবী করতেন। ফলে, বিভিন্ন যায়গায় গড়ে উঠতো হাসপাতাল। শাসকরাও অকৃপণ হাতে সার্বিক সাহায্য দিয়ে হাসপাতালে স্থাপনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ইতিহাসের পাতায় সে কাহিনীসমূহ আজো সযত্নে রক্ষিত আছে।[২৬]

ইসলামী যুগে হাসপাতালের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ওরিয়েন্টিষ্ট ড. ডানল্ড ক্যম্বল বলেন, "একমাত্র কর্ডোভায়ই ইসলামী শাসনামলে প্রায় ৫০০ চিকিৎসা কেন্দ্র ছিলো।" তখনকার হাসপাতালসমূহের মধ্যে "আল জেকিরাজ" ছিল অন্যতম। সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত রাজ চিকিৎসকরা এটি পরিচালনা করতেন। এছাড়া রাজকীয় চিকিৎসা প্রধানের উপর হাসপাতালটির পরিচালনাভার ন্যস্ত ছিল। এ কার্যনিবাহী পদে মুসলমান হওয়ার কোন প্রয়োজন পড়তো না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক, কৌশলী ও পরিশ্রমীদের এখানে নিয়োগ করা হতো। অনেক ইহুদী ও খৃষ্টান চিকিৎসক এই হাসপাতালে কাজ করতো।

উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা এক এক করে প্রত্যেক রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসে মত বিনিময় করতো। কর্ডোভার প্রত্যেক হাসপাতালেই রোগীর তালিকা পুস্তকে লিখিত এবং রক্ষিত হতো। সরকারী চিকিৎসকরা দূরবর্তী স্থানের রোগীদের পরিদর্শন করতেন। গরীব এবং নিঃস্ব রোগীরা বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা সুবিধা লাভ করতেন। তাদের প্রতি সেবা ও চিকিৎসায় কোন অবহেলা প্রদর্শন করা হতো না। স্বাস্থ্য রক্ষার দিক দিয়ে হাসপাতালসমূহ বর্তমান যুগের হাসপাতালগুলি হতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। বর্তমানে হাসপাতালসমূহের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং রোগীর প্রতি দরদহীন যে ব্যবস্থা চালু আছে তার চাইতে স্পেনসহ অন্যান্য হাসপাতাল অনেকগুণ পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত ছিল।

মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষে অসংখ্য হাসপাতাল গড়ে উঠে। এসব হাসপাতালেও সব রকমের সুবিধা, ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদি মজুদ থাকতো। অন্যান্য চিকিৎসা বিভাগের সাথে সার্জারী বা অস্ত্রোপচারের আলাদা বিভাগ ছিল। শরীরের বিভিন্ন স্থানের জন্য আলাদা আলাদা দায়িত্বপ্রাপ্ত সার্জনও ছিলো। ড. আমীন আসাদ খায়রুল্লাহর 'আত তীব্বুল আরাবী' ইবনে আবী আসিবা কৃত 'তবকাতিল আতিব্বা' জুজী জায়দান প্রণীত 'তারিখে তমদ্দুনে ইসলামী, এবং ড. ডানল্ড ক্যম্বল রচিত 'এ্যারাবিয়ান মেডিসিন' নামক গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ রয়েছে।

সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ জংগী ছিলেন মুসলিম শাসকদের মধ্যে কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব। তিনি দামিশ্ক নগরীতে এক বিশাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এ হাসপাতালে সব ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান

---

[২৬]. https://www.google.com/search?q

করা হতো। সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণকে এই হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত করা হতো। হাসপাতাল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তিনি বিপুল অর্থসম্পদ ব্যয় করেন। হাসপাতাল সংলগ্ন ভবনে তিনি যে গ্রন্থাগারটি স্থাপন করেন সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখার অসংখ্য মূল্যবান বই এবং পান্ডলিপিতে সমৃদ্ধ ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর রোগীরা এখান থেকে চিকিৎসা সেবা পেতেন।

'সুলতান নুরুদ্দিন জংগী হাসপাতাল' নামে উক্ত হাসপাতালের প্রধান এবং মুখ্য চিকিৎসক ছিলেন আবুল হিকাম ওরফে ইবনুদ দাখওয়ার, ইবনু আবী উসাইবা এবং ইবনু নাফীস প্রমুখ। তাঁরা প্রতিদিন সকালে নিয়মিত প্রত্যেক রোগীকে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ খবর নিতেন। তাদের রোগাবস্থা এবং ইচ্ছা-আকাংখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। এ সময় প্রধান চিকিৎসকদের পেছনে থাকতো সেবক-নার্সদের বিরাট দল। চিকিৎসকদের তাৎক্ষণিক নির্দেশ তামিলের জন্য এসব নার্স সর্বদা প্রস্তুত থাকতো এবং রোগীর যথাসাধ্য উত্তম সেবায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখতো। দৈনিক রোগীদের অবস্থার উন্নতি-অবনতি দেখার জন্য শয্যাপাশে চার্টের ব্যবস্থা থাকতো এবং সাথে ওষুধের পরিমাণ এবং খাদ্য তালিকাও থাকতো।

হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক আবুল হিকাম ভিআইপিদের পরিদর্শনের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষে যেতেন। রোগী দেখার পর তিনি বিরাট এক হলরুমে বিশাল গ্রন্থগারের মাঝখানে বসে চিকিৎসা বিষয়ক নোট লিখতেন। এ সময় বহু ডাক্তার ও ছাত্র-শিক্ষার্থী তাঁর কাছে বসতেন এবং জটিল রোগ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতেন। মারাত্মক এবং জটিল জরুরী কোন রোগীর চিকিৎসার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হতো।

সুলতান নুরুদ্দিন হাসপাতালে একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বিশেষ যত্নের সাথে চিকিৎসা বিদ্যার বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হতো। বিভিন্ন রোগীর শ্রেণী, রোগের ধারা, চিকিৎসা, ওষুধ, ইত্যাদি নিয়ে পরিচালিত হতো সূক্ষ্ম গবেষণা। এক্ষেত্রে এ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিরাট সাফল্য অর্জন করে। সে যুগের সকল খ্যাতিমান এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ ছিলেন এ শিক্ষায়তনের অধ্যাপক। ফলে, এখান থেকে অসংখ্য চিকিৎসক বের হয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।

বাগদাদ নগরীতে এক জাঁকজমকপূর্ণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন খলীফা আসাফুদ্দৌলাহ। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রকল্পের প্রধান ছিলেন বিশিষ্ট মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর রাজী (৮৪১-৯২৬ খৃ.)। তিনি এবং সাবিত বিন সিনান ছিলেন হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক। এ হাসপাতালের রোগীদের ওষুধ-পত্র এবং খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য আরামাদির জন্য যাবতীয় খরচ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হতো। হাসপাতারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূসম্পত্তি ওয়াক্ফ করা হয়।

ফিরিস্তা (১৫৭০-১৬১১) নামক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, সুলতান মাহমুদ খালাজী সাহিবাবাদ (বর্তমান মধ্য প্রদেশের মান্ডু) শহরে একটি আরোগ্যশালা স্থাপনা করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন।[২৭] কায়রো নগরীতে প্রতিষ্ঠিত মিসরের 'মানসুর কালাউন' একটি বিখ্যাত হাসপাতাল। মিসরের বাদশাহ মানসূর কালাউন এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে আন্ নাফীস (মৃত ১২৮৮ খৃ.), ইবনে আবি উসাইবা, ইবনে রিদওয়ান প্রমুখ চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এ হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। ইবনে রিদওয়ান ছিলেন হাসপাতালের প্রধান পরিচালক। তিনি সহকর্মী ও অন্য রোগীদের আরাম ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে রাত্রি জাগরণ করার নির্দেশ দেন। দক্ষ পরিচালনা, শৃংখলা, পরিচ্ছন্নতা, অনাবিল স্বাস্থ্যকর স্থান,

[২৭]. ডাঃ নাজির হোসেন, cvKwUK¨vj Kx U †nwgI c¨w_, ঢাকা: নাজির হোমিও হল, এপ্রিল ২০১০, পৃ. ২৭

উন্নত চিকিৎসা এবং রোগীদের প্রতি সার্বক্ষণিক খেদমতের জন্য এ হাসপাতালের দ্বার সবার জন্য সবসময় খোলা থাকত।

এভাবে ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রতিটি শহর, লোকালয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ সম্প্রসারিত হয়। রোগীদের সুবিধার প্রতি সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রাখা এবং আন্তরিকভাবে চিকিৎসা করাই ছিল এ হাসপাতালগুলোর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। প্রাতিষ্ঠানিক হাসপাতাল ছাড়াও বিশেষত গ্রামাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তখন ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পদ্ধতি চালু ছিল। যে সব অঞ্চলে ছোঁয়াচে এবং মহামারী ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকত সে সব অঞ্চলে ভ্রাম্যমান চিকিৎসকদল ঘুরে বেড়াতেন। সকল যুগে এটাই হল সহজ এবং ত্বরিত গতিতে চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর সর্বাধুনিক পন্থা। মোটকথা, রোগ প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা, হাসপাতালে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষাদান, পাঠাগার সংগঠন, সমাজ ও রোগ সচেতনতা বিষয়ক বক্তৃতা দান, চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনের ব্যাপারে মুসলমানরাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বজনস্বীকৃত পৃষ্ঠপোষক ও অগ্রপথিক।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তৎকালীন যুগে সার্জারীর ক্রমবিকাশ

বর্তমান অস্ত্র চিকিৎসা বা সার্জিক্যাল বিদ্যা প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। আধুনিক ও নবনব গবেষণা ও উদ্ভাবনের ফলে অনেক আশ্চর্যজনক অস্ত্রোপচার এখন সম্ভব হচ্ছে।[২৮] প্রাচীনকালে ভালো ভেষজ ওষুধের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা থাকায় অস্ত্র চিকিৎসার তেমন প্রয়োজন পড়তো না। এ কারনে সেকালে অস্ত্র চিকিৎসা জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়নি।

মুসলিম চিকিৎসাবিদদের অস্ত্র চিকিৎসা ও গবেষণার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যার কিছু বিবরণ উপরে উল্লেখিত হয়েছে। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের হাতেই সার্জিক্যাল বা অপারেশনের উৎকর্ষ ঘটে। তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সার্জিক্যাল বিদ্যা জনপ্রিয়তা লাভ করে। মুসলিম চিকিৎসাবিদরা পশু পাখী এবং প্রাণীর মৃতদেহ নিয়ে গবেষণা করতেন এবং সার্জারীর উপসর্গ ও সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয় করতেন।

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলোতে অপারেশনের জন্য অপরিহার্য শরীর বৃত্ত নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। আবদুল লতীফ ইউসুফ বাগদাদী (১১৬২-১২৩১খৃঃ) কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে মিসরের এক লাশের স্তুপে মানব দেহের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়াও আবু আলী ইবনে সীনার 'আল্‌কানুন' আলী ইবনে আব্বাসের 'কামেলুস সানাসাত' এ বিষয়ে জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ। মূলতঃ এ বিষয়ে ইবনে সীনা এবং ইমাম আর রাজীর গ্রন্থাবলীর চেয়ে ভালো আর কোন গ্রন্থ নেই। অতঃপর সমকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে নফীস (মৃত্যু ১২৮৮ খৃ.) তার 'আল কানুন'-এ শারীর বৃত্তের বিভিন্ন অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ইবনে রাজীর আরেকটি অসমাপ্ত গ্রন্থ 'মানাফিউল আ'জা'-তে মাথা থেকে গলা পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মুহাম্মদ বিন জাকারিয়ার গ্রন্থ 'হাইয়্যাতুল কুলব, হাইয়্যাতুস সেমাঘ' এবং 'হাইয়্যাতিল মাফাসিল' ইত্যাদি গ্রন্থও অতুলনিয়। এসব বিজ্ঞানী সমকালীন যুগে এসব শাস্ত্রে নক্ষত্রের মতো ছিলেন। তারা শুধু গবেষণা ও অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত থাকেননি, দেশের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করেছেন। এসব কেন্দ্রে অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও সার্জারীর (অস্ত্রোপচারের) আলাদা বিভাগ ছিলো। এসব বিভাগে অস্ত্রোপচারের আলাদা সার্জন বা অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। মুসলিম

---

[২৮]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C/, 3, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসাবিদদের হাতেই সার্জারী এবং অপারেশনের উন্নয়নের সূচনা ঘটে। আজকের আধুনিক সার্জিক্যাল বিদ্যা মুসলমানদেরই অবদান। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহান সৃষ্টিকর্তা স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা এবং বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন হাদীসের আলোকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। সপ্তম শতক থেকে ১৬৮০ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত বহু মুসলিম গুণিজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উম্মোচন করে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর জন্য রেখে গেছেন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। মুসলিম চিকিৎসাবিদদের মধ্যে যাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য অমর হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে হালাফ আল-তুলুনি (৮৪২-৮৯৭), আলী ইবনে রাববানী আত-তাবারী (জন্ম ৮৫০), আবুবকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া আল-রাজী (জন্ম ৮৬৫), আবূল কাসেম বিন্ আব্বাস আল জাহরবী (৯৩৬-১০১৩), আলী ইবনে ঈসা (৯৫০-১০১০), আলী ইবনুল আব্বাস (৯৬০-৯৯৪), আবূ আলী আল হাসান ইবনুল হায়সাম (৯৬৫-১০৪৩), আবূ মনসুর (জন্ম ৯৭০), আবূল কাসেম আমর বিন আলী আল মাওয়াসিসী (জন্ম ৯৭০), আবূ আলিয়ুল হুসায়ন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সী'না (৯৮০-১০৩৮), আবেন গুফেট (৯৯৮-১০৪৭), আবূ রূহ (জন্ম ১০৭০), উসায়বী (জন্ম ১২০৩), আবূল হাসান আলাউদ্দীন আলী ইবনে আবূল হাসেম ইবনে নফিস (১২১০-১২৮৮), আসসামরকান্দি (মৃত্যু ১০৯৫), আবূ ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহম্মদ ইবনে রূশদ (১১২৬-১১৯৮), শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন সৈয়দুল আন্সারী, হালিফা বিন আবূল মহসীন আল হালাবী, কামাল উদ্দিন হাসানুল ফারেসী, মুমিন বিন মকবুল (জন্ম ১৪২২), হাফেজ হাসান আফেন্দী (১৭২৮-১৮০১), এহিয়া আননাহভী, জাবির ইবনে হাইয়ান, ইবনে বখত ইয়াশু, আলবাতরিক, ছিউফিল ইবনে ছুমা, ইবনে বাতরিক, ইবনে সাহদা, জিবরাইল ইবনে বখত ইয়াশু, সালমুবিয়া ইবনে বুনান, মাসুবিয়া আবু ইউহান্না খুজী, ইউহান্না ইবনে মাসুবিয়া, মিখাইল বিন মাসুবিয়া, সাহল বিন সাবুর, আলকিন্দী, রব্বান আততাবারী, আলী বিন রব্বান, আইয়ুব আররাহাবী আলআবরাশ, ইবরাহিম বিন আইয়ুব, আলআবরাশ, আবুল হাসান আহম্মদ আততাবারী, সাবুর বিন সহল, ইয়াহিয়া ইবনে সারাফিউন, আররাযী, আততামিমি, আলবালাদি, হাসদাই ইবনে শারবুত, আরীব ইবনে সাদ, আবুল কাসিম, ইবনে জুলজুল, ইবনুল জাযযার, আলকিরমানী, ইবনুল ওয়াযিদ, মারওয়ান ইবনে জানাহ, মাসুবিয়া আল মারদিনী, আম্মার বিন আলী, ইবনুল হাইছাম, আলী ইবনে রেজওয়ান, আলবেরুনী, ইবনে সিনা, আবু সাইদ ওবায়দুল্লাহ, ইবনে বুতলান, আলী ইবনে ইসা, ইবনে জাযলা, সাইদ ইবনে হিবাতুল্লাহ, জরিন দাস্ত, ইবনে সারাবী, ইবনে হাসদাই, ইবনে জামী, আবুল মাআলী, ইবনুল বিশর, সোলায়মান কুহেন, আল কুহেন, আবুল হাসান বি গাযাল, সাদাকা বিন মুনাজা, দাউদ বিন সোলায়মান, আলআসাদ আলমাহাদী, ইবনুল বাইতার, মাসুবিয়াহ, নজিব ইদ্দীন আসসমরকন্দী, ইবনে আবি ওসাইবিয়া, ইবনুল কিফতি, ইবনুল লুবদী, ইবনুস সুরী, আব্দুল লতিফ, ইবনুস সাআত, ইবরাহিম বিন আররইস মুসা, মুসা বিন মায়মুন, আবুল মাআলী, ইবনে জামী, ইবনুন নাফেদ, ইবনুল মুদাব্বর, সামুয়েল ইবনে আব্বাস, শেশেত বিন কেনিতে, মোয়াফ্ফক উদ্দিন, ইবনুল কাফ, ইবনুল নাফিস, ইবনোদ দাখওয়ার, খলিফা ইবনে আবিল মহসিন, সালাহউদ্দিন ইবনে ইউসুফ, নাসিরউদ্দিন তুসী, কুতুবউদ্দীন শিরাজী, মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ, আহম্মদ ইবনে মোহাম্মদ, ইবনুল কুরতুবী, মাহমুদ ইবনে ইলিয়াস, ইবনুল আকফানী, ইবনে কাইয়ুম আলজাওযীয়া, রশীদ উদ্দীন ফজলুল্লাহ, আবু সাইদ আলআফিফ, মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ, মোহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে আবি হাজালা, আশশাদহিলী, আলমামবিজী, মোহাম্মদ আলমাহদী, আলআকসারাই, ইসহাক ইবনে মুরাদ,

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ ইবনে মাহমুদ, হাজী পাশা, জয়নুল আক্তার, মনসুর ইবনে মোহাম্মদ, ইবনুল আতীব, মুসা বিন মায়মুনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।[২৯]

এ ছাড়া আরো অনেক চিকিৎসক ছিলেন, যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদানের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ অবদানের কারণে সে বিষয়ে পরিচিতি লাভ করেন। চিকিৎসার পাশাপাশি দর্শন, রসায়ণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর যারা পরিচিতি লাভ করেন, তাঁরা হলেন আবুবকর মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ইবনে বাজা। তিনি পাশ্চাত্যে আভেম পোস নামে খ্যাত। আল কিন্দী, পূর্ণ নাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল কিন্দী, ইমাম আবু হামিদ মুহম্মদ আল গাযালী, তিনি আল গাজ্জালী নামে বিশ্বের দরবারে বিশেষভাবে পরিচিত। ওমর খৈয়াম, আল বিরুণী প্রমুখ রসায়নবিদ, জ্যোতিষী ও ঐতিহাসিক রূপে খ্যাতি লাভ করলেও তাঁরা একেক জন বড় মাপের চিকিৎসা বিজ্ঞানী। জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে এ প্রতিভাধর চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবাক করার মতো যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা সত্যই বিরল। আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানে যা কিছু অবদান তার সিংহ ভাগ তাঁদেরই অবদান।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ইতিহাস

১৮১০ থেকে ১৮৩৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভারতে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং এখনও এই চিকিৎসার জনপ্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে।[৩০] বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচলন হয় ব্রিটিশ আমলে। প্রাথমিক অবস্থায় হাতে গোনা কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এলোপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। এদেশের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশরা দক্ষ ইংরেজ চিকিৎসক নিয়োগের এবং স্বাস্থ্যখাতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৮৫৯ সালে বহু বেসামরিক লোক ও সেনা সদস্যের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি রয়েল তদন্ত কমিশন ভারতে পাঠানো হয়। কমিশন প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে একটি করে জনস্বাস্থ্য কমিশন গঠনের সুপারিশ করে। ১৮৬৪ সালে বোম্বে, মাদ্রাজ ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রত্যেকটির জন্য প্রতিটি ৫ সদস্যের ৩টি স্যানিটারি কমিশন গঠিত হয়। সিভিল সার্জনরা পদাধিকার বলে জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৯ সালে মেডিক্যাল অফিসার পদের নাম বদলে স্যানিটারি কমিশনার রাখা হয়। সরকার ঐ বছরই কেন্দ্রে ও অন্যান্য রাজ্যে কয়েকজন স্যানিটারি কমিশনার নিযুক্ত করে। ১৮৭৩ সালে আইনের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৮৮০ সালে গুটিবসন্তের টিকা নেওয়ার জন্য আইন এবং ১৮৮১ সালে প্রথমবারের মতো ভারতীয় শিল্পকারখানা আইন চালু হয়। ১৮৯৬ সালে হাজার হাজার লোক প্লেগ রোগে মারা যায় এবং সরকার একটি প্লেগ কমিশন গঠন করে। ১৮৯৭ সালে সংক্রামক ব্যাধি আইন ঘোষিত হয় এবং ১৯০৪ সালে প্লেগ কমিশন তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে। কমিশন জনস্বাস্থ্য সংস্থাগুলি পুনর্গঠনের সুপারিশ করে। অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলার স্যানিটারি কমিশনার জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ পায় এবং সংস্থার অফিস সার্জন জেনারেলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। স্যানিটারি কমিশনার সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ শুরু করে।

[২৯]. এম আকবর আলী, cÖv¸³, পৃ. ii

[৩০]. ডাঃ নাজির হোসেন, cÖv¸³, পৃ. ৩১-৩২

১৯০১ - ঢাকায় আয়ুর্বেদিক ওষুধের কারখানা শক্তি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯১২ - পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিভাগ গঠন করা হয়।

১৯১৪ - ঢাকায় সাধনা ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯১৯ - মন্টেগু-চেমসফোর্ডের প্রশাসনিক সংস্কার আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারগুলির ওপর ন্যস্ত করে।

১৯৩০ - সাইমন কমিশন কর্তৃক একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বোর্ড গঠন করে বিভিন্ন প্রদেশের স্বাস্থ্যসেবার বিকাশ ও সমন্বয় বিধানের সুপারিশ করে।

১৯৩০ - বাংলার রাজধানী কলকাতায় রকফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে All India Institute of Hygiene and Public Health প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৩৮ - কুমুদিনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৪৩ - দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ভারত সরকার স্যার জোসেফ ভোর এর নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য সেবার জরিপ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির এই রিপোর্টে ১৯৪৫ সালে ভারতে 'সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা' এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। তবে কমিশন 'সমন্বিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা' বলতে একটি পূর্ণাঙ্গ রোগনিবারক, আরোগ্যকর ও উন্নয়নমূলক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতিটি বাসিন্দার নিকট পৌঁছানোকে বুঝিয়েছিল।[৩১]

১৯৪৬ - ঢাকায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় এই প্রদেশটিতে ভারত থেকে অধিক সংখ্যায় উদ্বাস্ত আগমণের ফলে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যসচেতনতা, স্বাস্থ্যবিধান ও জনস্বাস্থ্য সুবিধাদির অভাব, যেমন প্রতিষেধক স্বাস্থ্যসেবা না থাকায় নানা ধরনের মহামারী দেখা দিয়েছিল। প্রাদেশিক সরকার অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য ছাড়াই সমস্যাগুলি যথাসাধ্য মোকাবিলা করেছিল।

১৯৫০ - পাকিস্তান আইন পরিষদে বাধ্যতামূলক নিয়োগ আইন পাস করায় ডাক্তারদের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যখাতে চাকুরি বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৯৫৩ - শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬২ - কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস প্রতিষ্ঠিত হয়, যক্ষ্মা হাসপাতালকে বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (IDCH) হিসেবে উন্নীত করা হয়।

১৯৬৭ - Institute of Post Graduate Medicine and Research (IPGMR) প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

[৩১]. http://bn.banglapedia.org/index.php?title=□□□□□_□_□□□□□□□□□□

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

১৯৭৪ - নিপসম (NIPSOM) প্রতিষ্ঠিত হয়।

\- আইসিডিডিআরবি (ICDDRB), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়া।

১৯৮০ - বারডেম (BIRDEM) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৮১ - পঙ্গু হাসপাতাল এবং শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯০ - বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করা হয়।

১৯৯৯ - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২০০৯ - ওয়ার্ড কম্যুনিটি ক্লিনিক চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল কমপ্লেক্সের ভিতরেই ১৯৮০-এর দশকে National Institute of Cardio-Vascular Diseases (NICVD) এবং National Institute for Opthalmology প্রতিষ্ঠান দুটির কার্যক্রম শুরু হয়। নিপসম (National Institute of Preventive and Social Medicine/NIPSOM) গঠিত হয়। ১৯৮০ সালে এবং কলেরা হাসপাতাল আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র আইসিডিডিআর,বি (International Centre for Diarrhoeal Diseases Research, Bangladesh/ICDDR,B) নামে পরিবর্তিত হয়। একই সময় গড়ে ওঠে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বারডেম (BIRDEM) হাসপাতাল।[৩২]

স্বাস্থ্যসেবা (Healthcare) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও গত ৪০ বছরে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা বিতরণে সমতাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। অর্থের অভাব এবং অনুপযুক্ত চিকিৎসা সেবা সরবরাহের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯০-১৯৯৫) স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে বলা হয়েছে 'স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যেকোন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার'। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) বলা হয়েছে 'চিকিৎসা সেবা প্রদানকরা সরকারের একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা'। দেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যখাতে, বিশেষত ব্যবস্থাপনা কাঠামো, সেবাপ্রদান ব্যবস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সারা বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও সময়ের ব্যবধানে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির চিত্র বদলে যাচ্ছে। এসব পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ফলে, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন, পানি, পয়ঃনিষ্কাসন, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল প্রকার সেবা ও অবকাঠামোয় প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।[৩৩] ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও দেশে বিরাজমান রোগব্যাধির প্রকৃতি পরিবর্তন। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের পুনরাবির্ভাব, ডেঙ্গু, গোদ, যক্ষা ইত্যাদি নতুন ও পুনরাবির্ভূত রোগের অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এছাড়া যৌনরোগ, এইডস জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক সংক্রামক রোগব্যাধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হৃদরোগ, বৃক্কের ব্যাধি, মানসিক

---

[৩২]. http://bn.banglapedia.org/index.php?title

[৩৩]. evsjv‡'k RbmsL¨v bxwZ-2012, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ২

অসুস্থতা, ক্যান্সার এবং ধূমপান ও মদপানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোগব্যাধিও বাড়ছে। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের বর্ধিত মাত্রা জনস্বাস্থ্যের জন্য এক সম্ভাব্য বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সম্ভবত বাংলাদেশে কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাবে এবং পুরনো রোগব্যাধি ও নতুন উদ্ভূত সংক্রামক রোগব্যাধি পাশাপাশি বিরাজ করবে। অপুষ্টি, যক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্যের সমস্যা, উদরাময়, শ্বাসনালীর সমস্যা ইত্যাদির প্রভাব জনগণের ওপর অব্যাহত থাকবে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের পর্যালোচনা করে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, স্বাধীনতা-উত্তর ২৫ বছরে জনগণের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। গুটিবসন্ত, কলেরা ও ম্যালেরিয়া নির্মূল হয়েছে বা এগুলি অন্তত এখন আর প্রধান প্রাণহরণকারী রোগ নয়। ১৯৭০ সালে গড় আয়ু ছিল ৪৫ বছর, তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে হয় ৬০.৮ বছর। ১৯৭৫ সালে মোট জন্মহার ছিল ৬.৩ জন, ১৯৯৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৩.৪ জন। ১৯৯০ সালে মৃত্যুহার ছিল ১২.০ জন, ১৯৯৫ সালে হ্রাস পেয়ে হয় ৯.০ জন এবং বর্তমানে আরও হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় টিকাদান সম্পন্ন হয় ৬৬ শতাংশ। ১৯৯৫ সালে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়ে হয় প্রতি হাজারে ৭৮ জন। অনুরূপভাবে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুর হার ১৯৭০ দশকে ছিল প্রতি হাজারে ২১০ জনের অধিক, ১৯৯৫ সালে নেমে আসে প্রতি হাজারে ১৩৩ জনে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সূচকসমূহে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রতি হাজারে ছিল ৮২.২, ২০০৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৫২-তে। ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯৬-৯৭ সালে ছিল ১১৫.৭, ২০০৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৬৫ তে নেমে এসেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শিশু মৃত্যু হ্রাসকরণ সংক্রান্ত ৪ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব হবে। অনুরূপভাবে মাতৃমৃত্যুর হার ও হ্রাস পাচ্ছে। বিএমএসএস জরিপ ২০১০ অনুযায়ী মাতৃমৃত্যুর হার ২০০১ সালের তুলনায় প্রতি লাখে ৩২২ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ১৯৪-তে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এই হার অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রেও সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে।[৩৪]

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি হচ্ছে প্রাথমিক সেবাপ্রাপ্তি সম্প্রসারণ এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে সেবার মান উন্নয়ন। সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন সাম্প্রতিককালের এক বিরাট অর্জন। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক নীতিমালা প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণভিত্তিক একটি প্রক্রিয়ায়। সরকার তা অনুমোদনের পর স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ১৯৯৮-২০১১ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে দেশে একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও সরকার কর্তৃক তার অনুমোদন। নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক নীতিমালা কাটছাট করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি এবং জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন প্রায় একই সময়ে শুরু হওয়ার কারণে সম্ভব হয়েছিল।

[৩৪]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, c. 2-3

স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক জরিপের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে ৪১ শতাংশ মানুষ অসুস্থতার কারণে জনপ্রতি বছরে ১০ কর্মদিবস হারায়। মাথাপ্রতি বাৎসরিক চিকিৎসা খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি শহরাঞ্চলে ৯০০ টাকা, গ্রামাঞ্চলে ৬০০ টাকা। উভয় অঞ্চলে এই খরচের পরিমাণ আঞ্চলিক মাসিক দারিদ্র্য সীমারেখার সমান বা তার চেয়ে বেশি।

জন্মহার কমেছে, শিশুদের টিকাদান প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। ১৯৮১ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে চিকিৎসক জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধেক হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১ : ৫২৪২ এবং ২০০০ সালের শেষ নাগাদ এই অনুপাত দাঁড়ায় ১ : ৪৭১৯ জন। নার্স ও জনসংখ্যার অনুপাত ১ : ৮২২৬ জন। ২০০০ সালে নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা ২৭,৫৪৬, জন, নিবন্ধনকৃত নার্সের সংখ্যা ১৫,৮০৪ জন। ২০০০ সালে হাসপাতাল শয্যার সংখ্যা ৪০,৭৯৩ টি। তন্মধ্যে ২৯,৪০২টি সরকারি হাসপাতালের।

সারণি বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগ রোগীর সংখ্যা।[৩৫]

হাসপাতাল/ক্লিনিকের ধরণ	সংখ্যা	বেডের সংখ্যা	আভ্যন্তরীণ রোগীর সংখ্যা	বহির্বিভাগ রোগীর সংখ্যা
স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল	৬	১৬১৪	১৫৫৯৩১	৩৪৪১৮৪
সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	১৪	৮৫১০	৬৬৬৪১৫	৩৩২৭০১৬
জেলা হাসপাতাল	৬০	৭৮০০	৮৩৭৪১৬	৬৪৫৮৬৪৫
শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, ঢাকা	১	৩৭৫	৮৬১১	৩৩১৪৮৬
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৪১৩	১৫৫২৯	১৩৪৫৮৬০	২৩৬৪২৫১২
বক্ষব্যাধি ক্লিনিক ও হাসপাতাল	৫৫	৫৪৬	২৮০০	১৫১১৮৪
কুষ্ঠ হাসপাতাল	৩	১৩০	৪১৪	১৩৬৭৬
সংক্রমিত রোগ	৫	১৮০	৩৮৪৬	৩৬৫৯২
মানসিক হাসপাতাল, পাবনা	১	৫০০	১০১৬৪	২০০৩৫
ক্যান্সার হাসপাতাল, ঢাকা	১	১০০	১০৭২	৯৫৪০
IMHR, ঢাকা	১	১৫০	১০৯৪	১৪০৭৩
হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল	১	১০০	১০৪২৯	৩৩৪৫১
টঙ্গি শ্রমিক হাসপাতাল	১	৫০	৫৩৭৬	১০৫৩৯০
শ্রীমঙ্গল শ্রমিক হাসপাতাল	১	৫০	-	-
সৈয়দপুর হাসপাতাল	১	৫০	৭৪৭২	৩২৩৫৪
ICMH	১	১০০	-	-

[৩৫]. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সংকলন, ২০০৯ ইং।

বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্যনীতিসমূহ

স্বাস্থ্যনীতি (Health policy) বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বিকাশের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে, যা প্রধানত চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকগণের বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় এক দশক পরও সরকারকে পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিদ্যমান প্রশাসনিক গঠন এবং সম্পদ নিয়েই চলতে হয় যা স্বাস্থ্যনীতি বিকাশের জন্য উপযোগী ছিল না। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে যদিও সরকারের নির্বাহী আদেশে একটি ওষুধনীতি গৃহীত হয়েছিল, সেটি ছিল ওষুধের ব্যবহারসহ এর প্রস্তুতকরণ এবং সকল প্রকার আমদানি যুক্তিসিদ্ধকরণের প্রচেষ্টা।

এই নীতি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির ওপর কিছুটা বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল যেমন কি কি ধরনের ওষুধ তাদের প্রস্তুত করা প্রয়োজন বা আদৌ প্রস্তুত করার দরকার আছে কিনা এবং যেগুলি প্রস্তুত করা একেবারেই নিষিদ্ধ অথচ দীর্ঘদিন ধরেই দেশে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ওষুধনীতির পথ ধরেই ১৯৮০ সালের শেষ দিকে একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির দলিল পস্তুত করা হয় যা গৃহীতও হয়েছিল। এর কিছু অংশ বাস্তবায়ন করা হয়, তবে তা সরকারের নির্বাহী আদেশে; সংসদে প্রণীত আইনের মাধ্যমে নয়।

১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে দেশে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি শক্তিশালী মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে উত্তরণ। এর ফলে ওষুধনীতি এবং স্বাস্থ্যনীতি উভয়ই নবতর প্রসঙ্গে চলে আসে এবং ১৯৯০ সালের শেষ দিকে জাতীয় ওষুধনীতি বিকাশের কাজটি পরিবর্তিত জাতীয় ও বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে অগ্রসর হতে থাকে। খসড়া নীতিটি মন্ত্রিসভা কর্তৃক পর্যালোচনা ও গ্রহণ করা হয় কিন্তু সংসদে বিষয়টি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় নি। ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি গৃহীত হয়। জনগণের উন্নত পরিসেবার মানসে একই অঙ্গীকার নিয়ে সরকার ২০০০ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি আরও সময়োপযোগী করে প্রণিত হয়েছে স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ যা বর্তমান সময়ের প্রচলিত স্বাস্থ্যনীতি।

২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি গৃহীত হয়। প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে ১৫টি মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে এবং এই লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১০টি মূলনীতি (Policy principles) ও ৩২টি কর্মকৌশল (Policy Strategies) এর কথা উল্লেখ রয়েছে।[৩৬] মূল স্বাস্থ্যনীতিতে যথেষ্ট সুপরিকল্পিতভাবে, আশা জাগানো এবং আদর্শিক বলে মনে করার উপযুক্ত কারণ আছে বলে অনুভূত হয়। নিম্নে সেসব কর্মকৌশলের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

- স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা পূরণের জন্য স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধনীতিকে আরও গ্রহণযোগ্য এবং উন্নত করতে হবে। বর্তমান সময়ের চাহিদা, নিরাপত্তা উপকারিতা, ক্রয় ক্ষমতা এবং সর্বস্তরে জরুরি ওষুধের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাজারজাত ওষুধের গুণগত মান ও ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামালের মান নিশ্চিত করার জন্য এবং ওষুধের যৌক্তিক

[৩৬]. মজনু-নুল হক, wZ³ I la, iæMY wPwKrmv I wRw¤§ RbMY, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রি. পৃ ১০১

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ওষুধ প্রশাসনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনবল তৈরি করা প্রয়োজন।

- সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণে পাঠানোর সময় তাদের কর্মস্থলে সেবা প্রদানকারী নিশ্চিত করেই প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ বিকল্প কর্মকর্তা ব্যতীত কোনো প্রশিক্ষণ ছুটি না দেওয়ার নিয়ম চালু করা।
- সর্বস্তরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণ ও স্থানীয় সম্পৃক্ত করা হবে।
- মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের রেজিস্ট্রেশন, পেশাগত মান এবং এথিকেল প্র্যাকটিস সংক্রান্ত বিষয়গুলি কড়াকড়িভাবে তদারক করার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের (BMDC) পুণর্বিন্যস্ত ও জোরালো করা হবে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ নাসিং কাউন্সিলকে (BNC) পুনর্বিন্যস্ত ও জোরালো করা হবে।
- ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, অন্যান্য প্যারামেডিকসদের সেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যথাক্রমে ফার্মেসি কাউন্সিল এবং টেস্ট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি (SMF) কে পুনর্বিন্যাস ও সুসংহত করা হবে।
- প্রয়োজনের ভিত্তিতে (Need Based) চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও গণমুখী এবং যুগোপযোগী করতে হবে।
- সরকারী চিকিৎসকদের মধ্যে যে সমস্ত চিকিৎসক/প্রশিক্ষাণার্থী সার্বক্ষণিক ও আবাসিক পদে এবং জরুরি বিভাগে কর্মরত আছেন, তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে বিরত রেখে নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা আরও জোরালো করতে হবে। এই লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে, যার মাধ্যমে জবাবদিহিতা আরো নিশ্চিত হয় এবং প্রয়োজনে কাজে গাফিলতির জন্য ত্বড়িৎ গতিতে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- স্থানীয় ও আঞ্চলিক কাউন্সিল স্থানীয়ভাবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মকান্ড মনিটরিং করবে এবং জনগণকে প্রদত্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মকান্ডের বিন্যাস, প্রয়োগ, তদারক, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করবে।
- স্বাস্থ্যসেবাকে প্রত্যেক নাগরিকের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রতি ৬০০০ জনসংখ্যার জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ করা হবে এবং সেখানে ডাক্তারের পূর্ণাঙ্গ আবাসিক সুবিধার বন্দোবস্ত থাকবে।[৩৭]

বাংলাদেশের এই জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। অনেক উন্নত দেশের স্বাস্থ্যনীতির সমকক্ষ বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু পার্থক্য একটি জায়গায়, বিদেশীরা তাদের জাতীয় যে কোনো নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, আর আমরা সেখানে অক্ষরে অক্ষরে তা অবহেলা করি। আমরা ভাল আইন, উত্তম কর্মকৌশল প্রণীত করি তা ভাঙার জন্য। জনগণের উন্নত পরিসেবার মানসে একই অঙ্গীকার নিয়ে সরকার ২০০০ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি আরও সময়োপযোগী করার জন্য

[৩৭]. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2000

নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার পর ২০০৬ এর গোড়ার দিকে একটি খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি উপস্থাপন করে। কিন্তু তা জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। এক তথ্যসূত্রে জানা যায়, সরকারী চিকিৎসকদের প্রাইভেট সংক্রান্ত একটি বিধি-নিষেধ সংবলিত অনুচ্ছেদ থাকার জন্য চিকিৎসক সমিতির কাছে তা গ্রহণীয় হয়নি। ফলে ২০০০ হতে ২০০৬ সালে পদাপর্ণ করার সুযোগ জনগণের হয়নি। অবশ্য স্বাস্থ্যনীতি, ওষুধনীতি সবসময়ই একটি স্পর্শকাতর বিষয়। তাই আমরা দেখি যুগে যুগে দেশে বিদেশে চিকিৎসক সমাজের একটি বড় অংশ এই নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে বিরোধিতা করে এসেছেন।[৩৮] এরই ধারাবাহিকতায় আরো যুগোপোযোগী করে প্রণিত হয়েছে স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ যা বর্তমান সময়ের প্রচলিত স্বাস্থ্যনীতি।

বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার ইতিহাস

চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন হলো দেশের ১৩টি সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অথবা দ্বাদশ শ্রেণীর সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলিতে পাঁচ বছরের এম.বি.বি.এস কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভের পর ব্যক্তিগত পেশায় যোগদানের আগে এই স্নাতকদের জন্য এক বছরের ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলি হলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ (ঢাকা), চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ, শেরে-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ (বরিশাল), খুলনা মেডিক্যাল কলেজ, ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ (ঢাকা), শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (বগুড়া) ও কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ। এগুলি ছাড়াও আছে ২টি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, দেশীয় চিকিৎসার একটি সরকারি ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রি কলেজ।

১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে সরকার দেশে বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করে। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের প্রবল আগ্রহ দেখা যায় এবং অতি দ্রুত ১২টির বেশি বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলির অধিকাংশই ঢাকায় অবস্থিত।

চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একমাত্র চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়। সংসদীয় আইনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ (IPGMR) সংস্থাটি এই স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত IPGMR ছিল একমাত্র ইনস্টিটিউট, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে মেডিসিন বিষয়ে স্নাতকোত্তর এম. ফিল ও পিএইচ. ডি ডিগ্রি প্রদান করত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর এম.ডি, এম.এস, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ তৈরির জন্য

---

[৩৮]. মজনু-নুল হক, C/, 3, পৃ. ১০২-১০৩

অনেকগুলি বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রদান করে। দেশের ১৩টি সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর যাবতীয় শিক্ষাক্রম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে।

বিশেষজ্ঞ তৈরির স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউট দেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (BCPS)। এটি প্রতি বছর চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ফেলোশিপ (FCPS) ও মেম্বারশিপ (FCPS) সনদ প্রদান করে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ সালে ৪৫ জন প্রতিষ্ঠাতা ফেলো ও ২০ জন কাউন্সিল সদস্য সমন্বয়ে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮২ সালে সরকার মহাখালীতে সংস্থাকে নিজস্ব জমি প্রদান করলে সেখানে অবকাঠামোসহ এর নিজস্ব ভবন গড়ে ওঠে।

জীবচিকিৎসা খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বেশ কয়েকটি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলি নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করে। এগুলির কয়েকটি ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, বাংলাদেশ ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল, ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ বাংলাদেশ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অফথালমোলজি অ্যান্ড হসপিটাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন এবং রিহ্যাবিলিটেশন ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল ফর দ্য ডিসএবল্ড।

এছাড়া ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ইন ডায়াবেটিস এন্ডোক্রাইন অ্যান্ড মেটাবোলিক ডিসঅর্ডারস সংক্ষেপে বারডেম নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি বহুমূত্র ও বিপাকীয় রোগের চিকিৎসার একটি অগ্রগণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা দেশব্যাপী উপকেন্দ্রের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে চিকিৎসা সেবা যোগায়। সদস্যরাই মূলত এখানকার গ্রাহক যারা নামমাত্র খরচে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পান। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই ইনস্টিটিউট বারডেম হাসপাতাল নামের বিশাল হাসপাতালের মাধ্যমে আধুনিক রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়বহুল সেবাপ্রদান করতে পারে।[৩৯]

পুষ্টি শিক্ষা ও গবেষণা (Nutrition Education and Research) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়ন বিভাগে ১৯৫৭ সালে পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষাক্রম শুরু হয়। ১৯৬২ সালে জাতীয় পুষ্টি জরিপ পরিচালিত হওয়ার পর পুষ্টি-বিষয়ক গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। জরিপে দেশের বিপুল সংখ্যাগুরু জনসংখ্যার ব্যাপক পুষ্টিহীনতার তথ্যাদি উদঘাটিত হয়। ৫ বছরের কমবয়সী শিশুর ৮০ শতাংশের বেশি এবং প্রায় সমসংখ্যক গর্ভবতী ও নবজাত সন্তানের জননী দীর্ঘস্থায়ী প্রোটিন শক্তির অভাবে ভুগছিল। প্রায় ৭০% শিশু ও মায়ের ছিল লৌহঘাটতিজনিত রক্তশূন্যতা, ৫ শতাংশের বেশি শিশু এ-ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ এবং জনসংখ্যার ২৯% ভুগছিল আয়োডিনের ঘাটতিতে

[৩৯]. http://bn.banglapedia.org/index.php?title

(৫% দৃশ্যমান গলগন্ডসহ)। এই জরিপের একটি অর্থবহ সুফল হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুষ্টিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীকালে পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (INFS) নামের এই সংস্থাটিতে বর্তমানে নিযুক্ত প্রায় ১০০ কর্মীর ৪৫ জনই শিক্ষক ও গবেষক।
গোড়ার দিকে এই ইনস্টিটিউটে প্রধানত গবেষণাকর্মই চলত। ১৯৭৫ সালে প্রথম চালু হয় এক বছরের ফলিত পুষ্টি ও পথ্যবিজ্ঞানের এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স এবং ১৯৮৩ সাল থেকে শুরু হয় এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান। ১৯৮৮ সাল থেকে ডিপ্লোমা কোর্সের পরিবর্তে চালু হয় ২ বছরের এম.এসসি এবং ১৯৯৮ সালে ৪ বছরের বি.এসসি (অনার্স)। পুষ্টিশিক্ষা ও গবেষণা এখন বাংলাদেশের বৃহত্তম পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বিবিধ বিষয়ক গবেষণা ছাড়াও ইনস্টিটিউট নিয়মিত জাতীয় পর্যায়ে পুষ্টি-জরিপ পরিচালনা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়ন বিভাগেও পুষ্টিবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম রয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীরা উক্ত বিষয়ে এম. এসসি, এম. ফিল, ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করে। এক্ষেত্রে এই অনুষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সমাধা করে (১৯৯৩ সালের জাতীয় আয়োডিন ঘাটতিজনিত বৈকল্য (IDD) জরিপ), যা থেকে এই প্রথম জানা যায় যে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ জীবরাসায়নিকভাবে আয়োডিন ঘাটতিতে ভুগছে, অর্থাৎ গলগন্ড থাকুক আর না থাকুক এদের দেহকোষে আয়োডিনের অভাব রয়েছে। এরই পরিণতিতে বাংলাদেশ সরকার আইনের মাধ্যমে সারাদেশে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার প্রবর্তন করে। ১৯৯৯ সালে পুষ্টিশিক্ষা ও গবেষণা কর্তৃক পরিচালিত IDD জরিপ থেকে দেখা গেছে যে, আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার কর্মসূচির ফলে দেশে গলগন্ড পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে।

কালক্রমে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ায় ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুষ্টিবিজ্ঞানের পড়াশোনা ও গবেষণা চালু হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয় জীবরসায়ন ও পুষ্টিবিজ্ঞানে বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি, এম. ফিল, ও পিএইচ. ডি ডিগ্রি দিয়ে থাকে।

সরকারি পর্যায়ে ফলিত পুষ্টিবিজ্ঞানে শিক্ষাদান ও গবেষণার জন্য কয়েকটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যখাতে (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন) জনস্বাস্থ্য পুষ্টি ইনস্টিটিউট (IPHN), কৃষিখাতে (কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন) বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টিবিজ্ঞান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলের (BCSIR) খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (IFST), পরমাণু শক্তি কমিশনের (AEC) খাদ্য বিকিরণ জীববিদ্যা ইনস্টিটিউট (IFRB). জনস্বাস্থ্য পুষ্টি ইনস্টিটিউট (IPHN) জনসাধারণের পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়নে, বিশেষত ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতি পূরণে গৃহাঙ্গনের সবজি বাগান বাস্তবায়নে কর্মরত। এই ইনস্টিটিউট ১৯৮১ সালে প্রথম গলগন্ড জরিপ পরিচালনা করে এবং স্থায়ী আয়োডিন ঘাটতি অঞ্চলে, বিশেষত দেশের উত্তরের জেলাগুলিতে আয়োডিন ইনজেকশনের মাধ্যমে আয়োডিনের ঘাটতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান গলগন্ডের ৩০ লক্ষ রোগীকে এই ইনজেকশন দিয়েছে।
১৯৭২ সালে বেসরকারি সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত BIRTAN কৃষিতে পুষ্টির ধারণার প্রবক্তা হিসেবে জাতিকে সুষম খাদ্য (চিরাচরিত ভাত প্রাধান্যের পরিবর্তে যথা

পরিমাণে সবগুলি পুষ্টিবস্তুসহ খাদ্য) যোগানোর লক্ষ্যে ফসল বৈচিত্র্যায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সাহায্য করে। তদুপরি, এই ইনস্টিটিউট ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণ ও প্রসেসিংয়ের ধারণা বাস্তবায়নেও সফল হয়েছে, যেজন্য ভোক্তারা এখন এগুলি সব মৌসুমেই পায়। পক্ষান্তরে BCSIR সংস্থার IFST অসংখ্য ভোজ্যপ্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন করেছে এবং খাদ্যবস্তু প্রসেসিং ও সংরক্ষণের অনেকগুলি গবেষণা ফলের পেটেন্ট পেয়েছে। AEC-র অধীনস্থ IFRB সংস্থাও বিকিরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য প্রসেসিং ও সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিলের সাফল্যও উল্লেখ করার মতো। এগুলিরই কয়েকটি পুষ্টির জন্য বাংলাদেশের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি কর্মনীতি ও বাংলাদেশের পুষ্টিগত নির্দেশিকা প্রণয়ন। অধিকন্তু, এই সংস্থা পুষ্টিসংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পের জন্য অর্থ যুগিয়েছে এবং হাজার হাজার স্কুলশিক্ষক ও ইমামের জন্য পুষ্টিমূলক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। পুষ্টিগত শিক্ষা ও গবেষণার প্রত্যয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক এনজিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ উদরাময় রোগ গবেষণার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, আইসিডিডিআর,বি, ব্র্যাক, ওয়ার্ল্ড ভিশন ফাউন্ডেশন ও প্রশিকা উদ্ভাবিত ওরস্যালাইন উদরাময় থেকে বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু ও বয়স্কের প্রাণ রক্ষা করেছে। আইসিডিডিআর,বি এখনও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষযয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। ব্র্যাক গবেষণা ছাড়াও তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি বিষয়ক অনেকগুলি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন ফাউন্ডেশনের প্রধান কর্মসূচি হলো পুষ্টির বিভিন্ন দিক, বিশেষত দেশে ‘এ’ ভিটামিনের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। প্রশিকারও রয়েছে পুষ্টিগত অনেকগুলি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি।[৪০]

ফার্মেসি শিক্ষা ও গবেষণা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উৎস থেকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় বা রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার্য ওষুধ তৈরি ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞানের এক বিশেষ শাখা। গ্রিক শব্দ Pharmakon থেকে ফার্মেসি শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ ওষুধ বা ভেষজ। ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দের এক নথিতে ফ্রান্সে ফার্মাসিস্ট বা ওষুধ প্রস্তুতকারক শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে ওষুধ সংক্রান্ত পেশা এবং ওষুধ প্রস্তুতকারক সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আরও পুরানো। এ বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠান ১৭৭৭ সালে College de Pharmacie প্যারিসে স্থাপিত হয়েছিল।

বাংলাদেশে ফার্মেসি শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৬৪ সালে, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগে একটি পৃথক শাখায় ফার্মেসি কোর্সের শিক্ষাদান শুরু হয়। এর প্রায় দুবছরের মধ্যেই ফার্মেসি শাখা একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ফার্মেসি সংক্রান্ত শিক্ষাদান ও গবেষণা পরিচালনা করছে। ফার্মেসি বিভাগ, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ফার্মেসি বিভাগ, জীববিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার; ফার্মেসি বিভাগ, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়, ধানমন্ডি; ফার্মেসি বিভাগ, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার; ফার্মেসি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ফার্মেসি বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; ফার্মেসি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি ফার্ম ডিগ্রি প্রদান করা হয় এবং ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফার্মেসি কাউন্সিল অব বাংলাদেশ-এ ফার্মাসিস্ট গ্রেড-এ হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

---

[৪০]. http://bn.banglapedia.org/index.php?title

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ সালের ফার্মেসি অধ্যাদেশ-এর আওতায় ঐ একই বছরে ফার্মেসি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিল দেশের ফার্মেসি শিক্ষাদান এবং ফার্মেসি সংক্রান্ত পেশা, বিপণন, বাণিজ্য, ওষুধ প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও দেশের সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় শুরুতে ৩-বছরের ডিগ্রি অনার্স কোর্স চালু করেছিল, ঢাকা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪-বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করে। সম্প্রতি অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ও একই ধরনের কোর্স পদ্ধতি অনুসরণ করছে। ফার্মেসি শিক্ষাদানকারী এসব বিভাগ স্নাতক ডিগ্রির পরে এক বছরের মাস্টারস ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা রেখেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ গবেষণা কাজের ওপর ভিত্তি করে এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রিও প্রদান করে। ডিগ্রিপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের ফার্মেসি কাউন্সিল গ্রেড-এ মানের ফার্মাসিস্ট হিসেবে তালিকাভুক্ত করে দেশে ফার্মেসি সংশ্লিষ্ট পেশা গ্রহণের অনুমোদন দেয়। ওষুধ প্রস্তুতকারক বিভিন্ন শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে এসব ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যোগদান করে ওষুধ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, বিপণন ইত্যাদি দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। এদের অনেকেই বিভিন্ন হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট হিসেবেও নিয়োগ পায়।

ডিগ্রি কোর্স ছাড়াও ঢাকা এবং রাজশাহীতে অবস্থিত Institute of Health Technology, বাগেরহাটের Medical Assistant Training School এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর Armed Forces Medical Institute ফার্মেসি বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স প্রদান করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আজ পর্যন্ত ৯,০০০-এর বেশি ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট গ্রেড-বি ফার্মাসিস্ট হিসেবে ফার্মেসি কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত হয়েছে। চার মাস অন্তর অন্তর কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত বৃত্তিমূলক পরীক্ষায় সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কৃতকার্য হলে কোন চিকিৎসালয়ে বা ওষুধের দোকানে চাকরি করার অনুমোদন পায়। ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সাধারণত গ্রামীণ হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিভিন্ন চিকিৎসালয় এবং রোগনির্ণয়কারী ল্যাবরেটরিতে চাকরি করে। দেশের সর্বত্রই বিভিন্ন ওষুধের দোকানে এবং চিকিৎসালয়ে সাধারণত ফার্মেসিতে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধপত্র বিক্রির পেশা গ্রহণ করে।[৪১]

ফার্মেসি অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ ওষুধ তৈরি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফার্মেসি কাউন্সিলের মাধ্যমে জারিকৃত অধ্যাদেশ। ওষুধ তৈরি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত ও অধিকন্তু প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এই অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নম্বর XIII, ১৯৭৬) প্রণয়ন করেন। এই অধ্যাদেশের অধীনে সরকার দাপ্তরিক গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল গঠন করে। কাউন্সিলের কার্যাবলি ফার্মাসিস্ট হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রদেয় পরীক্ষাসমূহ অনুমোদন করা; অনুমোদিত পরীক্ষাসমূহে ভর্তির উদ্দেশে ফার্মেসিতে অধীতব্য কোর্সসমূহ ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অনুমোদন দান; ফার্মাসিস্ট হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার উদ্দেশে ফার্মেসিতে স্নাতক বা ডিপ্লোমা ডিগ্রি অনুমোদন প্রদান; ফার্মাসিস্টদের নিবন্ধনকরণ ও নিবন্ধনের প্রশংসাপত্র প্রদান; ফার্মাসিস্ট হিসেবে নিবন্ধন দানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা; এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে এই ধরনের অন্যান্য কাজ করার ক্ষমতা প্রদত্ত হতে পারে বা কাজ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

---

[৪১]. http://bn.banglapedia.org/index.php?title

কাউন্সিল প্রয়োজন অনুসারে পরিদর্শক অথবা উপকমিটি নিয়োগ করে এই সকল কাজ সম্পাদন করে। এই অধ্যাদেশবলে কোন ব্যক্তি ফার্মাসিস্ট হিসেবে নিবন্ধিত না হয়ে এবং তার প্রশংসাপত্র প্রদর্শন ব্যতিরেকে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না। এই অধ্যাদেশের অধীনে কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এর বিরুদ্ধে কোন মামলা, অভিযোগ দায়ের বা বৈধ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।[৪২]

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের ইতিহাস

ভাল স্বাস্থ্যই সুস্থ ও সতেজ জীবনের চাবিকাঠি। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের ভাল স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাঁধা যেমন দারিদ্র, তেমনই আর একটি প্রধান বাঁধা অসচেতনতা। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা এমন একটি বিষয়, যার উপর একটি দেশের মানব সম্পদ অনেকাংশে নির্ভরশীল। নাগরিকের সুস্বাস্থ্যের অভাবে দেশের উৎপাদনশীলতা বাঁধাগ্রস্থ হয় কমে যায় উন্নয়নের গতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের গুরুত্ব এখানেই।

৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। ১৯৪৮ সালের এই দিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতি বছর সংস্থাটি এমন একটি স্বাস্থ্য ইস্যু বেছে নেয়, যা বিশেষ করে সারা পৃথিবীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে পালিত হয় এ দিবসটি।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রসংঘ অর্থনীতি ও সমাজ পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৪৬ সালের জুন ও জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাংগঠনিক আইন গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল আইন আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যকর হয়। তখন থেকেই এই দিন "বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস" বলে নির্ধারিত হয়। ১৯৫০ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে পৃথিবীর নানা প্রান্তে “বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস” পালিত হয়ে আসছে। এই দিনটিকে পৃথিবীর বহু দেশ এবং বহু বেসরকারি সংগঠন পালন করে আসছে। মূলত জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধিই এই দিনটির প্রধান উদ্দেশ্য। দৈনিক পত্রিকায় এই দিন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO যে আটটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রচার মূলক কাজ করে থাকে, তার অন্যতম হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। অন্যগুলি- বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস, বিশ্ব রোগ প্রতিরোধ সপ্তাহ, বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস, বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস, বিশ্ব রক্তদাতা দিবস, বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস এবং বিশ্ব এইডস দিবস।[৪৩]

স্বাস্থ্য অর্থনীতি

এটি একটি অপেক্ষাকৃত নতুন শাখা যেখানে অর্থনীতির নীতিসমূহকে প্রয়োগ করে স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ব্যয় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য অর্থনীতির মূলনীতিসমূহের প্রয়োগের বিষয়টি এতদিন বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ বা স্বাস্থ্য পেশাজীবীগণের নিকট খুব একটা আগ্রহের বিষয় ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে, কারণ বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৬.৫০ কোটি এবং ২০৪০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা

[৪২]. http://bn.banglapedia.org/index.php?title
[৪৩]. http://bn.vikaspedia.in/health

দাঁড়াবে ২৪ কোটির কাছাকাছি। কাজেই আগামী দশকগুলিতে এই বিশাল জনসংখ্যা বাংলাদেশে একটি ভয়ঙ্কর স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করার কোন নিয়মানুগ ও যথাযথ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। তাই এই অপ্রতুলতা দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৮ সালে একটি বিভাগ খুলতে উদ্যোগী হয়, যার নাম স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ। যদিও কোন কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায়, বিশেষ করে ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্রে এই বিষয়টা নিয়ে চর্চা করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থায় ইতোমধ্যেই এই আর্থিক খরচের বিপরীতে স্বাস্থ্যখাতে উন্নতির বিশ্লেষণের বিষয়টা দ্রুত গুরুত্ব লাভ করছে। বাণিজ্যিক সুবিধার আলোকে বিভিন্ন খাত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে NGOএর অংশ গ্রহণ

স্বাস্থ্যসেবায় বেসরকারি সংস্থা (NGO’s in health services) বাংলাদেশে এখন অনেক রকমের খাত আছে, যেখানে বেসরকারি সংস্থাসমূহ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী এবং কম সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি। বেসরকারি সংস্থার কাজের মধ্যে দৈনন্দিন স্বাস্থ্যসেবা দানের কর্মসূচি সীমিত। অনেক বেসরকারি সংস্থা এমন ধরনের স্বাস্থ্যসেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকতে পছন্দ করে যা বিশেষ বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও এদের বেশির ভাগই আবার ক্ষুদ্র এবং এদের কাজের পরিধিও সীমিত। কিন্তু কয়েকটি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত বেসরকারি সংস্থা আছে যেগুলি কয়েক দশক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি বহু বিস্তৃত যার মধ্যে কিছু স্বাস্থ্যসেবাগত প্রকল্পও আছে।

স্বাস্থ্য খাতে বিশিষ্ট বেসরকারি সংস্থার মধ্যে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট আইসিডিডিআর,বি উল্লেখযোগ্য। যদিও এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম দিকে লক্ষ্য ছিল উদরাময় রোগ, কেন্দ্রটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার কর্মপরিধি বিস্তৃত করে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার সংস্থাগুলিই নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহে কাজ করে থাকে। সাধারণত, শিক্ষা কর্মসূচি এবং মাদকাসক্তি দূরীকরণ বা টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি অগ্রাধিকার পায়। বর্তমানে বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেসব ক্ষেত্রে তৎপর তার মধ্যে আছে যৌনরোগের মাধ্যমে ছড়ানো রোগসমূহ, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, পেটের কৃমি এবং পরিবার পরিকল্পনা।

বেশির ভাগ বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে আছে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান বিতরণ। প্রথমটি যদিও সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব, পরবর্তী বিষয়টি বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকেই পরিচালিত হয়ে থাকে, যদিও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সরকার প্রদত্ত স্বাস্থ্য পরিসেবা খুবই অপ্রতুল। এই ক্ষেত্রটিকে বেসরকারি সংস্থাসমূহ তাদের প্রধান ক্ষেত্র রূপে চিহ্নিত করে নি। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে দেশের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়েছিল যা অর্ধ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এই প্রকল্প স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করে এবং এর বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত থাকার উদ্দেশ্যে

অনেক বেসরকারি সংস্থার অভ্যুদয় ঘটে। এর পরবর্তীতে পঞ্চম স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা প্রকল্প এই খাতে যে বিশাল অর্থের যোগান দেয় তার ফলে এই ক্ষেত্রটি বেসরকারি সংস্থাসমূহের বড় ধরনের কর্মকান্ডরূপে আবির্ভূত হয়।

সক্রিয় বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে বেশির ভাগেরই বর্তমান সময়ে দেশের সর্বত্র কর্মশাখা বিদ্যমান এবং এই সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক সেবা প্রদান করছে। স্বাস্থ্যসেবা কাজে সরকারের প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেবে এনজিওদের অবদান উল্লেখযোগ্য, যেমন শিশুদের টিকাদান, পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষা ইত্যাদি। ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশে পোলিও নির্মূল অভিযানের অংশ হিসেবে পাঁচ বছরের কম বয়স্ক এবং শিশুদের ক্ষেত্রে মুখে খাবার পোলিও টিকা প্রদানের কর্মসূচি চালু হয়। এই টিকাদান কর্মসূচিতে বেসরকারি সংস্থাসমূহ তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োজিত করে। এছাড়া বেসরকারি সংস্থাসমূহ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে যাতে শিশুদের প্রতিষেধকযোগ্য ছয়টি শিশুরোগের বিরুদ্ধে টিকাদান করা হয়।[৪৪]

বর্তমান সময়ে এদেশে সরকারি চিকিৎসা ব্যাবস্থার পাশাপাশি অনেক ব্যক্তি বা সংস্থা বেসরকারি প্রতিষ্ঠনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। মরহুম ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বারডেম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ইসলামিক ব্যাংক হাসপাতাল এবং ডাঃ শেখ মহিউদ্দিন পরিচালিত আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সারা দেশে রোগীদের স্বল্প মূল্যে উন্নত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচলিত সেবাসমূহ:

- আদ্-দ্বীন মহিলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঢাকা।
- বসুন্ধরা আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঢাকা।
- আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ (ASMC) যশোর।
- আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঢাকা।
- আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যশোর।
- আদ্-দ্বীন আই হসপিটাল যশোর।
- আদ্-দ্বীন হাসপাতাল কুষ্টিয়া।
- ফাতেমা নার্সিং ইনস্টিটিউট ঢাকা।
- আদ্-দ্বীন নার্সিং ইনস্টিটিউট যশোর।
- Safina নার্সিং ইনস্টিটিউট কুষ্টিয়া।
- আদ্-দ্বীন উইমেন্স হেলথ টেকনোলজি যশোর ইনস্টিটিউট।
- আদ্-দ্বীন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড যশোর।

বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি দেশেই চিকিৎসা কার্যক্রম এই সংস্থার নিয়ম মেনেই করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য নীতিও সে অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন শুধু সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের।

---

[৪৪]. http://bn.banglapedia.org/index.php?title

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

স্বাস্থ্য (Health)

Health is man’s most valuable possession because it influences all the activities. It is the solid foundation on which a man’s happiness rest. Health is a resource in which the whole community has a stake and it is desirable to maintain and promote it.[৪৫]

স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা; শুধু কোন রোগ বা অক্ষমতার অনুপস্থিতিই নয়। অর্থাৎ কোন ব্যাক্তির শরীরে কোন রোগ বা অক্ষমতা না থাকলেই যে তিনি স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ, তা ঠিক নয়। সুস্থ হতে হলে তাঁকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে হবে। এর সাথে আধ্যাত্মিক দিকের কথাও বলা হয়। কিভাবে আমরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকতে পারি? শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাবার, ব্যায়াম, বিশ্রাম ইত্যাদি। মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য চায় সুস্থ শরীর, সুস্থ সমাজ।

সুস্থতা ও অসুস্থতার ধারণা

বিখ্যাত আরবীয় চিকিৎসক হারিস ইবনে কালাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ওষুধ কি? তিনি উত্তরে বলেন, প্রয়োজন, মানে ক্ষুধা।’ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, ‘রোগ কী? তখন তিনি উত্তর দেন, খাবারের পর খাবার গ্রহণ’ অর্থাৎ অতি ভোজন।[৪৬] হারিস ইবনে কালাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,‘ক্ষুধাই রোগ নিরাময়ের উপায়’। অপর দিকে Hippocrates বলেন, All excess is contrary to the laws of nature. Let your eating drinking, your sleeping and your sexual intercosurse, all be in moderation.”[৪৭] ইবনে সীনা বলেন, “Never have a meal until the one befour it has been digested.” অর্থাৎ আগের খাদ্য হজম না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করোনা।”[৪৮] হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “Avoid a pot-belly, for it spoils the body, causes diseases and makes doing prayer tiring. Make use of bloodletting, for this putsbody right. Avoid all excess, for Allah hates a learned man who is fat.”[৪৯] ‘শারীরিক ও মানসিক সুস্থ অবস্থার নামই স্বাস্থ্য’। ‘স্বাস্থ্য’ মহান আল্লাহর দেওয়া একটি বিশেষ নিয়ামত।[৫০] মহান আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের মধ্যে ঈমানের পরেই স্বাস্থ্যের স্থান। অতএব এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। অপরদিকে

---

[৪৫]. S. Dheer, Dr. Mitra Basu, *Indruction to Health Education,* Frends publications, 6, Mukherjee Tower, Mukherjee Nagar, com. Complex, Delhi: 110009, India. N.D, P.4

[৪৬]. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৮৪৯-৯১১ (হিজরী), Avj RwgDm mvMxi dx Avnv‘xwm j evkxwib bvhxi, বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২৫ (হিজরী), ২০০৪ খ্রি. পৃ. ১২

[৪৭]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, Bmjv‡gi Av‡jv‡K wPwKrmv weÁvb, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১০ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৯৫

[৪৮]. আস-সুয়ূতী, c¸ ³, পৃ. ১২

[৪৯]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cv¸ ³, পৃ. ৯৫

[৫০]. প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, (অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুয্ যমান), wZ‡eŸ beex (m), ঢাকাঃ হক লাইব্রেরী, বাইতুল মুকাররম, মার্চ ২০০২ খ্রি. পৃ. ১৫

শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার অবস্থার নাম রোগ-ব্যাধি। Disease is a disordered condition of mind or body.[৫১] A disease is an abnormal condition affecting the body of an organism. It is often construed to be a medical condition associated with specific symptoms and signs. It may be caused by factors originally from an external source, such as infectious disease, or it may be caused by internal dysfunctions, such as autoimmune diseases. In humans, "disease" is often used more broadly to refer to any condition that causes pain, dysfunction, distress, social problems or death to the person afflicted or similar problems for those in contact with the person. In this broader sense, it sometimes includes injuries, disabilities, disorders, syndromes, infections, isolated symptoms, deviant behaviors, and atypical variations of structure and function, while in other contexts and for other purposes these may be considered distinguishable categories. Diseases usually affect people not only physically, but also emotionally, as contracting and living with many diseases can alter one's perspective on life, and their personality.[৫২]

A disordered or incorrectly functioning organ, part, structure or system of the body resulting from the effect of genetic or developmental errors, infection, poisons, nutritional deficiency or imbalance, toxicity or unfavorable environmental factors; illness; sickness; ailment.[৫৩]

স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক নীতিমালা সমূহ মেনে চলা যেমন প্রতিটি মানুষের দ্বায়িত্ব তেমনি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা সরকারের জন্য একান্ত কর্তব্য। মহান আল্লাহ এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাহি ওয়াসাল্লাম স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যের হিফাযত ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে অত্যন্ত সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক ও উপকারী বস্তু এবং সে সকল বিষয়াবলী চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যা স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরী। সুস্থ থাকার চেষ্টা থাকতে হবে নিরন্তর। কারণ অসুস্থ হলে কষ্ট এবং খরচ দুটোই বৃদ্ধি পায়। সুস্থ থাকার চেষ্টা করা খুব কঠিন কাজ নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার, সুস্থ অভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, পরিমিত আহার, প্রাকৃতিক বিধান এবং সময় সময় হেলথ চেকআপ এভাবে সুস্থ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। যদি আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং আমি সুস্থ থাকি তবে আমি শোকর আদায় করি। এই অবস্থাটি আমার নিকট সেই অবস্থার চেয়ে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় যা আমি অসুস্থতার দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হলে অনুভব করি।

---

৫১. Prof. Md. Nur nobi, *Oxford Dictionary of contemporary English*, Joneki prokashani, Dhaka: March 2012

৫২ . *Wikipedia, the free encyclopedia, en.wikipedia.org/wiki/Disease N.B.*

53. Define *Disease* at Dictionary.com, *dictionary. reference.com/browse/disease, N.B.*

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এমনি ভাবে স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে পছন্দ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন নিয়ামত দান করেননি।[৫৪] স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ মহান রাব্বুল আলামীনের নিয়ামত সমূহের মধ্যে দুটি বিশেষ নিয়ামত। অধিকাংশ লোক এই দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে ক্ষতি ও ধোঁকায় রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নাই যে, পার্থিব ভোগ-বিলাসের লালসার কারণে অধিকাংশ লোক এই দুইটি নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয়। তারা ভাবে স্বাস্থ্য সব সময় অটুট থাকবে এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা কোন দিন শেষ হবে না। তারা শারিরীর ও মানসিক বিভিন্ন প্রকার চাহিদার প্রতি অনিয়ম করে তাদের শরীরকে নানা ধরনের রোগ-ব্যাধির আবাসস্থল রূপে গড়ে তোলে।

তিব্বুন নববী

‘তিব্ব’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ: ১. দেহ ও মনের চিকিৎসা ২. নম্রতা ও সুকৌশল অবলম্বন ৩. জাদু ৪. অভ্যাস ৫. কোন বিষয়ে পান্ডিত্ব অর্জনে দক্ষতা। বর্তমানে এর দ্বারা ওষুধ, ওষুধ ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা পদ্ধতিকে বোঝানো হয়। পরিভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান (ইলমুল তিব্ব) ঐ শাস্ত্রকে বলা হয় যা শিক্ষা করলে কোনো প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের সুস্থতা ও অসুস্থতার দিক দিয়ে শারীরিক অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।[৫৫]

তিব্বুন নববী বা Prophetic Medicine বলতে আমরা রোগ, ওষুধ ও চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থের হিফাজত ইত্যাদি সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা কাজ ও নির্দেশনাকে বুঝায়। স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল বিধি-বিধান সম্পর্কে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে অসুস্থ্য হলে চিকিৎসক তার জন্য কী ব্যবস্থা পত্র দিতেন, কোন সাহাবী অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিতেন এবং তিনি নিজে অসুস্থ হলে আরোগ্য লাভের জন্য কী করতেন কিংবা রাসূলের উপস্থিতিতে কোনো চিকিৎসক কোনো সাহাবীকে যে ব্যবস্থাপত্র দিতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপত্তি করেননি, এ সবই তিব্বুন নববীর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমণ ডাক্তার বা চিকিৎসক হিসোবে নয়। তথাপিও বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, অসুস্থ ব্যক্তি তাঁর নিকট প্রায়ই আগমণ করতেন, তিনি তাঁদের আরোগ্যের জন্য ব্যবস্থাপত্র প্রদান করতেন এবং আল্লাহর নিকট তাদের আরোগ্যলাভের জন্য দু‘য়া করতেন। তাঁর এসব বাণীর উপর ভিত্তি করে তদানীন্তন আরব সমাজে তিব্বুন নববী নামে একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠে, যা বিজ্ঞানের আলোকে উত্তীর্ণ একটি যথার্থ যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকরী ব্যবস্থা। অজ্ঞাত কারণে মুসলমান সমাজে এটা দীর্ঘদিন লুকায়িত ছিলো।

বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান তথা তিব্বুন নববীর সাথে অন্যান্য আধুনিক ও সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য সাধারণ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকের সাথে অর্ধশিক্ষিত হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার পার্থক্যের চেয়েও বেশি। বস্তুত তিব্বুন নববীর উৎসই হচ্ছে কিছু অহি বা প্রত্যাদেশ, কিছু ইলহামভিত্তিক অনুপ্রেরণা বা প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান। তবে এর সিংহভাগই সমাজে প্রচলিত পদ্ধতি এবং শ্রুত-অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞানের উৎকর্ষতার উপর নির্ভরশীল। অপর দিকে

---

[৫৪]. প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, cÖv¸³, পৃ. ১৬

[৫৫]. ইবনে সীনা Avj-Kvbb wdZ wZeŸ, ১/৩, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে অনুমান, অভিজ্ঞতা, ল্যাবরেটরিতে পরিক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণার ফলাফল।

Modern medicine is base on conjecture, suppositions and experimentation. অপরদিকে তিব্বুন নববী এসবের উপর নির্ভরশীল নয়। Medicine of the Prophet (SAWS) are not based on speculations or results of laboratory investigations. They are base on niche of the Prophecy and perfection of human intellect.[56]

শারীরিক বিজ্ঞান

স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে মানবের দেহতত্তের বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। দেহতত্তের জ্ঞান বলতে দেহের বিভিন্ন অংশে কি কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে? তার চারপাশে কি কি আছে? তাদের সম্পর্ক কি, একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক, প্রতিটি যন্ত্রের রক্ত সরবরাহ, শিরা-ধমনী ও লিমফের প্রবাহের যোগাযোগ, স্নায়ু, একটির সঙ্গে অন্যটির কি কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।

মানুষের শরীর একটি জটিল যন্ত্রের সমাহার। এর প্রতিটি অংশ কিভাবে কাজ করে শরীর-বিজ্ঞানীরা তা আজও পুরোপুরিভাবে জানতে সক্ষম হননি। গবেষণার ফলে যতদুর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে শুধু মাত্র ততটাই মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আশারবাণী, গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং তা অব্যাহত রয়েছে। মানুষের শরীর সুস্থ রাখে জীবনী শক্তি। জীবনী শক্তি দেহের প্রতিটি জীবিত কোষের মধ্যে বিদ্যমান। জীবনী শক্তি বিহীন শরীরের কোন কোষ অবশ্যই মৃত। জীবনী শক্তিই কোষগুলোকে সঞ্জীবিত রাখে এবং কোন দেহে জীবনী শক্তির অনুপস্থিতির অর্থ হলো সে দেহ জীবিত নয় বরং মৃত। রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা রয়েছে। কিছু লোক রোগকে জ্বিন-ভুত এবং প্রেতাত্মার আছর বলে থাকে।[৫৭] আবার কিছু লোক রোগকে আল্লাহর গজব মনে করে। রোগ অর্থ পীড়া, ব্যাধি, অসুখ, ব্যারাম বা অসুস্থতা। এই অসুস্থতা সর্ব প্রথম মানুষের মনে দেখা দেয়। ধীরে ধীরে শরীর যন্ত্রের মধ্যে দেখা দিতে থাকে নানা রকম বিশৃংখলা। এই অসুস্থতা ও বিশৃংখলা হতে দ্রুত, বিনাকষ্টে, স্বল্পতম সময়ে, সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও নির্দোষ উপায়ে সহজবোধ্য নীতির সাহায্যে সামগ্রিকভাবে রোগের লক্ষণ দূরীকরণ ও বিনাশ সাধন এবং স্থায়ী ভাবে স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।[৫৮] রুগ্ন মানব জাতির স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার মত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করতে হলে এক দিকে যেমন শরীর-বিজ্ঞানী, অপর দিকে তেমনি জীবন-শিল্পীর প্রয়োজন। জীবদেহ জৈব ও অজৈব পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ। এদের কোনটির ক্রিয়ার অভাব হলেই শরীর ব্যাধিযুক্ত হয়। জীবদেহের এই স্বভাব প্রকৃত অবস্থায় আছে কিনা তা নির্ধারণ করা এবং না থাকলে তাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যাধি নিরাময় করাই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য।

'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এ প্রবাদটি সকলেই জানে। সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা ইসলামে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতিকে দেওয়া মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ

---

[৫৬]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, C\/¸ ³, পৃ. ৪৫-৪৬

[৫৭]. প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, C\/¸ ³, পৃ. ৪০

[৫৮]. ডাঃ জি. দীর্ঘাঙ্গী, AM¨\/bb, কলিকাতাঃ রায় পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ১৬১

নিয়ামত এবং আমানত হচ্ছে স্বাস্থ্য। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে আল্লাহর ইবাদত এবং অন্যান্য কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঈমানের পরেই স্বাস্থ্যের স্থান। স্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম যত্ন নেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। সুস্থ থাকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও নিতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য দিয়েছেন। আল্লাহর দেওয়া আমাদের এই দেহ ও স্বাস্থ্যের দেখভাল আমরা কেমন করেছি, এগুলোর ব্যাবহার আমরা কেমন করেছি, এর জন্য কিয়ামতের দিন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন ইসলামি জীবন-ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইসলামে এরূপ জীবন-ধারার সূচনা হয়েছে। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর সবকিছুই বিদ্যমান ইসলামী জীবন বিধানে। আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য এবং শরীর-স্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের বিস্তর দিক নির্দেশনা রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে। বস্তুত ইসলামী জীবনাচারণের মধ্যেই নিহিত আছে সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। অজু, গোসল, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতসহ ইসলামের প্রতিটি বিধানই স্বাস্থ্যকর। এছাড়া মুসলমানের খাওয়া-দাওয়া, সামাজিক আচরণ ইত্যদি সব কিছুই সুস্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক। অজু, গোসল, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত। অজু, গোসল, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম। নামাজের পূর্বে অজু করতে হয়। নামাজ জান্নাতের চাবি, আর নামাজের চাবি হলো অজু; এসবই স্বাস্থ্যকর বিধান। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নামাজের আগে অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ **إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى** الْكَعْبَيْنِ

তোমরা যখন নামাজের জন্য দন্ডায়মান হবে, তখন তোমরা তোমাদের দু'হাত কনুই সহ ধৌত করবে, তারপর মাথা মাছেহ করবে, আর দুই পা গিরা পর্যন্ত ধৌত করবে।[৫৯] অজু করার সময় শরীরের এই সমস্ত অঙ্গ ধৌত করা ছাড়াও তিনবার করে হাত ধুতে হয়, কুলি করতে হয়, মুখমন্ডল ধুতে হয়, নাক পরিস্কার করতে হয়, এগুলো অজুর সুন্নাত। অজু যেমন আমাদেরকে আধ্যাত্নিক ভাবে পবিত্র করে, তেমনি এর প্রতিটি ধাপ আমাদের শরীরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে সহয়তা করে, রোগ-ব্যাধি মুক্ত রাখতে সহয়তা করে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসলেরও নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের জন্য যে সব নিয়ম মেনে চলা জরুরী, যেগুলো মেনে চললে স্বাস্থ্য সুন্দর থাকে, রোগ ব্যাধি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চা। এগুলোর মধ্যে শারিরীক পরিচ্ছন্নতা, কাপড়-চোপড়ের পরিচ্ছন্নতা, হাত, মুখ, দাঁত, নখ, পা, ইত্যাদির যত্ন, খাওয়া-দাওয়ার সময় সতর্কতা, হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় সতর্কতা, থুথু ফেলায় সাবধানতা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, ইত্যাদি। পরিস্কার পচ্ছিন্নতা বা ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চার মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের সর্বোচ্চ পরিচ্ছন্নতা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর নিয়মগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে এর প্রতিটি পর্ব আমাদের শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে এবং রোগ-ব্যধি মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য তিনি বলেন,

---

[৫৯]. আল-কুরআন ৫ : ৬

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّـهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ اللَّـهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ

(হে রাসূল!) আপনি তাদের বলুন, বল তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি; তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে।[৬০]

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ٧١ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেস্তাগণকে বললেন, আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেও।[৬১]

অতএব মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মধ্যেই রয়েছে সকল প্রকার অনুগত্যতা ও পবিত্রতা।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দিক নির্দেশনা

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নিয়ে এসেছেন। মহান আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ এই গ্রন্থটি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্যই সমভাবে শেফাদানকারী বলে প্রমাণিত। যখনই যে জাতি এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে রক্ষাকবচ বানিয়ে নিয়েছে তখনই সে জাতি নতুন জীবন লাভ করেছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও শিক্ষার গন্ডির বাইরে থেকে গেছে। কারণ এটা কি করে সম্ভব যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথাতুর পৃথিবীবাসীর শারীরিক ও মানসিক রোগসমূহ থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূহানী রোগের সঙ্গে শারীরিক সমস্যারও সমাধান দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজের প্রচলিত কোন চিকিৎসক ছিলেন না। নবুওয়তের পদমর্যদার জন্য এটা জরুরীও নয়। তথাপিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসকদের জন্য একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনাও দিয়ে গেছেন।

আধুনিক যুগে মানুষের মস্তিষ্কে বস্তুবাদ এতই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের ঝাড়-ফুঁক ও দোয়া-কালামকে একেবারেই অনর্থক ও নিঃষ্প্রয়োজন মনে করে থাকে। ওষুধ ব্যাতীত অন্য কিছুই তাদের জ্ঞানে আসে না। ওষুধ সুস্থতার মাধ্যম মাত্র, সুস্থতা দানকারী নয়। কারণ, সুস্থতা এক মাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের হাতে। যদি ওষুধ ব্যবহারের দ্বারাই সুস্থতা লাভ করা যেত তাহলে কোন অসুস্থ ব্যক্তি ওষুধ ব্যবহারের পর অসুস্থ থাকতো না। আমাদের কখনও এই ধ্রুব সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না যে, শেফা দানের ক্ষমতা এক মাত্র মহান আল্লাহর হাতে। অতএব, সুস্থতা লাভের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের মুখাপেক্ষি হওয়া উচিত। ওষুধ একটি কার্যকর ও উপকারী মাধ্যম মাত্র। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ঈমানদারদের জন্য (তাদের রোগের) শেফা ও রহমত স্বরূপ।[৬২] পবিত্র কুরআন এমন শেফা ও রোগ মুক্তির মহৌষধ যার মধ্যে আত্মিক ও দৈহিক সর্বপ্রকার অসুস্থতার শেফা

৬০. আল-কুরআন ৬ : ৪৬
৬১. আল-কুরআন ৩৮ : ৭১-৭২
৬২. আল-কুরআন ১৭ : ৮২

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। এমনকি এতে চারিত্রিক ত্রুটি ও সামাজিক বিপথগামীদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যাক্তি আল্লাহর কালামের দিক নির্দেশনা গ্রহণ করে নিয়েছে, তারা সকল প্রকার রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত এবং চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ গ্রহণেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় মদীনা শরীফের ডাক্তারগণ হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকত। এমনকি এক ডাক্তার নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ নিয়ে এল যে, কোন রোগীই তার নিকট যায় না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সম্ভবত এর কারণ এই যে, এ সকল লোকেরা সে পর্যন্ত খাবারের প্রতি হাত বাড়ায়না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তীব্র ক্ষুধা অনুভব না করে। আর পরিপূর্ণরূপে পেটভরার পূর্বেই খাবার খাওয়া ছেড়ে দেয়। তাই মনে করা যায় যে কম খাওয়ার কারণেই তাদের সুস্থতা বজায় আছে।[৬৩] পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শের মধ্যে মানুষের জীবন যাপনের উত্তম পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রয়োজন শুধু সঠিক মর্ম উপলব্ধী করে সে হিসাবে জীবন প্রণালী গড়ে তোলা। কুরআনকে পবিত্র আর উত্তম মনে করে শুধু মাত্র পাঠ করায় যথেষ্ট নয়। হাদীসকে অনুসরণ করে কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, তথা রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত মেনে চললেই কেবলমাত্র কুরআন-হাদীস উৎগত উপকারিতা লাভ করা সম্ভব।

মেস্ওয়কের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় জাতি দাঁতের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না। প্রকৃত পক্ষে বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে এ সম্বন্ধে তাদের ধারণা জন্মে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে দাঁতের যত্ন ও সংযোজন বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়। বিলাতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ আছে যে ১৯৫৭ সালে এক কোটি পনের লাখ দাঁত উত্তোলন করেন সেখানকার ডেন্টাল সার্জনগণ। আরও বলা হয়েছে যে পঞ্চাশ লাখ দাঁত দন্ত চিকিৎসকগণ সংযোজন করে দেন এবং তেত্রিশ লক্ষ রোগীর মাড়ির চিকিৎসা প্রদান করেন। এ খাতে এ দেশের ব্যয় হয়েছিল আটান্ন কোটি পঞ্চাশ লাখ পাউন্ড।[৬৪] সুতরাং দেখা যায় ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁতের যত্ন শুরু হয়। কিন্তু বহু পূর্বে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই গোটা বিশ্বের জন্য শান্তি ও বিজ্ঞানময় ধর্ম ইসলামের উৎস ভূমি আরবে দাঁতের যত্নের প্রতি চর্চা ও অনুশীলন শুরু করছিলেন বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ফলে বলতে হয় তখন থেকেই দন্ত বিজ্ঞানের উদ্ভব। দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন ইউরোপীয় জাতি অনুন্নত ও অসভ্য ছিল তখন আরব মরুভূমিতে প্রেরীত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা বিশ্বের মানব গোষ্ঠীর জন্য দাঁত পরিষ্কারের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেন। শুধু তাই নয় তিনি স্বয়ং এর উপর আমল করেছেন।

জাপানের টোকিওতে ১৯৬০ সালে ১৫০টি স্কুল ও ১৭টি কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দাঁতের যত্নের উপর এক সপ্তাহ ব্যাপি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এতে আলোচনা ও বক্তৃতা ছাড়াও দাঁত পরিষ্কার করার উত্তম পন্থা শিখানো হয় এবং ছাত্রদের মাঝে বিনামুল্যে দাাঁতের ব্রাশ ও মাজন বিতরণ করা হয়।[৬৫] বর্তমানে দাঁতের যত্ন ও চিকিৎসার জন্য বহু বই-পুস্তক লেখা হয়েছে। এর জন্য ক্লিনিক্স,

[৬৩]. প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, অনুবাদ, cÖv¸³, পৃ. ৮১

[৬৪]. ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, ¯^v¯'¨ weÁv‡b Bmjvg, ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশনস, cÖv¸³, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৫০

[৬৫]. cÖv¸³, পৃ. ৫১

হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি খোলা হলেছে। ইদানিং স্কুলের ছাত্র থেকে শুরু করে প্রতিটি নাগরিকের নিয়মিত দাঁত পরীক্ষার প্রয়োজন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্য দ্রব্য ভাল ভাবে হজম করতে দাঁত সাহায্য করে। দাঁত দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কারক। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যত্নের মত দাঁতের ও প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া উচিত। ইসলামে যেমন দাঁত পরষ্কার রাখার উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁত পরিস্কার সম্বন্ধে যা বলে গেছেন, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম প্রবর্তক, বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসক তদ্রুপ বলে যাননি। এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে যা অধ্যায়ন করা প্রতিটি স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণ কালেও মিসওয়াক সঙ্গে রাখতেন। নিম্নে কয়েকটি হাদীসের উদ্বৃতি দেয়া হলোঃ

আবূ হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি মু'মিনদের জন্য এবং যুহাইরের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে "আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হতো তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[৬৬] হুযায়ফাহ (রা.) বলেছেন যে, রাত্রিতে যখন রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতেন।[৬৭] ইবেন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিস্কার করছি। তখন দুই ব্যক্তি আমার নিকট এলো। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি কণিষ্ঠকে মিসওয়াকটি দিলাম। আমাকে বলা হলো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে তা দাও। তারপর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমি মিসওয়াক দিলাম।[৬৮] আবূ বুরদা (র) এর পিতা, আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একদা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে দেখি, তিনি তাঁর হাতের মেসওয়াক দিয়ে দাঁত ঘসছেন। তিনি মুখে মেসওয়াক রেখে এমন ভাবে উহ্ উহ্ শব্দ করছেন মনে হলো যেন তিনি বমি করবেন।[৬৯] শুরাই ইবনে হানীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, গৃহে প্রবেশ করে নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম কি করতেন? তিনি বললেন যে, মিসওয়াক করতেন।[৭০]

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দশটি স্বাভাবিক সিদ্ধ ধর্ম কর্ম আছে : গোঁফ খাট করা, দাঁড়ি দীর্ঘ করা, দাঁত পরিস্কার করা, অজুর সময় নাক পরিস্কার করা, নখ কাঁটা, আঙ্গুলের গিরা সমূহধৌত করা, বগলের কেশ মুন্ডন করা, নাভির নিচের কেশ মুন্ডন করা এবং পায়খানা প্রশাবের পর পানি দ্বারা পরিষ্কার করা অর্থাৎ ইস্তেঞ্জা করা। রাবী বলেছেন দশম জিনিসটি আমি ভুলে গিয়েছি। হয়তবা কুলি করা হতে পারে। কুতাইবা একটু অধিক বলেছেন যে, ওয়াকী বলেছেন 'ইনতি কাসুল মা' অর্থাৎ ইস্তেঞ্জা করা।[৭১] হুযায়ফাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠতেন তখন

---

[৬৬]. ইমাম মুসলিম (র), C╱¸ ³, খন্ড ২য়, ২য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২, হাদীস নং ৪৯৬

[৬৭]. আবূ আব্দুলাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী আল-জুফী (র), Avm-mnxn, খন্ড ১ম, উযু অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১৭২, হাদীস নং ২৪৪ ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩ খ্রি.,

[৬৮]. C╱¸ ³, পরিচ্ছেদ ১৭২

[৬৯]. C╱¸ ³, হাদীস নং ২৪৩

[৭০]. ইমাম মুসলিম (র), C╱¸ ³, খন্ড ২য়, ২য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২, হাদীস নং ৪৯৭

[৭১]. C╱¸ ³, অনুচ্ছেদ ১৩, হাদীস নং ৫১১

মিসওয়াক দ্বারা ঘসে মুখ সাফ করতেন।[৭২] সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত এবং বহু ফযীলত। প্রত্যেক সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করলে ঐ সালাতের ফযীলত মিসওয়াক বিহীন সালাতের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বেও মিসওয়াক ব্যবহার করছিলেন। বিশ্বের সেরা মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁত পরিস্কার সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজে পালন করে গেছেন তা আমরা কমই খেয়াল করে থাকি। অথচ মুসলমান হিসবে আমাদের উচিত সেদিকে লক্ষ্য রাখা। পাঁচ ওয়াক্ত সালতের পূর্বে মিসওয়াক করা সম্বন্ধে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বক্তব্যই শুধু রাখেননি বরং নিজে এবং সাহাবীগণ তা মেনে চলেছেন।[৭৩] কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগে খুব অল্প সংখ্যক মুসলমান এই নিয়ম মেনে চলে। এর কারণ হচ্ছে :

* সালাতের প্রতি অমনোযোগ
* হাদীস চর্চার অভাব বা হাদীস শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ
* অলসতা
* স্বাস্থ্য সচেতনার অভাব।

তবে খুশীর কথা বর্তমানে মুসলমানগণ অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন। স্বাস্থ্য সর্ম্পকীয় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ বর্তমানে বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় পাওয়া যায়। অভাব শুধু এই সব মূল্যবান গ্রন্থ পড়া এবং তদনুযায়ী আমল ও প্রচার করা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা পাঠ্য বই ছাড়া বহু পুস্তক পড়ে থাকে কিন্তু তাদের খুব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কুরআনের বাংলা অর্থসহ ও বাংলায় অনুদিত স্বাস্থ্য সর্ম্পকীয় গ্রন্থসমূহ পড়ে থাকে।

প্রকৃতি কখনো মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ নয় বরং তা সর্বদাই মানব-স্বভাবের অনুকূলে। শুধু তাই নয়, মানুষ যখন দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে গিয়ে নানা ধরনের বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয় এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনরূপ উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় প্রকৃতির দিকে ফিরে আসে, প্রকৃতি তখনও মানুষকে পূর্বের ন্যায় উপকার করতে থাকে। চিকিৎসকগণ বলে থাকেন সকালে ঘুম থেকে উঠে, প্রতিবার আহারের পর এবং রাত্রে শয়নের পূর্বে দাঁত পরিস্কার করতে হবে। যদি সম্ভব না হয় তবে অন্তত কমপক্ষে দু'বার অর্থাৎ সকালে নাস্তার পর এবং রাত্রে শয়নকালে অবশ্যই দাঁত পরিস্কার বা মিস্ওয়াক করতে হবে। আহারের পর দাঁত নিয়োমিত পরিস্কার না করলে শর্করা জাতীয় খাদ্য মুখের লালার সঙ্গে মিশে এক প্রকার ডেক্সট্রিন তৈরী করে এবং পরে ভেঙ্গে বিষাক্ত এক প্রকার অ্যাসিড সৃষ্টি হয় যা দাঁতের এনামেলকে নষ্ট করে। খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া নামক রোগ জীবাণু দাঁতের মধ্য আবরণকেও ধ্বংস করে আর এভাবে ধ্বংস করতে করতে যদি দাঁতের ভিতরের আবরণ 'পালপ' পর্যন্ত পৌঁছে তবে মারাত্মক ব্যাথা হয়। কারণ স্নায়ুগুলো দাঁতের ভিতরের আবরণ 'পালপে' থাকে। এই দন্তক্ষয় রোগকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় Dental caries বা Carious tooth বলে। আমাদের সমাজে সাধারণ লোকেরা যাকে 'দঁতের পোকা' বলে থাকে সেগুলো আসলে দাঁতের পোকা নয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড অপরিস্কার দাঁতকে ক্ষয় করে। বিশেষ করে দাঁতের যে অংশ দ্বারা খাদ্য দ্রব্য চিবানো হয় সেই অংশের মাঝখানে কালো রঙের গর্ত হয়, অবশেষে দাঁতের আবরণ সমূহ নষ্ট হয়ে যায়। শিশুরাই আমাদের দেশে দন্তক্ষয় রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে

---

৭২. C\/¸ 3, হাদীস নং ৫০০

৭৩. ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, C\/¸ 3, পৃ. ৫৩

অপরিস্কার মুখগহব্বর, অনিয়মিত ও ভুল পদ্ধতিতে দাঁত পরিস্কার করা এবং অতিরিক্ত চকলেট, চুইংগাম এবং মিষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ। ফলশ্রুতিতে মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, মাড়ি ফুলে যাওয়া, দাঁত থেকে মাড়ি পৃথক হয়ে যাওয়া, দাঁত নড়ে যাওয়া অবশেষে দাঁত পড়ে যায়। একে চিকিৎসা শাস্ত্র মতে 'পাইয়োরিয়া' ও 'জিনজিভাইটিস' রোগ বলে।[৭৪] নিয়োমিত ও সঠিকভাবে দাঁত পরিস্কার না করলে মুখ দুর্গন্ধময় হয়। অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় এই দুর্গন্ধ প্রকাশ পায়। নিয়োমিত মেসওয়াক না করলে দাঁত ও মাড়িতে রোগ দেখা দেয় তাতে সৌন্দর্য হ্রাস পায়। মুখের সৌন্দর্য ও দাঁতের লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য নিয়োমিত মেসওয়াক ও মাড়িকে ম্যাসেজ করা একান্তই দরকার। ভালো ভাবে দাঁতের গোড়া পরিস্কার না করলে মাড়িকে দাঁতের গোড়া থেকে সরিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের পূর্বে হাত ধৌত করতেন আর খাবার শেষে কুলি করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষেরা খাবার খেয়ে কুলি করে না, অথচ সে ব্যক্তি যদি মিষ্টি দ্রব্য খেয়ে থাকে, তাহলে তার প্রভাব মুখের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ অবশিষ্ট থাকে আর যদি সাথে সাথে কুলি করার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় তাহলে মহা ক্ষতির হাত থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। তাছাড়া দিনে অন্তত পাঁচবার অজু করতে হয়, আবার পৃথক ভাবে মুখ পরিস্কার করা হয়ে থাকে। এভাবে মানুষ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত মুখ, হাত, পা ইত্যাদি পরিস্কার করে থাকে। টনসিলের রোগীদেরকে মিস্ওয়াক ব্যবহার করিয়ে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। মিস্ওয়াক ব্যবহার করে এবং মিস্ওয়াক কেটে পানিতে ফুটিয়ে সেই পানি দ্বারা গড়গড়া করে 'থাইরয়েড গ্লান্ড' রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি খুব দ্রুত উপশম পেয়েছে। গালের ঘা অনেক ক্ষেত্রে গরমের তিব্রতা এবং প্রখরতার কারণে হয়ে থাকে। তন্মধ্যে বিশেষ এক প্রকার ঘা রয়েছে যার বিষাক্ততা দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য তাজা মিস্ওয়াক দ্বারা দাঁত মাজতে হবে এবং তখনকার সৃষ্ট মুখের লালা গুলো মুখের মধ্যে মলতে হবে। এই পদ্ধতিতে অনেক রুগী আরোগ্য লাভ করেছে। অনেকে দাঁত হলুদ বর্ণ হয়ে যাওয়া এবং দাঁতের শুভ্র আস্তর বেরিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করে থাকেন। মিস্ওয়াকের নতুন নতুন আঁশ দাঁতের জন্য খুবই উপযোগী। মিস্ওয়াক হল দুর্গন্ধ প্রতিষেধক। মিস্ওয়াক মুখের ভিতরের রোগ জীবাণু ধ্বংস করে দেয়, ফলে নামাযী ব্যক্তি অসংখ্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পায়। আর অনেক রোগ জীবাণু তো মিস্ওয়াকের প্রতিরোধক পদার্থের ক্রিয়াতে ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত আলী (রা.) বলেন, মিস্ওয়াক দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়।

প্রকৃত পক্ষে যে বৃক্ষে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় পদার্থ যত বেশী, সেই গাছের মিস্ওয়াক তত বেশী উত্তম। কারণ দাঁত গঠনের মূল উপাদান ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধময় পুঁজযুক্ত দাঁত মস্তিষ্ক রোগের বড় কারণ হতে পারে। উম্মাদনা মস্তিষ্ক বিকৃতিসহ আরো অনেক রোগ-ব্যাধিও এর থেকে জন্ম নেয়। দীর্ঘ দিন যাবত পাইওরিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কের পর্দায় পুঁজ হতে দেখা গেছে। আবার এই একই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মাড়ীর দাঁতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু-বরণ করার ঘটনাও বিরল নয়। যেসব রোগীদের কানে ফোলা, পুঁজ, রক্তিমতা, ইত্যাদি হয়েছে এবং ডাক্তারগণ তাদের চিকিৎসা করে ব্যার্থ হয়ে পড়েছেন! তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে মাড়ীতে পুঁজ জমেছে। সুতরাং মাড়ীর চিকিৎসা করার পর রোগী সুস্থ হয়ে পড়ে। দন্তরোগের সাথে রয়েছে চক্ষু-রোগের গভীর সম্পর্ক। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যখন খাবারের ছোট ছোট কণা জমে থেকে মুখ দূর্গন্ধময় হয়ে পড়ে তখন চক্ষু রোগ, দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা এবং অন্ধরত্বের শিকার হতে পারে।

---

[৭৪]. C/, ³ পৃ. ৫৫

চক্ষু রোগের আরো যতো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তন্মধ্যে দাঁতের যত্নের প্রতি অমনোযোগই এর প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হয়েছে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের গবেষণায় একথায় প্রমাণিত হয়েছে যে, দন্তরোগের কারণেই পাকস্থলীর ৮০% রোগ হয়। বর্তমান বিশ্বে পাকস্থলীর রোগ এক প্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দঁড়িয়েছে। দাঁতের মাড়ীর অথবা মুখের ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ খাদ্য-পানির সাথে মিলিত হয়ে অথবা লালার সংমিশ্রনে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে সমস্ত খাদ্যসমূহকে দূষিত ও দুর্গন্ধময় করে তোলে, ফলে এই পুঁজ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে পাকস্থলী ও যকৃত রোগের চিকিৎসার পূর্বে দাঁত এবং মুখের চিকিৎসার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাহলে পাকস্থলী, যকৃতসহ পেটের অন্যান্য অসুখের দ্রুত ও স্থায়ী আরোগ্য সম্ভব। সমাজ-জীবনে একে অন্যের সাথে বাক্য বিনিময়ের সময় মুখের দূর্গন্ধের কারণে গোটা পরিবেশটাই বিষাদময় হয়ে পড়ে। এ ধরনের রোগের চিকিৎসার জন্য সর্বপ্রথম দাঁতের কথা স্মরণ রাখা উচিত। কারণ দূর্গন্ধের প্রধান কারণ হল দাঁত। অতএব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য দাঁতের যত্ন নেয়া আবশ্যক। কারণ সুস্থতাই হলো সফল জীবনের চাবিকাঠি। সে জীবন কখনো সফলকাম হতে পারে না, যেখানে স্বাস্থ্য রক্ষার মূল নীতির প্রতি থাকে চরম উদাসীনতা।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, দাঁতের যত্ন নেওয়ার জন্য ব্রাশ বেশি প্রয়োজন না মিস্ওয়াক? ব্রাশ এবং মিস্ওয়াক উভয়ই কি এক? এ ব্যাপারে জীবাণু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ জ্ঞান লাভ করেছেন যে, একবার ব্যবহার করা ব্রাশ স্বাস্থ্যের জন্য তখনই ক্ষতিকর যখন উহা দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা হয়। কেননা ব্যবহারের ফলে তার মধ্যে জীবাণুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। পানি দ্বারা পরিস্কার করলেও জীবাণু ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ছাড়াও ব্রাশ দাঁতের উপরের উজ্জল স্তরকে দূরীভূত করে দেয়, ফলে দাঁত অমসৃন হয়ে যায়, দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি হয়, দাঁতগুলো ধীরে ধীরে মাড়ী থেকে বিচ্যুতি হতে থাকে এবং খাবারের ছোট ছোট কণাগুলো দাঁতের ফাঁকে জমে মাড়ী ও দাঁতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। অপর দিকে এমন বৃক্ষের মিস্ওয়াক দাঁতের জন্য উপযোগী যার আঁশগুলো হয় কোমল, যা দাঁতের মধ্যে ফাঁকা বৃদ্ধি করে না এবং মাড়ীতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে না। তিনটি গাছের ডাল মিস্ওয়াকের জন্য উপযোগী (১) নীম গাছের মিস্ওয়াক (২) বাবলার মিস্ওয়াক (৩) পীলু গাছের মিস্ওয়াক। প্রকৃত পক্ষে এই তিনটি গাছের ডালে দাঁত গঠনের মূল উপাদান ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বেশী পরিমাণে রয়েছে। মিস্ওয়াক হলো সর্দি-কাশির সর্বোচ্চ প্রতিরোধক। স্থায়ী সর্দি-কাশির রোগীর শেষ্মা যদি জমাট বেঁধে থাকে সে ক্ষেত্রে মিস্ওয়াক ব্যবহার করলে শেষ্মা ভিতর থেকে বের হয়ে মস্তিষ্ক হালকা হয়ে যায়। নিয়মিত মিস্ওয়াক ব্যবহার করলে নাক ও গলার অপারেশন করার মত পরিস্থিতি খুব কমই সৃষ্টি হয়।[৭৫]

অজুর বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর দিক

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিম বান্দাহ অজুর সময় যখন মুখমন্ডল ধৌত করে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গোনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দু'হাত ধোয় তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতপর যখন

[৭৫]. ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদ, হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, mbv‡Z ivmj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg I AvaywbK weÁvb, ZZxq I PZ_ LÛ, ঢাকা: আল-কাওসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯ খ্রি. পৃ. ৪২ - ৪৩

সে পা দু'টি ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ্ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। এভাবে সে যাবতীয় গোনাহ্ থেকে মুক্ত ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন্ হয়ে যায়।[৭৬]

হাত ধোয়াঃ আমরা যখন হাত দিয়ে নানা কাজ করি, এটা-সেটা ধরি, তখন অসংখ্য জীবাণু হাতে লেগে যায়। এক মিলিমিটার লোমকূপের গোড়ায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার জীবাণু থাকতে পারে। আর একটা আংটির নিচে কোটি কোটি জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে। আঙ্গুলের নখের নিচে লুকিয়ে থাকতে পারে শত-কোটি জীবাণু। এসব জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না। আর যখন আমরা সেই হাতে খাবার, মুখ, চোখ, নাক স্পর্শ করি, তখন আমরা সংক্রমিত হই। অন্যকে স্পর্শ করে তাকেও আমরা আক্রান্ত করতে পারি। নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুললে আমশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, ডায়রিয়া, কৃমিসহ আরো অনেক জীবাণু দ্বারা সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। অজু করা শুরু করতে হয় হাত ধোয়ার মাধ্যমে। অজুর মাধ্যমে হাত ধোয়ার পর খুব কম জীবাণু হাতে লেগে থাকতে পারে। তাই নিজের ও অন্যের সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায় যথেষ্ট।

মুখ ধোয়াঃ আমাদের মুখে হাজারো জীবাণু বসবাস করে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এসব জীবাণুর বেশির ভাগই থাকে খসখসে জিহব্বার পেছনের অংশের উপরি ভাগে এবং দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে ফাঁকে। আমরা যে খাবার খাই, সে খাবারের ক্ষুদ্রাতি কণা জিহব্বার উপরি ভাগে আর দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে ফাঁকে লেগে থাকে। মুখের ভেতরে জীবাণুরা বেঁচে থাকে এসব খাদ্য কণা খেয়ে। জীবাণুরা যখন এসব খাদ্য কণা খেতে থাকে, তখন এসব খাদ্য কণা ভেঙ্গে দুর্গন্ধ যুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। কথা বলার সময় এ গ্যাস দুর্গন্ধরূপে বেরিয়ে আসে। দিনে পাঁচবার অজু করার সময় কুলি করে মুখ ধোয়ার মাধ্যমে এসব জীবাণুর সংখা যথেষ্ঠ কমে যায়। ফলে মুখের দুর্গন্ধ কমে যায়। মুখ ও দাঁতের যত্নে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন যথেষ্ঠ যত্নবান। সাহাবিদেরও তিনি মুখ ও দাঁতের যত্নের কথা বলেছেন। প্রতিবার অজুর আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত। প্রতিদিন নামাজের পূর্বে পাঁচ বার মেসওয়াক করে অজু করার সময় কুলি করে মুখ ধোয়ার মাধ্যমে মুখের জীবাণু সংখ্যা অনেক কমানো যায়। দাঁত মাজা বা ব্রাশ করার ফলে দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে লেগে থাকা ময়লা ও জীবাণু পরিস্কার হয়। দাঁত ও মাড়ি শক্ত হয়। দাঁতের ক্যারিস বা ক্ষয়রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

নাক ধোয়াঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বাতাসের কিছু ধুলাবালি ও জীবণু নাকের লোমে আটকা পড়ে। অজু করার সময় মুখ ধোয়ার পরই নাক ধুয়ে পরিস্কার করতে হয়। দিনে পাঁচবার নাক ধুয়ে ফেলার ফলে নাকের ভেতর লেগে থাকা ধুলাবালি থেকে রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

মুখোমন্ডল ধোয়াঃ অজুর পরবর্তী ধাপ মুখমন্ডল ধৌত করা। প্রতিবার অজুর সময় তিনবার করে মুখমন্ডল ধোয়ার ফলে মুখের ত্বকের ধুলাবালি, তেলতেলে ভাব ও জীবাণু দূর হয়। এতে মুখের ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা কমে। ত্বকে রক্ত সরবরাহ বাড়ে। ফলে ত্বক থাকে মসৃণ; ত্বকে বার্ধক্যজনিত ভাঁজ পড়ে দেরিতে।

[৭৬]. ইমাম মুসলিম (র), C\/¸ ³ , অনুচ্ছেদ ৯, হাদীস নং ৪৮৪

বাহু ধোয়া: অজুর সময় প্রত্যেক বাহুর কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করতে হয়। এতে বাহুর ত্বকের ধুলাবালি, তেলতেলে ভাব ও জীবাণু দূর হয় এবং ত্বকে রক্ত সরবরাহ বাড়ে।

মাথা ও ঘাড় মাছেহ করা: এর দ্বারা মাথার চুল, ঘাড় ও কানের ভাজ থেকে ধুলাবালি, ময়লা, জীবাণু দূর হয়। কানের ছত্রাকজনিত অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কমে। কমে ধুলাবালির এলার্জি জনিত ঘাড়ের চুলকানি।

পা ধোয়া: আমাদের পায়ের ত্বকে আছে অসংখ্য ঘর্ম গ্রন্থি। এগুলো থেকে নির্গত ঘামের সাথে বের হয় পানি, খনিজ লবণ, তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থ এবং শরীরের বিপাকীয় আরো অনেক পদার্থ। পায়ের ত্বকে স্বাভাবিকভাবেই হাজারো জীবাণু থাকে। এসব জীবাণু তাদের বেঁচে থাকা ও বংশ বৃদ্ধি করার জন্য ঘর্মাক্ত পায়ের স্যাঁতস্যেঁতে পরিবেশে ঘামের এসব জিনিস খেয়ে থাকে। ফলে তৈরী হতে থাকে নানা উচ্ছিষ্ট। আর এ জন্য পায়ে দুর্গন্ধ হয়। এ দুর্গন্ধ দূর করতে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রতিদিন একাধিক বার পা ধুয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। আর ইসলাম অজু করার নির্দেশ দিয়েছে নামাজের আগে। অজু করার সময় দৈনিক পাঁচবার পা ধোয়া নিঃসন্ধেহে পা-গুলোকে দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। সেই সাথে কমে পায়ের নানা ইনফেকশনের সম্ভাবনাও। ইসলাম কত স্বাস্থ্যসম্মত ও বিজ্ঞানময় ধর্ম।

নামাযের স্বাস্থ্যগত সুবিধা

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামায অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় অনেক আয়াতে নামাযের নির্দেশ ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের জন্য যে সমস্ত বিধান রেখেছেন তার প্রত্যেকটিতেই শরীর-স্বাস্থ্যের উপকারীতা রয়েছে। ফরজ ইবাদত নামাযও তেমনি, নামাযে শরীর স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না; বরং উপকার হয়। নামায একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম যা একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচ বার করতে হয়। নামাজের মাধ্যমে রোগ নিরাময় বা রোগ থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব।[৭৭] আমরা অবশ্য ব্যায়াম করার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করিনা। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর ফরজ হুকুম মানার জন্যই আমরা নামায আদায় করি, নামায কায়েম করি। এতে অবশ্যই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কল্যাণই নিহিত আছে। নামায আদায়ের সময় নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদাহ, বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের অনেক ব্যায়াম হয়। আর জামাতে নামায পড়ার সময় মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়াম শরীরের জন্য উপকারি। হাড়ের প্রতিটি জোড়া, চোখ, ঘাড়, রক্তনালি ও হৃৎপিন্ডের জন্য ভালো। নামাযের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি অনেক স্বাস্থ্যপকার রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া স্বাস্থ্যের সংজ্ঞার তিন দিকেরই সুস্থতা অর্জিত হয় নামাযের মাধ্যমে। ব্যায়াম হিসাবে হাঁটার কথা আজকাল খুবই বলছে চিকিৎসা বিজ্ঞান। উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হিসাবে হাঁটার কথা আমরা সবাই জানি। হাঁটার ফলে শরীরের অনেক উপকার হয়। রক্তের খারাপ কোলেস্টেরল

---

[৭৭]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, C\ , ³ , পৃ-৭৩

'এল ডি এল' কমে, আর ভালো কলেস্টেরল 'এইচ ডি এল' বাড়ে। রক্তনালির দেয়ালে তেল-চর্বি জমে না। ফলে উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক এবং হৃদরোগের সম্ভাবনা কমে যায়।হ্রাস পায় ডায়াবেটিক্স হওয়ার সম্ভাবনা। আর ইতিমধ্যেই যাদের ডায়াবেটিক্স রোগ হয়েছে, তাদের ডায়াবেটিক্স থাকে নিয়ন্ত্রণে এবং শরীরের ওজন থাকে সঠিক। শরীরের মাংশপেশি হয় সুঠাম ও জয়েন্ট বা হাড়ের জোড়াগুলো থাকে কর্মক্ষম। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমেও প্রায় একই ধরনের উপকার পাওয়া যায়। দৈনিক ৩০ (ত্রিশ) মিনিট করে হাঁটলে যেসব শারীরিক উপকার পাওয়া যাওয়ার কথা, তার প্রায় সবই অর্জিত হয় নামায পড়ার সময় শরীরের বিভীন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে নিয়মতান্ত্রিক নড়াচড়া হয়, তার মাধ্যমে। নামাযের সময় শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশী ও জয়েন্টের নিয়মতান্ত্রিক নড়াচড়ার যে পুনরাবৃত্তি হয়, তাতে এসব অঙ্গে রক্ত সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে পেশির শক্তি বৃদ্ধি পায়। হাড়ের জোড়ার বা জয়েন্টে স্থিতিস্থাপকতা ও নমনিয়তা বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত ছন্দোবদ্ধ সংকোচন ও প্রসারণের ফলে মাংসপেশি সবল হয়, সুঠাম হয়। পেশিগুলো শুকিয়ে যায়না। অল্প বয়সে গিঁটেবাত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। রুকু ও সিজদায় ঘাড়, মাথা ও মস্তিষ্ক রক্ত সরবরাহ বাড়ে, ফলে ঘাড় ও মাথা ব্যাথার উপশম হয়। নামাযের মাধ্যমে হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের কর্ম-দক্ষতা বাড়ে। শ্বাসতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিরাত পাঠের জন্য গভীরভাবে শ্বাস টানার ফলে ফুসফুসের ভেতরে অক্সিজেনের সর্বোচ্চ ব্যাবহার হয়। নামায পড়ার ফলে শরীর-মন প্রফুল হয়। বাইরের দুশ্চিন্তা এসে মনে বাসা বাঁধে না। কুরআন তেলাওয়াত করায় বা শোনায় মনে পরিবর্তন হয়। আধ্যাত্মিক চেতনায় মন ভরে উঠে। মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আত্মতৃপ্তিতে মন ভরে উঠে। মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার সময় এলাকার অনেক লোকের সাঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হয়, কুশল বিনিময় হয়। ফলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। নামায কায়েম করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি আমরা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থাকতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের কত উত্তম ব্যাবস্থাপনাই না দিয়েছেন।

ফজরে ওঠার স্বাস্থ্যগত সুবিধা

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একদিন তাঁর পুত্রকে সকালে ঘুমাতে দেখে বললেন, "উঠে পড়ো, তুমি কি এই সময়ে ঘুমাচ্ছ, যখন জীবিকা বন্টন হয়ে থাকে?"[৭৮] সকালে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যসম্মত। জ্ঞানী ব্যাক্তিরা বলেন, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলে স্বাস্থ্যবান, জ্ঞানী আর ধনী হওয়া যায়। Early to bed and early to rise, Makes a man healthy, wealthy and wise (বেঞ্জামিন ফ্রান্কলিন)। ইসলাম অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের জন্যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরজ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রথম ওয়াক্তই ফজরের নামায। আর ফজরের নামায আদায় করতে হয় অতি প্রত্যুষে, সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্য উঠার পূর্বেই। সময় মত নামায আদায় করার জন্য অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠতে হয়। সুতরাং ইসলাম সকালে ঘুম থেকে উঠাকে যেমন ফরজ করেছে, তেমনি উৎসাহিতও করেছে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠা খুবই বরকতময়। সুতরাং যারা দেরিতে ঘুম থেকে উঠে, তারা সকালে উঠার বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

---

[৭৮]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

আজকাল শহরে বসবাসকারীদের বেশির ভাগ লোকের অভ্যাস দেরিতে ঘুমাতে যাওয়া এবং দেরিতে ঘুম থেকে উঠা। গ্রামে অবশ্য এই অভ্যাস কিছুটা কম। একজন স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের সকালে সূর্য উঠার পূর্বে ঘুম থেকে উঠা অবশ্যই কর্তব্য। এটা একজন ভালো মুসলমানের অভ্যাসে পরিণত হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠার স্বাস্থ্য সুবিধা অনেক। মসজিদে জামাতে নামায অদায়ের জন্য বাসা-বাড়ি থেকে মসজিদ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া এবং হেঁটে অসার ফলে ভাল ব্যায়াম হয়। নামাযের সময় ও নামায আদায়ের মাধ্যমে ব্যায়াম হয়। এছাড়াও সকালে ঘুম থেকে উঠলে হাঁটা-হাঁটি বা ব্যয়াম করার অনেক সময় পাওয়া যায়। শরীরের জন্য হাঁটা খুবই জরুরী। নিয়মিত ব্যায়াম উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি হয়। কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ার বড় কারণ চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া এবং ব্যায়াম না করা। চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হবে কম। ব্যায়াম করতে হবে বেশি। ব্যায়াম করলে খারাপ কোলেস্টেরল 'এল ডি এল' এর মাত্রা কমে । আর ভাল কোলেস্টেরল 'এইচ ডি এল' এর মাত্রা বাড়ে। ব্যায়াম করলে রক্ত নালির দেয়ালে চর্বি জমতে পারে না। ফলে রক্তনালি সরু হয় না, সঠিক থাকে। ব্যায়াম করলে হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম রক্তচাপ কমাতেও সহায়ক। চিকিৎসা বিজ্ঞনীরা বলেন, প্রতিদিন ৩০ (ত্রিশ) মিনিট করে সপ্তাহে ৫ দিন ব্যায়াম করলে রক্তচাপ কমবে প্রায় ৪ থেকে ৯ মিলিমিটার। মাত্র কয়েক সপ্তাহেই এরূপ ফল পাওয়া যাবে। নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে রক্তচাপ থাকবে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে। ইসলামি জীবন-যাপনে দৈনন্দিন বেশ ব্যায়াম হয়। একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন, নামায পড়ার সময় নামাযের কিয়াম, রুকু-সিজদাহ, বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের অনেক ব্যায়াম হয়। আর জামাতে নামায পড়ার সময় মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়াম শরীরের জন্য উপকারি, হাড়ের প্রতিটি জোড়া, চোখ, ঘাড়, রক্তনালি ও হৃৎপিন্ডের জন্য ভালো। বিকেলে ব্যায়াম করার চেয়ে সকালে ব্যায়াম করার সুবিধা একটু বেশি। সারারাত ঘুমানোর কারণে শরীরের পেশীগুলো একটু শিথিল হয় এবং ব্যায়ামের জন্য বেশি উপয়োগী হয়। পক্ষান্তরে বিকালে পেশীগুলো থাকে বেশি ক্লান্ত। ব্যাস্ত জীবনে বিকালে ব্যায়াম করার জন্য সময় বের করা খুবই কষ্ট সাধ্য। সকালের বাতাস থাকে নির্মল। ধুলাবালি এবং ক্ষতিকর গ্যাস থাকে খুবই কম। এরূপ বাতাস শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

সারারাত অভূক্ত থাকার ফলে সকালে আমাদের শরীরে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায়। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলে সকাল সকাল নাস্তা করার মাধ্যমে দ্রুত শরীরের খাদ্যের অভাব পূরণ হয়। অপর দিকে দেরিতে ঘুম থেকে উঠলে নাস্তা করার জন্য বেশি সময় পাওয়া যায়না। অল্প নাস্তা করেই তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়। ফলে শরীর ব্যবহার করে শরীরের জমে থাকা শক্তি। আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। সকালে উঠলে এ সমস্যাগুলো হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এ ছাড়া সকালের নির্মল পরিবেশে ফজরের নামাযে আধ্যাত্মিক চেতনায় মন ভরে উঠে। আত্মতৃপ্তিতে মন পরিপূর্ণ হয়। ফলশ্রুতিতে, মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠলে আমরা আল্লাহর অদেশ পালনের পাশাপাশি এসব স্বাস্থ্য সুবিধা পেতে পারি। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মু'মিন মহিলারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়তেন, তারপর সর্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে ঘরে ফিরতেন। (তখনও এরূপ অন্ধকার থাকতো যে)

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের কে কেউ চিনতে পারতো না।[৭৯] সঠিক সময়ে জামায়াতের সহিত নামায আদায় করা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে যেমন প্রিয়, তেমনি স্বাস্থ্যকর ও বটে। ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করতে হলে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয়। সুতরাং ইসলাম সকালে ঘুম থেকে উঠাকে ফরজ করেছে।

রোযা রাখার স্বাস্থ্যগত সুবিধা

চন্দ্র বৎসরের বার মাসের মধ্যে 'রামযান' মাসের নাম পবিত্র কুরআনে সূরা 'আল-বাকারায়' উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

রমজান মাস এমন একটি মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, আর এই কুরআন মানব জাতির জন্য পথের দিশা। মানুষের জন্য সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসটি পাবে, সে এই মাসে রোযা রাখবে।[৮০] তাছাড়া 'সিয়াম' শব্দটি মোট চৌদ্দবার কুরআন মাজীদে সূরা আল-বাকারা, আন নিসা, আল মায়িদা, মরিয়ম, আল আহযাব ও মুজাদালাহ্ এই ছয়টি সূরায় প্রয়োগ দেখা যায়। তবে সিয়ামের বিধান সম্বলিত আয়াতগুলোর একত্র সমাবেশ ঘটেছে সূরা আল-বাকারায়। তাছাড়া সহীহ্ হাদীস গ্রন্থগুলোতে সিয়ামের মাহাত্ম্য, মর্যদা ও বিধি-বিধান সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম (আ.) হতে নূহ (আ.) পর্যন্ত প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়াম ফরয ছিল। একে বলা হয় 'আইয়ামে বীয' এর রোযা। ইহুদীদের প্রতি সপ্তাহে শনিবার, বছরের মধ্যে মুহর্‌রমের ১০ম তারিখে এবং হযরত মূসা (আ.) এর পর্বতে ৪০ দিন সিয়াম পালনের স্মৃতি স্মরণে ঐ ৪০ দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ আছে। মহর্‌রমের আশুরার রোযার কারণ হলো হযরত মূসা (আ.) এর শুকরিয়ার সিয়াম। সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'পাশবিক প্রবৃত্তি দমন'। তাই এর মাধ্যমে তা সম্ভব বলে যুগে যুগে নবী রাসূল ওহী লাভের প্রাক্কালে সিয়াম পালন করতেন। হযরত ঈসা (আ.) ইঞ্জীল প্রাপ্তির পূর্বে দীর্ঘ ৪০ দিন সিয়াম পালন করেছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর যে ৪০ দিন সিয়াম ফরজ তাকে ইংরেজীতে লেন্ট (Lent) বলা হয়। অবশ্য খৃষ্টানদের খুব কম লোকেই এ সিয়াম পালন করে থাকেন। হিন্দুরা প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১১ ও ১২ তারিখ শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী ও দ্বাদশীর উপবাস ব্রত পালন করেন। কোন কোন হিন্দু কার্তিক মাসের প্রতি সোমবার উপবাস করে থাকেন। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের জৈন ধর্মবলম্বীরা প্রতি বছর কয়েক সপ্তাহ ধরে উপবাস পালন করেন। প্রাচীন মিসরীয়দের মাঝেও ঠিক অন্যান্য ধর্মের আনন্দ উৎসবের মত উপবাস পালন করার প্রথা চালু ছিল।[৮১]

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার 'সিয়াম' প্রবন্ধের লেখক লিখেছেন, 'এমন কোন ধর্ম আমাদের স্মরণে আসে না, যার ধর্মীয় নিয়ম নীতির মাঝে অবশ্যই উপবাসকে অন্তভূক্ত করা হয়নি'। আরো বলেছেন, প্রকৃতই উপবাস ধর্মীয় কর্মকান্ড হিসাবে সকল ধর্মের মাঝেই বিদ্যমান আছে। উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজিদে নির্দেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

---

[৭৯]. C\/¸ ³, ৫ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪২, হাদীস নং ১৩৪২

[৮০]. আল-কুরআন ২ : ১৮৫

[৮১]. ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, C\/¸ ³, পৃ. ৮০

হে মুমিনরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পার।[৮২] এই মাসের মর্যাদা এই জন্যে বেশী যে পবিত্র কুরআন,

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

ইব্রাহীম (আ.) এর সহীফা, দাউদ (আ.) এর যবুর, মূসা (আ.) এর তাওরাত এবং ঈসা (আ.) এর ইঞ্জিল এই রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়। ঈসা (আ.) এর মাতা মরিয়ম সিয়াম পালন করতেন।[৮৩]

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের দ্বিতীয় সালে মুসলমানদের উপর এক মাস সিয়াম ফরয করা হয়। ধন ও মালের যেমন যাকাত আদায় করতে হয় ঠিক তেমনি সিয়াম শরীরের যাকাত স্বরূপ। 'প্রত্যেক বস্তুর যাকাত (পরিশোধক) রয়েছে, আর দেহের যাকাত হলো সিয়াম'। সিয়াম দ্বারা মানুষ শারীরিক মানসিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মায়া, মাৎসর্য এই ষড় রিপুকে নিয়ন্ত্রিত করাই সিয়ামের বিশেষ উদ্দেশ্য। এই ষড় রিপুই মানুষের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। ষড় রিপু দমন করা ইসলামের শিক্ষা নয় বরং এগুলোকে নিয়ন্ত্রিণ করাই ইসলামের শিক্ষা।[৮৪] এই রিপু দমনের জন্যে খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ না করে বা সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে বাস করবার মত কষ্টসাধ্য রীতি চালু আছে। ইসলাম ষড় রিপুকে বস্তুত শরীরের দাবী বলে স্বীকার করে কিন্তু এর দমন নয় বরং শরীয়তের সীমার মধ্যে এর নিয়ন্ত্রণ করাই কর্তব্য বলে মনে করে।

মানব জীবনের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা (Basic needs) তা হলো :

* ক্ষুধা নিবারণের চাহিদা
* পিপাসা নিবারণের চাহিদা
* বিশ্রাম (নিদ্রা) গ্রহণের প্রবনতা ও
* কাম বাসনার চাহিদা।

এগুলোর ন্যায় সংগত চাহিদা পূরণের দ্বারা মানব জীবন সুন্দর মার্জিত ও উৎকর্ষ-মন্ডিত হয়। এগুলোর চরম স্বল্পতা জীবনকে স্থবির, পঙ্গু ও অর্থব করে দেয়। আবার এ সবের ব্যাপারে অত্যধিক বাড়াবাড়ি জীবনকে লাগামহীন ও বেপরোয়া করে তোলে এবং পশুত্বের দিকে ঠেলে দেয়। ইসলাম এ চারটি মৌলিক চাহিদার বিজ্ঞান সম্মত ও ন্যায় সংগত বাস্তবায়নের দ্বারা মানব চরিত্রকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে আগ্রহী এবং এ কাজে সিয়ামের ভূমিকা সর্বাধিক। অথচ মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাক্তিগণ সিয়ামকে অস্বীকার করে এবং উহা পালন করে না। তারা সিয়ামের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও শারীরিক কোন প্রকার উপকারিতাই দেখে না। এজন্য সিয়ামের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা অর্থাৎ দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মনে এর বৈজ্ঞানিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্তই দরকার।

প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানদের জন্য রোযা একটি ফরজ ইবাদত। সারা দিন রোযা রাখা আপাত দৃষ্টিতে বেশ কষ্টকর একটি ইবাদত এবং মনে হতে পারে যে সারা দিন না খেয়ে থাকার ফলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এমন কোন ইবাদতের বিধান রাখেননি যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর; বরং খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, সবই নির্ধরণ করেছেন আমাদের উপকারের জন্যই। রোযা রাখা স্বাস্থ্যের জন্য অপকারী নয় বরং উপকারীই বটে। তবে আমরা স্বাস্থ্য সুবিধা

---

[৮২]. আল-কুরআন ২ : ১৮৩

[৮৩]. আল-কুরআন ১৯ : ২৬

[৮৪]. ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, C/, ³, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়ার জন্য রোযা রাখিনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ফরয হুকুম পালনের জন্য রোযা রাখি। তারপরও রোযা রাখলে স্বাস্থ্যগত অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। নিচে রোযা রাখার কয়েকটি স্বাস্থ্যগত উপকারের কথা উল্লেখ করা হলো।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ্যতা; শুধু কোন রোগ বা অক্ষমতার অনুপস্থিতিই নয়। অর্থাৎ কোন ব্যাক্তির শরীরে কোন রোগ বা অক্ষমতা না থাকলেই যে তিনি স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ, তা ঠিক নয়। সুস্থ হতে হলে তাঁকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে হবে। এর সাথে আধ্যাত্মিক দিকের কথাও বলা হয়। কিভাবে আমরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে সুস্থ থাকতে পারি? শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাবার, ব্যায়াম, বিশ্রাম ইত্যাদি। মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য চায় সুস্থ শরীর, সুস্থ সমাজ। রোযা কি আমাদের সুস্থ থাকতে সহায়তা করে? রোযা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক দেওয়া স্বাস্থ্যের সংজ্ঞার সব দিকই অর্জন করতে রোযা আমাদের সহায়তা করে।

শারীরিক দিক: রোযা তাকওয়াসম্পন্ন সমাজ গড়া ছাড়াও রোগ থেকে মুক্ত থাকার অন্যতম উপায়।[৮৫] পবিত্র রমজান মাসের ৩০ দিন বা ২৯ দিন সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থেকে রোযা রাখতে হয়। রোযা রাখার ফলে খাদ্যনালী একটু বিশ্রাম পায়। বছরে একবার এই রমযান মাসেই কেবল এই সুযোগটা পাওয়া যায়। রোযা রাখার জন্য স্বাদ গ্রন্থি ১৪-১৫ ঘন্টা বিশ্রামের কারণে সন্ধ্যায় ইফতারির কী মজাই না পাই! সারা দিন রোযার শেষে খাদ্যনালীর রস নব উদ্যমে কাজ করতে পারে। শরীরের বাড়তি ওজন নানা রোগের কারণ। রোযা শরীরের বাড়তি ওজন জনিত অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। রোযা রাখলে রক্তের চিনির পরিমাণ কমে। সুতরাং ডায়াবেটিসে রোযা বেশ উপকারী। ডায়াবেটিস রোগীদের রোযা রাখার ব্যাপারে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। চিকিৎসকের পরামর্শমত ওষুধ ব্যাবহার করে ও নিয়ম মেনে রোযা রাখলে ডায়াবেটিস রোগীদেরও তেমন সমস্যা হয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে কেহ যদি এমন রোগাক্রান্ত হয় যে, যদি রোযা রাখে তবে রোগ বেড়ে যাবে, রোগ দুরারোগ্য হয়ে যাবে, অথবা জীবন হারাবার আশঙ্কা হয়, তবে তার জন্য রোযা না রেখে আরোগ্য লাভের পর রোযা কাযা করা দুরস্ত আছে। যখন কোন মুসলমান দিনদার চিকিৎসক সার্টিফিকেট দেবেন যে, রোযা রোগীর ক্ষতি করবে, তখন রোযা ছাড়া জায়েয হবে। রোযা রাখার ফলে রক্তে চর্বি কমে। আর চর্বি কমলে হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনাও কমে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য রোযা খুবই উপকারী। রোযার মাসে রাতে তারাবিহ্‌র নামায পড়তে হয়। হেঁটে মসজিদে গিয়ে এশা ও তারাবিহ্‌র নামায পড়ায় শরীরের যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে ব্যায়াম এবং নামায পড়ার সময় নামাযের মাধ্যমে ব্যায়াম। তারাবির নামাযের সময় শরীরের যে ব্যায়াম হয়, তা শরীরকে ফিট রাখতে সহায়তা করে। মোটামুটি দীর্ঘ সময় ধরে তারাবিহ্‌র নামায আদায়ের ফলে, শরীরের মাংসপেশী ও হাড়ের জোড়ার ব্যায়াম হয়। অস্থি, সন্ধি অধিকতর কর্মক্ষম হয়। শরীর থাকে ফিট। নামাযের কারণে হাড়ের ঘনত্ব বাড়ে। মাংসপেশী ও হৃদপিন্ডে রক্ত সরবরাহও বেড়ে যায়। হৃদপিন্ডে ও ফুসফুসে কর্মক্ষমতাও বাড়ে।[৮৬] শরীরের বাড়তি ওজন কমাতেও তারাবিহ্‌র দীর্ঘ নামায বেশ কার্যকর। তারাবিহ্‌র নামাযের

---

[৮৫]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, C\, ³, পৃ-৭৩
[৮৬]. ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

সময় বিশ রাকাতে কিয়াম, রুকু, সিজদা, বৈঠক ইত্যাদির বাড়তি পরিশ্রমের জন্য ইফতার ও সন্ধা রাতের খাবার শরীরে ব্যবহৃত হতে পারে। খাবার থেকে শক্তি আহরিত হতে পারে শরীরে। প্রতি রাকাত নামাযে বেশ কয়েক ক্যালরি শক্তি খরচ হয়। এতে করে সাহরীতে পর্যাপ্ত ক্ষুধা লাগে, খাওয়ার ইচ্ছাটা স্বাভাবিক থাকে।

মানসিক দিক: রোযা মানসিক প্রশান্তি অর্জনে সহায়তা করে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখা হয়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রয়াসে মন তৃপ্তিতে ভরে যায়। মানসিক প্রশান্তি আসে। মসজিদে মসজিদে খতম তারাবিহ্ হয়। খতম তারাবিহ্র দীর্ঘ সময় কুরআন তেলাওয়াত হয়। কুরআন তেলাওয়াত শুনেও মনে প্রশান্তি আসে। রোযা রাখার মাধ্যমে মানসিক অবস্থা, চিন্তা ও আচরণ উন্নত হয়। দুশ্চিন্তা ও হতাশা কমে। আত্মশক্তি বাড়ে। ক্রোধ দমন ও সংযমী হতে রোযা যথেষ্ট সহায়ক। কেউ ঝগড়া করতে চাইলেও সংযমী হয়ে ক্রোধ দমনের উপায় হিসাবে বলতে হয়, 'আমি রোযাদার'। স্বাস্থ্যের জন্য অপকারী অভ্যাস বা বদ-অভ্যাস যেমন, ধুমপান, পান ও জর্দাপাতা ইত্যাদি বর্জনে রোযা অত্যান্ত সহায়ক। সারা দিন তো রোযাই থাকা হয়। পানাহার থেকে বিরত হওয়ার পাশাপাশি ধুমপান থেকেও বিরত থাকতে হয়। রাতে ইফতারের পর থেকে সাহরী পর্যন্ত অল্প সময় ধুমপান না করলে এক মাসেই ধুমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করা সম্ভব।

সামাজিক দিক: সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে বসে ইফতার করার একটা রেওয়াজ আছে। পরিবারের লোকজনের সাথেতো বটেই, পরিবারের বাইরের লোকজনের সাথেও। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব একসঙ্গে খেলে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় হয় এবং বন্ধুত্ব বাড়ে। রমযান মাসের তারাবিহ্র নামাযের সময় এলাকার সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হয়, কুশল বিনিময় হয়। এতে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

আধ্যাত্মিক দিক: তারাবিহ্র নামাযের আগে বয়ান ও তারাবিহ্তে ত্রিশ পারা কুরআন শোনায় মনে পরিবর্তন হয়। আধ্যাত্মিক চেতনায় মন ভরে উঠে। সুতরাং রোযা আমাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে সুস্থ থাকতে নিশ্চিত ভাবে সহায়তা করে। আল্লাহর হুকুম পালন করার মাধ্যমে পবিত্র মাহে রমযানের রোযা রেখে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি আমরা যেন রোযা থেকে স্বাস্থ্য সুবিধা লাভ করতে পারি, আল্লাহ আমাদের সে তওফিক দান করুন। আমীন।

রমযানের খাবার-দাবার

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র রমযান মাসে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য রোযা রাখাকে ফরয বা অবশ্য পালনীয় ইবাদত হিসেবে নির্ধরিত করেছেন। এ মাসের প্রতিদিন সুবহে সাদেকের পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থেকে রোযা রাখতে হয়। খাবার খেতে হয় রাতে। দীর্ঘ সময় পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয় বলে রাতে যে খাবার খাওয়া হয়, তা হওয়া চাই স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর। এটি সুষম ও পরিমিতও হওয়া চাই। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে রমযানে সুষম খাদ্য গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোযার মাসের খাবার অন্যান্য মাসের খাবার থেকে যে একেবারেই ভিন্ন হবে, তা কিন্তু নয়। হওয়া উচিতও নয়। এ মাসের খাবার-দাবার অন্যান্য মাসের খাবার-দাবারের মতোই হবে। এ মাসে প্রতি রাতে সাধারণত তিনবার খাওয়া হয়। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই করা হয় ইফতার। মাগরিবের নামাযের একটু পরেই খাওয়া হয় সন্ধ্যারাতের খাবার। আর শেষরাতে খাওয়া হয় সাহ্রী।

যাদের শরীরের ওজন বেশী বা স্বাভাবিক, রমযানে বেশী খাবার খেয়ে তাদের ওজন যেন না বাড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর যাদের ওজন কম বা স্বাভাবিক, তাদের খেয়াল রাখতে হবে রমযানে ওজন যেন বেশী না কমে। সারা দিন রোযার শেষে শরীর থাকে ক্লান্ত, শক্তি থাকে কম। ইফতারের সময় শরীর, বিশেষ করে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষ, খাবারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক শক্তির যোগান পায়। ইফতারের দু-একটা খেজুর ও একটু শরবত সে শক্তির জোগান দিতে পারে। সাথে পেঁয়াজু, ছোলা, মুড়ি, শসা শরীরের অন্যান্য চাহিদা মেটায়। তবে মিষ্টি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার এবং বেশি মসলাযুক্ত খাবার ও ভাজাপোড়া খাবার পরিমাণে কম হওয়া চাই। ইফতারের সময় একসঙ্গে বেশি খাওয়া উচিত নয়। মাগরিবের নামাযের পর সন্ধ্যারাতের খাবারে ভাত বা রুটি প্রচুর সবজি, দু-এক টুকরা মাছ বা মাংস, দুধ ও ফল থাকা চাই। সারাদিন রোযা রাখার কারণে শরীরে পানির কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়। এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য ইফতার ও ঘুমানোর মধ্যবর্তী সময়ে প্রচুর পানি পান করতে হবে। সাহরীতে একটু কম খাবার খাওয়াই ভালো। একটু দেরিতে হজম হয়, সাহরীতে এরূপ খাবার গ্রহণ করাই শ্রেয়। দেরিতে হজম হয় এরূপ খাবারের মধ্যে আছে কম ছাঁটা চাল, আটা, ডাল, মাংস ইত্যাদি। আর দ্রুত হজম হয় এরূপ খাবারের মধ্যে আছে চিনি, মিষ্টি, ময়দা ইত্যাদি। খাবারের তালিকায় আঁশযুক্ত খাবারও থাকতে হবে। আঁশযুক্ত খাবারের মধ্যে আছে আটা, সিমের বিঁচি, ছোলা, শাক-সব্জি, ফল ইত্যাদি। শরীরের খনিজ লবণের অভাব পূরণের জন্য শাক-সব্জি ও ফল-মূল দরকার। খেজুরে ও কলায় আছে শর্করা, পটাশিয়াম ও ম্যাগালেশিয়াম। শসা পানি ও খনিজ লবণের চাহিদা মেটায়। সাহরীতে পানি পান করতে হবে বেশি। সব মিলিয়ে বলা যায়, রমযান মাসে পরিমিত সুসম খাবার খেতে হবে, পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। প্রচুর শাক-সব্জি ও ফল-মূল খেতে হবে। অন্যদিকে অতিভোজন, অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার এবং ধুমপান পরিহার করতে হবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাত্না

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ থেকে ত্বক ছেদন করাকে খাত্না (circumcision) বলে যা মুসলমান ছেলেদের জন্য সুন্নাত। আমাদের দেশে কোথাও স্থানীয় ভাবে একে 'মুসলমানী' বলে থাকে। সর্ব প্রথমে খাত্না করেছিলেন নবী ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। খাত্নার ব্যাপারে জনৈক শৈল্য চিকিৎসাবিদের (Surgical specialist) অভিমত হচ্ছে Apparently circumcision did not originate among the Jews. They took the custom from either the Babylonians or the Negroes, Probably the later. It has been, Practiced in West Africa for over 5,000 years. (Bailey and Love's short Practice of surgery) অর্থাৎ : স্পষ্ট রুপে খাত্না রীতিটা ইহুদীদের মধ্যে থেকে উদ্ভব হয়নি। তারা এই প্রথাটি গ্রহণ করেছিল হয় ব্যাবিলনীদের নিকট থেকে, না হয় নিগ্রোদের নিকট থেকে, সম্ভবত শেষেরটি থেকে। পাঁচ হাজার বছর পূর্ব থেকে এই রীতিটা পশ্চিম আফ্রিকাতে অনুশীলন হয়ে আসছে।[৮৭] চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষের খাত্না করার পিছনে কি কি যুক্তি ও অভিমত আছে তা ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমরা প্রথমে দেখে নিতে চাই ইসলামের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব আছে কতটা। কেননা ইসলামের সব কয়টি বিধানই

[৮৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। আর জীবন যাপনের সঠিক পন্থা সমূহ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমণ হয়েছিল।

ইসলামের দৃষ্টিতে খাত্না

খাত্না প্রথা পয়গম্বর ইবরাহীম (আ.) থেকে আরম্ভ হয়ে[৮৮] আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত থাকবে ইনশায়াল্লাহ। পুরুষের জন্য খাত্না করা সুন্নাত এবং স্বাস্থ্য সম্মতও বটে। ইসলাম এই খাত্নার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়নি তবে তা বয়ো-প্রাপ্ত হওয়ার পুর্বেই করা উচিত। এ ব্যাপারে দু’টি হাদীসের উদ্ধৃত করা হলোঃ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের স্বভাবগত বিষয় হল পাঁচটি। খাত্না করা, নাভীর নিচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ানো, গোপ কাটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা।[৮৯]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) ৮০ (আশি) বছর বয়সের পর ‘কাদ্দুম’ নামক স্থানে নিজেই নিজের খাত্না করেন। কুতাইবা (র) অবুয যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ‘কাদ্দুম’ একটি স্থানের নাম।[৯০]

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খাত্না

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে খাত্না করা বা পুরুষাঙ্গের ত্বক ছেদনকে অতি প্রয়োজনীয় কাজ বলে অভিহিত করেছে এবং এর উপকারিতার স্বপক্ষে সুদৃঢ় মত প্রকাশ করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, খাত্না করলে অনেক গুরুত্বর ব্যাধি থেকে রেহায় পাওয়া যেতে পারে। ‘Bailey and loves short Practice of Surgery’ নামক পুস্তকের ১২৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, Circumcision correctly performed soon after birth confers almost total immunity against carcinoma of the penis. On the other hand (and this is difficult of explanation) circumcision after early infancy does not provide the same degrce of protection. For practical purposes, then, carcinoma of the penis occurs only in men who have not been circumcised in early infancy. অর্থাৎ : জন্মের পরক্ষণেই যদি ঠিকমত খাত্না করানো হয় তা হলে পুরুষাঙ্গে ক্যান্সার রোগ হবে না, অপর পক্ষে (এবং এ ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন) শৈশবের পরে খাত্না করলে অনুরূপ সমান ফল পাওয়া যাবে না। কার্যতঃ পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার ঐ সমস্ত লোকদেরই হয় যারা শৈশবের পূর্বে খাত্না করেনি।[৯১]

বর্তমান কালের চিকিৎসাবিদদের অভিমত হচ্ছে ছেলে জন্ম গ্রহণের পরেই খাত্না করে দিতে হবে, সে যে কোনো ধর্মেরই হউক না কেন। পশ্চাত্যের হাসপাতল ও মাতৃসদনগুলোতে ছেলে সন্তান প্রসব করার পরে বাধ্যতামূলকভাবে খাত্না করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের বিশিষ্ট শৈল্য চিকিৎসাবিদ অধ্যাপক ডাঃ কে দাস তাঁর ‘Clinical Methods in Surgery’ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেনঃ

---

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৮৯. ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ৯ম, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২৬১১, হাদীস নং ৫৮৬০

৯০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৮৬১

৯১. ড. দেওয়ান আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

Mohammedans owing to their religious custom of compulsary circumcision in infancy will naturally not suffer from phimosis, paraphimosis and sub-prepucial infection. Carcinoma of the penis is said to be less common in them. Possibly for the same reason. অর্থাৎ : শৈশবকালে খাত্না করানো মুসলামানদের ধর্মীয় রীতিতে বাধ্যাতামুলক বলে স্বাভাবিকভাবে তারা ফাইমুসিস, প্যারা-ফাইমুসিস এবং সাব-প্রিপুসিয়াল প্রদাহ প্রভৃতি রোগে ভোগেনা। সেজন্যে পুরুষাঙ্গে ক্যান্সার তাদের বেলায় খুব একটা দেখা যায় না। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ত্বকের ভিতরে এক প্রকার রস অনবরত নির্গত হয়, তাকে বলা হয় স্মেগমা (smegma). চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে এই স্মেগমা রস পুরুষাঙ্গে নানাবিধ রোগ এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। যদি কোন মহিলার স্বামীর খাত্না না করানো থাকে তবে ঐ মহিলার জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে (Gynaecology) সমস্ত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞগণ যথার্থই বলেছেন, Rarity of the disease (Carcinoma of the cervix) in Muslims and Jewes অর্থাৎ: মুসলমান ও ইহুদী মহিলাদের জরায়ুর মুখে ক্যান্সার খুবই কম হয়।[৯২]

খাত্না না করলে যে সমস্ত রোগ হয়

পুরুষের শৈশবে খাত্না না করানোর জন্যে যেসব রোগ হতে পারে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. সাব-প্রেপুসিয়াল প্রদাহ (Sub – prepucial inf ection) : পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে অবস্থিত বাড়তি চামড়ার (Pr epuce) ভিতরে প্রদাহ হয় এবং তা একিউট অথবা ক্রনিক হতে পারে।

২. ফাইমুসিস (phimosis) : পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের অবস্থিত বাড়তি চামড়া প্রদাহ যখন দীর্ঘায়িত (Chronic) অথবা আকস্মিক (*Acute*) হয় তখন এই রোগ হয়ে থাকে। এতে প্রস্রাবের নালির বহির্ভাগ ঐ বাড়তি চামড়া আবৃত করে একেবারেই বন্ধ করে ফলে প্রস্রাব করতে মারাত্মক অসুবিধা হয়। প্রস্রাব বের হতে না পারাতে পুরুষাঙ্গের মাথা বেলুনের মতো ফুলে যায় এবং তীব্র ব্যথা হয় তখন হাসপাতালে নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে খাত্না করানো হলে রোগী উপশম পায় এবং ভালো হয়ে যায়।

৩. প্যারা-ফাইমুসিস (*Para – phimosis*) : পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের বাড়তি চামড়া হঠাৎ করে আটসাট হয়ে এবং পিছনের দিকে সরে এসে আটকিয়ে যায় কিন্তু পূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। এতে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের পিছনের দিক অর্থাৎ গোড়া সংকুচিত হয়ে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ফুলে ফেঁপে যায় এবং ব্যাথা হয়। এটা আমাদের দেশে স্থানীয় ভাবে কোথাও বলে গায়েবী খাত্না। প্রকৃত পক্ষে কোনো খাত্না নয় বরং একটি রোগ। উক্ত রোগটি দেখতে খাত্নার মতো তাই লোকেরা বিশেষ করে অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এটা মনে করে থাকে। এরূপ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো উচিত অথবা হাসপাতালে নিয়ে খাত্ন করানো উচিত। তা ছাড়া এর চিকিৎসা ও হচ্ছে খাত্না করানো। অনেক সময় কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় না এবং সে ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসারও প্রয়োজন হয় না। এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে।

---

[৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬

৪. গ্রপুসিয়ালের পাথর (prepucial calculi): শৈশবে খাত্না না করালে বুড়ো বয়সে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ার ভিতরে পাথর হতে পারে সাধারণত : তিন প্রকারের পাথর দেখা যায়।

- শুধু স্মেগমা হতে পাথর তৈরি হতে পারে।
- স্মেগমা ও প্রস্রাবের লবণের সঙ্গে মিশেও পাথর হতে পারে।
- শুধু প্রস্রাবের লবণের দ্বারা পাথর তৈরি হতে পারে।

চিকিৎসা হলো সার্জনের পরামর্শ অনুযায়ী খাত্না করা।

৫. ব্যালানু পস্থাইট্রিস (Balano posthitis) : পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের বাড়তি চামড়ায় প্রদাহ হলে তাকে পস্থাইটিস বলে এবং শুধু পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে প্রদাহ হলে তাকে ব্যালানইটিস বলে। সাধারণত: উভয় প্রদাহ এক সাথে সংঘটিত হয় বলে এই রোগের নাম একত্রে ব্যালানু পস্থাইটিস বলা হয়।

৬. লিউকুপাকিয়া (Leukoplakia of the glans penis)

৭. পিনাইল প্যাপিলুমা (Penile papilloma)

৮. পুরুষাঙ্গে প্যাজেটস্ রোগ (Paget's disease of the penis)

৯. পুরুষাঙ্গে ক্যান্সার (Carcinoma of the penis)

খাত্না না করলে এইড্সে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি

খাত্না না করা ভারতীয়দের এইচ আই ভি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খাত্না করেছে এমন লোকদের তুলনায় আটগুণ বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ২৯৮ জন ভারতীয় নাগরিকের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করেছে। ভারতের পুনাই এ অবস্থিত একটি হাসপাতালে যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এইচ আই ভি-১ জীবাণুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় একটি বড় মাপের গবেষণা করেছে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে ইনফেকশাস ডিজিজেস সোসাইটি অফ আমেরিকার ৪১তম সভায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রধান স্টিভেন রিনল্ড এই ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। এই গবেষণাটিতে ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ২ হজার ২৯৮ জন এইচ আই ভি-১ আক্রান্ত রোগীর ওপর পরীক্ষা চালানো হয়।[৯৩]

ইসলাম যে জীবন বিধান দিয়েছে তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

শপথ বিজ্ঞানময় কোরআনের।[৯৪] এ ছাড়া এটাও প্রমাণিত হয় যে ইসলাম বিজ্ঞানের জয়-যাত্রাকে উৎসাহ দিয়েছে। আল-কুরআনে সুরা আল-বাকারার ২৬৯ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে যে,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

যাকে হিকমত (জ্ঞান) দেয়া হয়েছে তাকে অনেক কল্যাণ ও দান করা হয়েছে। আর বোধ-শক্তির অধিকারি ছাড়া অন্য কেও বুঝতে পারে না।[৯৫] পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

[৯৩]. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

[৯৪]. আল-কুরআন ৩৬ : ২

[৯৫]. আল-কুরআন ২ : ২৬৯

সাল্লামের যাবতীয় কাজ-কর্ম, নির্দেশ ও অনুমতি প্রভৃতি সম্পূর্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক। তাঁর আচার-আচরণ, রীতি-নীতি এবং প্রদত্ত আদেশ নিষেধই উত্তম আদর্শ। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا

(হে মুসলমানেরা) তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রসূলের (জীবনের) মাঝে অনুকরণ যোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের মুক্তির আশা করে, (সর্বোপরি) যে বেশি পরিমাণে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে।[৯৬] সুতরাং খাত্না একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক কাজ। একে কোনো মতেই অবহেলা বা কম গুরুত্ব দেয়া উচিৎ নয়। এটা যে স্বাস্থ্য সম্মত তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সপ্তম দিনে দাদা আব্দুল মোত্তালেব যথা নিয়মে তাঁর খাত্না করিয়েছেন।

চিকিৎসা এবং সংযম

চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিপরীতধর্মী খেয়াল দেখা যায়। কিছু সংখ্যক লোক রোগ নিরাময়কে শুধু মাত্র ওষুধপত্র ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করেন। আর কিছু লোক আছেন যারা কোন কোন সময় কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে ওষুধপত্রকে অনর্থক মনে করে বরং সেক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিকে উপকারী ও যথেষ্ট মনে করেন। কিছু লোক এমনও আছেন যারা ওষুধ-পত্রকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করেন। তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কী? আল্লাহ তা'আলার শেষ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে কি শিক্ষা দিয়েছেন? ওষুধ-পত্র ও চিকিৎসা থেকে বিরত থাকা এবং ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন? এ সকল প্রশ্নের জবাবের জন্য নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

চিকিৎসা গ্রহণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসা গ্রহণের জন্য চিকিৎসকের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ওষুধ-পত্র ব্যবহারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ এমন কোন রোগ অবতীর্ণ করেননি যার নিরাময়ের উপকরণ সৃষ্টি করেননি।[৯৭] রোগমুক্তি ওষুধের নিজস্ব গুণ বা ক্ষমতা নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা ওষুধের মধ্যে রোগ মুক্তির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দেওয়াতে রোগ মুক্তি হয়। আল্লাহর ইচ্ছাই শুধু মাত্র ওষুধ রোগ মুক্তির কারণ হতে পারে। যদি তিনি ইচ্ছা না করেন তবে কোন ওষুধই কার্যকরী হয় না, এমনকি চিকিৎসক সঠিক ওষুধ নির্বাচনই করতে পারে না। যখন মানুষের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন অভিজ্ঞ ডাক্তারও বোকা বনে যায়।

---

[৯৬]. আল-কুরআন ৩৩ : ২১

[৯৭]. ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৭২, হাদীস নং ৫২৭৬

ব্যাধি ও প্রতিকার

স্বাস্থ্য সুরক্ষা সর্ম্পকিত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক কয়েকটি মূল্যবান হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কালোজিরায় মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে।[৯৮]

আবূ সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে মধু পান করাও। দ্বিতীয়বার আসলে তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। তৃতীয়বার আসলে তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপর পুণরায় এসে বলল, আমি অনুরূপই করেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সত্যই বলছেন। কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। তৎপর তাকে পুণরায় মধু পান করালে সে তা পান করল এবং তাতে তার আরোগ্য লাভ হলো।[৯৯]

ইবনে উমার (রা.) এর সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়। কাজেই তা পানির সাহায্যে নিভিয়ে দাও। না'ফি (র.) বলেন, 'আব্দুল্লাহ (রা.) যখন বলতেন, তোমাদের উপর থেকে শাস্তিকে হালকা কর।[১০০]

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ওফাত পান সেই রোগের সময় তিনি নিজ দেহে 'মুআব্বিযাত' (আল ফালাক ও আন নাস) পড়ে ফুঁক দিতেন। এরপর যখন রোগ তীব্র হয়ে গেল তখন আমি তদ্ধারাই তাঁর দেহের উপর ফুঁ দিতাম আর আমি তাঁর নিজের হাত তাঁর দেহের উপর বুলিয়ে দিতাম। কেননা তাঁর হাতে বরকত ছিল। রাবী বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিভাবে ফুঁক দিতেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর দুই হাতের উপর ফুঁক দিতেন, এর পর সেই হাতদ্বয় দ্বারা আপন মুখমন্ডল বুলিয়ে নিতেন।[১০১]

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জ্বর জাহান্নামের ধূয়া হতে আসে সুতরাং তাকে পানি দ্বারা শীতল করো।[১০২]

রাফে বিন খাদিজ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জ্বর জাহান্নামের ধূয়া হতে আসে সুতরাং তাকে পানি দ্বারা শীতল করো।[১০৩] আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিমত হচ্ছে, জ্বর হলে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পানি অথবা বরফসহ ব্যাগ (lcebag) দিয়ে বা সমস্ত শরীরে বরফ বা পানি দিয়ে মুছে ফেলা একান্ত কর্তব্য। অতএব দেখা যায় আজ হতে প্রায় পনের শত বছর পূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে যে শিক্ষা দিয়েছেন একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেছে। অতএব

---

[৯৮]. প্রাগুক্ত,পরিচ্ছেদ ২২৭৮, হাদীস নং ৫২৮৬

[৯৯]. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৭৫, হাদীস নং ৫২৮২

[১০০]. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৯৯, হাদীস নং ৫৩১২

[১০১]. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২৩০৩, হাদীস নং ৫৩২৪

[১০২]. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৯৯, হাদীস নং ৫৩১৪

[১০৩]. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৯৯, হাদীস নং ৫৩১৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লমের বাণী অবশ্যই চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত এবং জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি এর অনুকরণে হওয়া বাঞ্চনিয়।

আবূ হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ অবতীর্ণ করননি যার নিরাময়ের উপকরণ সৃষ্টি করেন নি।[১০৪]

শিরকী শব্দ দ্বারা মন্ত্র পড়া হারাম। পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা ফুঁক দেওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট মন্ত্র। পবিত্র কুরআনের আয়তের ভিতর সূরা আল ফাতিহা, সূরা আল ফালাক, সূরা আন নাস প্রভিতী দ্বারা ফুঁক দেওয়াই উত্তম। বর্তমানে সর্প দংশনের ওষুধ বেরিয়েছে এবং ফলপদ প্রমাণিত হয়েছে সুতরাং সাপে কাঁটলে ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

রোগ-ব্যাধি এবং এর প্রতিকার সম্বন্ধে চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিমত হচ্ছে Prevention is better than cure. অর্থাৎঃ রোগ প্রতিরোধ আরোগ্যের চেয়ে উত্তম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) রোগ প্রতিরোধের দিকে বেশী নজর দিয়েছে। দুনিয়া ব্যাপী সকল দেশে রোগ প্রতিরোধের কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। বাংলাদেশও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে চললে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা আরও ত্বরান্বিত হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে আটটি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে নবজাতক শিশুদেরকে প্রাথমিক টিকা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং শিশুর তিন মাস বয়স থেকে দু'বছরের মধ্যে নিম্ন লিখিত রোগের প্রাথমিক টিকা অবশ্যই দেওয়া উচিত। উল্লেখ্য যে, দেশের সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকে টিকা দেওয়া হয়।

- ডিপিটি ইনজেকশন (D-Diphtheria, P-Pertussis, T-Tetanus)ঃ ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশ ও টিটেনাস রোগের প্রতিষেধক।
- পলিও ড্রপ (Poliomyelitis)ঃ পলিও মাইলাইটিস রোগের প্রতিষেধক।
- যক্ষা (Tuberculosis)ঃ যক্ষা রোগের প্রতিষেধক ইনজেকশন।
- হাম ইনজেকশন (Measles)ঃ হাম রোগের জন্য প্রতিষেধক।
- হেপাটাইটিস ইনজেকশন (Hepatitis)ঃ ভাইরাস জনিত লিভার প্রদাহ সহ জন্ডিস রোগের প্রতিষেধক।
- চিকেন পক্স ইনজেকশন (Chicken Pox)ঃ জল বসন্তের প্রতিষেধক।

স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ

দিনে-রাতে তিনবার খাবার, মধ্যে দু'বার সামান্য নাশতা। অতিভোজন নয় কখনো। সারাদিনের খাবারে থকতে হবে সব ধরনের পরিমাণ মতো উপাদান। শর্করা, আমিষ, তেল, ভিটামিন, খনিজলবণ ও পানি; যাকে বলে সুষম খাবার। এসব খাবার থেকে দেহ শক্তি পাবে; দেহের ক্ষয় পূরণ হবে; রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে। খাদ্য-আঁশও থাকতে হবে খাবারে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়, কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরের ওজন কমাতে, মেদভূড়ি কমাতে, খাদ্যনালি ও স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমাতে খাদ্য-আঁশ উপকারী। বাইরের খাওয়া-দাওয়া করার সময়ও ভাবতে হবে খাবারটা স্বাস্থ্যসম্মত কি-না।

---

[১০৪]. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫২৭৬

ধুলাবালি, মাছি, অপরিচ্ছন্নতা, বাসি পচা বা নিম্ন মানের খাবার থেকে সতর্ক হয়ে খাবার গ্রহণ করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়া

ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা হতে হবে স্বাস্থ্যকর। হাত ধোয়া, খাওয়া, বিশ্রাম, ঘুম, দাঁত মাজা, নখকাঁটা, গোসল, প্রস্রাব-পায়খানা, পোশাক-আশাক সবকিছুর অভ্যাস হওয়া চাই স্বাস্থ্যসম্মত।

অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব

যে কোন প্রকারের নেশাই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপান তার অন্যতম। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপানের কারণে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ফুসফুস, মুখ, গলা ও পাকস্থলির ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, হাঁপানিসহ নানা রোগ হতে পারে। সুতরাং ধূমপন ত্যাগ করতে হবে। ধূমপানের মতোই মদ্যপান একটি বড় সমস্যা। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা দেয় মদপানের কারণে। শারীরিক বিভিন্ন রোগ-শোক এসে ভর করে। লিভারে চর্বি জমে, লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস হয়। লিভার সিরোসিসের মতো জটিল রোগও দেখা দিতে পারে। ঠোঁট ও মুখ থেকে শুরু করে খাদ্যনালির বিভিন্ন অংশে মরণ ব্যাধি ক্যান্সার হতে পারে। হতে পারে পাকস্থলির প্রদাহ বা গ্যাস্ট্রাইটিস। অগ্নাশয়ের প্রদাহ বা প্যানক্রিয়াটাইটিসও হতে পারে। ওপরের পেটে প্রচন্ড ব্যাথা; রক্তের চর্বির পরিমাণ বাড়ে; রক্তনালির দেয়ালে চর্বি জমে; ফলে, দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ। বেড়ে যায় হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি। মানসিক অশান্তি ও নিদ্রাহিনতা দেখা দেয়। শরীর হারায় শারীরিক ভারসাম্য। মারামারি, ছিনতায়, আত্মহত্যা, নারীঘটিত সামাজিক অন্যায়, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি ব্যাক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। শ্লোগান উঠেছে, মাদককে না বলুন। অথচ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আজ থেকে প্রায় দেড়হাজার বছর আগে মাদককে না বলে দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষ বিপথগামী হয়েছে। আল্লাহকে ভুলে নানা অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। তাইতো যুগেযুগে নবী-রাসূলদের আগমণ হয়েছে মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে। সঠিক পথে অর্থাৎ, আল্লাহর পথে নিয়ে আসতে। ইসলামের শুরুর দিকে খোদ আরব দেশেও আর দশটা অন্যায় অত্যাচরের ন্যায় মদ, জুয়া ইত্যাদি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এই মদপানের কারণেই তখনকার সমাজে নানা অনাচার হতো। এক সময় কয়েকজন সাহাবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদ, জুয়া ইত্যাদর খারাপ দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল হলো,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, দুটোতেই মানুষের জন্য পাপ ও উপকার রয়েছে। তবে পাপ উপকার অপেক্ষা বেশি।[১০৫]

তাৎক্ষণিকভাবে মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়নি। মানুষ তাৎক্ষণিক মদ ও জুয়া পুরোপুরি বর্জন করেনি। পরবর্তী সময়ে আয়াত নাযিল হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ

[১০৫]. আল-কুরআন ২ : ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

হে মুমিনরা! নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়ো না।[১০৬] এভাবে ধীরে-ধীরে মানুষকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এবং সব শেষে এ সম্পর্কিত নির্দেশ এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ
فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হে মু'মিনরা! মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এসব নোংরা ও অপবিত্র, শয়তানের কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং তোমরা এসব বর্জন কর। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শক্রতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে চায়। তোমরা কি এখনও বিরত হবে না?[১০৭]

ইসলামে মদপান হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েক বার বলেছেন 'মদপান করো না। কারণ এটি সব অন্যায়ের উৎস' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তারা যখন বললো এটা তো ওষুধ। তখন মহান আল্লাহ বললেন, 'এটা অসুখও। এ কারণে ইসলামে মদ্যপান নিষেধ করেছেন। যে মদ শুধু শরীরের জন্য এত ক্ষতিকর, ইসলাম কত আগেই না তা নিষিদ্ধ করেছে! ইসলামি বিধি-বিধান মেনে মদপান তথা সব নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহার করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি আমরা যেন শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ থেকে স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপন পালন করতে পারি সে জন্য আমাদের সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

নিয়মিত ব্যায়ামের সুফল

নানা রকমের ব্যায়াম আছে। হাঁটা, জগিং, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, সাঁতারকাঁটা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা সহ আরো কত কী! হাঁটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। সহজ ও মুটামুটি ঝুঁকিহীন। উপকার অনেক। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ প্রতিরোধ হবে; শরীরের মেদ কমবে। শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায় ফলে, শরীর ও মন থাকে প্রফুল্ল। প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে ৫ দিন একটু দ্রুত (মিনিটে ১০০ কদম) হাঁটলে শরীর থাকবে ফিট। সাঁতারকাঁটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। এর মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অঙ্গের ব্যায়াম হয়। যাদের সুযোগ আছে তারা এর সুফল নিতে পারেন।

দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা

শরীরের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, রক্তের চর্বির আধিক্য, উচ্চ রক্তচাপ, মহিলাদের স্তন ক্যান্সার ইত্যাদি অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সুতরাং শরীরের ওজন রাখতে হবে সঠিক। এ জন্য একদিকে যেমন চাই পরিমিত খাবার, অন্যদিকে এ খাবার ব্যাবহারের জন্য তেমনি চাই পরিমিত ব্যায়াম। যাদের শরীর মোটা তারা একটু কম খেলে এবং বেশি পরিশ্রম করলে শরীরের ওজন কমানো সম্ভব।

ব্লাডপ্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখা

হৃৎপিন্ড রক্ত পাম্প করে রক্তনালি দিয়ে সারা শরীরে সরবরাহ করে। আবার পাম্প করার পূর্বে সারা শরীর থেকে রক্ত এসে হৃৎপিন্ডে জমা হয়। হৃৎপিন্ড যখন সংকুচিত হতে হতে রক্ত পাম্প করে, তখন

[১০৬]. আল-কুরআন ৪ : ৪৩
[১০৭]. আল-কুরআন ৫ : ৯০-৯১

ধমনি (রক্তনালি) দিয়ে রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়। রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তনালির দেয়ালে রক্ত যে চাপ প্রয়োগ করে, তাকে সিসটোলিক চাপ বলে। স্বাভাবিক সিসটোলিক রক্তচাপ হচ্ছে ১২০ মিলিমিটার পারদ (১২০ মিলিমিটার উচ্চতর পারদের পাদদেশে যে পরিমাণ চাপ বাড়বে, এ চাপ সেই চাপের সমান)। সিসটোলিক প্রেসার ১২০ থেকে ১৩৯-এর মধ্যে থাকলে তা উচ্চ রক্তচাপের দিকে যাচ্ছে বলা যায় (একে প্রাক উচ্চ রক্তচাপ বলে)। আর ১৪০ এর বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেসার বলে। হৃৎপিন্ড রক্ত পাম্প করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সারা শরীর থেকে রক্ত এসে হৃৎপিন্ডে জমা হতে থাকে। এ রক্তকে গ্রহণ করার জন্য হৃৎপিন্ড তখন প্রসারিত হতে থাকে। এ সময় ধমনিতে (রক্তনালিতে) রক্তের যে চাপ থাকে, তা-ই ডায়াসটোলিক রক্তচাপ। স্বাভাবিক ডায়াসটোলিক রক্তচাপ ৮০ মিলিমিটার পারদ। ৮০ থেকে ৮৯ পর্যন্ত ডায়াসটোলিক রক্তচাপ থাকলে তা প্রাক-উচ্চ রক্তচাপ। আর ৯০ এর উপরে হইলে সেটা উচ্চ রক্তচাপ। সিসটোলিক উচ্চ রক্তচাপই হোক বা ডায়াসটোলিক রক্তচাপই হোক, কোনটাই শরীরের জন্য ভালো নয়। হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনির অসুখসহ অনেক কিছুই হতে পারে।[১০৮] যদি আপনার জানা থাকে যে আপনার রক্তচাপ স্বাভাবিক তাহলে ৬ মাস পর পর রক্তচাপ পরীক্ষা করা ভাল। আর উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করা প্রয়াজন।

রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা

কোলেস্টেরল হলো রক্তের চর্বি। এটা এমন একটি চর্বি যা সুস্থ থাকার জন্য পরিমিত পরিমাণ জরুরী। কোলেস্টেরল আমাদের শরীরকে সুস্থ সবল রাখে। এর সাহায্যে রক্ত বিভিন্ন হরমোন ও ভিটামিন তৈরীতে সহায়তা করে। শরীরের লক্ষ লক্ষ কোষের গঠণ প্রক্রিয়ায় কোলেস্টেরল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কোলেস্টেরল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে নেতিবাচক ধারণা আছে তা সঠিক নয়। পূর্ণ বয়স্কের ক্ষেত্রে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা প্রতি ১০০ মিলিলিটারে দুইশত মিলিগ্রামের মধ্যে থাকা উচিত।[১০৯] কোলেস্টেরলের আধিক্যের সমস্যা হচ্ছে অবচেতন ভাবে শরীরের রক্তনালীগুলো বিশেষ করে হৃৎপিন্ডের Coronary Artery তে চর্বির আস্তরণ পড়ে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপসর্গ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এটা ধরা পড়ে না। বিশেষ করে আমাদের দেশে চিকিৎসা সচেতনতার অভাবে অনেক সময় এগুলো উপেক্ষা করা হয়। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে কোলেস্টেরল চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মানবদেহে কোলেস্টেরলের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও কোন কোন ক্ষেত্রে অপকারিতা সম্পর্কে সবারই কমবেশী ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত ব্যাংকের একাউন্ট চেক করার মত রক্তের Lipid Profile চেক করাও সবার জন্য জরুরী। কোলেস্টেরল হিসাব নিকাশে যদি গরমিল থাকে তাহলে অনেক শারীরিক অসুবিধা হতে পারে। কোলেস্টেরল রক্তে প্রবাহিত হয় প্রটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে, লাইপোপ্রটিন নামে। লাইপোপ্রটিনের আবার বিভিন্ন নাম। হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রটিন (এইচ ডি এল) এবং লো ডেনসিটি লাইপোপ্রটিন (এল ডি এল)। এগুলোর একটি ভাল কোলেস্টেরল এবং অন্যটি খারাপ কোলেস্টেরল। 'এইচ ডি এল' হলো ভাল কোলেস্টেরল আর 'এল ডি এল' হলো মন্দ কোলেস্টেরল। 'এইচ ডি এল' কোলেস্টেরল রক্তের সব কোলেস্টেরলকে লিভারে নিয়ে যায় প্রসেসিংয়ের জন্য, নিষ্কাশনের

---

[১০৮]. অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, m¯^‡¯¨i Rb¨, ঐতিহ্য, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি. পৃ. ১৪

[১০৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

জন্য। এতে রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমান কমে, রক্তনালির দেওয়ালে কোলেস্টেরল জমে কম। রক্তনালি ভাল থাকে। উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে। তাই 'এইচ ডি এল' হলো ভাল কোলেস্টেরল। আর 'এল ডি এল' কোলেস্টেরল রক্তনালির দেওয়ালে জমা হয়। রক্তনালির দেওয়ালে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে পুরু ও শক্ত। ফলে দিনে দিনে বাড়তে থাকে রক্তচাপ; পরিনতি উচ্চ রক্তচাপ। কমে যায় রক্তের প্রবাহ। সম্ভাবনা বাড়ে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের। তাই 'এল ডি এল' হলো মন্দ কোলেস্টেরল। মন্দ কোলেস্টেরল আধিক্য সাধারণত নিম্নোক্ত অবস্থাগুলোতে বেশী দেখা দেয়।

* মেদবহুলতা
* ডায়াবেটিস
* কিডনী রোগ
* একটানা বিশেষ কিছু ওষুধসেবন
* বংশগত কারণ
* বসে কাজ করা
* থাইরয়েড রোগ
* লিভার রোগ
* অনিয়ন্ত্রিত চর্বি জাতীয় খাদ্য খাওয়া

রক্তের এইচ ডি এল বাড়ানো এবং এল ডি এল কমানোর উপায়

ওষুধ ছাড়া যে সমস্ত পন্থায় এইচ ডি এল বাড়ানো এবং এল ডি এল কমানো যায় সেগুলো হচ্ছে-

- ওজন কমানো।
- কায়িক পরিশ্রম না থাকলে ব্যায়াম করা।
- ধূমপান ত্যাগ করা।
- ঘরের তাপমাত্রায় জমে যাওয়া রান্নার তেল অর্থাৎ সম্পৃক্ত তেল পরিহার করা। এগুলোর বদলে অসম্পৃক্ত রান্নার তেল যেমন : যয়তুন, সরিষা, বাদাম, সূর্যমুখী, ভুট্টা ও সয়াবিন তেল ব্যবহার করা।
- আঁশযুক্ত খাবার বেশী খাওয়া। যেমন : সব ধরনের শাক-সবজী, ফল ও ডাল খাওয়া।
- রসুন ও ইছুপগুল ব্যবহার করা।
- মাছ, বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ বেশী খাওয়া।
- কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাদ্য পরিহার করা। যেমন : লালগোশত, ডিমের কুসুম, কলিজা, মাছের ডিম, চর্বি, হাঁসমুগীর চামড়া, হাড্ডি মজ্জা, ঘি, মাখন, ডালডা, গলদা চিংড়ি, নারিকেল ইত্যাদি।
- সর্বোপরি ডায়াবেটিস থাকলে তা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মনমেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা

কিছু কথা বা কাজ আছে যেগুলো করলে মন ভাল থাকে। আবার এমন কিছু কথা বা কাজ আছে যেগুলো করলে মন খারাপ হয়। আমাদেরকে মন্দটা পরিহার করে ভালটা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো করলে সুফল পাওয়া যাবে।

- হাসুন প্রাণ খুলে। হাসলে 'এনডরফিন' নিঃসরণ হয়, যা মস্তিষ্কে জাগায় ভালো লাগার অনুভূতি। হাসি খুশি মানুষ সুস্থ থাকে দীর্ঘ দিন। আপনার প্রিয় কাজগুলো করুন। প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান, গল্প করুন, আর প্রাণ খুলে হাসুন।
- ব্যায়াম করুন নিয়োমিত। ব্যায়ামে, এমনকি কেবল উঠ-বস করলে, যৌবনের হরমোন 'গ্রোথ

Dhaka University Institutional Repository

হরমোন'-এর নিঃসরণ বাড়ে। আর এই হরমোনের জন্য মন ভালো হতে পারে। ব্যায়ামের ফলে মস্তিষ্কে মন ভালো লাগার মতো কিছু 'নিউরোট্রান্সমিটারও' নিঃসরণ হয় ।

➢ হাতের পরশও ভালো করতে পারে মন। পরশেও নিঃসরণ হয় 'এনডরফিন', 'গ্রোথ হরমোন'। এগুলো স্ট্রেসের ক্ষতিকর দিক কমায়। গবেষণায় দেখা গেছে, চিকিৎসকের নিয়মিত হাতের পরশ পাওয়া রোগীরা পরশ না পাওয়া রোগীদের চেয়ে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

যে সমস্ত পরিবারের পিতা-মাতা উভয়ই পরিবারের বাহিরে শুধু মাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকেন এবং তাদের সন্তানদেরকে অন্যের মাধ্যমে লালন-পালন করেন ফলে, তাদের সন্তানদের পরিপূর্ণ ভাবে মানসিক বিকাশ ঘটে না। পরবর্তীতে এরা মানসিক ভাবে অন্যদের থেকে অনেক বিষয়েই পিছিয়ে থাকে। তারা সব সময় হিনমন্যতাই ভোগে। তাদের মন সব সময় দূর্বল থাকে।

পরিমিত আহার গ্রহণ

আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খায় আর কাফের সাত উদরে খায়।[১১০]

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'জনের খাবার তিন জনের জন্য এবং তিন জনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট।[১১১]

মুহম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র.) নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা.) ততক্ষণ পর্যন্ত আহার করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য একজন মিসকিনকে ডেকে আনা না হতো। একদা আমি তাঁর সঙ্গে বসে আহার করার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসলাম। লোকটি খুব বেশি আহার করলো। তিনি বললেন, নাফি' এ ধরনের লোককে আমার কাছে নিয়ে আসবে না। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুমিন এক পেটে খায়। আর কাফির সাত পেটে খায়।[১১২]

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার তাঁর ইন্তিকালঅব্দি একাধারে তিন দিন আহার করে পরিতৃপ্ত হননি। আরেকটি বর্ণনায় আবূ হাযিম আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হই। তখন ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং মহান আল্লাহর (কুরআনের) একটি আয়াতের পাঠ তার থেকে শুনতে চাইলাম। তিনি আয়াতটি পাঠ করে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। এদিকে আমি কিছু দূর চলার পর ক্ষুধার যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। একটু পরে দেখি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথার কাছে দাঁড়ানো। তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা। আমি বললাম লাব্বাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ ওয়া'সাদায়াকা' (আমি হাজির ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনার সমীপে) বলে সাড়া দিলাম। তিনি আমার হাত ধরে তুললেন এবং আমার অবস্থা বুঝতে পারেন। তিনি আমাকে বড়িতে নিয়ে গেলেন এবং এক পেয়ালা দুধ দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমি কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা আরো পান করো। আমি আবার পান করলাম। তিনি পুণরায় বললেন আরো। আমি পুনর্বার পান করলাম। এমন কি আমার পেট তীরের মত সমান হয়ে গেল। এরপর আমি ওমরের সাথে সাক্ষাত করে আমার অবস্থা তাকে জানালাম এবং বললাম, হে

[১১০]. ইমাম মুসলিম (র), C|/¸ ³, খন্ড ৭ম, ৩৭তম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩২, হাদীস নং ৫২১৬

[১১১]. ইমাম বুখারী (র), C|/¸ ³, পরিচ্ছেদ ২১১৫, হাদীস নং ৫০০০

[১১২]. C|/¸ ³, পরিচ্ছেদ ২১১৬, হাদীস নং ৫০০১

ওমর আল্লাহ তা'আলা এমন এক জন লোকের মাধ্যেমে বন্দোবস্ত করেছেন যিনি এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত। আল্লাহর কসম, আমি তোমার কাছে আয়াতটির পাঠ শুনতে চেয়েছি অথচ আমি তোমার চেয়ে ভাল পাঠ করতে পারি। উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে আপ্যায়ন করা আমার কাছে লাল বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয়।[১১৩]

হযরত জাবালা ইবনে সুহাইম (রা.) বর্ণনা করেন। তখন ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। আমরা ইবনে যুবায়ের (রা.) এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদেরকে খাওয়ার জন্যে খেজুর দেওয়া হতো। একদিন আমরা যখন খানা খাচ্ছিলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা দুইটি খেজুর একত্রে মিলিয়ে খেয়ো না, কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, তবে তার ভাই (যার সঙ্গে সে একত্রে খাচ্ছে) অনুমতি দিলে এর ব্যতিক্রম করে খেতে পারবে।[১১৪]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় মদীনা শরীফের ডাক্তারগণ হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকত।[১১৫] এমনকি এক ডাক্তার নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ নিয়ে এল যে, কোন রোগীই তার নিকট যায় না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্ভবত এর কারণ এই যে, এ সকল লোকেরা সে পর্যন্ত খাবারের প্রতি হাত বাড়ায়না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তীব্র ক্ষুধা অনুভব না করে। আর পরিপূর্ণ রূপে পেট ভরার পূর্বেই খাবার খাওয়া ছেড়ে দেয়। তাই মনে করা যায় যে কম খাওয়ার কারণেই তাদের সুস্থতা বজায় আছে।[১১৬] কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের রোগ-ব্যাধি পুর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ খাদ্য। বেশীরভাগ মানুষ এখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। আজ প্রত্যেকটি শহরেই অসংখ্য খাবারের হোটেল। সেখানে বাহারি রকমের খাবারে ভরপুর। এর মধ্যে কোন্‌টি স্বাস্থ্যকর এবং কোন্‌টি অস্বাস্থ্যকর তা বোঝার উপায় নেয়। তবে একথা সত্য যে, 'ফার্ষ্ট ফুডের' 'দোকনে খাবারের নামে যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায় এর বেশীর ভাগই 'সম্পৃক্ত' চর্বিতে দোষণীয়, যা খেলে পাকস্থলী, লিবার, কিডনী, হৃৎপিন্ডসহ শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ সমস্ত খাদ্য দ্রব্য উচ্চ রক্তচাপের ব্যক্তিদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে যে সমস্ত কোমল পাণীয় পাওয়া যায় এর বেশীর ভাগই কিডনীর জন্য ক্ষতিকর। বর্তমানে অসুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে পাকস্থলী, লিবার, কিডনী, হৃৎপিন্ড ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখাই বেশি।

খাবারের মধ্যে ফুঁক না দেওয়া

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য ও পাণীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না এবং তিনি পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতেন না।[১১৭] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম কতই না জ্ঞানগর্ভময়। কারণ ব্যক্তির দাঁত অথবা মুখের মধ্যে যে কোন সংক্রামক ব্যাধি থাকতে পারে। এই ব্যাধি একজন থেকে অন্য জনের দেহে ছড়াতে পারে। কারো কারো মুখ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, খানার মধ্যে ফুঁক দেওয়া অন্যের জন্য কতটুকু কষ্টের কারণ হয় এবং স্বয়ং খাদ্য গ্রহণকারীর জন্যই বা কতটুকু

---

১১৩. C৷¸ ³, পরিচ্ছেদ ২১০৬, হাদীস নং ৪৯৮৩

১১৪. C৷¸ ³, পরিচ্ছেদ ২১৪৮, হাদীস নং ৫০৫২

১১৫. প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, C৷¸ ³, পৃ. ৮১

১১৬. C৷¸ ³, পৃ. ৮১

১১৭. ইমাম ইবনে মাজাহ (র), C৷¸ ³, হাদীস নং ৩২৮৮

ক্ষতিকর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী গরম খানা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, এর মধ্যে বরকত হবে না। এটা সতঃসিদ্ধ কথা যে, আপনি পরীক্ষামূলক ভাবে রুটির তাওয়া থেকে গরম গরম রুটি তুলে তুলে খাওয়া শুরু করুন এবং লক্ষ্য করে দেখুন সাধারণ খানার চেয়ে অধিক খেতে পারেন এবং খাওয়ার সময় রুটির পরিমাণ সম্পর্কিত ধারণাটুকুও থাকে না। গরম খাদ্য গ্রহণে মুখের মধ্যের ছাল উঠে যায়, খাদ্যনালি ও পরিপাক তন্ত্রের সুস্থতা অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্যক্ষমতার উপর প্রভাব পড়ে। গরম খাদ্য গ্রহণের মধ্যে ঠান্ডা পানি পান করলে দাঁতের বড় ধরনের ক্ষতি হয়। বিশেষ করে গরমকালে বরফের ঠান্ডা পানি পানকারীর জন্য গরম খানা খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। সুতরাং ধীর-স্থির ভাবে খাবার গ্রহণ করা উচিত, যাতে ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করার প্রয়োজন না হয় এবং দাঁত, খাদ্যনালি ও পরিপাক তন্ত্রের সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর না হয়।

হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি হেলান দিয়ে আহার করিনা।[১১৮]

আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি তাঁর কাছে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে বললেন, হেলান দেওয়া অবস্থায় আমি আহার করিনা।[১১৯] সাধারণভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত বাণীর সঙ্গে দ্বীনী আকিদা, ইসলামী নীতিমালা এবং ধর্মীয় বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। এটা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপার এবং শারীরিক সুস্থতার খাতিরে উক্ত নির্দেশ মেনে চলা খুবই জরুরী। এটা হজমশক্তি ও পরিপাক প্রক্রিয়ার জন্য অশেষ ক্ষতিকর। হেলান দিয়ে অথবা উপুড় হয়ে শুয়ে খাওয়া শুধু স্বাস্থ্যগত ও ভদ্রতার পরিপন্থী নয় বরং এটা পশুর স্বভাবও বটে। হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপকারের পক্ষে, কারণ চিকিৎসা শাস্ত্রও তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। ইসলাম শুধু মাত্র কতিপয় আকীদা বিশ্বাসের নাম নয় এবং ইসলামী শিক্ষা শুধু কিছু মাযহাবী ইবাদত ও প্রকাশ্য রীতি-নীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং ইসলামী শিক্ষা পুরা মানবীয় জীবনের অন্তর্ভুক্ত। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অসভ্য, বর্বর এবং মুর্খ জাতির মধ্যে প্রেরিত হন এবং নিজেও অক্ষর জ্ঞান শূন্য ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা’আলার ওহীর মাধ্যমে তিনি দুনিয়াবী জ্ঝ্যান-বুদ্ধি ও কৌশল ইত্যাদি এ পরিমাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন যা বড় বড় পন্ডিত বুদ্ধিমান ও দার্শনিকগণ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

পায়ে হেঁটে চলা ও আধুনিক বিজ্ঞান

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, মানুষ আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ার চেয়ে চিকিৎসার প্রতি বেশী ঝুকে পড়েছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে এ চিন্তাও করা দরকার যে, আমাদের রোগ-ব্যাধির কারণ কি? কেন আমরা বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধিতে ভুগছি? একথা সকলে স্বীকার করবেন যে, এর মূল কারণ হলো অলস এবং

---

[১১৮]. ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২১১৭, হাদীস নং ৫০০৬

[১১৯]. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫০০৭

কর্মবিমুখ জীবন-যাপন ও জ্ঞানের সল্পতা। আমরা মানসিক পরিশ্রম কিছুটা হয়তো করি কিন্তু শারিরীক পরিশ্রম এত কম করি যা আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য যথেষ্ট নয়। শারিরীক পরিশ্রমের দ্বারা মাংসপেশী, হাড়, জয়েন্ট, এগুলো যেমন মজবুত হয় তেমনি হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত, পাকস্থলী ইত্যাদি দ্রুত সঠিক কার্যাদি সম্পন্ন করে শরীরকে সুস্থ রাখে। অর্থাৎ, নিয়োমিত শারীরিক পরিশ্রম ব্যতিত দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকা যায় না। পায়ে হাঁটা একটি উত্তম ব্যায়াম। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখা যেতে পারে। নিয়োমিত শারীরিক পরিশ্রম ব্যতিত আমরা সাধারণত যে সমস্ত রোগ-ব্যাধি ভোগ করি নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

গ্যাষ্ট্রিক

আবূ নু'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের খাবার গ্রহণের পরপরই ঘুমোতে যেতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "খানা আল্লাহর নামে এবং দু'য়ার মাধ্যমে হজম করো এবং রাতের খানা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে যেয়োনা। কারণ এটি তোমার কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করতে পারে।"[১২০] গ্যাষ্ট্রিক পাকস্থলীর রোগ। খাদ্যদ্রব্য সঠিক ভাবে হজম না হওয়ার কারণে গ্যাষ্ট্রিকের সৃষ্টি হয়। ইদানিং বাস, ট্রেন, স্টেশন, বাজার, অলিতে-গলিতে সর্বত্রই হজমের ওষুধপত্রের বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। গাছের রস, ছাল-বাকোল, বড়ি, বটিকা, দানা, মিক্সার ইত্যাদির বিক্রেতাও পাওয়া যায়। সকলেই দাবী করে, এটি গ্যাস্ট্রিক রোগ নিরাময়ের একমাত্র মহৌষধ। বর্তমানে সারা বিশ্বে পাকস্থলীর রোগ নিরাময়ের জন্য যত ওষুধ-পত্র তৈরী হচ্ছে তার মধ্যে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ অন্যতম। অথচ নিয়োমিত শারীরিক পরিশ্রম ব্যতিত আমরা যত ধরনের চিকিৎসা ব্যাবস্থায় গ্রহণ করি না কেন, সেগুলো কেবল মাত্র সাময়িক উপশম দিতে পারে। এর সঠিক চিকিৎসা হলো নিয়োমিত শারীরিক পরিশ্রম করা এবং ইসলাম নির্দেশিত পরিমিত আহার করা। আমরা যখন ঘি দিয়ে রান্না করা সুস্বাদু খাবার খেয়ে চেয়ারে বসে থাকি এবং চলাফেরা করি না, তখন উক্ত খাদ্য হজম না হয়ে পচে যায়। ফলে তা রোগ প্রতিরোধক হওয়ার পরিবর্তে রোগ জীবাণুতে পরিণত হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য

বর্তমান যুগে এটি একটি কঠিন সমস্যা। গাছ-গাছড়া, ওষুধ-পত্র ইত্যাদি সেবনে যদি এর উপশম হয় তাহলে তো ভাল, না হলে সারা জীবন এই রোগ সঙ্গের-সাথী হয়ে থাকবে এবং এর থেকে শরীরের অনেক রোগের সৃষ্টি হবে। রোগী চিকিৎসার সাথে সাথে যদি পায়ে হেঁটে চলা শুরু করে তবে কোষ্ঠ-কাঠিন্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

অর্শ্বরোগ

কোন ব্যক্তি যদি কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই রোগ সাধারণত পাকস্থলীর রোগের কারণে হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি ইসলামিক নিয়ম মেনে খাবার খায় এবং নিয়োমিত ভাবে শারিরীক পরিশ্রম ও হাঁটা-চলা শুরু করে তাহলে তার অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। আর যদি কোন ব্যক্তির অর্শ্বরোগ হয়ে থাকে তাহলে সে

---

[১২০]. আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়ম-কানুন মেনে হাঁটা-চলা করলে এবং ডাক্তারের পরামর্শক্রমে কিছু ওষুধ সেবন করলে, ইনশাআল্লাহ সে অচিরেই এই কষ্টদায়ক রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

মেদভূড়ি

আমাদের সমাজে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে মেদভূড়িওয়ালা অনেক লোক দেখা যায়। সাধারণত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে মেদভূড়ি হয়ে থাকে। মেদভূড়ি জীবনের জন্য অস্বস্তিকর ও কষ্টদায়ক। মেদভূড়ির জন্য মানুষ কত রকম অশান্তি ভোগ করছে। এর চিকিৎসার জন্য কত রকম চটকদার বিজ্ঞাপন তৈরী হচ্ছে। মানুষ হাজার হাজার টাকা এর পেছনে ব্যয় করছে। তবুও কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে মেদভুঁড়ি কি অপ্রতিরোধ্য? আদৌ নয়। এর যথাযথ চিকিৎসা রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি ইসলামিক নিয়ম মেনে খাবার খায় এবং নিয়োমিত শারীরিক কাজ-কর্ম ও হাঁটা-চলা করে তাহলে তার মেদভূড়ি হতেই পারে না। আর যে ব্যক্তির মেদভূড়ি হয়েছে সে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে কিছু ওষুধ সেবনসহ দৈনিক ৫ কিলোমিটার নিয়োমিত হাঁটা-চলা করে, হাঁটার গতি হবে মিনিটে নূন্যতম ১০০ কদম। এভাবে নিয়োমিত হাঁটলে এবং ইসলামিক নিয়ম মেনে খাবার খেলে মাত্র ৪০ দিনেই মেদভূড়িওয়ালা ব্যক্তির মেদভূড়ি কমে যাবে ইনশাআল্লাহ। এমনকি পরিশেষে তার পোশাক পরিবর্তন করতে হতে পারে।

হৃৎপিন্ডের রোগ

হৃৎপিন্ড একটি ক্রিয়াশীল অঙ্গ। এটা গতিশীলতাকে পছন্দ করে। কিন্তু হৃৎপিন্ডের বাহক মানুষ অধিক অলসতা করে এবং কাজ থেকে বিরত থাকে। অতএব মানুষ যদি হৃৎপিন্ডের ন্যায় সচল ও সক্রিয় না হয় তবে হৃৎপিন্ড অকেজো হয়ে যাবে। তারপর একে সক্রিয় ও সচল করার জন্য চিকিৎসার নামে বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও পন্থা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু তাও অকেজো হলে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। এ কারণে হৃৎপিন্ডের জটিলতা দেখা দেওয়ার পূর্বেই যদি নিয়মিত হাঁটা-চলা/ব্যায়াম করা যায় তাহলে তার হৃৎপিন্ডের রোগ হতে পারে না।

অনিদ্রা

ইদানিং অধিকাংশ মানুষের নিকট ঘুম এক প্রকার সোনার হরিণ। ডাক্তারদের ক্লিনিক এবং হেকিমদের দাওয়াখানাসমূহ বর্তমানে এরূপ রোগীদের মহাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান যতোই আধুনিক উপায়-উপকরণ ও পন্থা আবিষ্কার করছে, রোগ-ব্যাধিও দিন দিন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এর মূল কারণ, অলস জীবন-যাপন। ঘুমের জন্য সমস্ত প্রকার চিকিৎসার পরও যখন কোন ব্যক্তির ঠিকমত ঘুম হয় না, তখন যদি সে দৈনিক নিয়োমিতভাবে শারীরিক পরিশ্রম ও পায়ে হেঁটে চলাফেরা করে তাহলে দেখবেন যে, অনিদ্রা তার থেকে বহু দূরে চলে গেছে। এমনকি যে রোগীর উপর ওষুধ, পুরিয়া, অনুবটিকা ও ডোজ কোন ফল হয় না, তখন যদি সে নিয়মিত ভাবে শারীরিক পরিশ্রম ও পায়ে হেঁটে চলাফেরা করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে, তবে পুনরায় সে স্বাভাবিক সুখনিদ্রা পাবে ইনশাল্লাহ।

স্বাস্থ্য সুরক্ষার ইসলামী বিধি-বিধান

আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকেই ইসলাম তার সত্য ও ন্যায়ের শাশ্বত সৌন্দার্যের আলোকে সমগ্র মানব জাতিকে সুপথ দেখিয়ে চলেছে। মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও অনুসন্ধানী, কেবল তারাই খুঁজে

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছেন সত্যের ও শান্তির সন্ধান, খুঁজে পেয়েছেন একমাত্র প্রতিপালক মহান আল্লাহকে, জেনেছেন স্বাস্থ্য সুরক্ষার সর্বোত্তম পদ্ধতি। আধুনিক সভ্যতার এই যুগে মানুষ আজ কঠিনতম ব্যস্ততার শিকার। সবাই চায় স্বচ্ছলতা, আর্থিক নিরাপত্তা, চায় শান্তি। বস্তুত মানুষের আত্মিক শান্তি এবং বেঁচে থাকার জন্য এটি অপরিহার্য।

ইসলামের যৌক্তিকতা, সরলতা, পাপের প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা; রোগ ও অশুচিতা, ক্ষতিকারক পানাহার, অন্ধবিশ্বাস ও অবাস্তববাদিতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা, মনকে আল্লাহ ভীরু করে ইবাদতের দিকে মনোযোগ এনে মানসিক প্রশান্তি প্রদানের ক্ষমতা এক কথায় ইসলামের সৌন্দর্য আজ ভোগবিলাসী বস্তুতান্ত্রিক অশান্ত অপরিতৃপ্ত বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করছে, তাদেরকে আকর্ষণ করছে ইসলামের দিকে।

ইউ এস এ টুডে (USA Today) পত্রিকার ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৯৪ইং সংখ্যার ভাষ্য হচ্ছে- ইসলাম আমেরিকানদের জোয়ারের টানের মত প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে। আমেরিকানরা এ সার্বজনীন বিশ্বধর্মের প্রতি ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে।

লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক 'টাইমস' তার ৯ই নভেম্বর ১৯৯৩, সংখ্যায় ব্রিটেনে ইসলামের বিকাশ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। তার শিরোনাম ছিল, ব্রিটিশ মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করছে কেন? নিবন্ধটিতে উপশিরোনাম দেয়া হয়েছিল, পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলোর বৈরী আচরণ সত্ত্বেও ইসলাম পাশ্চাত্যের মানুষকে জয় করে চলেছে। নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে- ইদানিং যে বিপুল সংখ্যায় ব্রিটেনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করছে, তার কোন দৃষ্টান্ত অতীতে আর দেখা যায়নি। পত্রিকাটি আরও লিখেছে : Westerns despairing of their own society rising crime, family breakdown, drugs and alcoholism have come to admire the discipline and security of Islam.

অর্থাৎ পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের সমাজের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাতে ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা, পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস, মদ্যপান ও মাদকাশক্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম প্রবর্তিত নিয়ম-শৃংঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।[১২১]

বর্তমানে বিভিন্ন ধর্ম থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন, তারা কোন লোভে পড়ে বা ঝোঁকের মাথায় এটা করছেন না। বরং ব্যাপক অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যালোচনার পর ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সাম্প্রতিককালে ইসলাম গ্রহণকারী অধিকাংশ নওমুসলিমই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, ডক্টরেট, খেলোয়াড়, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার, ধনকুবের, জমিদার, সাংবাদিক বা কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এমনকি খ্রিষ্টধর্মের ধারক বাহক অনেক পাদ্রীও বর্তমানে ইসলাম গ্রহণ করছেন।

স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিধান

হযরত আবূ মালিক আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ বা অর্ধেক।[১২২] মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

[১২১]. *USA Today* 27 January 1994, উদ্ধৃতি-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[১২২]. ইমাম মুসলিম (র), C/¸ 3 , পাক-পবিত্র অধ্যায়, হাদীস নং ৪২৭

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যারা অতিমাত্রায় পবিত্র থাকে তাদেরকেও।[১২৩] স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। শরীর পরিচ্ছন্ন না থাকলে মনও পরিচ্ছন্ন থাকে না। মন পরিচ্ছন্ন না থাকলে ইবাদত করতে ইচ্ছা হয় না। শয়তান তখন মনকে খারাপের দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং ব্যক্তিকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা সুন্দর ও পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন এবং অন্যদেরকেও উৎসাহ দিতেন। অজুর মাধ্যমে মনোদৈহিক ক্লান্তি দূর হয় এবং কাজকর্মে মনোযোগ বাড়ে। গোসলের মাধ্যমে দেহের ময়লা দূর হয় এবং হাত দিয়ে শরীর মন্থন করলে চামড়ার নিচে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় ফলে দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চামড়া ও মাংসপেশী সতেজ থাকে। এ বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান হাদীস, সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারও পাত্রে কুকুর পান করে সে যেন পাত্রটি সাতবার ধুয়ে লয়।[১২৪] মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যখন কুকুর তোমাদের কারও পাত্র চাটে তা সাত বার ধৌত করবে এবং মাটি দ্বারা প্রথম ধৌত করবে।[১২৫]

আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। এক স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের কারও বস্ত্রে হায়েযের রক্ত লাগলে তার বিধান কি? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বস্ত্রে উহা লাগলে সে তা রগড়িয়ে তারপর তা পানি দ্বারা ধৌত করে সালাত আদায় করবে।[১২৬]

সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আয়েশা (রা.) কে বস্ত্রের ভিতর শুক্র পতিত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বস্ত্র হতে আমি উহা ধুয়ে ফেলতাম এবং বস্ত্র ধোয়ার চিহ্ন থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে যেতেন।[১২৭]

উম্মে কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর ছোট শিশুসহ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিলেন। শিশুটি বুকের দুধ ছাড়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করত না। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোলে নিলে সে মুত্র ত্যাগ করছিল। তারপর পানি এনে তার উপর ছিটিয়ে দিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ ধুইলেন না।[১২৮]

পবিত্রতা পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতার অনেক ঊর্দ্ধে। কাজেই যার কাপড়, দেহ ও স্থান পবিত্র তার কাপড়, দেহ ও স্থান পরিচ্ছন্নও বটে। কিন্তু কাপড় পরিচ্ছন্ন হয়ে অপবিত্রও হতে পারে।[১২৯] বাহ্যিক পবিত্রতায় দেহ, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং স্থানের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেহের পবিত্রতায় মলমূত্র ত্যাগের পর শৌচকার্য সম্পন্নের পরই উযু-গোসল করতে হয়। নাপাক পানি দিয়ে কেউ কাপড় এবং স্থান পরিস্কার করেনা। পবিত্রতার পূর্ব শর্ত হলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, “তোমরা যথাসম্ভব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থেকো। কারণ মহান আল্লাহ

---

[১২৩]. আল-কুরআন ২ : ২২২

[১২৪]. ইমাম মুসলিম (র), C\/¸ ³, খন্ড ২য়, ২য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২০, হাদীস নং ৫৫৭

[১২৫]. C\/¸ ³, হাদীস নং ৫৫৮

[১২৬]. ইমাম বুখারী (র), C\/¸ ³, খন্ড ১ম, হায়েয অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২১১, হাদীস নং ৩০১

[১২৭]. C\/¸ ³, উযু অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১৬২, হাদীস নং ২৩০

[১২৮]. C\/¸ ³, পরিচ্ছেদ ১৫৭, হাদীস নং ২২৩

[১২৯]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, C\/¸ ³, পৃ. ৫৩

ইসলামের ভিত্তি রেখেছেন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর। জান্নাতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রবেশ করবেনা।”[১৩০] উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে কমিউনিটি হেল্‌থ বা জনস্বাস্থ্য অটুট রাখার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অপবিত্রতা, অপরিচ্ছন্নতা, নোংরামী, পছন্দ করতেন না। সুতরাং আমাদের সকলকে সর্বদা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। বস্তুত পবিত্রতা অর্জন করাকে মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায় বলে পবিত্র কুরআন মাজিদে উল্লেখিত হয়েছে।

বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ

বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা একটি রুচি বিরুদ্ধ এবং ঘৃনিত কাজ। যে পানি বদ্ধ এবং যেখানে আমাদের দৈনন্দিন কাজ কর্ম করতে হয় সে পানিতে এক দিকে প্রস্রাবের কারণে যেমন দুষিত হয়ে যায়, অপর দিকে এই অপবিত্র পানি দ্বারা অজু, গোসল কাপড়-চোপড় পরিস্কার করা, খাবারের পাত্র ধোয়া কিছুই করা সম্ভব হয় না। ফলে সাধারণের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। এলাকার মানুষের কষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং রোগ-ব্যাধির বিস্তার লাভ করে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা কতই না মূল্যবান।

হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।[১৩১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে এবং পরে সেই পানিতে গোসল না করে।[১৩২]

‘প্রবাহিত পানি পাক’ এ কথা তো সকলেরই জানা আছে। এই পানি নহর, ঝর্ণা, নদী বা সমুদ্র যাই হোক; এগুলোর পানি পাক। এমনি ভাবে বড় হাউজ বা পুকুরের বদ্ধ পানিও পাক হয়ে থাকে। এই বড়র পরিমাপ, দৈর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতায় ন্যূনতম কতটুকু হতে হবে, ফিকাহবিদগণ তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বদ্ধ পানি পাক হওয়ার জন্য শর্ত হল এই যে, পানির রঙ গন্ধ ও স্বাদ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে। অন্যভাবে কথাটাকে এভাবেও বলা যায় যে, পানির পরিমাণ বেশী হবে এবং মাটি বা অন্য কিছুর সংমিশ্রণের দ্বারা পানির আসল অবস্থায় কোন পরিবর্তন হবে না।

একথা স্পষ্ট যে, হাউজ বা পুকুরের অধিক পানিতে মূত্র ত্যাগের দ্বারা না পানির রঙ বদলাবে, না স্বাদ নষ্ট হবে। আর না দুগর্ন্ধ সৃষ্টি হবে। এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এই পানি নাপাকও হবে না। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবগত রুচিবোধ ও পরিচ্ছন্নতা এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ বদ্ধ পানিতে পস্রাব-পায়খানা করুক আর তা অন্য লোকদের জন্য কষ্ট ও বিরক্তির উদ্রেক হোক। কেননা শুধু আইনের ধারা রক্ষা করে চললেই জীবন সুখময় হয়ে উঠে না এবং হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জিত হয় না।

প্রস্রাব আটকিয়ে রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

---

[১৩০]. ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহম্মাদ আশ-শামী আত-তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, Av j -gÖRvgm mvMxi, দারুল হারামাইন, কায়রো, মিসর ও সূদান: ১৪১৫ হিজরী, ১৯৮৩ খ্রি. হাদীস নং ৩৩৬৯ যয়ীফ

[১৩১]. ইমাম মুসলিম (র), cÖv¸³, অনুচ্ছেদ ২১, হাদীস নং ৫৬২

[১৩২]. cÖv¸³, হাদীস নং ৫৬৩

পস্রাব আটকিয়ে রাখা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এর ফলে মূত্রগ্রন্থির উপর বেশি চাপ পড়ে ফলে মূত্রগ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মূত্রথলী এবং মূত্রযন্ত্রের দূর্বলতা দেখা দেয়া সহ অনেক ক্ষতিকর অসুখ হতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব আটকিয়ে রাখতে অথবা প্রস্রাবের সময় বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। একজন গ্রাম্য লোক মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে আরম্ভ করলো, অন্যান্য লোকেরা তাকে বাধা দিতে গেল। এ সময় হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, লোকটিকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমাদেরকে সহজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে কঠোরতা করার জন্য সৃষ্টি করা হয় নি।[১৩৩]

সেই দৃশ্যটি একবার কল্পনা করে দেখুন। আল্লাহর নবীর মসজিদ (মসজিদে নববী)। যেখানে এক রাকাআত নামায অন্য স্থানে পঞ্চাশ হাজার রাকাআত নামাযের মর্যাদা রাখে। সেই পবিত্র মসজিদে একজন অপরিচিত লোক প্রস্রাব করছে। সংগত কারণেই সাহাবায়ে কেরাম উত্তেজিত হবেন। তাই তাদের চিৎকার করা, তাকে ধরার জন্য দৌঁড়ানো এবং তাকে প্রস্রাব করতে বাধা দেওয়াটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু বিশ্ব মানবের চিকিৎসক ও শিক্ষক সেই রহমতের নবী যিনি তাঁর প্রাণ প্রিয় সাহাবাগণকে বাধা দিলেন এবং বললেন যে, লোকটিকে প্রস্রাব করতে দাও। পরে জায়গাটি পানি দিয়ে ধুয়ে দেবে। তিনি আরো বললেন, তোমাদেরকে মানুষের সাথে সহজ ও সুন্দর আচরণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষের সাথে কঠোর ও রূঢ় ব্যবহার এবং তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য তোমাদের পাঠানো হয়নি। কেননা, প্রস্রাব আটকিয়ে রাখায় অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং এতে কষ্টদায়ক বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান আজ বলছে যে, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিজ্ঞানময়।

মলমুত্র ত্যাগের পর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

মলমুত্র ত্যাগের পর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া খুবই প্রয়োজন। মলমুত্র ত্যাগের স্থানে অনেক ধরণের রোগ জীবাণু থাকে। মলমুত্র ত্যাগের পর পরিচ্ছন্ন না হলে সে সমস্ত জীবাণু আমাদের শরীরের সাথে আমাদের বসবাসের পরিবেশে চলে আসে। এ কারণে আমাদের মধ্যে রোগ-ব্যাধির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। মলমুত্র ত্যাগের পর শুধু মাত্র শারীরিক পরিচ্ছন্নতাই যথেষ্ট নয়। মানসিক পরিচ্ছন্নতার ও প্রয়োজন। পায়খানা বা প্রস্রাব করার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া পড়তেন।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন তখন বলতেন, 'আলাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবছিওয়াল খাবায়িছ'। অর্থাৎ : 'হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র বস্তু ও অপবিত্রতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।'[১৩৪]

পায়খানা প্রস্রাব হতে ফিরবার সময়ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া পড়তেন।

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা হতে বের হয়ে "গুফরানাকা" বলতেন। (অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করছি)।[১৩৫]

---

[১৩৩]. ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ১৫৬, হাদীস নং ২২০

[১৩৪]. ইমাম মুসলিম (র), প্রাগুক্ত, ৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৯, হাদীস নং ৭৩০

[১৩৫]. ইমাম আবূ দাউদ (র), প্রাগুক্ত, খন্ড ১ম, কিতাবুত তাহরাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৭, হাদীস নং ৩০

মলমুত্র ত্যাগ ও এসতেনজা (শৌচকার্য্য) সম্বন্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমর বাণী সহীহ হাদীস গ্রন্থ থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা পায়খানায় গমন করো কেবলার দিকে মুখ করোনা এবং তা পিছনেও রেখোনা।[১৩৬]

ইব্‌নে আবদুল্লাহ ইব্‌নে সারজিস (রা.) হতে বির্ণত। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, লোকেরা হযরত কাতাদাহ (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, গর্তে প্রস্রাব করা নিষেধ কেন? রাবী বলেন, এরূপ প্রবাদ আছে যে, জিনেরা (সাধারণত) গর্তে বসবাস করে থাকে।[১৩৭]

গর্তের ভিতর সাপ বা বিষাক্ত জীব বসবাস করতে পারে এবং ঐগুলো ক্ষতি করতে পারে। জিনেরা গর্তে বসবাস করতে পারে এছাড়াও গর্তের ভিতর প্রস্রাব করলে এর মধ্যে বসবাসকারী প্রাণীটি তার নিজ আবাস স্থলেরও নিরাপদ নয়। অথচ ইসলাম বিনা কারণে সৃষ্টি কোন জীবের ক্ষতি করতে নিষেধ করেছে।

মোয়াজ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লানতের তিনটি কারণকে ভয় করো। তা হলো পানিতে, পথের মাঝখানে এবং ছায়ায় মল মূত্র ত্যাগ করা।[১৩৮]

পানিতে, পথের মাঝখানে অথবা ছায়ায় মল মূত্র ত্যাগ করলে চলাচলকারী পথিক এবং বিশ্রামরত ব্যক্তিগণের কষ্টের সৃষ্টি হয়। তাদের শরীর ও পোষাক অপবিত্র হতে পারে। এর ফলে তাদের স্বাভাবিক কাজ কর্ম ও ইবাদত বন্দেগিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। পানিতে এবং পথের মাঝখানে মলমূত্র ত্যাগের কারণে পরিবেশ নষ্ট হয়। রোগ-জীবাণুর বিস্তার লাভ ঘটে, ফলে জনজীবনে দূর্ভোগের সৃষ্টি হয়।

ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, যখন আমি দাঁড়িয়ে মূত্র তাগ করতেছিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে বললেন, হে ওমর দাঁড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করো না। এরপর আমি দাঁড়িয়ে মূত্র তাগ করিনি।[১৩৯] আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন যে, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে প্রস্রাবের সহিত প্রোটিন (এলবুমিন) শরীর থেকে বের হয়ে আসে। এটাকে অরথোস্টাটিক এলবুমিনিউরিয়া (*Orthostati c albu* min *uria*) বা ফাংশনাল এলবুমিনিউরিয়া (*Functional albu* min *uria*) বলা হয়। ফলে শরীরে প্রোটিনের অভাব দেখা দিতে পারে। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে বিশ্বের সেরা মহামানব ওহী প্রাপ্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পস্রাব করতে নিষেধ করছেন। ওজর অর্থাৎ শরীয়ত ও স্বাস্থ্য সম্মত কারণে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনুমতি সম্পর্কিত একটি হাদীস হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেছেন।

হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা লোকদের ময়লা ফেলার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন। তারপর তিনি পানি চাইলেন। আমি তার নিকট পানি নিয়ে গেলাম এবং তিনি উহা দ্বারা পবিত্র হলেন।[১৪০]

---

[১৩৬]. ইমাম বুখারী (র), C৷¸ ³, পরিচ্ছেদ ১০৬, হাদীস নং ১৪৬

[১৩৭]. ইমাম আবূ দাঊদ (র), C৷¸ ³, অনুচ্ছেদ ১৬, হাদীস নং ২৯

[১৩৮]. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র), C৷¸ ³, খন্ড ১ম, পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ চলাচলের পথে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ, হাদীস নং ৩২৮

[১৩৯]. C৷¸ ³, অনুচ্ছেদ বসে প্রস্রাব করা, হাদীস নং ৩০৮

[১৪০]. C৷¸ ³, অনুচ্ছেদ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, হাদীস নং ৩০৫

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমদেরকে জানিয়েছে যে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করতেন। তাকে বিশ্বাস করোনা। তিনি বসেই মূত্র ত্যাগ করতেন।[১৪১]

আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পবিত্রতা হাসিল করতে চায়, তখন সে যেন তার ডান হাত দিয়ে তা না করে। বরং সে যেন তার বাম হাতে ইস্তিন্‌জা করে।[১৪২]

বিবেক বুদ্ধি

পবিত্র কুরআ’নে বিবেক বুদ্ধি কে ‘আকল’ বলা হয়েছে। ‘আকল’ শব্দটি পবিত্র কুরআ’নে বিভিন্ন ভাবে মোট ৪৯ বার ব্যবহার হয়েছে। শব্দটি কুরআ’নে ব্যবহৃত হয়েছে, ‘হয় বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে বোঝার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, আর না হয় ঐ কাজে বিবেক বুদ্ধি না খাঁটানোর কারণে তিরস্কার করার জন্য’। বিবেক বুদ্ধি খাঁটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআ’নে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করেনা, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।[১৪৩]

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّـهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।[১৪৪]

কুরআ’নের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা গবেষণা করাকে মহান আল্লাহ কি অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা নতুন তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিস্কার ও অর্থবহ হবে। মহান আল্লাহ কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা না বলে কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাঁটিয়ে বোঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) ইসলামের প্রতিটি কথাই বিবেক-বুদ্ধি সম্মত। বিবেক-বুদ্ধির বাইরে ইসলামের কোন বক্তব্য নেই। বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কুরআন অথবা হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্ধেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। অতএব, মানুষের জ্ঞান একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে নাও আসতে পারে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ١١ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ١٢ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

---

[১৪১]. C৵¸ ³, হাদীস নং ৩০৭

[১৪২]. C৵¸ ³, অনুচ্ছেদ ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা এবং ইস্তিন্‌জা করা অনুচিত, হাদীস নং ৩১২

[১৪৩]. আল-কুরআন ১০ : ১০০

[১৪৪]. আল-কুরআন ৮ : ২২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টিজীবের জন্য। এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে।[১৪৫] মহান আল্লাহর দেওয়া অতি প্রয়োজনীয় নিয়ামতকে জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা ব্যবহার ও কার্যকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা জ্ঞান বুদ্ধিরই পরিচায়ক। নিম্নে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

হারাম জিনিসের মধ্যে আরোগ্য নেই

হারামের অর্থ হল ঐ জিনিস যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে সকল জিনিস ব্যবহার করতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে তা হারাম। বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কোন জিনিসকে যখন ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন তখন আল্লাহর কোন অনুগত বান্দার জন্য তা চিকিৎসার জন্য ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা কিরূপে বৈধ হতে পারে? যেখানে সর্বোতভাবেই তা ব্যবহার নিষেধ, সেক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় তা ব্যবহার করা কিরূপে জায়েয হবে? হারাম বস্তুর মধ্যে আরোগ্য দানের কোন ক্ষমতা নাই এবং এ কথাও প্রমাণিত যে, হারাম কোন কিছুকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা নিষেধ।

ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার না করা

'খবীস' অর্থ অপবিত্র, বাজে, ক্ষতিকর, খারাপ, নষ্ট, এবং অপছন্দনীয়। যাকে পবিত্র কালামে হারাম পর্যন্ত বলা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক কোন কিছু ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এটা পবিত্রতা, রুচীবোধ, এবং মানবীয় মর্যাদার পরিপন্থী। তবে অপারগতা থাকলে ভিন্ন কথা। কেননা মানুষ যখন একেবারেই নিরূপায় হয়ে যায় এবং তার জন্য অন্য কোন পথই খোলা না থাকে, এমতাবস্থায় জীবন বাঁচাবার জন্য শরীয়ত জীবন রক্ষা পরিমাণ যে কোন খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। নতুবা সকল নাপাক জিনিসই নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আল্লাহ তোমাদের জন্য মৃতদেহ, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম ঘোষণা করা হয়েছে সে সব প্রাণী হারাম করে দিয়েছেন, তবে কোন লোক যদি বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে সে তা বিদ্রোহী হিসাবে অথবা সীমালঙ্ঘন কারী হিসাবে না করে, তবে তাতে কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহ কারী।[১৪৬]

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন বিনাশী ওষুধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[১৪৭]

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিষপান করে নিজেকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের অনন্ত কালের বাসিন্দা হয়ে বিষপান করতে থাকবে।[১৪৮]

[১৪৫]. আল-কুরআন ৫৫ : ১০-১৩

[১৪৬]. আল-কুরআন ২ : ১৭৩

[১৪৭]. ইমাম ইবনে মাজাহ্ (র), C\/¸ ³, অনুচ্ছেদ জীবন বিনাশী ওষুধ ব্যবহার নিষিদ্ধ, হাদীস নং ৩৪৫৯

[১৪৮]. C\/¸ ³, হাদীস নং ৩৪৬০

Dhaka University Institutional Repository

যদি এমন কোন ওষুধ হয়, যা এক রোগে উপকারী কিন্তু তাতে অন্য কোন রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে ঐ ওষুধ বর্জন করা উচিত। যদি কোন ওষুধ দ্বারা রোগ সৃষ্টি হওয়ার ভয় থাকে তবে তা ত্যাগ করা কর্তব্য। অসুস্থ ব্যক্তি কিসে আরাম পাবে, কিসে তার শক্তি অর্জিত হবে ও অসুস্থতা দূর হবে চিকিৎসকের এটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এ মহান উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ তিক্ত স্বাদহীন ওষুধ সেবন করে, ইনজেকশন গ্রহণ করে, অপারেশনের কষ্ট সহ্য করে। এরূপ বহু উদহরণ আছে যে, অনভিজ্ঞ এবং হাতুড়ে চিকিৎসক অনেক সময় তাঁর রোগীদের এমন ওষুধ দিয়ে থাকেন যা কোন একটি রোগকে তো দূর করে দেয় ঠিকই তবে অপর একটি রোগ সৃষ্টিরও কারণ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে সস্তা খ্যাতি, নাম-যশের আকাংখী ও লোভী চিকিৎসকগণ জেনে বুঝেই এ ধরনের অপচিকিৎসা করে থাকে। অতএব এ সকল লোক মানুষের জীবন নিয়ে খেল-তামাশা করে এবং আল্লাহর ভয়ে তাদের বুক প্রকম্পিত হয় না।

হাতুড়ে ডাক্তার

মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[১৪৯]

শু'আয়েব (রা.) এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে (অন্যের) চিকিৎসা করে, অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান আছে বলে ইতিপূর্বে জানা যায়নি তাহলে সেই দায়ী হবে।[১৫০]

যদি এমন কোন ব্যক্তি চিকিৎসা করে যার চিকিৎসা বিষয়ে কোন জ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, এমতাবস্থায় যদি রোগীর কোন ক্ষতি হয় তাহলে রোগীর সমস্ত দায় দায়িত্ব উক্ত চিকিৎসকের উপর বর্তাবে। যে সকল অনভিজ্ঞ চিকিৎসক মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে খেলা করে তারা শুধুমাত্র আইনের দৃষ্টিতেই দোষী নয় বরং মানবতার দৃষ্টিতেও দোষী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা নীতি অনুযায়ী তাদেরকে মহান আল্লাহর সামনে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। সনদ-বিহীন হাতুড়ে চিকিৎসক ছাড়াও সার্টিফিকেটধারী অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, চাই সে হেকিম, কবিরাজ অথবা এলোপ্যাথিক বা হোমিপ্যাথিক ডাক্তার এ বাস্তবতাকে ভুলে গেলে চলবে না যে, সর্ব অবস্থায়ই সে একজন মানুষ। সুতরাং যখন সে কোন রোগ নির্ণয়ে অক্ষম অথবা সঠিক ওষুধ নির্বাচন করতে না পারে তখন শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া উচিত নয়। আর যদি তার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভুল চিকিৎসায় রোগীর কোন সমস্যা হয় তবে সে আল্লাহ এবং মানব জাতি উভয়ের নিকটই দোষী সাব্যস্ত হবে। অনভিজ্ঞ এবং হাতুড়ে চিকিৎসক অনেক সময় রোগীদের এমন ওষুধ দিয়ে থাকেন যা কোন একটি রোগকে তো দূর করে দেয় ঠিকই তবে অপর একটি রোগ সৃষ্টিরও কারণ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে সস্তা খ্যাতি, নাম-যশের আকাঙ্খী ও লোভী চিকিৎসকগণ জেনে বুঝেই এ ধরনের অপচিকিৎসা করে থাকেন। অতএব এ সকল লোক মানুষের জীবন নিয়ে খেল-তামাশা করে এবং আল্লাহর ভয়ে তাদের বুক প্রকম্পিত হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের

---

[১৪৯]. আল-কুরআন ১৭ : ৩৬

[১৫০]. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ, C/, 3, অনুচ্ছেদ চিকিৎসা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা করা, হাদীস নং ৩৪৬৬

এই হাদীস জানার পর হাতুড়ে চিকিৎসকদের মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করার পেশা ত্যাগ করা উচিত।

প্রচলিত মেকআপ ক্ষতিকর

শারীআতের সীমার মধ্যে থেকে নারীদের সৌন্দর্য চর্চা করা কেবল বৈধই নয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা কাম্যও। বিশেষ করে স্বামীদের উদ্দেশ্যে নারীদের সৌন্দর্য চর্চা করা পূণ্যের কাজ। কারণ এর ফলে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের আকর্ষণ ও ভালোবাসা বেড়ে যায়। যে সব সৌন্দর্য উপকরণ নারীদের চেহারা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তাদের চেহারার কোন ক্ষতি সাধন করে না এবং তাতে যদি চেহারার আসল রূপ চাপা না পড়ে, তা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। অপর পক্ষে যে সব সৌন্দর্য উপকরণ চেহারার ক্ষতি সাধন করে এবং যাতে চেহারার আসল রূপ চাপা পড়ে যায়, তা ব্যবহার করা উচিত নয়। এ কারণে মেহেদী কিংবা ক্রীম অথবা কসমেটিকসের সাহায্যে মুখমন্ডলকে কৃত্রিম উপায়ে এমন ভাবে লাল, ফর্সা বা উজ্জ্বল করা জায়েয নয়, এতে চেহারার আসল রূপই চাপা পড়ে যায়। এতে অনেক সময় বিবাহ প্রার্থী ছেলে বা ছেলে পক্ষ ধোঁকায় পড়ে যায়। তবে স্বামীদের কাছে সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য তাদের অনুমতি নিয়ে স্ত্রীদের তা করতে কোন দোষ নেই। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে চেহারার রং ফর্সা ও উজ্জ্বল করতে স্টেরয়েড জাতীয় মলমের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিউটিশিয়ানরা মুখের রং ফর্সা করার জন্য এ জাতীয় মলম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ ধরনের স্টেরয়েড জাতীয় মলম ত্বকে দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে অ্যালার্জি সৃষ্টি হয়। ফলে মুখে চুলকানি ও গোটা দেখা দেয়। এছাড়াও ত্বক শুকিয়ে পাতলা হয়ে যেতে পারে এবং ত্বকের সরু রক্তনালীগুলো প্রসারিত হতে পারে। সূর্যের আলোর অতিবেগুনি রশ্মি ত্বককে কাল করে দেয়। মুখের ত্বক যাদের কালো, পারতপক্ষে সূর্যের আলো এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সূর্যের আলোর সাহায্যে আমরা ভিটামিন ‘ডি’ পেয়ে থাকি।

চর্ম-অ্যালার্জি ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দিদারুল আহসান মহিলাদেরকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন, যারা জন্মগতভাবে কালো অথবা শ্যামলা, তারা মলমের মাধ্যমে ফর্সা হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালাবেন না। কারণ, এতে ত্বক সাময়িক ভাবে কিছুটা ফর্সা হতে পারে, কিন্তু ওষুধ বন্ধ করে দেওয়ার পর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। মনে রাখবেন, কালোই জগতের আলো! তবে যদি কেউ কালো নিয়ে খুব দুচিন্তায় ভোগেন, তবে একটু বেশী করে গাজর খাবেন। গাজরে ক্যারোটিন থাকে, যা ত্বকের গায়ে হালকা হলদে আভা এনে দেয়।[১৫১] মেকআপ যদিও কিছু সময় ধরে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; তথাপি চেহারার জন্য তা ভীষণ ক্ষতিকর। এর ফলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে চেহারার রঙ ও উজ্জ্বলতা অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। তখন মেকআপ বা অন্য কিছু দিয়ে তা ধরে রাখা যায় না। অতএব, ব্যবহারের পূর্বে ভেবে দেখতে হবে মেকআপ ক্ষতিকর কিনা। যদি বাস্তবিকই ক্ষতিকর হয়ে থাকে, তবে তা ব্যবহার করা কোন মতেই শরী‘আতের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। কারণ, ইসলামের মূলনীতি, যা ক্ষতিকর তা নিষিদ্ধ।[১৫২] কখনো মেয়েদের চেহারায় মেসতা, ছোট ছোট দাগ, ব্রণ, ফুস্কুড়ি ইত্যাদি দেখা দেয়। ওষুধ সেবন অথবা মলম ব্যবহারের সাহায্যে এ সব দাগ দূর করে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও শ্রী রক্ষা করতে কোন দোষ নেই। সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে মুখে ক্রীম ব্যবহার করতে কোন নিষেধ নেয়, যদি তাতে মুখের কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। সাধারণত মুখের

---

[১৫১]. ডা. দিদারুল আহসান, রমণীর মুখের রঙ বদলাতে মলম, bqv w‘MšÍ, ২৩ মার্চ ২০০৮ খ্রি. পৃ. ১১

[১৫২]. ড. আহমদ আলী, Bmjv‡gi ‘wó‡Z †cvkvK c‘v I mvSm¾v, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১০ খ্রি. পৃ. ১৯৬

ক্রীমে পারফিউম ছাড়াও কিছু জৈব রং যেমন এজোডাই, লেনোলিন এবং সংরক্ষক হিসেবে প্যারাবেন ব্যবহার করা হয়, যা চেহারার জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের ক্রিমের প্রতিক্রিয়া চামড়া জ্বালা করা ও এলার্জিমূলক।[১৫৩]

লিপিস্টিকের ক্ষতি

লিপিস্টিক ঠোঁটের জন্য ক্ষতিকর। লিপিস্টিক ব্যবহারের ফলে ঠোঁটের আদ্রতা ও মসৃণতা হ্রাস পায়। অনেক সময় এর ব্যবহারের ফলে ঠোঁট ফেটে যায়। অভিজ্ঞগণ বলেন, লিপিস্টিক ব্যবহারের পর ছয় ঘন্টা পর্যন্ত খাদ্য-পানীয়, ধুলাবালি ও অপরিচ্ছন্ন সবকিছুর সংস্পর্শ থেকে ঠোঁটকে রক্ষা করা উচিৎ, নতুবা ঠোটে ছত্রাক জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মহিলাদের জন্য লিপিস্টিক খুবই ক্ষতিকর।[১৫৪] ইসলামের মূলনীতি হলো, যা ক্ষতিকর তা নিষিদ্ধ।[১৫৫] এর আলোকে লিপিস্টিকও ব্যাবহার নিষিদ্ধ। তদুপরি কিছু কিছু ব্রান্ডের লিপিস্টিকে 'রোডামিন বি' ও 'ব্রিলিয়েন্ট ব্লু নামের যে রঙ থাকে, তা ক্যান্সার সৃষ্টির সাথে জড়িত বলে চর্ম বিশেষজ্ঞগণ অভিযোগ করেন।[১৫৬]

নখপালিশের ক্ষতি

আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে ডাক্তারগণ আঙ্গুলের নখের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক বুঝতে পেরেছিলেন। বর্তমানে ডাক্তারদের দৃষ্টি সর্ব প্রথম রোগীর নখের উপর পড়ে। নখের রং দেখে রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার ধারণা নেওয়া হয়। নখপালিশ ব্যবহারের ফলে নখের স্বাভাবিক রং দেখে রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার ধারণা নেওয়া সম্ভব নয় ফলে, সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজনে, রোগীকে রক্তের পরীক্ষা করাতে হয়, এতে সময় এবং অর্থ দু'ই ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বর্তমান যুগের মহিলারা নখের যে পালিশ ব্যবহার করেন তা নখের জন্য খুবই ক্ষতিকর। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে, নখপালিশ দেহের জন্যেও ক্ষতিকর। নখপালিশ নখের বায়ুকূপ বন্ধ করে দেয় এবং নখের স্বাভাবিক আদ্রতা শোষণ করে। এর ব্যবহারে নখের উপর আস্তরণ জমে যায়। এ ধরনের অবস্থায় ফরজ গোসল ও অজু বিশুদ্ধ হবে না। নখপালিশের প্রধান রাসায়নিক উপাদান 'ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক' ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে 'নিকেল'। 'ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক' ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। এর থ্যালেট লিভার, কিডনী ও প্রজননতন্ত্রের ক্ষতি করে। নখপালিশের টলুইন অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থিগুলোর কার্যক্রমে কিছু বিঘ্ন ঘটায়। এর জন্য শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানোরও আশংকা থাকে।[১৫৭]

নখ লম্বা করা

প্রতিটি সুস্থ মানুষের নখ প্রতি মাসে এক ইঞ্চির এক অষ্টমাংশ বৃদ্ধি পায়। একজন সাধারণ মানুষের জীবনে ৫০ বছরে আঙ্গুলে ৬ ফুট নখ সৃষ্টি হয়।[১৫৮] লম্বা নখ রাখা বর্তমানে ফ্যাশন মনে করা হয়। অথচ এটা মারাত্মক নোংরামী। লম্বা নখ জীবাণু বহন করে, ফলে ডায়রিয়ার মত নানাবিধ মারাত্বক রোগ হতে পারে। নিয়মিত নখ কেটে পরিচ্ছন্ন রাখা সুরুচির পরিচয় বহন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

---

[১৫৩]. ডা. নাজমুল আলম, প্রসাধনী, gwmK cw_ex, নভেম্বর ১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ৪৬

[১৫৪]. ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, cÖv¸³, খন্ড ৩ - ৪, পৃ. ১১৯

[১৫৫]. ড. আহমেদ আলী, Bmjv‡gi ‘wó‡Z †cvkvK c‘v I mvSm¾v, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

[১৫৬]. cÖv¸³, পৃ. ১৯৬

[১৫৭]. ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, cÖv¸³, খন্ড ৩ - ৪, পৃ. ১২০

[১৫৮]. cÖv¸³, পৃ. ১২০

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি বিষয়কে মানব স্বভাবের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন তন্মেধ্যে 'নখকাটা' অন্যতম।

সুগন্ধি ও তার ব্যবহার

যে সব জিনিস মানব মনে উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে, তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু নিয়ম-কানুন বেঁধে দিয়েছে। নারী ও পুরুষ কোন্ ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ঘরোয়া পরিবেশে যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। তবে ঘরের বাইরে তারা যে সুগন্ধি ব্যবহার করবে তা এমন হতে হবে যার রঙ আছে গন্ধ নেই। যেমন যা'ফরান। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাবধান! পুরুষদের সুগন্ধ হচ্ছে এমন জিনিস যাতে গন্ধ আছে রং নেই, আর মেয়েদের সুগন্ধি হচ্ছে যাতে রঙ আছে গন্ধ নেয়।[১৫৯] চারিদিক সুবাস ছড়িয়ে আলোড়িত করে তোলে এমন সুগন্ধি ব্যবহার করে ঘরের বাইরে যাতায়াত করা মেয়েদের জন্য জায়েয নয়। শুধু স্বামীর উদ্দেশ্যে তীব্র মন মাতানো সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মেয়েলোক সুগন্ধি লাগিয়ে বেগানা পুরুষদের কাছ দিয়ে যাতায়াত করবে, সে ব্যভিচারিণী।[১৬০] দেবর, ভাসুর ভগ্নিপতি, চাচাত ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, খালাতো ভাই সবাই গায়ের মাহরাম ও বেগানা। কাজেই তাদের সামনে দিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে বা সুসজ্জিতা বেশে আসা যাওয়া করা যাবে না।

বর্তমান সময়ে বাজারে অনেক ধরনের সুগন্ধি (পারফিউম) পাওয়া যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পারফিউম শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এটা 'এসেনশিয়াল ওয়েল' এবং কিছু রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণ। সুগন্ধটা নির্ভর করে ব্যবহারিক যৌগের উপর। পারফিউমে মিশ্রণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বালসাম, বেনজাইল, স্যালিসাইলেট ইত্যাদি। এগুলো ব্যবহারের ফলে চামড়ায় একজিমা, ইরাইথেমা বা লাল স্ফীতি, শোথ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। আরো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হিসাবে চামড়ায় 'বারলকডার্মাটাইটিক' নামক জটিল চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। পারফিউম ও ওডি কোলনের ৮ মেথোক্রিসোরালেন নামের রাসায়নিক উপাদানটির প্রভাবে চামড়ার রঙ বাদামী হতে কালচে হয়।[১৬১]

শরাব বা মদ সভ্যতা ও মানবতার দুশমন

মদ্যপান তথা মাদকাসক্তি একটি বড় সমস্যা। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা দেয় মদ্যপানের কারণে। শারীরিক বিভিন্ন রোগ-শোক এসে ভর করে। লিভারে চর্বি জমে, লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস হয়। লিভার সিরোসিসের মতো জটিল রোগ ও দেখা দিতে পারে। ঠোঁট থেকে শুরু করে খাদ্যনালির বিভিন্ন অংশে মরণব্যাধি ক্যান্সার হতে পারে। হতে পারে পাকস্থলির প্রদাহ বা গ্যাস্ট্রাইটিস। অগ্নাশয়ের প্রদাহ বা প্যানক্রিয়াটাইটিসও হতে পারে। ওপরের পেটে প্রচন্ড ব্যাথা। রক্তের চর্বির পরিমাণ বাড়ে। রক্তনালির দেয়ালে চর্বি জমে। ফলে দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ। বেড়ে যায় হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি। মানসিক অশান্তি ও নিদ্রাহিনতা দেখা

[১৫৯]. ইমাম, আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আস সিজিস্তানী (র), অনুবাদ অধ্যাক্ষ মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, ড. আফম আবুবকর সিদ্দীক, মাওলানা নূর মোহাম্মদ, Ave 'vE' kix d, কিতাবুল লিবাস অধ্যায়, হাদীস নং: ৩৫২৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৬ খ্রি.

[১৬০]. ইমাম তিরমিযী (র), cv¸ ³, কিতাবুল আদাব অধ্যায়, হাদীস নং: ২৭১০

[১৬১]. ডা. নাজমূল আলম, প্রসাধনী, gvwmK cw_ex, নভেম্বর ১৯৯৪ খ্রি. পৃ.৪৬

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। শরীর হারায় শারীরিক ভারসাম্য। মারামারি, ছিনতায়, আত্মহত্যা, নারী ঘটিত সামাজিক অন্যায়, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়।[১৬২] শ্লোগান উঠেছে, মাদককে না বলুন। পবিত্র ধর্ম ইসলাম আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মাদককে না বলে দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষ বিপথগামী হয়েছে। আল্লাহকে ভুলে নানা অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। তাইতো যুগেযুগে নবী-রাসুলদের আগমন হয়েছে মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে, আল্লাহর পথে নিয়ে আসতে। ইসলামের শুরুর দিকে খোদ আরব দেশেও মদ, জুয়া ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই মদ পানের কারণেই তখনকার সমাজে নানা অনাচার হতো। এক সময় কয়েকজন সাহাবি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদ, জুয়া ইত্যাদির খারাপ দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল হলো, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

আপনার কাছে মানুষ শরাব এবং জুয়ার সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলে দিন, ঐ দুটি জিনিসের মধ্যে খুবই খারাবী রয়েছে। যদিও এর মধ্যে মানুষের জন্যে কিছু কিছু উপকারও রয়েছে। তবে এর লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অনেক বেশী।[১৬৩] তাৎক্ষণিকভাবে মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়নি। মানুষ তাৎক্ষণিক মদ ও জুয়া পুরোপুরি বর্জন করেনি। পরবর্তী সময়ে আয়াত নাজিল হয়েছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো কখনো নেশাগ্রস্থ হয়ে নামাজের ধারে কাছেও যেও না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এতোটুকু নিশ্চিত না হবে যে তোমরা যা কিছু বলছো তা তোমরা ঠিক ঠিক জানতে ও বুঝতে পারছো, আবার অপবিত্র অবস্থায়ও নামাযের কাছে যেও না, যতক্ষণ না তোমরা পুরোপুরিভাবে গোসল সেরে নেবে, তবে পথচারী অবস্থায় থাকলে তা ভিন্ন কথা, আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো অথবা প্রবাসে থাকো, কিংবা কেও যদি পায়খানা থেকে ফিরে আসো অথবা তোমরা যদি কামসক্ত হয়ে নারী স্পর্শ করো তাহলে পানি দিয়ে নিজেদের পরিস্কার করে নেবে। তবে যদি এ অবস্থায় পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবে এবং তার পদ্ধতি হচ্ছে তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত মাসেহ করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা গুনাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।[১৬৪] এভাবে ধীরে-ধীরে মানুষকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সব শেষে এ সম্পর্কিত নির্দেশ এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ **لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ٩٠
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ
فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা জেনে রেখো, মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক এর সব কয়টাই ঘৃণিত শয়তানের কাজ। তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করো। শয়তানতো চায় এই মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে এবং এভাবে মদ ও

---

[১৬২]. অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ, Bmjvg I ¯^v¯'¨, ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[১৬৩]. আল-কুরআন ২ : ২১৯

[১৬৪]. আল-কুরআন ৪ : ৪৩)

জুয়ার চক্করে ফেলে সে তোমাদেরকে মহান আল্লাহর স্মরণ নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তোমরা কি একাজ থেকে ফিরে আসবে না।[১৬৫]

যে মদ শুধু শরীরের জন্য এত ক্ষতিকর, ইসলাম কত আগেই না তা নিষিদ্ধ করেছে! আমরা যেন ইসলামী বিধি-বিধান মেনে মদ্যপান তথা সব নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহার করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থেকে স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপন পালন করতে পারি।

উপরোক্ত সূরা তিনটিতে শরাবের ক্ষতিসমূহ সম্পর্কে পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। শরাব তৈরীর প্রধান উপাদান এ্যালকোহল, মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ইহা বিভিন্ন জটিল কাজে রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বপ্রথম মুখ থেকেই শুরু হয়। মুখে সাধারণত লালা সদৃশ এক ধরনের পদার্থ থাকে। শরাব পান করার কারণে মুখের লালা উৎপাদনের শক্তি ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে, ফলে মাড়িতে ক্ষত এবং ফোলা দেখা দেয়। সুতরাং শরাবে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের দাঁতগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এরপর কণ্ঠ ও খাদ্যনালিতে প্রভাব দেখা দেয়। উক্ত অঙ্গ দুটি সংবেদনশীল নরম আবরণ দ্বারা গঠিত। শরাব পান করার কারণে উক্ত আবরণটির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে, ফলে অঙ্গদ্বয় ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে এবং ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। শরাব পান করার কারণে পাকস্থলিতে এক প্রকার ধ্বংসাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি হয়। রক্তে লিপিড (Lipid) নামক এক প্রকার চর্বি থাকে যা শরীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ করে। শরাব ব্যবহারের কারণে লিপিড (Lipid) গলে যায়। শরাবের বড় ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ডিওডেনামের উপর। ডিওডেনাম খুবই স্পর্শকাতর একটি অঙ্গ। ইহা হজমের জন্য এক প্রকার এনজাইম তৈরী করে। শরাবের প্রভাবে এই এনজাইম তৈরীর প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ফলে খাদ্য হজম প্রক্রিয়ায় বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। শরাব লিভারের কাজেও বাধা সৃষ্টি করে, ফলে লিভারের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও নিজ কাজ ঠিকমত করতে পারে না। শরাবে অভ্যস্থ ব্যক্তির কণ্ঠ ও খাদ্যনালী, পাকস্থলী, ডিওডেনিয়াম, লিভার, ইত্যাদি আক্রান্ত হওয়ার পর শরীর অভ্যন্তরে নানা প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে হজম শক্তি ধ্বংস হয়, মুখ, খাদ্যনালি, পাকস্থলী, ডিওডেনিয়াম, লিভারে ক্যান্সারের মত ঘাতক ব্যাধির সৃষ্টি হয়, শরীরে মেদ জমে। চর্বির আধিক্যর কারণে হৃদরোগ দেখা দেয় এবং সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিডনী। শরাবের প্রভাবে কিডনীর বিপজ্জনক পরিণাম হলো কিডনী সংকুচিত হওয়া। নিয়মিত শরাব পানকারীর কিডনী তার জীবদ্দশাই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হৃদযন্ত্রের পেশীর উপর সরাসরি শরাবের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এর প্রভাবে রক্তে (HDL) এর মাত্রা কমে যায় এবং (LDL) এর মাত্রা বেড়ে যায়। রক্তচাপের ভারসাম্যতা বিনষ্ট হয়। হৃদযন্ত্র এবং বাল্‌বের সমস্যা সৃষ্টি হয়। নিয়মতান্ত্রিক রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে, দুর্বলতা ও অবসন্নতার সৃষ্টি হয়, মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত হার্টফেল করে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, শরাব পান করো না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের দরজাস্বরূপ।[১৬৬]

খাব্বাব (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবধান! শরাব পরিহার কর। কারণ শরাবের পাপ অন্যান্য সমস্ত পাপাচারকে আওতাভুক্ত করে নেয়, যেমন

---

[১৬৫]. আল-কুরআন ৫ : ৯০-৯১

[১৬৬]. ইমাম ইবনে মাজাহ্‌, প্রাগুক্ত, পানিয় ও পানপাত্র অধ্যায়, অনুচ্ছেদ শরাব সমস্ত পাপ কাজের দরজা স্বরূপ, হাদীস নং ৩৩৭১

তার গাছ (আঙ্গুর গাছ) অন্যান্য গাছের উপর ছড়িয়ে যায়।[১৬৭] শরাবের অভ্যাস যে সভ্য আমেরিকা মাত্র ১৫ বছরের জন্য বর্জন করতে পারেনি, প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে সফলতার সঙ্গে ইসলাম তা বর্জন করেছে এবং শরাবের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মানবতাকে রক্ষা করে আসছে।

হৃদরোগ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলাম ধর্মকে মানুষের জন্যে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। এই বিধানে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর সব বিষয়ই নির্দেশিত আছে। রোগ-শোকের প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ইঙ্গিতও দেওয়া আছে এই বিধানে। হার্টের অসুখ, হার্টের রক্তনালির অসুখ, এ সবই হৃদরোগ। হৃদরোগ মারাত্মক রোগ। মৃত্যুর অন্যতম কারণ। নানা কারণে হৃদরোগ হয়ে থাকে। আজকাল বিজ্ঞান বলছে এসব কারণের অনেকাংশই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ইসলামি জীবন-যাপনের মাধ্যমেও যে হৃদরোগ প্রতিরোধ সম্ভব তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, নিয়মিত ব্যায়াম উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি। কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ার বড় কারণ চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া এবং ব্যায়াম না করা। চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হবে কম। ব্যায়াম করতে হবে বেশি। ব্যায়াম করলে খারাপ কোলেস্টেরল 'এল ডি এল' এর মাত্রা কমে এবং ভাল কোলেস্টেরল 'এইচ ডি এল' এর মাত্রা বাড়ে। ব্যায়াম করলে রক্ত নালির দেয়ালে চর্বি জমতে পারে না। ফলে রক্তনালি সরু হয় না, সঠিক থাকে। ব্যায়াম করলে হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম রক্তচাপ কমাতেও সহায়ক। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রতিদিন ৩০ (ত্রিশ) মিনিট করে সপ্তাহে ৫ দিন ব্যায়াম করলে রক্তচাপ কমবে প্রায় ৪ থেকে ৯ মিলিমিটার। মাত্র কয়েক সপ্তাহেই এরূপ ফল পাওয়া যাবে। নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে রক্তচাপ থাকবে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে তশরীফ আনেন। তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক আমার বুকের উপর রাখলেন। তাঁর পবিত্র হস্তের শীতলতা আমার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি অন্তরে কষ্ট অনুভব করছো। (তুমি হার্টের রোগী) কাজেই তুমি সাকীক গোত্রের অধিবাসী হারিস ইবনে কালাদহর নিকট যাও। কারণ সে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আর সে যেন মদীনার ৭টি আজওয়া খেজুর বিচিসহ পিষে তোমার জন্য তা দিয়ে সাতটি ট্যাবলেট তৈরি করে দেয়।"[১৬৮] ইসলামী জীবনযাপনে দৈনন্দিন বেশ ব্যায়াম হয়। একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন, নামায পড়ার সময় নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদাহ, বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের অনেক ব্যায়াম হয়। আর জামাতে নামায পড়ার সময় মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়াম শরীরের জন্য উপকারি, হাড়ের প্রতিটি জোড়া, চোখ, ঘাড়, রক্তনালি ও হৃৎপিন্ডের জন্য ভালো। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে হলে খাবার হতে হবে হৃদবান্ধব ও পরিমিত। ফলমূল, শাকসজি এবং আশযুক্ত খাবার খেতে হবে বেশি বেশি। তেল-চর্বি খেতে হবে অবশ্যই কম। বিশেষ করে, স্যাচুরেটেড তেল। মাংসের চর্বি পরিহার করতে হবে। মাছের তেল ভাল। মাছ খাওয়া যাবে বেশি। সব মিলিয়ে খাবার খেতে হবে পরিমিত। কারণ বেশি খেলে রক্তে চিনি, চর্বির পরিমাণ বাড়ে।

---

১৬৭. C\/¸ ³, হাদীস নং ৩৩৭২

১৬৮. আবূ দাউদ, C\/¸ ³, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৮৩৫;

শরীরে মেদ জমে, শরীর বেশি মোটা হয়ে যায়। মোটা শরীরে ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগ বেশি হয়। এরূপ শরীরে হৃদরোগের ঝুঁকিও বেশি। ইসলাম আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে স্বাস্থ্যকর খাবারের কথা বলেছে। পরিমিত আহার রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত।

মিকদাম ইবনে মা'দি কারাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে, ততটুকু খাদ্য কোন ব্যক্তির তোলা দূষনীয় নয়। যতটুকু আহার করলে মেরুদন্ড সোজা রাখা যায়, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এর পরও কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয় তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।[১৬৯]

ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঢেকুর দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের ঢেকুর প্রতিরোধ কর; কারণ যারা পার্থিব জীবনে ভুরিভোজ করবে, তারাই কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত হবে।[১৭০]

শূকরের মাংসে ক্ষতিকর চর্বি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী এবং সীমালজ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।[১৭১]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ **فَمَنِ اضْطُرَّ** فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের জন্য মৃত প্রণীর মাংস, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে নিহত প্রাণীর মাংস, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর মাংস, কঠিন আঘাতে নিহত প্রাণীর মাংস, উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর মাংস, শিংয়ের আঘাতে (পশু লড়াই) নিহত প্রাণীর মাংস, যে প্রাণীর কিছু অংশ কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে অবশ্য যদি তাকে যবেহ করার সুযোগ পাওয়া না যায় বা কোন বেদীর উপর বলি দেওয়া হয়েছে এবং যে মাংস তীর ছুড়ে (পাশা খেলার ন্যায়) ভাগ্য নির্ণয় করা হয়েছে, এসবই হারাম, এসবই ফাসেকি কাজ।[১৭২]

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

দু'টি সমুদ্র সমান হয় না; একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস্য) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য অলঙ্কারাদি আহরণ কর। তুমি তাতে তার

[১৬৯]. ইমাম ইবনে মাজাহ্, প্রাগুক্ত, আহার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ কম খাওয়া এবং পেট ভরে না খাওয়া, হাদীস নং ৩৩৪৯

[১৭০]. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩৫০

[১৭১]. আল-কুরআন ২ : ১৭৩

[১৭২]. আল-কুরআন ৫ : ৩

বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১৭৩]

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা গোশত (মৎস্য) খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর।[১৭৪] এছাড়াও সুরা ফাতির: আয়াত ১২ এবং সুরা নাহল-এর ১৪ নম্বর আয়াতে মাছ খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

রমযানে এক মাস রোযা রাখা ফরয। রোযা রাখলে রক্তের চর্বি কমে। আর চর্বি কমলে হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, সিগারেটের ধোঁয়ার কার্বন মনোক্সাইডের কারণে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। কোলেস্টেরল জমা হয় রক্তনালির দেয়ালে। ফলে রক্তনালি শক্ত হয়, সরু হয় এবং প্রসারণ কমে যায়। রক্ত চাপ বাড়ে। রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবনতাও বাড়ে। দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অধূমপায়ীদের চেয়ে প্রায় ১০ বছর আগেই হৃৎপিন্ডের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। রক্ত জমাট বাঁধতে পারে মস্তিষ্কের রক্তনালিতেও। ধূমপানের কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায়। কমে যায় হৃৎপিন্ডেও। এসব কারণে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ধূমপানের জন্য মৃত্যুর প্রধান কারণ হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক। দেখা গেছে প্রায় ৯০ শতাংশ হৃদরোগই ধূমপানের জন্য হয়ে থাকে। ধূমপান করা, নিজেকে ধ্বংস করা। ইসলাম ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করেছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করোনা। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।[১৭৫] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, স্ট্রেস বা মানসিক চাপও উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের গোপন কারণ। ইসলামী জীবন যাপন আমাদের চাপ মুক্ত রাখতে পারে। নামাযের একাগ্রতা মানসিক চাপ কমায়। নামাযের সময় কুরআন তেলাওয়াতে মন প্রফুল্ল হয়। হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য ক্রোধ ও দমন করতে হবে। কারণ ক্রোধের সময় শরীরে এড্রোনালিন ও নরএড্রোনালিন নামক হরমোন নিঃসরণ বেড়ে যায়। এই হরমোন দুটি রক্তনালি গুলোকে সংকুচিত করে এবং হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি ও রক্তনালি গুলোর সংকোচনের ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। হৃদপিন্ডের রক্তনালির সংকোচনের কারণে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। মস্তিষ্কের অত্যন্ত সরু সরু রক্তনালি ছিড়ে হতে পারে স্ট্রোক। যারা ঘন ঘনই রাগান্বিত হন, তাদের হৃদরোগ হবার ঝুঁকি শান্ত স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি। রাগান্বিত হওয়ার দুই ঘন্টার মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্য সময়ের চেয়ে মুটামুটি দুই গুণ বেশি। ইসলাম ক্রোধ পছন্দ করে না।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

---

[১৭৩]. আল-কুরআন ৩৫ : ১২

[১৭৪]. আল-কুরআন ১৬ : ১৪

[১৭৫]. আল-কুরআন ২ : ১৯৫

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

রবের ক্ষমার প্রতি ধাবমান হও প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ঐ জান্নাতের প্রতি যার বিস্তৃতি আসমান ও যমিনের ন্যায়, তা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত। যারা ব্যয় করে, সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আর তারা ক্রোধ দমন করে, আর ক্ষমা করে মানুষকে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।[১৭৬] নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধ পছন্দ করতেন না। একদিন এক লোক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, হুজুর, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, 'ক্রোধান্বিত' হয়ো না।[১৭৭] লোকটি আরও কয়েক বার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপদেশ দিতে বললেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারই বললেন, 'ক্রোধান্বিত' হয়ো না'। অতএব দেখা যাচ্ছে, ইসলামি জীবন-যাপনের মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধ করা অনেকাংশেই সম্ভব। ইসলামী বিধান পালন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি আমরা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থেকে স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপন পালন করতে পারি।

ক্রোধ, স্বাস্থ্য ও ইসলাম

মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কতৃক মনোনীত পরিপূর্ণ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর সব বিষয়ই সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশিত আছে এই বিধানে। কল্যাণকর বিষয়গুলো পালন আর অকল্যাণকর বিষয়গুলো বর্জন করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে এই ধর্মে। ক্রোধ মানুষের জন্য অকল্যাণকর। ক্রোধ মানুষের চরম শত্রু। যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী, ক্রোধ প্রত্যেকেরই ক্ষতি সাধন করে। ক্রেধের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যেরও নানাবিধ ক্ষতি হয়। কারণ, ক্রোধের সময় শরীরে এড্রোনালিন ও নরএড্রোনালিন নামক হরমোন নিঃসরণ বেড়ে যায়। এই হরমোন দুটি রক্তনালিকে সংকুচিত করে এবং হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি ও রক্তনালির সংকোচনের ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। হৃদপিন্ডের রক্তনালির সংকোচনের কারণে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে।[১৭৮] মস্তিষ্কের অত্যন্ত সরু সরু রক্তনালি ছিড়ে গিয়ে হতে পারে স্ট্রোক। যারা ঘন ঘনই রাগান্বিত হন, তাদের হৃদরোগ হবার ঝুঁকি শান্ত স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি। রাগান্বিত হওয়ার দুই ঘন্টার মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্য সময়ের চেয়ে মুটামুটি দুই গুণ বেশি। ক্রোধের সময় শরীরের অনুচক্রিকা নামের রক্তকণিকার মাধ্যমে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা বেড়ে যায়। জমাট বাঁধা রক্ত হৃদপিন্ডের ধমনিতে প্রবেশ করলে রক্তনালি বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। জমাট বাঁধা রক্ত মস্তিষ্কের সরু নালিতে গেলে হতে পারে ব্রেইন স্ট্রোক। ক্রোধের সময় শরীরের অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যায়। হৃৎপিন্ডে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়ে বুকে ব্যাথা (এনজাইনা) হতে পারে। আর বাড়তি অক্সিজেনের চাহিদা পূরণের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। ক্রোধের সময় মাংসপেশিতে কাঁপুনি হয়। শরীর তখন কাঁপতে থাকে। রাগের জন্য ঘাড় ও মাথার পেশির খিঁচুনি হয়। ফলে মাথা ব্যথা অনুভূত হয় ও ঘুম চলে যায়। ক্রোধের সময় পাকস্থলিতে বেশি অ্যাসিড নিঃসরণ হয়। বেশি অ্যাসিড নিঃসরণ হলে পেপটিক আলসার হতে পারে। ক্রোধের কারণে শরীরের

[১৭৬]. আল-কুরআন ৩ : ১৩৩-১৩৪

[১৭৭]. অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুলাহ্, Bmjvg I ¯^v¯'¨, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[১৭৮]. cÖv¸³, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। যারা প্রায়ই রেগে যায় তার ঘনঘন ঠান্ডা লাগা, হাঁপানি ইত্যাদি রোগে ভুগতে পারে। রাগী ব্যক্তিরা বেশির ভাগ সময় অসুখীই থাকে। একটু সুখের আশায় বিকল্প হিসেবে ধূমপান, মদপান ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। পরিণতিতে শরীরের আরো ক্ষতি হয়। ইসলাম ক্রোধ পছন্দ করে না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

রবের ক্ষমার প্রতি ধাবমান হও প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ঐ জান্নাতের প্রতি যার বিস্তৃতি আসমান ও যমিনের ন্যায়, তা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত। যারা ব্যয় করে, সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আর তারা ক্রোধ দমন করে, আর ক্ষমা করে মানুষকে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।[১৭৯]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধ পছন্দ করতেন না। ক্রোধের ক্ষতির কথা বিবেচনা করেই তিনি তা বর্জন করার জন্য নানা রূপ উপদেশ দিয়েছেন। ক্রোধ কখনই শক্তির পরিচায়ক নয়; বরং ক্রোধ মানুষের চরম দুর্বলতা। ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ক্রোধের বসে সে নানা গোনাহের কাজ করে বসে। এজন্য ক্রোধ দমন করতে হবে।

ক্রোধ দমনের উপায় এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে। সুলায়মান ইবনে সুরদ (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই দুই ব্যক্তি গালাগাল করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই বসাছিলাম। তাদের একজন অপর জনকে এত রাগান্বিত হয়ে গালী দিচ্ছিল যে, তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি একটি কালেমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়তো, তাহলে তার ক্রোধ চলে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি আয়ুজু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়তানির রাজীম পড়তো, তখন লোকেরা সেই ব্যক্তিকে বলল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন তা কি তোমরা শুনছো না? সে বলল, আমি নিশ্চয় পাগল নই।[১৮০] ক্রোধ দমন করতে পারলে পুরস্কারেরও ঘোষণা আছে ইসলামে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্রোধের অনল থেকে বেঁচে সুস্থ থাকার তওফিক দান করুন। আমীন।

অনাড়ম্বর জীবন

ইসলাম অনাড়ম্বর ও সরলতার ধর্ম। এর প্রতিটি দিকেই রয়েছে শান্তি ও সরলতা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনকে সরল ও সাদামাঠা বানিয়ে আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার বাদশা হয়েও সাধারণ জীবন যাপন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যাদি এবং সেগুলির উপকারিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি কাঠের পেয়ালা ছিল।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি কাঁচের পাত্রও ছিল।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির পাত্রও ব্যবহার করতেন।

কাঠের ও মাটির পাত্র ব্যবহার অনাড়ম্বরেরই পরিচায়ক। আজ চীনের ইয়াং শহরের মানুষ পুনরায় মাটির পাত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কারণ, ধাতব জাতীয় প্রতিটি পাত্রেই ক্ষতির আশঙ্কা

[১৭৯]. আল-কুরআন ৩ : ১৩৩-১৩৪

[১৮০]. ইমাম বুখারী, C\/¸ ³, আচার ব্যবহার অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ২৫০৭, হাদীস নং ৫৬৮৫

রয়েছে। প্লাষ্টিকের পাত্র বর্তমান বিশ্বে সভ্যতার যুগের উৎকৃষ্ট উপহার। তবে এ ধরনের পাত্রে খাদ্য দ্রব্য রাখা এবং খাওয়া-দাওয়া করা খুবই ক্ষতিকর। খাওয়া-দাওয়ার জন্য মাটি, চিনামাটি এবং কাঁচের পাত্রই সর্বোত্তম। বর্তমানে প্লাস্টিক এবং কৃত্রিম পদার্থ দ্বারা তৈরীকৃত যে সমস্ত পাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তার ক্ষতির নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল:

কোলেক্টিকাট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান বিভাগের ডাক্তার মাইকেল ফিলিপ বলেন, প্লাস্টিকের পাত্রে গরম খাদ্য বিশেষত চা, কফি পান করা খুবই ক্ষতিকর। এর ক্ষতিকর প্রভাব তখন আরো বৃদ্ধি পায়, যখন চায়ের সঙ্গে লেবুর রস দেওয়া হয়। কারণ এ জাতীয় প্লাস্টিকের পাত্রে ভিতরের অংশ গরম হয় এবং এসিডের প্রভাবে তা গলে গলে বের হতে থাকে। এমতাবস্থায় ঐ পাত্রে চা পান করলে যে 'পলিষ্ট্রিন' শরীরে যাবে, সেটি ক্ষত রোগ বা ক্যান্সার হওয়ার কারণ হতে পারে। ইহা ইঁদুরের উপর পরিক্ষীত। তিনি লোকদেরকে প্রচলিত সাধারণ পাত্রে খাওয়া-দাওয়া করতে পরামর্শ দিয়েছেন। যদি মাটির পাত্রে জীবাণু প্রবেশ করে, তবে তা চুষে অপর দিক দিয়ে বের করে দেয়।[১৮১]

এবার ভেবে দেখুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম কতটা বিজ্ঞানময়। ধাতব পাত্রের পানি পান করার স্বাদের চেয়ে মাটির পাত্রের পানি পান করার স্বাদ ভাল। অভিজ্ঞতাই এর স্বাক্ষী। কিন্তু আমরা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে বরং প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি, ফলে প্রকৃতিও আমাদের সঙ্গে বিরূপ আচরণের মাধ্যমে আমাদেরকে পেরেশানিতে রেখেছে। আজ আমরা প্লাস্টিক, পলিথিন, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতব পাত্র ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদেরকে জীবনকে কঠিন সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। একজন ইউরোপিয়ান ডাক্তার বলেছেন, অনেক সময় পাকস্থলীতে খাদ্যের অন্তর্গত বিষ থেকে যায়। কিন্তু পাকস্থলীর মজবুত পর্দার উপর তার কোন প্রভাব পড়ে না। এ পূর্ণ শক্তি দিয়ে বিষের প্রভাবের সঙ্গে মোকাবেলা করে এবং কোন ক্ষতিও হয় না। কিন্তু যখন এ্যালুমিনিয়ামের সংমিশ্রণ ঐ পদার্থগুলিকে দূর্বল করে দেয়, তখন ঐ বিষের প্রভাবগুলোই যেগুলো মাইক্রোসকোপ দ্বারাও অনুভব করা যেতো না, সেগুলো ভেসে ওঠে। এ্যালুমিনিয়াম পাকস্থলীতে পৌঁছে প্রভাব বিস্তার করার পর কোন কোন সময় আমাশয়, বমি বমি ভাব, বমি, ক্ষুধা মন্দা, পাতলা পায়খানা, রক্ত দূষিত হওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

- মিশিগান ইউনির্ভাসিটির ডাক্তার ভিক্টোরণের বলেন, এ্যালুমিনিয়ামের সকল লবণই মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর।
- শিকাগো ইউনির্ভাসিটির ডাক্তার ভেলস বলেন, এ্যালুমিনিয়াম যুক্ত কেমিক্যাল পাকস্থলীতে পৌঁছে ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। ভিতরগত অঙ্গের সকল অংশকে দূর্বল করে। লোমকূপে এ্যালুমিনিয়মের কেমিক্যাল জমে ক্ষতি সাধন করে।
- ডাক্তার এইচ এ শিগান বলেন, এ্যালুমিনিয়ামের কেমিক্যাল পাকস্থলীতে পৌঁছে ক্ষুধামন্দা সৃষ্টি করে। অনেক সময় পেটে ব্যাথা হয়। ফলে আমাশয়, বমি, বমি বমি ভাব সৃষ্টি হয়।
- যুক্তরাষ্ট্রের হেলথ লীগের প্রধান ডাক্তার হিলডের বলেন, এই কেমিক্যালগুলি পাকস্থলীর শক্তি নিঃশেষ করে দেয়।
- ডাক্তার ডেভিস্ট নাইট এফ.সি.এস. লিখেছেন, এ্যালুমিনিয়াম পাত্রের ব্যবহার ডাক্তারী দৃষ্টিকোন থেকে ক্ষতিকর। নিঃসন্দেহে এই চাকচিক্যময় ধাতব পাত্র নারীদেরকে মোহগ্রস্ত করে এবং

[১৮১]. ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, C⁄, ³, খন্ড ১ - ২, পৃ.৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

নানা ধরনের খাদ্য এই ধাতব পাত্রে রান্না করা হয়। কিন্তু তাদের এ ধরনের পাত্র ব্যবহার না করা উচিত এবং তাতে কোন খাদ্য দ্রব্য কখনো রান্না করবে না, যেগুলিতে এসিড কিংবা লবণাক্ত পদার্থ থাকে। আধুনিক গবেষণা দ্বারা জানা যায়, এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না করা খাবার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এ বিষয়ে ডাক্তার জর্জ ডোনেলসন ব্যাপক গবেষণার পর প্রমাণ করেছেন যে, এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে খাবার রান্না করলে এর কোন কোন পদার্থ বিষাক্ত মিশ্রণে রূপান্তরিত হয়ে খাদ্যে মিলে যায় এবং বিভিন্ন অঙ্গের উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে।

অন্য এক বিজ্ঞানী বলেন, একবার যখন সোডার পানি এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে ঢালা হল, তখন সে পানিতে বুদবুদ উঠতে শুরু করল। তারপর ঐ পানিকেই যখন কাঁচের গ্লাসে রাখা হল, তখন আর বুদবুদ উঠল না। তাহলে নিশ্চয় খাবার রান্না করার সময় এ্যালুমিনিয়াম গলে খাদ্যের সাথে মিশে যায় এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে আধ ঘন্টা পানি জাল দিলে তাতে এ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড (এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ) পানির সঙ্গে মিশে যায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র চাকু দিয়ে চেছে পাত্রের ঝকঝকে অংশে জিহব্বা লাগালে লবণাক্ত স্বাদ অনুভুত হয়। এটা এ্যালুমিনিয়ামেরই একটা লবণ। এ্যালুমিনিয়ামের সকল পাত্রই ক্ষতিকর। কোনটির মধ্যে বিষাক্ত অংশ বেশি কোনটির মধ্যে কম। এ সব কেমিক্যাল খাদ্যের সাথে মিশে খাদ্যের পুষ্টিমাণ নষ্ট করে দেয়। এবং খাদ্যের সাথে পাকস্থলীতে পৌঁছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ক্ষারযুক্ত তরকারী কোন এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে আধা ঘন্টা থাকলে তরকারীতে এ্যালুমিনিয়াম যুক্ত হয়ে যায়। কাঁচা আম এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না করে খেলে সঙ্গে সঙ্গে দাস্ত-বমি আরম্ভ হবে। এ্যালুমিনিয়ামের কেমিক্যাল পেটের নাড়ীকে দূর্বল করে দেয় এবং পাকস্থলীর পর্দায় ছোট ছোট ক্ষতের সৃষ্টি করে।[১৮২] বর্তমান সময়ে যতো বেশি এ্যালুমিনিয়মের পাত্রের ব্যবহার ততোবেশি গ্যাস্ট্রিক আলসারের রোগী। এক গবেষণা থেকে নিম্ন লিখিত তথ্যগুলি জানা যায়।

- চাক্কী এবং কূয়ার পানি ব্যবহার করা যেদিন থেকে বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকেই নারীদের মধ্যে মেদ, শিরা-উপশিরার খিঁচুনি (Muscle Strain), স্ত্রী রোগ (Gyanaecological Disease), স্নায়ুবিক দুর্বলতার মতো কঠিন কঠিন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কাপড় ধোয়া একটি সাংসারিক নিয়ম এবং এর দ্বারা বাহু, বক্ষ এবং বক্ষের মাংসপেশীর যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে নারীরা অগণিত রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পায়। যখন মহিলারা নিজেদের ঘর বাড়ি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, পানি আনা, খাবার রান্না করা, শিশুদেরকে খাবার খাওয়ানো, সেলাই করা, কাপড় বুনোনো ইত্যাদি কাজ করত তখন একদিকে যেমন শারিরীক ব্যায়াম হতো অপর দিকে তেমনি মানসিক আনন্দের মধ্যেও থাকতো, ফলে শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকত। কিন্তু বর্তমান সময়ে মেশিন অথবা কাজের লোকের মাধ্যমে সাংসারিক অতি প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নিয়ে নিজেরা অলস জীবন-যাপন করা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে বাসা বাড়িতে কাজের মহিলার মাধ্যমে কাজ করোনোটা এখন সমাজে স্ট্যাটাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে নারীরা প্রয়োজনীয় ব্যায়াম হতেও নিজেকে বঞ্চিত করছে।

[১৮২]. CV, 3, পৃ. ৩৬৩-৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

➢ স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা হল, যে সকল মহিলারা তাদের বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান, তাদের পরবর্তী সন্তান প্রসবের মাঝে এমনিতেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়। নারীদেরকে সুখী সংসার গড়ার জন্য আর ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনা। প্রয়োজন শুধু উপযুক্ত জ্ঞান এবং সচেতনতা।

➢ পূর্বে মহিলারা সুতি কাপড় পরিধান করত। তখন তাদের মধ্যে গোপন স্ত্রী রোগ তেমন বেশী ছিল না। বিশেষতঃ লিউকোরিয়া তো ছিলইনা। অসংখ্য অভিজ্ঞতার আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এরূপ মন্তব্য করেছেন।

➢ ইতোপূর্বে মেয়েদের বিয়ে-শাদী খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যেত। কারণ, তখন রসম-রেওয়াজের সমস্যা ছিল না। বিশেষজ্ঞদের মতে দেরীতে বিয়ে করলে যেরূপ পুরুষের ক্ষতি হয়, তদ্রূপ ক্ষতি হয় নারীদেরও। তাদের ব্রেষ্ট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

➢ রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে মেকআপ তৈরীর সন্ধান কোন হাদীসেই পাওয়া যায়নি। বর্তমান সমাজের মেয়েরা যখন থেকে এই মেকআপ ব্যবহার শুরু করেছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত চেহারার রোগ, এবং কদাকৃতি দূর করার বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহারের চক্করে পড়ে গেছে। ইদানিং অনেক মহিলার মুখে অযাচিত পশম দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের মেকআপ ব্যবহারও এর একটি কারণ।

➢ ঢিলা-ঢালা পোশাক সুস্থতা ও স্বাস্থ্যের জন্য শক্তিশালী খাদ্যের চেয়েও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ জাতীয় পোশাক ছেড়ে দিয়ে আজ আমরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছি।

➢ ইসলামী জীবন-যাপন সাদাসিধে কিন্তু আরামদায়ক। পাশ্চাত্যের জীবন চাকচিক্যময়, কিন্তু জটিল এবং কষ্টদায়ক। সাদাসিধে জীবন-যাপনকারী অধিকাংশ লোকই রোগ-ব্যাধি, অস্থিরতা, অনিদ্রা, আত্মহত্যা ও তালাকের মত মারাত্মক জটিলতার শিকার খুব কমই হয়ে থাকে। ফলে, তারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে থাকে খুবই সতেজ।

➢ লিপিস্টিক তৈরীতে প্রথম প্রথম এরূপ চর্বি ব্যবহার করা হত, যা তাড়াতাড়ি গলত না। অনুসন্ধানে জানা গেল, শূকরের চর্বি তাড়াতাড়ি গলে না। তারপর থেকে লিপিস্টিকে শূকরের চর্বি ব্যবহৃত হতে লাগল। এখনো ভাল এবং দামী লিপিস্টিকে শূকরের চর্বি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু লিপিস্টিকে সাধারণত রং জাতীয় দ্রব্য এবং চর্বি জাতীয় শক্ত ভ্যাসলিন ব্যবহার করা হয়। তাই এটা খুবই ক্ষতিকর। কেননা রং থেকে রক্তের অগণিত রোগ ব্যাধি জন্ম নেয়। তার মধ্যে শরীরের মারাত্মক রোগ ক্যান্সার ও জন্ম নেয়।

➢ স্যার জেমস সাগম কানাডার একজন বড় ফিজিওথেরাপিষ্ট। তেল ব্যবহারের ব্যাপারে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বলেন, পূর্বে আমি মাথায় তেল লাগানোকে সময়ের অপচয় ও ধুলাবলি আটকে থাকার কারণ মনে করতাম। কিন্তু একটি ঘটনা আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। আমি কিউটের একটি গ্রামের রোডে মোটর গাড়ীতে করে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় এক বৃদ্ধকে আরেক বৃদ্ধের মাথায় ম্যাসেজ করতে দেখলাম। আমি ভাবলাম, একি হতবুদ্ধিতা! আমি গাড়ী থামিয়ে তাদের অবস্থা জানতে চাইলাম। তাদের একজন বলতে লাগল, আমার পিতা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে চলে যেতেন। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু কোন ফল হলো না। তখন আমাকে এক ব্যক্তি বলল, তুমি তোমার পিতার মাথায় আমলা মালিশ কর। আমি মালিশ করতে আরম্ভ করলাম। এভাবে সাতাশ দিন কেটে গেল, এখন আমার পিতা একেবারে সুস্থ। আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমি রোগীকে ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলাম বাস্তবিকই সে সুস্থ। তার পূর্বের রিপোর্টগুলো পড়ে বুঝলাম, আসলেই সে মানসিক রোগী ছিল।

এরপর থেকে আমি তার মত রোগী এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের উপরও এ পদ্ধতি ব্যবহার করলাম। এতে আশাতীত ফল হল। আমি এটাকে মস্তিষ্কের চাপ, শিরা-উপশিরার খিঁচুনী ও মাথা ব্যথার পুরাতন রোগী, ঘাড়ের রগের ব্যথা, কাঁধের ব্যথা এবং খিঁচুনী, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, চেহারার সার্জারীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলদায়ক পেয়েছি। চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানোর ফলে এক প্রকার উষ্ণতা এবং এনার্জী সৃষ্টি হয়, যা পশম বা চুলের মাধ্যমে শরীরে শিরা-তন্ত্রীকে প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করে। এমন কি নিয়মিত চুল আঁচড়ালে চুল বৃদ্ধি পায় এবং ঘন হয়। নিয়মিত চুল আঁচড়ানোর ফলে চুলের জীবাণু ও উকুন কম হয়।[১৮৩]

সুস্থ থাকার সহজ উপায়

পারস্যের এক রাজা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক পাঠান। তিনি প্রায় ১ থেকে ২ বছর মদীনা শরীফে ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ সময়ে কোনো রোগী চিকিৎসার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়নি। অবশেষে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে অভিযোগ কররেন," আমাকে আপনার সহকর্মীদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে অসুস্থতার কারণে কেউই আমার শরণাপন্ন হয়নি বা আমার ব্যবস্থা পত্র নিতে আসেনি।" তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এখানকার লোকদের অভ্যাস হচ্ছে, ক্ষুধা না লাগলে তারা খাবার গ্রহণ করেনা এবং খাবারের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এক পর্যায়ে তারা খাওয়া বন্ধ করে থাকে।" তখন চিকিৎসক বললেন, "এটিই তাদের সুন্দের স্বাস্থের মূল কারণ।"[১৮৪] ঢিলে-ঢালা সুতি কাপড় পরিধান করা, পরিমিত আহার এবং পায়ে হেঁটে চলার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে সুস্থ জীবন-যাপন পালন করা সম্ভব। খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও সচেতনতার মাধ্যমে অতি সহজেই পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা যায়। দৈনন্দিন জীবন-যাপনের জন্য খাদ্য হিসাবে আমরা কি গ্রহণ করবো? কখন (কোন্ সময়ে) গ্রহণ করবো? কতটুকু পরিমাণ গ্রহণ করবো এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান এবং পরিকল্পনা থাকতে হবে। খাদ্যদ্রব্য রান্নার সময়ে পুষ্টির অপচয় রোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র পরিবারের ভূমিকায় যথেষ্ট নয়, রাষ্ট্রীয় ভাবে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। ইসলামের প্রতিটি বিধানই স্বাস্থ্য সম্মত, অতএব ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করাই সুস্থ থাকার সহজ উপায়।

---

[১৮৩]. C\/¸ 3 , পৃ. ৩৬১

[১৮৪]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, C\/¸ 3 , পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুসলিম স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীর পরিচয়

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় চিকিৎসাবিজ্ঞান শাখায় বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা অনেক বেশী। জনসাধারণের অতি প্রয়োজনের জন্যই সব দেশে সব কালেই বহু সংখ্যক চিকিৎসাবিদের আবির্ভাব হয়েছে। প্রাচীন যুগের পর গ্রীক সভ্যতার যুগ শুরু হয়। এ সময় গ্রীকরা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। গ্রীক চিকিৎসাবিদদের মধ্যে যাঁরা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে হিপোক্রীটিস, এ্যারিষ্টোটল, ক্লাডিয়াস গ্যালেনের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এছাড়া ইসলামী যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা। চিকিৎসা বিজ্ঞান বর্তমান অবস্থায় পৌছার পেছনে যে সকল মহামনীষিদের অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুসলিম স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীর নাম এখানে স্মরণ করা হয়েছে।

বোখরাত বা হিপোক্রীটিস

মানুষের মনের অন্ধকারে যারা জ্ঞানের আলো জ্বেলে বিশ্ববাসীকে করেছে আলোকিত, হিপোক্রীটিস তাঁদের অন্যতম। তিনি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে অবদান রেখে উজ্জল নক্ষত্রের মতো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। ক্ষণজন্ম এই মহামনিষী ৪৬০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে অ্যাপিয়ান সাগরের ‘কচ দ্বীপে’ জন্ম গ্রহণ করেন।[১৮৫] তখনকার চিকিৎসাবিদ্যাকে বলা হত গুপ্তবিদ্যা। তখনকার যুগে পিতা শুধুমাত্র তার সন্তানকে এ বিদ্যা শিক্ষা দিত। হিপোক্রীটিস ছিলেন এমনই এক চিকিৎসক পিতার সন্তান। তাঁর সমসাময়িক সময়ে গ্রীসে সক্রেটিস, এ্যাসকাইলাস এবং কয়েক বছর পরে সোফেক্লিস, প্লেটোর মতো মহান দার্শনিকগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের জ্ঞানের আলো এবং মুক্ত স্বাধীন চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষার সূত্রপাত পিতার নিকট হতে শুরু হয়। পিতার নিকট থেকে যাবতীয় শিক্ষা অর্জন শেষ করে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এথেন্স গমন করেন। সেখানে তিনি সেই যুগের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি ডিমোক্রিটাসের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে তোলেন, যার ভিত্তি ছিল যুক্তি, সততা, প্রত্যক্ষজ্ঞান আর বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা ভাবনা। ফলে, অল্প দিনের মধ্যে সমগ্র গ্রীসেই তাঁর চিকিৎসার সুনাম জনগণের নিকট পৌঁছে যায়। তাঁর পূর্বে চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রীকদেশে কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম পরিবারতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যাবস্থা ভেঙ্গে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় রুপান্তর করেন। প্রায় একই সময়ে তিনি রোগীকে পরীক্ষা করার বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ণয় করেন এবং চিকিৎসকেরা যাতে তাদের সুমহান আদর্শ থেকে বিচ্যুতি না হন সে জন্য তিনি চিকিৎসকদের জন্যে একটা আইন প্রণয়ন করেন যাকে “Hipocretes Outh” বলা হয়।[১৮৬] বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের লেখাপড়া শেষে নব্য চিকিৎসকদের এই শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। তিনি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হিপোক্রেটিসের Aphorism এর আরবী অনুবাদ দেখে তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ হুনায়েন ইবনে ইসহাক মন্তব্য করেন, এমন বই মানুষের চেষ্টায় হয় না; ঐশীবাণী (এলহাম) মারফত হয়েছে। পবিত্র আত্মার (রুহুল কুদ্দুস) সহযোগিতা ছাড়া এমন লেখা সৃষ্টি হতে পারেনা।[১৮৭] তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে- De aera, acquis et locis,

---

[১৮৫]. ডা. ইবনে আখতার, h‡M h‡M wPwKrmv weÁvbx, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খ্রি. পৃ. ১৬

[১৮৬]. ডাক্তার এম. এ. ওয়াহেদ, cÖv¸³, পৃ. ২

[১৮৭]. এম আকবর আলী, cÖv¸³, পৃ. xvi

Dhaka University Institutional Repository

Prognosticon, De Dioeta acutorm, De morbis Popalaribus, Aphorismi, De natura hominis, De octimestri partu, De genitura, De septimanis, Proeceptiones এবং Secreta অন্যতম।[১৮৮]
অবশেষে এই মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ৩৬৩ মতান্তরে ৩৬৫ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে[১৮৯] এই ধরণী হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

আরাস্ত বা এ্যারিষ্টোটল

এ্যারিস্টটলকে আধুনিক জীব বিজ্ঞানের জনক[১৯০] বলা হয়। বিশ্ববিজয়ী বীর সম্রাট আলেকজান্ডার দূঃখ করে বলেছিলেন, জয় করবার মত পৃথিবীর আর কোন দেশ বাকি রইল না। তাঁর শিক্ষক মহাপন্ডিত এ্যারিস্টটল সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। জ্ঞানের এমন কোন দিক নেই যার তিনি পথপ্রদর্শক নন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানেও তাঁর অসাধারণ অবদান রয়েছে। ৩৮৪ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে[১৯১] এ্যারিষ্টোটল গ্রীসের অন্তর্গত স্তাজেইরা শহরে[১৯২] জন্ম গ্রহণ করেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটোর শিক্ষালয়ে এ্যারিস্টটল শিক্ষা গ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই নিজের যোগ্যতায় তিনি হয়ে উঠেন একাডেমির একজন সেরা ছাত্র। প্লেটোও তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হন। তিনি নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ করতেন। তর্কবিদ্যা, অধিবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি জীব বিজ্ঞানের মৌলিক সংজ্ঞা, লিঙ্গভেদ, বংশধারা, ক্রমবিকাশ এবং শোষণক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি দেহ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার ব্যপারে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বেশির ভাগ পুস্তকাদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপরই লিখেছেন। আলেকজান্ডার যখন এশিয়া জয়ের নেশায় সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হলেন, এ্যারিস্টটল তখন নিজ জন্ম ভূমি এথেন্সে ফিরে গেলেন। এথেন্স তখন শিল্প-সংস্কৃতি শিক্ষার পীঠস্থান। তিনি সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ বছর তখন বীর ছাত্র আলেকজান্ডারের আকস্মিক মৃত্যু হল। এতদিন বীর ছাত্রের ছত্রছায়ায় যে জীবন-যপন করতেন তাতে বিপর্যয় নেমে এল। কয়েকজন অনুগত ছাত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সক্রেটিসের অন্তিম পরিনতির কথা তাঁর অজানা ছিল না। তিনি গোপনে এথেন্স ত্যাগ করে ইউরিয়া দ্বীপে আশ্রয় নেন। অবশেষে সেচ্চানির্বাসালের যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে ৩২২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। বিখ্যাত চিকিসা-বিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ দার্শনিক আররাযী মন্তব্য করেছেন যে, যেখানে গ্যালেন ও হিপোক্রেটিস বা এরিস্টটল যে বিষয়ে একমত সেখানে কোন উচ্চবাচ্য চলবে না। সে মতবাদ অভ্রান্ত সত্য। তবে যেখানে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়, সেখানে শুধু বিবেচনা করে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিজের বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।[১৯৩]

[১৮৮]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C‌V¸ 3, পৃ. ৫৭

[১৮৯]. ডা. ইবনে আখতার, C‌V¸ 3, পৃ. ২১

[১৯০]. C‌V¸ 3, পৃ. ২২

[১৯১]. ডাক্তার এম. এ. ওয়াহেদ, C‌V¸ 3, পৃ. ২

[১৯২]. ডা. ইবনে আখতার, C‌V¸ 3, পৃ. ২২

[১৯৩]. এম আকবর আলী, C‌V¸ 3, পৃ. xvi

Dhaka University Institutional Repository

জালিনুস বা ক্লাডিয়াস গ্যালেন

৯৫ অথবা ১৩০ খৃষ্টাব্দে ক্লাডিয়াস গ্যালেন ইউনান বা গ্রীকে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শুরু করেন গ্রীক ও ইসকান্দারিয়ায় (আলেকজান্দ্রিয়ায়)। তিনিই সর্বপ্রথম গিনিপিগের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেন এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধারণা বিষয়-ভিত্তিক লিপিবদ্ধ করেন। তিনি শল্য চিকিৎসা বা সার্জারী বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি মানুষ ব্যতিত জীবজন্তুর মরদেহ ব্যবচ্ছেদ করেন এবং চিকিৎসক হিসাবে খুবই সুনাম অর্জন করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল। তিনি কাউচিং পদ্ধতিতে চোখের ছানি অপারেশন করতেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। Galen রোমান চিকিৎসাবিদদের অন্যতম পুরোধা। Campbell এর মতে, তাঁর ৫৯টি গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়; তন্মধ্যে ১৬টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের অবশ্য পাঠ্য। তন্মধ্যে কয়েকটা হলঃ Ars Medica, De elementis Secundum Hippocratem, De temperrmentis, De facultatibas naturalibus, Introductio sive medicus Opera varia অন্যতম।[১৯৪] জগৎ বিখ্যাত প্রাচীন এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী ১৬০ অথবা ২০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৯৫]

মোহাম্মদ আলমাহদী

মুসলিম জগতের বিজ্ঞানীদের বিষয় আলোচনায় সবচেয়ে বিস্ময়কর যে ব্যাপারটি চোখে পড়েছে সে হলো সুদুর ১৪শ শতাব্দীতে একজন ইতিহাসে স্থান পাওয়া বাঙ্গালী মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। তিনি হলেন মোহাম্মদ আলমাহদী। তিনি ১৪৩২ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন।।(xvii) তিনি বিদেশী হয়েও আরব দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে অন্তত ১০ বৎসর সময় নিয়েছিলেন এবং আরও ১০ বছর বেঁচেছিলেন।[১৯৬]

এহিয়া আন্‌আহভী

আরব দেশের বাইরের জ্ঞানী-গুণীর মধ্যে এহিয়াই সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানী যিনি এই বিজ্ঞানে আরবদের অবদানের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন।[১৯৭] তিনি মিসরের নবাগত মুসলিম শাসন কর্তার সংস্পর্শে আসেন।

আবু হাফসা ইয়াজিদ

আবু হাফসা ইয়াজিদ নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন। ইবনে খাল্লিকানের মতে, তিনি ইহুদি ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। Wustern field তাঁর গ্রন্থ Geschichte der Arabian Aerzte তে আবু হাফসাকে এ সময়কার অন্যতম চিকিৎসাবিদ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯৮]

ইবনে বখতিইয়াশু

জুরুজস ইবনে জিবরাইল ইবনে বখতইয়াশু এই বংশ ৬ পুরুষ ধরে চিকিৎসা-বিজ্ঞান জগতে আধিপত্য বজায় রাখেন। বখতইয়াশুর অধস্তন পুরুষরা ৮ম ও ৯ম শতাব্দী ধরে বংশ পরম্পরায়

---

[১৯৪]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¸ ³, পৃ. ৫৭

[১৯৫]. এম আকবর আলী, C¸ ³, পৃ. ২৭

[১৯৬]. J. Sir Jadu Nath Sarkar, History of Bengal, Vol II Ed. P.117

[১৯৭]. এম আকবর আলী, C¸ ³, পৃ. ৫

[১৯৮]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¸ ³, পৃ. ৫৯

চিকিৎসা ব্যবসা চালিয়ে চিকিৎসক বংশ হিসেবে তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।[১৯৯]

ইবনে উবায় রামছাতুন তামিমী

নবী (সা)-এর সময় ইবনে উবায় রামছাতুন তামিমী নামে একজন ক্ষত ও অস্ত্রোপচার বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ ছাড়া জয়নাব ও রাফিজা নামের দুই জন মহিলা চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত জয়নাব খোলাফায়ে রাশেদার যুগে চক্ষু রোগের চিকিৎসা করতেন। অন্যজন ছিলেন আনসার সাহাবীয়া। তিনি মসজিদে নববীর আঙিনায় তাঁবুতে যে হাসপাতালে করা হয়েছিল তার প্রধান ছিলেন।[২০০]

আলবাতরিক

আলবাতরিকের পূর্ণ নাম আবু ইয়াহিয়া আলবাতরিক ৭৯৬-৮০৬ খৃ. মধ্যে তিনি পরলোক গমন করেন।তাঁর জন্মের তারিখ জানাযায়নি। তিনি গ্যালেন ও হিপোক্রেটসের চিকিৎসা বিষয়ক কিছু গ্রন্থ এবং ওমর ইবনে আলফাররুখানের জন্য টলেমির Quadripartitum এর অনুবাদ করেন।[২০১]

৯ম শতাব্দীর চিকিৎসা-বিজ্ঞান পুরোপুরি ভাবেই মুসলিমদের দখলে চলে আসে। জাপানে সম্রাট হেইজো (Hejjo) ও সম্রাট সিউয়ার (Seiwa) অধীনে পূর্বেকার জাপানী চিকিৎসাবিদ্যা পূনর্জীবিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিশেষ কাজ কিছুই হয়নি। মুসলিম জগতে এই সময় অন্যদেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রন্থ অনুবাদ করার তৎপরতাও বেড়ে যায়।

মোহাম্মদ বিন আহমদ বিন সাঈদ আত্ তামিনী আল মুকাদ্দেসী

মোহাম্মদ বিন আহমদ বিন সাঈদ আত্ তামিনী আল মুকাদ্দেসী জেরুজালেমে জন্ম গ্রহণ করেন। আল কিফতির মতে, চিকিৎসা সম্পর্কে আত্ তামিনীর জ্ঞান ছিল সূদূর প্রসারী এবং ওষুধ তৈরীর প্রণালী ছিল বিজ্ঞানসম্মত।[২০২] তিনি 'তিরয়াক' কে ফলপ্রদ ওষুধ হিসাবে দাঁড় করান। এ সম্পর্কে তাঁর একাধিক গ্রন্থও আছে। মিশরে খলীফার অনুরোধে তিনি লিখেন 'মান্দাতিল বেকা বে এসলাহে ফাসাদিল ওয়াত তাহরাবরুষ মিন জারারিল ওবা' নামক কয়েক খন্ডের একটি গ্রন্থ। তামিনী ওষুধ নিয়ে বেশী গবেষণা করেছেন, তাঁর রচনাবলী বেশীর ভাগই Materia medica নিয়ে রচিত।

ইবনে বাতরিক

আল বাতরিকের পূত্র ইবনে বাতরিকও পিতার মতই চিকিৎসা-বিজ্ঞনের অনেক গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। হুনায়েন ইবনে ইসহাকের মতে তিনি গ্রীক ভাষার চেয়ে ল্যাটিন ভাল জানতেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে বাতরিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের সিররুল আসরার গ্রন্থটি এরিষ্টটলের Secretum (Secreta) Secretorum গ্রন্থের অনুবাদ। তিনি প্লেটোর Timaeos

---

১৯৯. এম আকবর আলী, C/¸ 3, পৃ. ৬-১০

২০০. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C/¸ 3, পৃ. ৬১

২০১. এম আকবর আলী, C/¸ 3, পৃ. ১২

২০২. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C/¸ 3, পৃ. ৭২

হিপোক্রেটসের Book of the signs of Death গ্যালেনের De Therica and pisonem এবং কিতাবুল বড়সাম নাম দিয়ে অন্য একখানি গ্রন্থও অনুবাদ করেন।[২০৩]

সিনান বিন সাবেত

সাবেতের পুত্র সিনান বিন সাবেত চিকিৎসা পেশায় সুষ্ঠুরীতি চালু করার জন্য বিশেষভাবে খ্যাতিমান।[২০৪] তিনি প্রায় ১৯টি বই লিখেছেন। সাবেত ও সিনান পরিবারের অনেক পুরুষই চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

ইবনে সাহদা

হুনায়েন ইবনে ইসহাকের মতে তিনি গ্যালেনের Secties এবং De pulsibus ad Tirones সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।[২০৫]

হাসান ইবনে নূহ

হাসান ইবনে নূহ ১০ম শতাব্দীর শেষ দিকে অন্যতম চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তবে তাঁর খ্যাতি, তিনি ইবনে সীনার শিক্ষক ছিলেন।[২০৬] জিবাল প্রদেশের 'কুম' নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং দশম ও একাদশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাগদাদে চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে "কিতাবু গানা ওয়া মানা" ৩ খন্ডে বিভক্ত এবং সবচেয়ে বিখ্যাত। অন্যান্য গ্রন্থ হলো-"মাকালাতু ফিত্তীব' 'মুসতালাহাতেত্ তীব এবং 'কিতাবু এলালিন এলাল'।

জিবরাইল ইবনে বখত ইয়াশু

জুরজিসের পৌত্র বখত ইয়াশুর পুত্র জিবরাইল ছিলেন বখত ইয়াশু বংশের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা চিকিৎসক। তার পূর্ণনাম জিবরাইল বিন বখতইয়াশু বিন জুরজিস বিন বখতইয়াশু। চিকিৎসার নৈপুন্যের জন্য তিনি খলিফা হারুন-অর রশীদ ও খলিফা আল মামুনের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন এবং তাঁদের দরবারী চিকিৎসক নিযুক্ত হন।[২০৭] ৮২৮-২৯ খ্রি. তিনি পরলোক গমন করেন। শধু খলিফাদের নয় বারমাক মন্ত্রী জাফরেরও তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

আবু মনসুর মুয়াফাক

আবু মনসুর মুয়াফাক, আরব-চিকিৎসা বিজ্ঞানে দুটো কারণে বিশিষ্ট। একটি হলো তিনি প্রাদেশিক ভাষা ফার্সীতে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, অন্যটি চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে রসায়ন সংযোগ সাধন করেছেন। সামানীয় নৃপতি মনসুর ইবনে নূহের (৯৬১-৯৭৬ খৃ.) রাজত্বকালে হিরাতে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে গুটি কতেক মনীষী রসায়নকে যোগ করেছেন কার্যকারিতার পার্থক্য সম্বন্ধে যেমন লিখেছেন তেমনি তামা ও সীসা প্রভৃতি যৌগিক পদার্থের বিষক্রিয়া

---

[২০৩]. এম আকবর আলী, C\/¸ ³, পৃ. ১৪-১৫
[২০৪]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C\/¸ ³, পৃ. ৭১
[২০৫]. এম আকবর আলী, C\/¸ ³, পৃ. ১৫
[২০৬]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C\/¸ ³, পৃ. ৭১
[২০৭]. এম আকবর আলী, C\/¸ ³, পৃ. ১৬-২১

পার্থক্য সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন আবু মনসুর মুয়াফাক তাঁদের অন্যতম।[২০৮] এছাড়া কলিচুনের (Quick Lime) লোমনাশক গুণ, Plaster of paris তৈরী করতে ও সার্জারীতে এর ব্যবহার সম্পর্কে, Cupric Oxide silicic acid প্রভৃতির ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

ইউহান্না ইবনে মাসুবিয়া

জন্ম ৭৭৭ খ্রি. মৃত্যু ৮৫৭: তিনি ৫৭ খানা চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থাবলীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থা (Clinical Studies), স্ত্রী রোগ, ওষুধ তৈরী, (Pharmacy), এনাটমি, চক্ষু চিকিৎসা, পথ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন।[২০৯]

তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে:

১। কিতাবুল রোবহান (৩০ অধ্যায়ে সমাপ্ত)

২। কিতাবহুল (মারফু) বাসিরাত

৩। কিতাবুত্‌ তামাম ও আলকামাল

৪। কিতাবুল হামিয়াত

৫। কিতাবুল আগজিয়াত

৬। কিতাবুল ফাসাদ ও হাজামাত

৭। কিতাবুল মোশজার

৮। কিতাবুল জুজাম

৯। কিতাবুল আসলাহ আগজিয়া

১০। কিতাবুর রুজহান ফিল মোআদাত

১১। কিতাবুল নুজাহ

১২। কিতাবুল আদবিয়াতুল মোসহেলাত

১৩। কিতাবুল কামেল

১৪। কিতাবুল হাম্মাম

১৫। কিতাবুল আসহাল

১৬। কিতাব এলাজেল সুদাআ

১৭। কিতাবুল সদর ওয়াদ দাওয়ার

১৮। কিতাবুলাম আস্‌ তানআ এলা আতবায় মিন এলাজেল হাওয়ামিল ফি বাজে শহুর হামলাহুন্না

১৯। কিতাবু মেহনতেত্‌ তাবিব

২০। কিতাবুল সুওতুওয়াল বুহহাত

২১। কিতাব মায়ে শাইর

২২। কিতাব মাজাসসাতুল আরুফ

২৩। কিতাবুল মিরাতুল সাওদা

---

[২০৮]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C/¸ ³, পৃ. ৭১

[২০৯]. এম আকবর আলী, C/¸ ³, পৃ. ২৪

২৪। কিতাবু এলাজেন নেসায়ে আলওয়াতীলা ইয়াহমেলনা
২৫। কিতাবুস সেওয়াক ওয়াল সুনুনাত
২৬। কিতাবু এসলাহেল আদবিয়াতু সুসহেলাত
২৭। কিতাবুল কলুনজ
২৮। কিতাবুত তাশরিহ
২৯। কিতাবু ফিশ্ শরবত
৩০। কিতাবুল্ মনজাহ ফিস সেফাত ওয়াল এলাজাত
৩১। কিতাবুজ জাওহার
৩২। কিতাবু ফি গায়রে মা শাইয়ুন মেম্মা আজায আনহু গায়রুহু
৩৩। কিতাবুল দিবাজ
৩৪। কিতাবুল আযমানথ
৩৫। কিতাবুত তারিখ
৩৬। কিতাবু দাফয়ে ফাজারুল আগজিয়া
৩৭। কিতাবুস সুমুম ওয়া এলাহেজা
৩৮। কিতাবু ফিল সাদ আওয়া এলাসহ ওয়া আওজায়াহু ওয়া জামিয়ে আদবিয়াতহু
৩৯। কিতাবু মাআরেফাত মেহনতেল ফাহালিন
৪০। কিতাব দলুল আইন
৪১। কিতাবুল জুনাইন
৪২। কিতাবুল মুয়াদাত
৪৩। কিতাবুল নওয়াদেরুল তিবিয়াত
৪৪। কিতাবু তদবিরুল আসহা
এছাড়াও তিনি চিকিৎসা বিষয়ক আরো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইয়াহিয়া আন্ নাহবী

সপ্তম শতাব্দীতে আরবের বাইরের খৃষ্টান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইয়াহিয়া আন্ নাহবী চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্ব প্রথম আরবদের অবদানের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মিশরের গভর্ণর আমার ইবনুল আসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন।

আল বাতরিক

আল বাতরিক (মৃ.৭৯৬-৮০৬ এর মধ্যে) খলিফা মনসুরের আমলে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ করেন ।[২১০]

জাবির বিন হাইয়ান

জাবির ইবনে হাইয়ান এর পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান। তিনি আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান নামেও পরিচিত। তিনি ৭২২ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাইয়ান ছিলেন

---

[২১০]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসক ও ওষুধ বিক্রেতা। পরবর্তীতে পিতার অনুসরণেই তিনি ওষুধ ব্যবসা শুরু করেন। তিনি তৎকালিন বিখ্যাত পন্ডিত ইমাম জাফর সাদিকের অনুপ্রেরণায় তিনি রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। জাবির ইবনে হাইয়ান তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই বাগদাদে কাটিয়েছেন।[২১১] ৮ম শতকে মুসলিম রসায়নবিদ জাবির বিন হাইয়ান এর আগমনে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন যুগের সুচনা হয়। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইবনে নাদিমের মতে, চিকিৎসা শাস্ত্র সম্মন্ধে তিনি ৫০০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[২১২] তিনি ৮০৩ খ্রি. এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞানে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা চির স্বরণীয়। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই তাঁর নাম জানে না; তাচ তাঁর মৌলিক আবিষ্কারের উপরই বর্তমান বিজ্ঞান অধিষ্ঠিত।[২১৩]

আল-কিন্দি

আরব জগতের প্রথম বিখ্যাত দার্শনিক হিসাবে পরিচিত হলেও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আনুমানিক ৮০০ খৃ. তিনি কুফাতে জন্ম গ্রহণ করেন।[২১৪] তিনিই সর্বপ্রথম আরব দার্শনিক যার মাধ্যমে এরিষ্টটলের দার্শনিক মতবাদ আরব জগতে প্রসার লাভ করে।[২১৫] তিনি ওষুধের সাথে গণিতের সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগের প্রয়াস ছাড়াও তিনি চিকিৎসাবিদ হিসেবেও তখন বেশ প্রখ্যাত ছিলেন। অর্থ উপার্জনের জন্য শুধু পেশা হিসেবেই তিনি চিকিৎসাবিদ্যা ব্যাবহার করেননি চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রণয়ন করে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। Encyclopaedia Britanica এর নিবন্ধকার R.R. Wr. এর মতে, তাঁর ২৭০টি গ্রন্থের ২৭টি চিকিৎসা সংক্রান্ত;[২১৬] তন্মধ্যে দু'টির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমটির নাম 'কিতাবু ফি কিমিয়া আল ইতর ওয়াত্ তাসিদাত' অন্যটি আকরাবাদিন'। প্রথমটিতে তেল, মলম, আতর তৈরীর কৌশল এবং শেষটিতে রোগ এবং রোগের ওষুধের ব্যবস্থা পত্র সম্বন্ধ। অধ্যাপক লেভী ১৯৬৬ সালে তাঁর যে গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তাতে ২২৬টি ব্যবস্থা পত্র রয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে ঠাণ্ডা, সর্দি, বাত, কালপিত্ত, দুর্বলতা, যকৃত ও পেটের পীড়া, বৃক্ক ও মুত্রাশয়ের অকর্মণ্যতা, ফোঁড়া ফাটানোর পুলটিশ, প্লীহার জন্য পুলটিশ, ভগন্দরের ওষুধ, আগুনে পোড়ার ওষুধ, চুল দাড়ি বড় করার ওষুধ, কাজল তৈরীর ব্যবস্থাপত্র অন্যতম। ১৯৬২ সালে ইরাকে কিন্দির জন্য সহস্র বার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে Prof Richard J. Mc. Carthy আল কিন্দির কার্যাবলী সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্দি ২৩৫ হি./ ৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

---

২১১. মাইকেল এইচ. হার্ট, অনুবাদ: সামছুল ইসলাম হায়দার, B¤Zn¦‡mi †kô kZ gbxlxi RxebK_v, ঢাকা: মিতা বুক সেন্টার, আগস্ট ২০১২ খ্রি. পৃ. ৫৪-৫৬

২১২. এম আকবর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

২১৩. মাইকেল এইচ. হার্ট, cÖv¸³, পৃ. ৫৬

২১৪. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, cÖv¸³, পৃ. ৬৫

২১৫. এম আকবর আলী, cÖv¸³, পৃ. ৫২

২১৬. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, cÖv¸³, পৃ. ৬৬

আলী ইবনে রাব্বান

আলী ইবনে রাব্বান ৮১০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[২১৭] তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কিতাব আল দ্বীন 'ফিরদাউসুল হিকমত; চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম বিশ্বকোষ[২১৮] এবং এখনো অতি উচ্চ মূল্যের অধিকারী। The Nataral Science and Medicine এর গ্রন্থকার Martin Pleesner এর ভাষায়: The oldest sur-viving Arabic encyclopaedia of Medicin, The Firdaus-al-Hikma or pradise of wisdom is in some respect unsurpassed. আরবী ভাষায় সর্ব প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আলী ইবনে রাব্বান।[২১৯] ইবনে রাব্বান খলীফা মোতাওয়াক্কিলের অনুপ্রেরণায় মুসলিম হন। তাঁর প্রায় ১৫টি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ৩টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চিকিৎসা বিশ্বকোষটি ড.মোহাম্মদ জুবায়ের সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকে তাঁর আজীবন সাধনার ধন বলা হয়। এতে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।[২২০] অন্য দুটি হচ্ছে 'কিতাবু হেফজিস সিহাত' ও 'দীন ওয়াদ দাওলত'। প্রথমটির পাণ্ডুলিপি oxford এর Bodleain লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত এবং দ্বিতীয়টি পাণ্ডুলিপি ম্যাচেষ্টারের John Rylands সংরক্ষিত।[২২১]

আবুল হাসান আহমদ আত্ তাবারী

তাবিরিস্তানে এই সময়ে অনেক অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসা বিদের আবির্ভাব হয়েছিল এদেরই একজন আবুল হাসান আহমদ আত্ তাবারী।[২২২] আবুল হাসান আহমদ আত্ তাবারী একজন অভিজ্ঞ চোখের চিকিৎসক। তার গ্রন্থ 'মুয়ালাজাতুল তুকরাতিয়া'-এ হিপোক্রেটের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

শেখ আবুল আব্বাস আহমদ বিন মোহাম্মদ আল বালাদি

মিশরে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন শেখ আবুল আব্বাস আহমদ বিন মোহাম্মদ আল বালাদি। তিনি গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে "তাদবীরুল হাবালা ওয়াল আতফাল ওয়াস সীবিয়ান" নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[২২৩]

সাবুর বিন সাহল

সাবুর বিন সাহল (মৃত্যু ১৫৫ হি./৮৬৯ খৃ.) পারস্য বংশোদ্ভূত আরবীয় চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। কিফতির মতে, তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ সুপন্ডিত ছিলেন এ বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকগুলো গ্রন্থও প্রণয়র করেন। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'আকরাবাদিন' গ্রন্থখানা সবচেয়ে বিখ্যাত। এই গ্রন্থখানা ২২ অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং এর ভিত্তিতেই কিফতির সময় পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান

---

২১৭. এম আাকবর আলী, c¨, ³, পৃ. ১১৭

২১৮. আখতার-উজ-জামান, Ávb-weÁv‡b gmjgvb‡'i Ae'vb, ঢাকা: আনোয়ার বুক হাউজ, জুলাই ২০০৩, পৃ. ২৩২

২১৯. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, c¨, ³, পৃ. ৬৬

২২০. এম আকবর আলী, c¨, ³, পৃ. ১১৯

২২১. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, c¨, ³, পৃ. ৬৬

২২২. এম আকবর আলী, c¨, ³, পৃ. ১৪০

২২৩. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, c¨, ³, পৃ. ৭২

পরিচালিত হত। সারটনের মতে এই গ্রন্থখানা আরব জগতে এই ধরনের গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রথম এবং ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।[২২৪]

আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর রাযী

পাশ্চাত্যের রাজেস্ (Rhazes) নামে খ্যাত আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর রাযী (৮৪১-৯২৬), নবম শতাব্দীর সংস্কৃতি জগতে একজন বিস্ময়কর ব্যক্তি।[২২৫] শুধু তাই নয় তিনি চিরকালের এক মহান ব্যক্তি। বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর অবদান রয়েছে তবে দু'টো বিশেষ শাখায়, রসায়নশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অনবদ্য অবদান তাঁকে শুধু ৯ম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পদেই স্থাপিত করেনি চিরকালের জন্য চিরস্মরণীয় বৈজ্ঞানিক হিসেবে সম্মান দিয়েছে।[২২৬] তিনি মোট ৩৫ বছর চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। Browne এর মতে, `Al-Razi was the most original and respectable physician of Islam. He is the author of worker that is informed by personal knowledge and experience and useful books.

আর রাযীর চিকিৎসা প্রণালী ছিল যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সমধর্মী, সেই রকম তাঁর শিক্ষা প্রণালীও ছিল উন্নত ধরনের।[২২৭] রাযী চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে ১১৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মৌলিক অবদান সম্পর্কে Campble বলেন, He was a great clinical and ranks with Hippocrates as one of the original portrayers of disease. He was the first to introduce chemical preparations into the practice of medicine. His `Liber de variolis et morbillis` is the oldest and most original work on small Pox and Measles and constitute a distinet original contribution to medicine by the Arabians. He was the first to distinguish them one from another and to write a lucid account that was almost modern in its Presentation of clinical detail.`[228]

অধ্যাপক সারটন বলেন, The greatest clinician of Islam and the whole Middle Ages.[229]

আর রাযী হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। Prof Metter এর মতে, তিনি প্রথম শিশু রোগ সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে হিসাবে তাঁকে 'Pediatrics' এর জনক বলা যেতে পারে।[২৩০] শিশু রোগকে তিনি ২৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন। আর রাযী সর্বপ্রথম স্নায়ু দৌর্বল্য মানসিক রোগ হিসাবে Neuropsy Chiatric সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। Intreventicalar Hydrocephalus সম্পর্কে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন। 'কিতাবুল মনসুরী' গ্রন্থে তিনি 'সন্ন্যাস রোগ' ও 'পক্ষাঘাত' সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন, তার মতে, রক্ত ও শ্লেষ্মার জন্যই এ রোগ হয়। তিনি প্রথম সন্ন্যাস রোগের চিকিৎসায়

---

২২৪. এম আকবর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

২২৫. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

২২৬. এম আকবর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬

২২৭. আখতার-উজ-জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

২২৮. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

২২৯. এম আকবর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২৩০. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

ভিজা কাঠি লাগান এবং টাইফয়েডের চিকিৎসায় ঠান্ডা পানির ব্যবহার প্রবর্তন করেন। তাঁর Of Habit Which Become Natural গ্রন্থে বতর্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানে Sherringtons conditional Reflex Theory মতবাদের পূর্বাভাস দেখতে পাওয়া যায়।
ডাঃ ক্যাম্পাবেল তাঁকে বলেন, The most celebarted and probably the most original of the Arabic writers.[231]
গ্রীকরা পারদকে অত্যন্ত বিষাক্ত মনে করতেন কিন্তু রাযীই পারদের মলম প্রবর্তন করেন। বানরের উপর পরীক্ষার পর তিনি এ উদ্ভাবন করেন। আল রাযীর চিকিৎসা গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি যেমন, ‘কিতাবুল হাবী’ ‘কিতাবুল মনসুরী’ ‘জুদরী ওয়াল হাসবাত’ ‘তাফসীমূল ইলাল’ প্রভৃতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সার্জারী বা অস্ত্র চিকিৎসায় তাঁর ছিল অন্ত্যান্ত প্রশংসনিয় হাত।[২৩২]
তাঁর গ্রন্থসমূহের যে সকল ল্যাটিন অনুবাদ আছে তা হলো :

১. The Continens ইহুদী ইবনে ফারাজ অনূদিত, ১২৮০ খৃ.
২. Liber ad-al Monsorem ক্রিমেনার জিরাল্ড, অনূদিত ।
৩. Liber Divisionum ক্রিমেনার জিরাল্ড অনূদিত।
৪. Antidotarim ইহুদী লেখক ইব্রাহীম কালচারী অনূদিত।
৫. De Aegritudinibus proconum জনৈক হিব্রু কর্তৃক অনূদিত।
৬. De Proprietatibus Membrorum et Utititatibus et Nocumentis Animalium Aggregatus ex dictis antequoram অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক হিব্রু থেকে ল্যাটিনে অনূদিত এবং ১৪৯৭ সালে ভেনিশ থেকে প্রকাশিত।
৭. Liber de variolis ET morbillis অনেকগুলো ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ভেনিশ ১৪৯৮ খৃ, ১৫৫৫খৃ. বাসলে থেকে ১৫২৯ খৃ. ১৫৪৪ খৃ. আরজেনটর থেকে ১৫৪৯ খৃ. লন্ডন থেকে ১৭৪৯ খৃ. এবং গর্টনজেন থেকে ১৭৮১ খৃ. প্রকাশিত সংস্করণ অন্যতম। মধ্যযুগে তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়।

আল-রাযী ‘কিতাবুল মনসুরী’ শরীরবিদ্যায় একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থ। ১০ ভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থের আলোচিত বিষয়গুলো হলোঃ এনাটমী ও ফিজিওলজি, মেজাজ, ওষুধ, স্বাস্থ্য রক্ষা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্য, শষ্য চিকিৎসা, বিষজ্বর ও অন্যান্য। এই গ্রন্থেও প্রভাব সম্পর্কে Hakim Mohammed Sayeed প্রণীত Al-Tibb Al. Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে ‘Razis works are held in great respect in the west. Manuscripts of his works are to be found in the Libraries of Asia and Europ. A manuscript was purchased by Cambrige University a few years ago. আর রাযীর ‘কিতাবুল হাবী’ সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। খল্লিকানের মতে, এটি ৩০ খন্ডে সমাপ্ত। পৃথিবীর পুরাকালে চিকিৎসা ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত। Prof. w.A. Greenhill বলেন, Not withstanding defects, the contents of Rhages in Universally admitted to be one of the most contnens of Rhages is Universally admitted to be one of the most valuable and

[২৩১]. এম আকবর আলী, C\/¸ ³, পৃ. ১৪৭
[২৩২]. আখতার-উজ-জামান, C\/¸ ³, পৃ. ২২৭

interesting medical works of antiquity though it might at first sight appear to be one of the most repulsive.[233] চক্ষুরোগ বিশেষ করে Opthalmic surgery-তে তাঁর বিশেষ অবদান আছে বলে সাধারণ মত প্রকাশ করেছেন। আর-রাযীর 'বাররুর সায়াত' গ্রন্থটি ১৭০০ সালে হুসেন জাবির আনসারী ফার্সীতে অনুবাদ করেন দিল্লীর সুলতান আজম শাহের জন্য। মেজর রালফের কথায়, Rhazes and Avenzoar wrote clinical descriptions wrothy of Hippocrates himself.[234] Dr. p. Guigues এর ফরাসী 'La Guerison en une Heure per Rhazes নামে অনুবাদ করেন। এই সব অভিমত থেকেই বুঝা যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানে আর রাযীর স্থান কত উচ্ছ। ১৯৩২ সালে এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পথ্য ও খাদ্য সম্পর্কে আর রাযীর কয়েকটি রচনা হলো 'কায়ফিয়াতিল আগাজী, 'মাকালাতুন ফিল আগাজিয়াতেল মুখতাসের', 'কিতাবু তিব্বুল মূলুকী', 'তারতিব আকলেল ফাওয়াকেহ' রিসাল ফিল মায়ে ওয়াল মুবারববাদ' ইত্যাদি। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান আল হাবী গ্রন্থ।[২৩৫]

মুসা বিন খালিদ

মুসা বিন খালিদ প্রখ্যাত অনুবাদক ছিলেন। তিনি অনুবাদের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছেন।[২৩৬]

আইয়ুব আররাহাবী আবরাশ

গ্রীক ও সিরিয়া ভাষার চিকিৎসা গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করার জন্য তিনি আরব চিকিৎস জগতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। হুনায়েন ইবনে ইসহাকের মতে তিনি গ্যালেনের ৩৫ খানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন।[২৩৭]

হুনায়েন ইবনে ইসহাক: হুনায়েন ইবনে ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খৃ.) পাশ্চাত্য জগতে Johannitius onan এর Hunainus নামে পরিচিত। তিনি খলীফার নিযুক্ত শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন।[২৩৮] ইরাকের 'হিরা' অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদে এসে জিবরাইলের নিকট চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু করেন। হুনায়েন বলেন, আমি লোকের উপকারের জন্যই কাজ করি, লোকের অনিষ্ট করার জন্য চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিনি।[২৩৯] হুনায়েন গ্যালেনসহ অনেক প্রাক-রোমান বিজ্ঞানী তাঁর মাধ্যমে আরবে পরিচিত হন। G.M. Wickens বলেন, The most fomous of the translators of this period was Hunayn ibn Ishaq (809-877) himself a physician with strong attachment to Galen` গ্যালেন ছাড়াও তিনি এরিষ্টটল, প্লেটো, ইউক্লিড, হিপোক্রেটস, আরবাসিয়ন এর গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করেন। অনুবাদ ছাড়াও তিনি শতাধিক

---

[২৩৩]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, c\, ³, পৃ. ৬৮

[২৩৪]. এম আকবর আলী, c\, ³, পৃ. ১৪৭

[২৩৫]. আখতার-উজ-জামান, c\, ³, পৃ. ২২৭

[২৩৬]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, c\, ³, পৃ. ৬৯

[২৩৭]. এম আকবর আলী, c\, ³, পৃ. ১৩৯

[২৩৮]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, c\, ³, পৃ. ৬৯

[২৩৯]. এম আকবর আলী, c\, ³, পৃ. ১৭৭

মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেন।[২৪০] তিনি আরো বলেন, আমার দুই শক্তি; এক হলো আমার ধর্ম আর এক হলো আমার পেশা। আমার ধর্ম আমাকে শত্রুদেরও উপকার করার নির্দেশ দিয়েছে, বন্ধুদের বেলায়তো কথায় নেই। আমার পেশার সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান অনুজ্ঞা হলো লোকের উপকার করা এবং সেই কাজেই বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ো করা। চিকিৎসকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হলো কারুর অপকারের জন্য কোন ওষুধ ব্যবহার না করা।[২৪১] তাঁর পুত্র ইসহাক বিল হুনায়েন, খলীফা আল মুতাজিদের সভাসদ ছিলেন, তাছাড়া অনুবাদক ও গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি প্রসারিত ছিল। তার চিকিৎসা গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'আদাবিয়াতুল মুফরেদাত' কুন্নাশুল খাফ্‌ফা, 'তরীখুল আতিব্বা, অন্যতম। তিনি ৯১০ খৃ. বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

সাবেত বিন কুরা

সাবেত বিন কুরা মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের অন্যতম প্রতিনিধি। চিকিৎসাবিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রজ্ঞার কথা সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেন।[২৪২] কিফতী, ইবনে আবি ওসাইবিয়া দুই জনেই তাঁর কয়েকটি অত্যাশ্চর্য চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছেন।[২৪৩] তিনি প্রায় ১২৮টি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁর অনেক গ্রন্থ ল্যাটিনে অনূদিত হয়। তিনি ২৮৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আলী ইবনে আব্বাস

মধ্য যুগের ইউরোপে চিকিৎসা জগতে আর রাযী, ইবনে সিনার মতো বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ হিসেবে আলী ইবনে আব্বাস পরিচিত হন। তাঁর পুরা নাম আলী ইবনুল আব্বাস আলমাজুসী। বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলী ইবনে আব্বাসের 'কিতাবুল মালিকী' তাঁকে অমর করে রেখেছে।[২৪৪] তাঁর প্রকাশিত কিতাবুল মালিকিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক চিকিৎসা প্রথা ও ওষুধ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[২৪৫] ১৪৯২ সালে ভেসিলে ষ্টিফেন কর্তৃক ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়।`Tractatus de Medicina- ৩ খন্ডে বিভক্ত; প্রতিটি খন্ডের নাম যথাক্রমে Liber Saritates, Liber Morbi এবং Liber signorum. এই গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদকের পান্ডুলিপি Gottingen লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। ১৮৭৭ সালে এটি কায়রো থেকে দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়। আলী ইবনে আব্বাসের শ্রেষ্ঠ অবদান 'কিতাবুল মালেকী'-'কামিনুস সানাআত' নামেও পরিচিত। সৌভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থের অনেকগুলো পান্ডুলিপি পাওয়া যায়। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে লায়ন্‌স সংস্করণের পর Michael de Capella, Liber Tolius medicinae necessaria Continens, guem Haly filus Abbas editit regiqul inscripsit under regalis dispositions nomen assumpsit নামে পুনঃপ্রকাশ করেন। ২০ খন্ডে বিভক্ত এই বিশাল গ্রন্থটির প্রথম ১০ খন্ডে তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে এবং শেষ ১০ খন্ডের ব্যবহারিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২য় ও ৩য় খন্ডে রয়েছে এনাটমী সংক্রান্ত রচনা। Dr. R. Konning লিভেন থেকে ১৯০৩ সালে এই দুই খন্ডের

---

[২৪০]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, c৷¸ ³, পৃ. ৬৯
[২৪১]. এম আকবর আলী, c৷¸ ³, পৃ. ১৭৮
[২৪২]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, c৷¸ ³, পৃ. ৬৯
[২৪৩]. এম আকবর আলী, c৷¸ ³, পৃ. ২৫১
[২৪৪]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, c৷¸ ³, পৃ. ৬৯
[২৪৫]. এম আকবর আলী, c৷¸ ³, পৃ. ৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

Trais traits d`anatomic Arabes নাম দিয়ে ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন। বইটির ১৯ তম খন্ডের ১১০টি অধ্যায়ে সার্জারী নিয়ে বিস্তারিত লেখা রয়েছে। রোগের উপসর্গ, কারণ ও চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে আলী ইবনে আব্বাস পূর্বেকার চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সাথে সমসাময়িক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরেন। ফলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অমূল্য ইতিহাসও এতে সংযোজিত হয়েছে। তাঁর সার্জারী সম্পর্কে আলোচনা করা সম্বন্ধে Mettler বলেন, আলী ছিলেন সুদক্ষ শল্যবিদ, যিনি ব্যন্ডেজ ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি ক্যান্সারের অপারেশন করেছেন। সার্জারী ছাড়া শুদ্ধ চিকিৎসা বিষয়ে তিনি পথ্য, মেটিরিয়া মেডিকা নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনায় রোগ নিবারক হিসাবে বারবার বমন করানোর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ওষুধ ব্যবহারের নিজস্ব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে নারকেল ব্যবহার। একজিমা, পাঁচড়া, মেছতা, গোদ, কুষ্ঠ, বসন্ত, হাম, ইরিসিপিলাস নিয়েও বিশদ আলোচনা তিনি করেছেন। যৌন বিষয়ক পদ্ধতিতে তিনি নিজস্ব স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাপক সারটনের মতে, আলী ইবনে আব্বাসের গ্রন্থেই Capillary System এর প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তিনি তীক্ষ্ণ নিরীক্ষক ছিলেন, যেমন তাঁর মতে, সন্তান প্রসবের সময় জরায়ুর গতিময় আবেগে সন্তান আপনি বেরিয়ে আসেনা ঠেলে বের করে দেয়।[২৪৬] তিনি ৯৯৪ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল কাসেম খালাফ আল জাহরাবী

স্পেন থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যাঁরা বাগদাদ গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে চিকিসা বিজ্ঞানে যাঁরা শীর্ষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন আবুল কাসেম সবদিক দিয়ে তাঁরে অগ্রগণ্য। ঐতিহাসিক হিট্টির মতে স্পেনের আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যবিদ।[২৪৭] ইউরোপে স্পেনীয় খৃষ্টানরা শব ব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল ছিলেন। তাদের কাছে এটা অধার্মিকতা ছিল। পোপ ৮ম বেনিকস ১২৯৯ খৃ. এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেন এবং এনডিয়াস ভেসাসিয়াল (১৫১৪-১৫৬৪) একটি শব-ব্যবচ্ছেদ করায় ইস্কুইজিশন তাকে পুড়িয়ে মারার জন্য রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইউরোপে তখনও মান্ধাতার যুগে নিমজ্জমান। স্পেনে মুসলমানদের আগমনে এখানে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা হয়। সার্জিকেল বিদ্যা ধর্ম নষ্টের কারণ যারা বলত সেই সেখানে জন্ম গ্রহণ করেন মুসলিম স্পেনের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল কাসেম খালাফ আল জাহরাবী (৯৩৬-১০১৩) ইউরোপে 'বুকাসিস' আল 'জাহারভিয়াস' ইত্যাদি নামে পরিচিত সমগ্র স্পেন তথা ইউরোপে সার্জিকেল বিদ্যা তিনিই সর্বপ্রথম প্রচলন করেন। হিট্রির মতে, স্পেনের আরব চিকিৎসাবিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যবিদ।' তাঁর খন্ডে গ্রন্থ 'আত্ তাসরীফ ২ খন্ডে সমাপ্ত এবং ৩০টি অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত। প্রথম খন্ডে এনাটমী, ফিজিওলজী ও ডায়টিটিকস সম্পর্কে এব শেষ খন্ডে সার্জারী সম্পর্কে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। শেষ খন্ডটিই এ বিষয়ে লিখিত সর্বপ্রথম সচিত্র শল্যবিদ্যা গ্রন্থ।[২৪৮] বইটিকে সারটন `Medical Encyclopedia' নামে অীভহিত করেছেন। গ্রন্থের সব খানেই রয়েছে মৌলিকতার ছাপ। আবুল কাসেম আজ্ জাহরাবীর গ্রন্থেও সার্জারী অংশটি বহুবার বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। জিরার্ড মূল

[২৪৬]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C৷¸ ³, পৃ. ৭০
[২৪৭]. এম আকবর আলী, C৷¸ ³, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮
[২৪৮]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C৷¸ ³, পৃ. ৭২

আরবী পাঠসহ 'De Chirurgia' নামে ল্যাটিনে প্রথম অনুবাদ করেন, এটি Salerno Montepeliar বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক শতাব্দী যাবত পাঠ্য ছিল। গ্রন্থে ২০০ প্রকার সার্জারির যন্ত্রপাতির ছবি পরবর্তীতে ইউরোপের সার্জারীর যন্ত্রপাতির নমুনা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ড. ক্যামপবলের মতে, এটি খুবই প্রভাবশালী গ্রন্থ এবং ৫ বছর পরপর ল্যাটিনে অনূদিত হয়। ইউরোপের The Restorer of Surgery নামে পরিচিত Guy de Chaulie তাঁর গ্রন্থে ২০০ বার আবুল কাসেমের (Albucasis) প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তাছাড়া Roger of parma Lanfrance, Salicate প্রমুখ তাঁর গ্রন্থ থেকে ঋণ স্বীকারপূর্বক বহু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

আবুল কাসেমই সর্বপ্রথম স্পেনে তথা ইউরেপে বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার্জারীর প্রচলন করেন। তাঁর আততাসরিফ গ্রন্থের মারফত গ্রন্থের পুরা নাম 'কিতাবুল তাসরিফ লেমান আজিয়া আনিল তাআলিফ'।[২৪৯] আবুল কাসেমের 'আত তাসরীফ' নানা কারণে ইউরোপে অপরিহার্য সার্জিকেল গ্রন্থ। "আবুল কাসিমের প্রকাশ ভঙ্গিও মহিমায় গ্যালেনের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয় পেড়ে।[২৫০] তাই ইউরোপে যখন বিজ্ঞানের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে এবং আত্ তাসরিফের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে তখনও ইউরোপে সার্জারীর মান বিশেষভাবে উন্নত হয়।"এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী সমগ্র পৃথিবীতে মৌলিক অবদানের কারণে যতুটুকু খ্যাতি পাওয়ার যোগ্য ছিলেন ততটুকু পাননি। একটি কারণ তৎকালে সার্জারী সম্পর্কে ধর্মীয় রক্ষণশীল সমাজের বাঁকা দৃষ্টি অন্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দীপ্যমান শিখা ইবনে সীনার আবির্ভাব।

সচিত্র যন্ত্রপাতির উল্লেখ 'তাসরীফের' বিশিষ্টভাবে অন্য প্রধান দিক। ড.এম. আবদুল কাদের বলেন, আরব নবজাগরণের পূর্বেও অল্প কয়েকটি চিত্র পাওয়া গেছে সত্য, কিন্তু আবুল কাসিমের পূর্বে অস্ত্রোপচার যন্ত্রেও চিত্রাঙ্কনের অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই নব প্রবর্তনের জন্য বিজ্ঞান স্পেনীয় মুসলমানদের নিকট ঋণী"। আবুল কাসেমের লিখিত গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পান্ডলিপি ইউরোপের গোথা, অক্সফোর্ডের Bodlein, প্যারিস, ফ্লোরেন্স, Bamberg, Francaise, মন্টেপেলিয়ার ভেনিস রক্ষণাগারে সুরক্ষিত আছে। ১৪১৭ খৃ. Liber Servitoris Sive Liber নাম দিয়ে ভেসিল থেকে সার্জারী অংশ প্রকাশিত হয়। ১৪৯৭ খৃ. Chirurgia Parva নাম নিয়ে ভেনিশ থেকে আরেকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং পরে একাধিক সংস্ককরণ বের হয়। ১৫৩২ খৃ.Schott-এর অনুবাদে Strassburg থেকে প্রকাশিত হয় এই নামে Albucasis methodus mehendi cum instruments Oxford থেকে প্রকাশ করের্ন Albucasis de Chirugia; এই অনুবাদের একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ১৮৬১ খৃ. Lucien Le Clere কর্তৃক ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয় প্যারিস থেকে।

আবুল মোতারিফ আবদুর রহমান বিন মোহাম্মদ ওয়াফিদ আল আযমী

এ সময়ে স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ইউরোপে যিনি Abengufit নামে পরিচিত, আবুল মোতারিফ আবদুর রহমান বিন মোহাম্মদ ওয়াফিদ আল আযমী। ৯৯৭ খৃ. টলেডোতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০৭৪ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সাধারণ ওষুধ ব্যবহার করতেন এবং তাও অতি সাবধানে ও কদাচিৎ। তাঁর 'কিতাবুল আদবিয়াত আল মুফরাদাত' এখনও

---

[২৪৯]. এম আকবর আলী, C\, ³, পৃ. ৩৩৯

[২৫০]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C\, ³, পৃ. ৭৩

অমুদ্রিত কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ ল্যাটিনে অনূদিত। ১৫৩১ খৃ. Tacuin Sanitate ও Alkindus প্রকাশিত ও বহুবার মুদ্রিত। ইবনুল ওয়াফিদ balneotherapy বিষয়েও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন যা ল্যাটিনে অনূদিত হয়েছিল।

আবুল কাসেম আম্মার বিন আলী আল মওসুলী

পাশ্চাত্য Canamusali নামে পরিচিত ইরাকের চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল কাসেম আম্মার বিন আলী আল মওসুলী খলীফা আল-হাকিমের (৯৯৬-১০২০ খৃ.) রাজত্বকালে খ্যাতি লাভ করেন। চক্ষু চিকিৎসা বিশেষ করে চোখের ছানি অপারেশনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। চক্ষু চিকিৎসার ব্যাপারে তাকে মুসলিম জগতের সর্বপ্রথম মৌলিক চিকিৎসাবিদ বলা হয়। সারটনের মতে, The most original of Muslim occulist, চোখ অপারেশনে তাঁর দক্ষতা আলী ইবনে ঈসা সমসাময়িক কালে আবির্ভূত না হলে খুবই খ্যাতি লাভ করতো তবুও আম্মার বিন আলীর দান মৌলিক। এগুলোর বক্তব্য সেটাই প্রমাণ করে- Ammar bin Ali in most unusually overshadowed by his contemporary, the more famous but less original Ali Ibn Isa.
'কিতাবুল মনতাখাব ফি এলাজিল আইন' আম্মারের চোখের রোগ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপাচারের বিশিষ্ট রচনা। চোখের ছানি অপারেশনে তিনি শোষণ করে নরম ছানি তুলে ফেলার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তিনি একটি ফাঁপা সূচ Selerotic এ ঢুকিয়ে দিয়ে শোষণ করে লেন্স তুলে নিতেন। এতে anterior Chamber- এ কোন ছিদ্র করবার দরকার হতো না এবং জলীয় পদার্থ নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। বলা বাহুল্য, ১৯ শতকে ইউরোপে এ প্রথাই পুনরাবিষ্কৃত হয়। এলগুড বলেছেন : 'Europe rediscovered the principle in the nineteenth Century : আম্মার চোখের Anatomy, pathology এর চোখের ৬ প্রকার ছানি ও পীড়া নিয়ে মৌলিক চিন্তা উপহার দিয়েছেন। Nathan-hq-Miati ১৩ শতকের শেষদিকে হিব্রুতে 'এলাজিল আইন' অনুবাদ করেন। জার্মান ও ল্যাটিন ভাষায় ও অনেক অনুবাদ বের হয়। তাঁর অন্য চিকিৎসা গ্রন্থটি হল 'মুনতাখাব ফি এলমিন আইন ওয়া আলালেহা ওয়ালাদাওলাতেই বিল আদবিয়াতিল হাদীদ।'

ইবনুল হাইছাম

প্রখ্যাত মুসলিম পদার্থবিদ ও গণিতবিদ ইবনুল হাইছাম চক্ষু চিকিৎসার ব্যাপারে এক যুগপৎ সৃষ্টি করেছেন। Physics ও mathematics তাত্ত্বিক জ্ঞানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, তিনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করেন। চোখের এনাটমী পরীক্ষা করে তিনি Scleroid, Cornea, Choroid, Iris প্রভৃতির পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি চোখের retina, optic nerve এর কাজ, চোখের দুই রসের জলীয় (aqueous) এবং স্বচ্ছ (Vilreous) কাজ প্রভৃতি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।
বর্তমানে 'Lens-' ইংরেজী শব্দটি ইবনুল হাইছামের আরবীতে ব্যবহৃত 'আদাসা' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আদাসা' অর্থ মসুরের ডাল, চোখের লেন্স মসুরের ডালের মত biconvex, ল্যাটিন অনুবাদকরা এই আদাসাকে তাই Lenticulum বলে অনুবাদ করেন। এই শব্দটি আজ Lens নামে পরিচিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল হাইছামের তাত্ত্বিক মতবাদ প্রযুক্তির মাধ্যমে চশমা আবিষ্কারে সাহায্য করে বলে তিনি চশমা আবিষ্কারের আদি পুরুষ। হিট্টির বলেন, In certain experiments he approaches the theo-retical discovery of magnifying gflasses which was actually made in Italy Three centuries later.[251]

আবুল হাসান আলী ইবনে রেজওয়ান আল মিশরী

১১শ শতাব্দীর মিসরের অন্যতম খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ আলী ইবনে রেজওয়ান। আবুল হাসান আলী ইবনে রেজওয়ান আল মিশরী (জন্ম ৯৮৮-মৃত্যু ১০৬০) ইউরোপে Hally Even Rodan বা Rodohan নামে পরিচিত।[২৫২] আল কিফতী তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা পোষন করতেন। তিনি বলতেন, আলী ইবনে রেজওয়ান মোস্তান শেরের আমলে মিসরের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বহুকাল মিসরে অধ্যায়ন ও অধ্যাপনায় কাটিয়েছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োগ তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রকেলম্যান ২৭টি এবং আবি উসায়বিয়া তাঁর ৮৪টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। হিজরী ৪৬০ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।[২৫৩]

আবু রায়হান আল বিরুনী

৩৬২ হিজরীর ৩ জিলহজ্জ মোতাবেক ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার খাওয়ারিজমের শহরতলীতে আবু রায়হান আল বিরুনী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুনী।[২৫৪] ১১শ শতাব্দীর যে সব মনীষীর অবদানে পৃথিবীর সভ্যতা সংস্কৃতির কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে আল বেরণী তাঁদের অন্যতম। তিনি ১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবাহে নতুন প্রণ সঞ্চার করেন। লোকে যাতে সহজে ওষুধ চিনতে পারে সেজন্য তিনি তাঁর বহু ভাষার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ওষুধের নামের একখানা গ্রন্থ্য রচনা করেন। এতে তিনি ফার্মাসী বিষয় নিয়ে লিখেছেন। হামারনেহ বলেছেনঃ The introduction represents a Masterpice of noteworthy pharmaceutical literary accomplishment. It is a mon- umental contribution not only for this medieval Arabic period but to the history of pharmacy for all times.[255] তিনিই সর্বোপ্রথম প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ করে ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অধ্যাপক মাপা বলেন, আল বিরুনী শুধু মুসলিম বিশ্বেরই নয় বরং তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি।[২৫৬] তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী। এ মনীষী ৬৩ বছর বয়সে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। আস্তে আস্তে তিনি দূর্বল হয়ে পড়েন। কোন চিকিৎসাই তাঁকে আর সুস্থ করে তোলা যায়নি। অবশেষে ৪৪০ হিজরীর ২ রজব ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার ৭৫ বছর বয়সে আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুনী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

---

[২৫১]. এম আকবর আলী, C¦¸ ³, পৃ. ৩৭৫
[২৫২]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¦¸ ³, পৃ. ৭৬
[২৫৩]. এম আকবর আলী, C¦¸ ³, পৃ. ৩৭৬
[২৫৪]. মাইকেল এইচ. হার্ট, C¦¸ ³, পৃ. ৫৮
[২৫৫]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¦¸ ³, পৃ. ৭৬
[২৫৬]. মাইকেল এইচ. হার্ট, C¦¸ ³, পৃ. ৫৮

আবু আলী আল-হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সীনা

মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ইতিহাসে যে দুই জন মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানীর প্রতিভা আজো পৃথিবীর কাছে মধ্যহ্ন সূর্যেও মতো দেদীপ্যমান তাঁরা হলেন আল রাজী এবং ইবনে সীনা। ইবনে সীনা বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখায় অপরিহার্য মৌলিক অবদান রেখেছেন তবে তার সবচেয়ে বেশী খ্যাতি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দর্শনে। গ্যালেনকে বলা হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষক; আর ইবনে সীনাকে বলা হয় 'মুয়াল্লেমা সানী' বা দ্বিতীয় শিক্ষক।

আবু আলী আল-হুসাইন বিন আবদুল্লাহ ইবনে সীনা (৯৮০-১০০৩৭) পাশ্চাত্যে `Avicena` নামে পরিচিত। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবনের শুরু করেন এবং বুখারার সামনীয় সুলতান নূহ বিন মনসূরের (৯৭৬-৯৯৭) ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। মাত্র ২১ বছর বয়সে ইবনে সীনা বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান চিকিৎসা বিশ্বকোষ 'আল কানুন ফিত্তীব্'।[২৫৭] এছাড়া এ বিষয়ে তিনি আরো ১৫টি পুস্তক রচনা করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা বাকি ছিল না যা তিনি জানেন না।[২৫৮]

ইবনে সীনার 'কানুন' প্রাচ্য-প্রাশ্চাতের অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রন্থ। একাদশ শতাব্দী হতে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৫টি শতাব্দীরও বেশী সময় কানুনের ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত ছিল। A.C. Crombie বলেন, It saw many Latin editions, fifteen during the last thirty years of the fifteenth Century and father twenty during the sixteenth century. Several more printed in seven-teenth century. বলা হয়েছে কানুন হল মেডিকেলের বাইবেল।[২৫৯] Osler এর কথায়- Canon remained a Medical Bible for a longer Period than any other work. গ্রন্থটি ৫ খন্ডে বিভক্ত। গ্রীক, রোমান, ভারত ও চীনা চিকিৎসা পদ্ধতির সার সংগ্রহ করে এই বৃহৎ চিকিৎসা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খন্ডে ৭৫০টি গুল্ম, প্রাণীজ ও খনীজ ওষুধের বর্ণনা দিয়েছেন। তন্মধ্যে অনেকগুলো ওষুধ এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৮০০ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত এই খন্ডে প্রত্যেকটি ওষুধের পরিচিত, ব্যবহারের পরিমাণ, কার্যকারিতা, কোন্ কোন্ রোগে কোনটি ব্যবহার্য, বিকল্প ওষুধ ইত্যাদিও বিস্তারিত প্রদান করেছেন। প্রথম খন্ডে রয়েছে Physiology এবং Hygiene এর সাধারণ মূলনীতি নিয়ে আলোচনা।

'কানুন'-এর তৃতীয় খন্ডে, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতঙ্গের রোগ, সেগুলোর Symptom, Diagnosis, Prognosis, চিকিৎসা এবং Etiology সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন ইবনে সীনা। মাথার রোগ যেমন, মাথাধরা, মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক তাপ, মৃগী, অবশতা, চোখ, কান, নাক, গলা ও দাঁতের অসুখ; হৃৎপিন্ড অস্বাভাবিক তাপ, মৃগী, অবশ্যতা, চোখ, কান, নাক, গলা ও দাঁতের অসুখ; হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের রোগ, গর্ভধারণ ও স্ত্রীরোগ ছাড়াও পেশী, ছাড়াও পেশী, সন্ধিস্থান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। চক্ষু রোগ সংক্রান্ত অংশ ১৯০২ সালে Hirchberg এবং Lipperst জার্মান ভাষায় 'Die Augenheilkunds des Ibn Sina নাম দিয়ে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির ৪র্থ খন্ডে জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া,খাদ্যের অনিয়ম, ক্রোধ, ভয়, বেদনা, প্রদাহ, পচন, শারীরিক রসের গোলমাল,

---

[২৫৭]. আখতার-উজ-জামান, CÖ¸ ³, পৃ. ২২৪

[২৫৮]. মাইকেল এইচ. হার্ট, CÖ¸ ³, পৃ. ৬৩

[২৫৯]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, CÖ¸ ³, পৃ. ৭৭

মহামারী,বসন্ত, যক্ষ্মা, ফোড়া,কুষ্ঠ,ঘা, হাড়ভোঙ্গা, স্থানচ্যুতি, আলসার, খনিজ উদ্ভিদ ও প্রাণীজ পদার্থেও বিষক্রিয়া, সৌন্দর্য প্রসাধনী, চুল, নখ, চর্ম, গাত্রগন্ধ, লিউকোডারমা, পেডিকেলোসিস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৫ম খন্ডে বিভিন্ন রোগের ওষুধের ব্যবস্থাপত্র বড়ি, পাউডার ও সিরাপ ইত্যাদি তৈরী করা নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। সম্প্রতি যে গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়েছে ইবনে সীনার, তা থেকে জানা যায়, তিনি বর্তমানে যা Pscho-therapy নামে পরিচিত তার সূত্রপাত করেন। কোটায়সের মতে, `Avicenna was perhaps one of the first to state the intimate relations which exist between Psychology and medicine and in his treatment of disease he kept in sight always the psychological element so important to hasten a cure or prevent a crisis.[260] দিল্লীর জমিয়া মিল্লিয়া লাইব্রেরীতে ইবনে সীনার একটি গ্রন্থেও পান্ডুলিপি পাওয়া যায়। পাটনা, বাঘপুর এর বৃটিশ মিউজিয়ামেও এ পান্ডুলিপির কপি পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে হার্টের রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে মৌলিক পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে।

হাকিম আবদুল লতিফের ভাষায়; 'Avicenna's researches on 'Heart drugs' are most original and I belive are still capable of revolutionizing our ideas on Heart Therapy'এতে মানুষের বিভিন্ন মানসিক অবস্থান যেমন ক্রোধ দুশ্চিন্তা, আনন্দ, স্নেহ ও অন্যান্য অনুভূতি মানুষের হার্টের এবং রক্তের উপাদানের কাজের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ওষুধ হার্টে কি রকম কাজ করে এবং সেসব কোন অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে তারও আলোচনা করেন। মোটকথা, মানুষের নৈতিক গুণাবলী আত্মার সাথে মিলিত হয়ে কিভাবে হার্টের উপর কাজ করে তা প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। হার্টের অসুখের জন্য তিনি কতগুলো ওষুধের বিবরণ দিয়েছেন, তন্মধ্যে মদের দোষ, মুক্তা ও রেশমের গুটি, কাবুলী, আমলীক লাল কোরাল, আম্বর, কর্পূর, গোলাপ পানি, সুগন্ধি, সুমিষ্ট ভেষজ, গাওজরানের পাতা এবং লাজওয়ারদ ইত্যাদি উপকার অন্যতম। আজও মরক্কো থেকে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে হাকিমরা ইবনে সিনার প্রেসকিপশন অনুযায়ী দূরারোগ্য রোগের ব্যবস্থা দেন।[২৬১]

চিকিৎসা বিজ্ঞানে রাজী এবং ইবনে সীনা দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে পন্ডিতগণের মতে বিতর্ক দেখা যায়। তবে সেদিকে না গিয়ে বলা যায়, ইবনে সীনার অবদান প্রধানত তাত্ত্বিক বিষয়ে আর রাজীর অবদান প্রধানত ব্যবহারিক ক্লিনিকসে।

ইউরোপে চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে ইবনে সীনার প্রভাব অসামান্য। Encyclopaedia Britania তে টমাস ক্লিফোর্ড উল্লেখ করেছেন, 'ইবনে সীনার 'কানুন' হিপোক্রোটস ও গ্যালেনের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে।' ক্রিমোনার জিরার্ড এটি ল্যাটিন অনুবাদ করেন এবং কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের চিকিৎসা শাস্ত্রের পথ প্রদর্শক হিসাবে পরিগণিত ছিল। ঐতিহাসিক কে. আলী বলেন, 'বর্তমান কালেও এটি ইউনানী পদ্ধতির মুখ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে এর ১৫ টি ল্যাটিন ও একটি হিব্রু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতএব এর জনপ্রিয়তা কোন গ্রন্থ এত বেশী পঠিত হয় নাই। ইতালীয় কবি দান্তে ইবনে সীনার উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। পশ্চিমাঞ্চলে ইবনে সীনা এত বেশী

[২৬০]. C\, 3, পৃ. ৭৮

[২৬১]. আখতার-উজ-জামান, C\, 3, পৃ. ২২৪-২২৫

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয় ছিলেন যে, এখনও প্যারিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিরাট হল ঘরে তাঁর প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে।

ইবনে সীনার মতে, শরীরের ৬টি বিষয় নিরীক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করা যায় তা হলোঃ ১. অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম। যথাঃ দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়া, বদহজম ইত্যাদি, ২. বেদনার স্থান ও তীব্রতার পরিমাণ, যেমন ডান দিকের বেদনা যকৃতের এবং বাম দিকের বেদনা প্লীহার অস্বাভাবিকতার জন্য হয়, ৩. মলমূত্রের স্বাভাবিক ব্যতিক্রম অর্থ্যাৎ কোষ্ঠ-কাঠিন্যতা, উদরাময় ইত্যাদি, ৪. শরীরের ফুলা দেখে কারণ নির্ণয়, যেমনঃ ইরিসিপ্লাস ঘন পিত্তরসের উপস্থিতির নিদর্শন, আর শক্ত ফুলা কাল পিত্তরসের ৫. আকৃতি ও পারস্পরিক সম্বন্ধ, ৬. এবং বিশেষ কোন উপসর্গ যা থেকে প্রত্যক্ষ রোগ নির্ণয় করা যায়। এজন্য নাড়ী পরীক্ষা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইবনে সীনার মতে, পুরুষের বাম হাত এবং মহিলার ডান হাতের নাড়ী দেখতে হবে। প্রস্রাব পরীক্ষার ১৭টি ধাপ ও অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে মল পরীক্ষায় ইহার রং, পরিমাণ, উপরকার ফেনা, মলের ঘনত্ব, বায়ু নিঃসরণ বিষয়গুলো দেখতে হবে।

আবু সাঈদ উবায়দুল্লাহ

বখত ইয়াশু পরিবার মধ্যযুগের মুসলিম চিকিৎসার জগতে ৩ শত বছর ধরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আবু সাঈদ উবায়দুল্লাহ (মৃত্যু ১০৫৮ খৃ.) এ বংশের সর্বশেষ চিকিৎসা বিজ্ঞানী। পরিবারের সবাই খৃষ্টান ধর্মে অটল ছিলেন। আবু সাঈদ অনেকগুলো চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন।

আবু হাসান আলী ইবনে আবিল ইবনে নাফিস আল মিশরী

ফুসফুসের গঠনতন্ত্র আবিষ্কারক মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু হাসান আলী ইবনে আবিল ইবনে নাফিস আল মিশরী (মৃত্যু ১২৮৮/৮৯ খৃ.) ইবনে নাফিস নামে সমধিত পরিচিত। পূর্ববর্তী খ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ভাষ্য রচনা ছাড়াও চক্ষু রোগ ও ওষুধ বিষয়ে দুটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্যালেন ও ইবনে সীনার মত বিজ্ঞানীদের দুঃসাহসী প্রতিবাদ করে তিনি রক্ত চলাচল সম্পর্কে তাঁর মতামতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অবিসম্বাদিত মতামত যে, শিরার রক্ত (Vinous Blood)-এর দৃশ্য বা অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে ডান দিক দিয়ে থেকে বাম দিকের হৃত প্রকোষ্ঠ চলাচল করেনা বরং এ সময়েই ধমনী শিরার (Vinous Artery)-ভিতর দিয়ে ফুসফুসে পৌঁছায়, সেখানে বাতাসের সাথে মিশ্রিত হয়ে শিরার ধমনীর (Arterious Vein) মধ্য দিয়ে বাম দিকের হৃৎপৃষ্ঠের যায় এবং সেখানে এ জীবন তেজ (Vital Sprit) গঠন করে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে নাফিসের মতবাদ পুরোপুরি মেনে নেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি কোন স্বীকৃতি পাননি। কেননা ১৯২৪ খৃ. পূর্বে তার এই অবদানের কথা জানত না। ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী William Harvey (1578-1657) এই মতবাদের বর্তমান কৃতিত্বেও অধিকারী। মিশরের বিজ্ঞানী ড. মহীউদ্দীন আত্ তাবায়ী তাঁর ডক্টরেট থিসিসে নাফিসের এই অবদানের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন।[২৬২] ইবনে নাফিসের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আল মুজীয্ ফিত্ তীব' শামিল ফি সিনায়াত তিব্বীয়া' 'আল মুখতার মিনাল আগাজিয়া', 'মুহাজজিব ফিল কুহল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

[২৬২]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, cÖ¸ ³ , পৃ. ৮২

কুস্তা বিন লুকা

কুস্তা বিন লুকা চিকিৎসা শাস্ত্রে অবদান রাখেন অংকের মতো। তার ৭০ টির মতো গ্রন্থ রয়েছে। মূসা বিন খালিদও প্রখ্যাত অনুবাদক ছিলেন। তাবারীস্তানের আহমদ আত্ তাবারী, আলী ইবনে আব্বাস অন্যতম চিকিৎসা বিজ্ঞানী।

আলী ইবনে ঈসা

১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে ৪ জন বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় আলী ইবনে ইসা তাঁদের অন্যতম।[২৬৩] আলী ইবনে ঈসা চক্ষু চিকিৎসকদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ।[২৬৪] ইউরোপে তিনি Jesu Haly নামে পরিচিত। হিট্টির মতে, মধ্যযুগে আরব চিকিৎসা জগতে ৩২টি চক্ষু বিষয়ক রচনার মাঝে আলী ইবনে ঈসার 'তাজকিরাতুল কাহ্হালিন' সর্ব প্রাচীন ও সম্পূর্ণতম গ্রন্থ।[২৬৫] এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এলগুড বলেন : His Book is the most complete text book on eye diseased which the Arab School Produced, besides being the most origina of all the early treatises written on the subject.[266] তিন খন্ডে বিভক্ত উক্ত গ্রন্থেও একটি প্রাচীন পান্ডুলিপি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ১ম খন্ডে চোখের বহির্দেশের রোগ সম্পর্কে এবং ৩য় খন্ডে চোখের অন্তর্ভাগের রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বর্তমানে Opthalmoscope এবং চোখের retina ও ভিতরকার বিশ্লেষণ, চক্ষু চিকিৎসায় যে বিপুল পরিবর্তন এনেছে তখনকার দিনে তা ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানে কল্পনারও বাইরে। তারা তখনও ভাবতে পারতেন না যে চোখের অন্তর্ভাগের পরিক্ষায় বহুমূত্র, কিডনী রোগ cerebral tumour ইত্যাদি রোগের কথা সহজেই ধরা পড়ে। আলী ইবনে ঈসা সে সময়েই এসব ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন। তাঁর মতে, চোখের দৃষ্টিহীনতা পেটের কোন রোগের বা মস্তিষ্কের কোন রোগের জন্যও হতে পারে। তিনি তাঁর গ্রন্থে ১৩০টি চোখের রোগের সুনিপুণ বর্ণনাসহ ১৪৩টি ওষুধের উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ছিল পাশ্চাত্য চক্ষু চিকিৎসার ভিত্তি। Metter বলেন, এ গ্রন্থের অনুবাদ ইউরোপে ৭ শত বছর ধরে পাঠ্য ছিল। হিব্রু, ল্যাটিন ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় এটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ইয়াহিয়া ইবনে ঈসা ইবনে আলী ইবনে জাযলা

ল্যাটিন অনুবাদের কারিশমার Bengesla, Buhaylgyh, Beyengezle নামে পরিচিত। অধ্যাপক সারটনের মতে তাঁর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না তবে তিনি ১০৭৪ সালে পরিণত বয়সে খৃষ্টান ধর্মে ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ১১০০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[২৬৭] তিনি দরবারী চিকিৎসক ছিলেন। ইবনে জাযলা অনেক গুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তবে, তার মধ্যে দু'খানা প্রধান। 'কিতাবু তাকযীমূল অবদান' ও 'মিনহাজুল বায়ান ফি মা ইয়াসতামালাহুল ইনসান' তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক।[২৬৮] ডাঃ এলগুডের মতে, জাযলার গ্রন্থ ইবনে বুতলানের গ্রন্থের চেয়ে বহুগুণে

---

২৬৩. এম আকবর আলী, C¨, ³, পৃ. ৪৪৭
২৬৪. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¨, ³, পৃ. ৭৯
২৬৫. এম আকবর আলী, C¨, ³, পৃ. ৪৪৮
২৬৬. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¨, ³, পৃ. ৭৯
২৬৭. এম আকবর আলী, C¨, ³, পৃ. ৪৫১-৪৫২
২৬৮. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¨, ³, পৃ. ৭৯

শ্রেষ্ঠ।[২৬৯] তিনি জ্বার, চর্মরোগ ও রোগের পূর্বাভাস নিয়ে আলোকপাত করেছেন। স্ত্রীরোগ বর্ণনায় তিনি তখনকার দিনেও জন্ম নিয়ন্ত্রেণের ব্যাপারে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। সে সময়ে কোন ডাক্তার এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। বহু অনূদিত 'তাকবিম' গ্রন্থে ৩৫২টি রোগ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

সাঈদ ইবনে হিবাতুল্লাহ

সাঈদ ইবনে হিবাতুল্লাহ (১০৪৪-১১০৪খৃ.) ছিলেন খলীফা আল মুকতাদিরের চিকিৎসকমন্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা গ্রন্থ 'Discoures on The Creation of Men' প্রধানত প্রজনন, গর্ভধারণকাল, প্রসব পুষ্টিসাধন, মৃত্যু ও ক্ষয় ইত্যাদি নিয়ে রচিত।[২৭০] তিনি তাঁর গ্রন্থের ৫০ পরিচ্ছেদে মননবিদ্যা (Phychology) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৭১] ব্রকেলম্যান তার ৭ খানা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে মনসুর জুরজানী

মুহাম্মদ ইবনে মনসুর জুরজানী 'জরিন দাস্ত' তথা শল্যবিদ্যায় 'স্বর্ণহস্ত' উপাধিপ্রাপ্ত।[২৭২] তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সুনিদ্রিষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে, ধরে নেওয়া হয় তিনি ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যের সেলজুক শাসক শাহের আমলে (১০৭২-১০৯২) সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৩৫-৩৬ মতান্তরে ১১৩৬-১১৪০ সালের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।[২৭৩] তিনি ফরাসী ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সীনার কানুনের মতো একখানা বিরাট ও বিষদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চক্ষু চিকিৎসায় তাঁর গ্রন্থ নূরুল উয়ুন (The Light of The Eyes) গ্রন্থেও পান্ডুলিপি অক্সফোর্ড সংরক্ষিত আছে।

মোহাম্মদ আল মাহদী বিন আলী সুনপুরী আল ইয়ামানী আল হিন্দী

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থান পাবার মত একজন বাঙালী চিকিৎসক আছেন-এ রকম তথ্য জানা যেত না কিছু দিন আগেও। বাঙালীদের গর্ব এই বিজ্ঞানীর নাম মোহাম্মদ আল মাহদী বিন আলী সুনপুরী আল ইয়ামানী আল হিন্দী। তাঁর লকব সুনপুরী (সুবর্ণপুর!) বাংলার পরিচয় এবং ইয়ামীনী, ইয়েমেনে বসবাসকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি ইয়ামেনের আল মুকরীতে স্থায়ী বসবাস করতেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়না। সারটন তাঁর Introduction to The History of Science গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, He was not a native of yaman but a Hindu perhaps a Bengali. The obligation of the pilgrimage drew Muslims from every where to the sacred cities, Some of them never returned home but spent the rest of their life in the Hijaz or southern Arabia. Apparmently that is what happened to Muhammad Al-Mahadi, who settled down in yaman. (Vol. 111 par t-2. Page-1215). সারটন তাঁকে হিন্দু

[২৬৯]. এম আকবর আলী, C৷¸ ³, পৃ. ৪৫৪
[২৭০]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C৷¸ ³, পৃ. ৮০
[২৭১]. এম আকবর আলী, C৷¸ ³, পৃ. ৪৫৭
[২৭২]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C৷¸ ³, পৃ. ৮০
[২৭৩]. এম আকবর আলী, C৷¸ ³, পৃ. ৫১০-৫১১

বলে উল্লেখ করেছেন। এটা সঠিক নয় বলে চিকিৎসা বিষয়ে রচনা করেন 'রহমা ফিত্তীব ওয়াল হিকমা' 'শিফা ওয়াল আজসাম,'তাস হিলুল আনাফী ফিত্তীব ওয়াল হিকমা' ইত্যাদি গ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থটি ৫ ভাগে বিভক্ত এবং যথাক্রমে পদার্থবিদ্যায়, খাদ্যবস্তু ও ওষুধ, স্বাস্থ্য, শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগ এবং সাধারণ রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি কায়রোতে ১৩০০, ১৩০২, ১৩০৪, হিজরীতে মুদ্রিত হয়। শেষোক্ত সংস্করণের 'তিব্বুন নবী' নামে একটি খন্ডও যোগ করা হয়। এই গ্রন্থে কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত এবং Prof, Alphose Berthirand একটি ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। সারটন উল্লেখ করেছেন, He wrote kitab AL-Rahma fil-Tibb wal Hikma (Book of ercy concerning Medicine and (medical) wisdom. It was wrongly ascribed to Egyptian polygraph al-suyuti. সারটনের এই শেষ বক্তব্য ঠিক নয়। এ সময় তুর্কীর মোহাম্মদ আল আকসারাই (মৃ. ১৩৬৮/৭৮) ইসহাক বিন মুরাদ, মোহাম্মদ ইবনে মাহমুদ, হাজী পাশা (মৃ.১৪১৭)-এর নাম চিকিৎসাবিদ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। হাজী পাশার ৪ খন্ডে বিরচিত 'শিফাউল আসকাম ও দাওয়ায়ুল আমল' চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ, অনেকটা ইবনে সীনার 'কানুনে'র অনুরূপ। প্রখ্যাত ফার্মাসিষ্ট সিরাজের জয়নুল আত্তার (জ. ১৩২৯ খৃ.) 'মিকফাহুল খাজায়েন' (Key of treasurs) ফার্সীতে লিখিত একটি মেটেরিয়া মেডিকো হিসাবে খ্যাত। এনাটমী বিদ্যা একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন মনসুর ইবনে মোহাম্মদ। 'তাশরীহুত, তাসবির' নামক এই গ্রন্থে রচনা করেন মনসুর ইবনে মোহাম্মদ। 'তাশরীহুত, তাসবির নামক এই গ্রন্থে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাড়, স্নায়ু, পেশী,শিরা,ধমনী ও নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবচেয়ে সর্বশেষ বিদগ্ধ ব্যক্তি গ্রানাডার ইবনুল খতীব (জন্ম ১৩১৩) চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।[২৭৪]

এভাবে আরো অনেক চিকিৎসাবিদগণের নাম উল্লেখ করা যায়। মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেকগুলো ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রেখেছেন। তন্মধ্যে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে সবচেয়ে বেশী নাম এসেছে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কর্মকান্ড নিয়ে। এই শত শত বিজ্ঞানীদের মধ্য হতে প্রধান কয়েকজনের পরিচিত উক্ত আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

আবদুল মালেক বিন আবিল আল জুহর

ল্যাটিন অনুবাদে তাঁর নাম Abhomeron পাশ্চাত্য Avenzoar পরিচিত আবদুল মালেক বিন আবিল আল জুহর পরিচিতি লাভ করেন।[২৭৫] তাঁর জন্মস্থান সেভিলে। তিনি ১০৯১ হতে ১০৯৪ খৃ. মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।[২৭৬] অধ্যাপক হিট্টির মতে তাঁর জন্ম ১০৯৪ সালে।[২৭৭] 'মুসলিম স্পেনে ইবনে জুহর পরিবার ছয় পুরুষ ধরে দীর্ঘ তিন শতাব্দী চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান রাখেন।[২৭৮] পাশ্চাত্যের মুসলিম জগতের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।[২৭৯] অধ্যাপক সারটনের মতে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের শুধু Physician হিসাবেই থাকতে পছন্দ করতেন।

[২৭৪]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¦¸ ³, পৃ. ৮৪
[২৭৫]. এম আকবর আলী, C¦¸ ³, পৃ. ৪৭৭
[২৭৬]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¦¸ ³, পৃ. ৮০
[২৭৭]. এম আকবর আলী, C¦¸ ³, পৃ. ৪৭৭
[২৭৮]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¦¸ ³, পৃ. ৮০
[২৭৯]. এম আকবর আলী, C¦¸ ³, পৃ. ৪৭৭

Dhaka University Institutional Repository

Clinicial Prof. E.R. Long তাঁর History of Pathology গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইবনে জুহর পাকস্থলীর ক্যান্সার (Gastric Carcinoma), কণ্ঠনালীর ক্যান্সার ও Serous Pericarditis প্রভৃতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন।[২৮০] তিনি সর্বপ্রথম প্রচার করেন Itchmite এর জন্যে খোঁস পাঁচড়া (Scabies) হয়। তিনিই সর্বপ্রথম পান্ডু রোগের (Jaundice) জন্য রেজওয়ান পাথর ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন। আর রাযীর পর মুসলিম জগতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ Clinician.[২৮১] এই ব্যবস্থা ষষ্ঠদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে প্রচলিত ছিল। Noctole Mondares (1492-1588) তার এই ব্যবস্থা হুবহু অনুসরণ করেছেন।

ইবনে জুহরের ৩টি চিকিৎসা গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। তাহলো 'কিতাবুত তাইসির' (Book of Simplification Percaditis Itchmie Concering Therapeutics & Diet), 'কিতাবুল আগজিয়া' (Book of Food Stuffs) এবং 'ইকতিসাদ ফি ইসলাহিল নফুস ওয়াল আজসাদ' (Book of The Iqtisad Concerning The Reformation of Souls and Bodies) । তবে এ বিষয়ে 'কিতাবুত্ তাইসির' তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ড. এম. আবদুল কাদের জানিয়েছেন, অস্ত্র চিকিৎসায় ইবনে যুহরের আবিষ্কারও যথেষ্ট। শ্বাসনালীর অস্ত্রোপচার (Wacheotoms) ও পাতলা হৃদয় বেষ্টনী কোষের (Percaditis) মৌলিক বিবরণের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান তার নিকট ঋণী।[২৮২] অধ্যাপক লং বলেছেন, তিনি পাকস্থলীর ক্যান্সার ও কণ্ঠনালীর ক্যান্সারের সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৮৩] ড. ক্যাম্পবেলের মতে, 'মধ্যযুগের মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে জুহরের প্রভাব সব চাইতে বেশী'।[২৮৪] জুহর এর কন্যা, পুত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে আরো চিকিৎসকের আবির্ভাব হয়েছে। তদীয় পুত্র আবু বকর মোহাম্মদ এবং আবু বকরের পুত্র আবু মোহাম্মদ বিন আল হাফিদ চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

ফকরুদ্দীন আর রাযী

পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনোল ওমর ইবনোল হুসাইন ইবনোল খাতিব ফকরুদ্দীন আর রাযী। জিবাল প্রদেশের রাই নামক স্থানে ১১৪৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেণ এবং ১২০৯ সালে হীরাটে মৃত্যুবরণ করেন। বস্তুত বর্তমান মুসলিম জগতে তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ হিজরীর মোজাদ্দেদ হিসেবেই খ্যাত। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রর্বতিতেও পারদর্শী ছিলেন। অধ্যাপক সারটন বলেন, তিনি হলেন Philosopher, Historian, Mathematician, Astronomer, Physician, Shafite Theologian, Encyclopadist, Writing in Arabic and Persian.[২৮৫]

---

[২৮০]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¦¸ ³, পৃ. ৮০
[২৮১]. এম আকবর আলী, C¦¸ ³, পৃ. ৪৭৭
[২৮২]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¦¸ ³, পৃ. ৮০-৮১
[২৮৩]. এম আকবর আলী, C¦¸ ³, পৃ. ৪৭৭
[২৮৪]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C¦¸ ³, পৃ. ৮১
[২৮৫]. এম আকবর আলী, C¦¸ ³, পৃ. ৫৩৮

ইব্রাহীম বিন তিলমিজ

বাগদাদের ইব্রাহীম বিন তিলমিজ (জন্ম ১০৭৩ খৃ.) আজুদী হাসপাতালের চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি গ্রীক ও আরবী চিকিৎসা গ্রন্থের অনেকগুলো ভাষ্য রচনা করেছিলেন। তিনিই প্রথম মহানবীর (সা) চিকিৎসা বিষয়ক হাদীসগুলো নিয়ে একটি ভাষ্য তৈরী করেন। এছাড়া Pharmacopia বিষয়ে একটি গ্রন্থ তাঁর আছে।

সমসাময়িক আরো কয়েকজন চিকিৎসক হলেন আলী মালকা, হিবাতুল্লাহ আল ইসপাহানী-(মৃ. ১১৪৫ খৃ.), ইসমাঈল আল জুরজানী (ম. ১১৩৫-৩৬ খৃ.) আল গাফিকী, অন্যতম।

ইসমাঈল বিন হাসান আল জুরজানী

ইসমাঈল বিন হাসান আল জুরজানী ফার্সীতে রচিত 'জাখিরায়ে খারিজম শাহী' তাঁর অমরত্বের জন্য যথেষ্ট। ফার্সীতে সর্বপ্রথম Medical Encyclopedia'এটি। ৯ খন্ডে বিভক্ত সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ সম্পর্কে এলগুড, বলেন, The importance of this work lies not merely in its contants, which are themselve a masterful, concise and dasily understood exposition of the wole system of medicine as was taught in his day but rather in the language in which it was written. Al-jurjani did for Persian science what the Bible did for the English Prose.

ইবনে আবিল মহসিন আল হালাবী

আলোপ্পোর অধিবাসী খলীফা ইবনে আবিল মহসিন আল হালাবী চক্ষু চিকিৎসক ও ব্যাখ্যাতা হিসাবে অমর। 'কাফি ফিল কুহল' তাঁর রচিত বিখ্যাত চক্ষু বিষয়ক গ্রন্থ। প্যারিসের Bibliothique National- এ রক্ষিত এর একটি পান্ডলিপি থেকে দেখা যায় গ্রন্থটি ১২৬৫ খৃ. দিকে প্রণীত। চক্ষু রোগ ও এর চিকিৎসার বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়াও চোখ, চোখের নার্ভ, মস্তিষ্ক এবং এ সংক্রান্ত চিকিৎসার ৩৬টি যন্ত্রপাতির ছবি বিস্তারিতভাবে অংকিত ও বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সালাহউদ্দীন ইবনে ইউসুফ

এ সময় সিরিয়ার বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ সালাহউদ্দীন ইবনে ইউসুফ এ বিষয়ে 'নুরুল আইয়ুন ওয়া জামিউল ফুনন' নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়কার নাসির উদ্দীন তূসী, কুতুব উদ্দীন শিরাজী প্রমুখ বিজ্ঞানী চিকিৎসা বিষয়ে গ্রন্থ লিখেন।

আলী ইবনে খাতিমা আল আনসারী

১৪ শতকে স্পেনে আর্বিভূত হন আলী ইবনে খাতিমা আল আনসারী (জন্ম-১৩২৪) প্লেগ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট রচনা 'তহসিনে গারাজিল ফাসিদ ফি তাফসিনিল মারাজিল ওয়াফফিদ' একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসাবে প্রশংসিত। ম্যাক্স মায়ার হফের ভাষায়- `To appreciate the teaching of these writers it must be remembered that the doctrine of the Contagious character of dis-ease is not emphazised by the Greek physicians and it almost passed over by most medieval Writers.

মাহমুদ ইবনে ইলিয়াস

মাহমুদ ইবনে ইলিয়াস চিকিৎসা বিজ্ঞান সাধনায় খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর 'হাবী ফি ইলমুত তাদাবী' (The Containing or Continens Concering The Art of Treatment) গ্রন্থটিকে পারিবারিক চিকিৎসা গ্রন্থ বলা চলে। ১৩৩৬/৩৭ খৃ. লিখিত এর একটি পান্ডুলিপি গোথাতে বিদ্যমান আছে; মোট পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত।

ইবনুল আকফানী

আরব দার্শনিক ইবনুল আকফানী (মৃত্যু ১৩৪৮/৪৯খৃ.) চিকিৎসা বিষয়ে ৩টি বই লিখেন। সারটনের মতে তিনি, 'Iraqi Physician Naturalist and Encyclopedist. তাঁর 'আহওয়ালিল আইন' গ্রন্থে চোখের ৪৩টি রোগের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। চোখের পাতার Phlegmon, কার্বাঙ্কল, Cramps, Twitching ইত্যাদি রোগ নির্ণয় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ।

রশীদউদ্দীন ফজলুল্লাহ

চতুর্দশ শতকের চিকিৎসা বিজ্ঞানী রশীদউদ্দীন ফজলুল্লাহ (জন্ম ১২৪৭ খৃ.) অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, Equally eminent as a Physician, a statesmen, a historian and a public benefactor, জামিউত তাসানিফুর রশীদ-'এর মধ্যে সন্নিবেশিত তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে চীনা চিকিৎসাপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্দশ শতক থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনন্য শাখার মত চিকিৎসা বিজ্ঞানেও মুসলমানদের পতনের যুগ হয়। তবু এ সময় চিকিৎসাবিদ খ্যাতি লাভ করেছিলেন-প্যালেস্টাইনে আবু সাঈদ আল আফিক (জন্ম ১৪০৭ খৃ.) তাঁর গ্রন্থ 'লামহা ফিত্তীব ও খুরসাতুল কানুন; স্পেনের মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ (পাশ্চাত্যে AL Belbanus পরিচিতি) একই স্থানের মোহাম্মদ বিন আলী আশ শাকুরী (জ. ১৩২৫/২৭ খৃ.) সিরিয়ার আল মাসবিজি (মৃ. ১৩৭০ খৃ.) সাদাক বিল ইব্রাহীম মিশরী আল শাদহিলী অন্যতম। শেষোক্ত শাদহিলীর চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ক অনন্য অবদান 'উম্দা আল কুহলিয়া ফিল, আমরাজুল বাসারিয়া' (Opthalmological Support For The Disease of The Sight Organ) সুবিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের চোখের পার্থক্য নিয়ে কৌতুহলোদ্দীপক বর্ণনা দেন। মুসলিম জগতে চক্ষু বিষয়ক শাদুহিলীর এই গ্রন্থই সর্বশেষ বলা যেতে পারে। এরপর মরক্কোর আবদুল্লাহ বিন আজীজ মারাক্কুশীর 'দাহির আল কুসুফ ফিততীব'- এ সংক্রান্ত গ্রন্থ যদিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

ইবনুল বাইতার

ইবনুল বাইতার ১৩ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ আরব উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও ফার্মাকোলজিষ্ঠ ছিলেন (Botanist). ৪ খন্ডে রচিত তাঁর গ্রন্থ জামে মুফরাদাতিল আদবিয়া ওয়াল আগজিয়া'তে ১৪০০ ওষুধের নাম দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৩০০টি সম্পূর্ণ নতুন। এছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের প্রায় প্রতিটি ওষুধ ও তার তৈরী বিষয় নিয়ে কম-বেশী আলোচনা করেছেন। ওষুধ বিজ্ঞানী হিসাবে ইবনে সীনা, ইবনে ওয়াহ্ শিয়া (মৃ.৯০ মুয়াফফাক্ আল হারবাবী (মৃ.৯৯০), ইসহাক বিন সুলায়মান (মৃ.৯৩২), আত্ তামিযী (মৃ.৯৯০), ইবনে জাজলা (মৃ.১১০০), আল কোহেন আল আত্তার (মৃ. ১১৯২), মূসা বিন মাইমুনের

Dhaka University Institutional Repository

(১২০০) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা জাবিব বিন হাইয়ান 'বিষ' বিষয়ক 'কিতাবুস সুসুম' (Book of Poision) প্রণয়ন করেন যা আরব ফার্মাকোলজীর অন্যতম উৎস। তাবারী (মৃ.৮৯৫), রাজী (মৃ.৯২৫) ও এ সম্পর্কে বই লিখেছেন।

ইবনে রুশদ

আবুল ওয়ালিদ মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ ইবনে রুশদ ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে একটি বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপীয় পন্ডিতগণ তাঁর নাম 'এভেরোস' লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৮৬] স্পেনের ইবনে রুশদ দার্শনিক হিসাবে খ্যাতিমান হলেও তিনি একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। দার্শনিক খ্যাতির কাছে তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবদান চাপা পড়ে গেছে। রেনাল এর মতে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁর রচনার সংখ্যা ২০টি। তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান' কুল্লিয়াত ফিত্ তীব'। কুল্লিয়াতে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। চোখের পীড়া আলোচনার মধ্যে তিনি রেটিনা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন বর্তমানেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তা প্রচলিত রয়েছে।[২৮৭] নাড়ীর গতিতে স্বাস্থ্য ও রোগের লক্ষণ, প্রস্রাব, নানা প্রকার জ্বর, সংকটকাল প্রভৃতি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। ল্যাটিনে Colliget নামে অনূদিত হয়ে ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ Liber Universalis De Medicana হিসাবে প্রচারিত হয়। ১১৬২ খৃ. সময়ের পূর্বে লিখিত ৭ খন্ডে সমাপ্ত এই বিশ্ব কোষের শিরোনাম বিষয়গুলো হল- Anatomy, Physiology, General Pathology, Diagnosis, Material Medica, Hygiene, Therapeutic. এই গ্রন্থ বহু ভাষায় বহুবার অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতেন।[২৮৮] তিনি ইউরোপে 'Averros'নামে পরিচিত।

ইবনে মাসবিয়

খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে ইবনে মাসবিয়া বাগদাদের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ছিলেন। শল্য চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে অনেক মুসলিম চিকিৎসাবিদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্পেনের তৃতীয় আবদুর রহমানের সময় চিকিৎসক আবুল কাসেম জাহরাভী (৯৩৬-১০১০ খৃ.) মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন ছিলেন। ইউরোপে তিনি 'বুকাসেস' নামে পরিচিত। তাঁর গ্রন্থ "আততাসরীফ" স্বাধীনভাবে লিখিত প্রথম সার্জিকেল গ্রন্থ। তাতে কাঠ বা তপ্ত দা'গুলি দিয়ে ক্ষত পোড়ান, মুত্রাশয়ের অভ্যন্তরে পাথরীভঙ্গ, অঙ্গচ্ছেদ এবং দেহ ব্যবচ্ছেদের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। হাড় ভাঙ্গা, স্থানচ্যুতি, মেরুদন্ড ভঙ্গেও পর পক্ষাঘাত, অস্ত্রের সাহায্যে চক্ষু ও দন্ত চিকিৎসা ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তিনিই প্রথম পাথরির ব্যবস্থা করে উহা ছেদনের উপদেশ দেন। আজ পর্যন্ত অস্ত্র চিকিৎসকরা তাই পালন করে আসছে। তিনি জটিলতম অস্ত্রোপচার কুণ্ঠিত হতেন না। ছুরি, লৌহশলাকা ইত্যাদি নিঃসকোচে তাঁর হাতে ব্যবহৃত হতো। আরব জাতির মধ্যে এত বড় চিকিৎসক সার্জন আর জন্মগ্রহণ করেনি।

---

২৮৬. মাইকেল এইচ. হার্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২৮৭. এম আকবর আলী, C॥¸ ³, পৃ. ৫৩০

২৮৮. আখতার-উজ-জামান, C॥¸ ³, পৃ. ২৩৪

অস্ত্র চিকিৎসায় ইবনে জুহুরের আবিষ্কারও যথেষ্ট। শ্বাসনালীর অস্ত্রোপচার ও পাতলা হৃদয় বেষ্টনীর কোষের মৌলিক বিবরণের কোষের মৌলিক বিবরণের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান তার কাছে চির ঋণী। তিনিই প্রথম চিকিৎসক যিনি প্রথম 'ফোড়ার' কথা উল্লেখ করেন।

চক্ষু চিকিৎসার প্রতি আরবরা অধিক মনোযোগ দিত। তাঁদের চক্ষু অপারেশনকারীরা ছিল সর্বাপেক্ষা দক্ষ এবং অভিজ্ঞ অস্ত্রোপচারকারী। তারা বিভিন্ন প্রকার ছানির কথা উল্লেখ করেন। তাতে অস্ত্রোপচারের ছানি তুলে বা বসিয়ে নয়টি বিভিন্ন কিংবা সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা চক্ষু অপারেশন করত। তাদের সূচ গোলাকার ও ত্রিকোণাকার দু'প্রকারই ছিল। এদের কতেকটি ফাঁপা ও কাঁচ নির্মিত আংটা ব্যবহার করত। অচেতনকারী পদার্থ ব্যবহারের সুবিধাও এ সমস্ত সুবিজ্ঞ প্রতিভাদীপ্ত চিকিৎসকের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। কঠিন ও কষ্টদায়ক অস্ত্রোপচারকালে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তারা Dernel ও অন্যান্য Decochon ব্যবহারের ব্যবস্থা করতেন। দাউস আল্ আগরেবীর মতে, পাথরী, ছেদন, ফোঁড়া কর্তন এবং মুস্কচ্ছেদনে মাদকদ্রব্য প্রয়োগ কর্তব্য। শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সংজ্ঞানাশক দ্রব্য ফুসফুসে আকর্ষণ করাবার পদ্ধতি ও সুগন্ধ ও স্পোঞ্জসিক্ত ও নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করতেন। সমসাময়িক ল্যাটিন ইউরোপে অস্ত্র চিকিৎসায় অশিক্ষিত হাতুড়িয়াদের দখল ছিল। নিদ্রা আনয়নকারী স্পঞ্জ আরব অস্ত্র চিকিৎসকদের উন্নতির অন্যতম সোপান।

সমস্ত অস্ত্রোপচারের স্পেনীয় মুসলিম শল্যবিদরা অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। প্রত্যেকটি অপারেশনে চূড়ান্ত নিরীক্ষা করানো হত; অপেক্ষাকৃত নিষ্ফল চিকিৎসা হলে তারা দুঃসাহসিক অপারেশনের শরণাপন্ন হতেন। ইবনে যুহর বলতেন, ভেষজ যথানিয়মে প্রয়োগ করতে পারলেই যথাসম্ভব ক্ষত নিরাময় হয়। সুতরাং অস্ত্রোপচারের আগে প্রাকৃতিক ভেষজে আরোগ্যজনক ক্ষমতার পূর্ণ সংযোগ দেয়া হতো।

আবুল কাসেম

দ্বিতীয় সক্রেটিস নামে খ্যাত আবুল কাসেমের (মৃত্যু ১০৭৭ খৃ.) অস্ত্রোপচারের বিবরণ সুস্পষ্ট। ব্যবহৃত গ্রন্থাবলীতে চিত্র অংকিত হওয়ার তাঁর গ্রন্থ সবিশেষ মূল্যবান। আরব জাগরণের পূর্বে তাঁর অল্প সংখ্যক চিত্র পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আবুল কাসেমের পূর্বে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রের চিত্রাংকনের কোন বিধিবদ্ধ চেষ্টা করা হয়নি। মধ্যযুগের অধিকাংশ চিত্র তাঁর গ্রন্থ হতে গৃহীত। অস্ত্র চিকিৎসার যাবতীয় পুস্তকে আজকাল যন্ত্রপাতির চিত্রাংকন অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। এই মত প্রবর্তনের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান স্পেনীয় মুসলমানদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।[২৮৯]

স্বাস্থ্যবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যায় জ্ঞান লাভ ব্যতিত চিকিৎসা শাস্ত্র এবং সার্জারীতে জ্ঞান লাভ অসম্ভব। কারণ রক্ত, ধমনী, অস্থিমজ্জা এবং মাংস প্রভৃতির আকৃতি প্রকৃতি ও অবস্থান নিয়ে শরীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্য বিদ্যার আলোচনা করা হয়। শুধু চিকৎসক নয় সাধারণ একজন মানুষও স্বাস্থ্য বিদ্যা এবং শরীর শারীরবিদ্যার অবদান অস্বীকার করতে পারে না। ইসলাম পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান হেতু এ দুটি বিষয় ইসলামে স্বীকৃত। মুসলিম দার্শনিক, চিকিৎসাবিদদের অবদানে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলোর বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

[২৮৯]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, C/, 3, পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাস্থ্যনীতি ও ইসলাম

ইসলাম ধর্মে জ্ঞানার্জনের উপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যাপারে নানাবিধ দিক-নির্দেশনা রয়েছে। চিকিৎসা বিষয়ে আল কুরআনে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছি তা হলো মুমিনদের জন্য সকল রোগের নিরাময় (চিকিৎসা) ও রহমত।[২৯০] ইসলামের চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় গুরুত্বারোপ করার কারণে মুসলমানরা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এর ফলে মুসলমানরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হন। আবু আলী সিনা, জাকারিয়া ও ইবনে রূশদসহ আরও বহু মুসলিম মনীষী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তারা চিকিৎসার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন। ইসলামের প্রথম শতাব্দিতেই মুসলিম বিশ্বের নানাপ্রান্তে বহু সমৃদ্ধ হাসপাতাল গড়ে ওঠে। এসব হাসপাতালে বিশেষ বিশেষ রোগের চিকিৎসার জন্য আলাদা আলাদা ইউনিটও ছিল। ফ্রান্সের বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ পিয়েরে রুসো তার বিজ্ঞানের ইতিহাস বইয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অগ্রগতি সম্পর্কে লিখেছেন, একবার স্পেনের এক বাদশা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে উপায়ান্তর না দেখে কর্ডোভা শহরে মুসলমানদের কাছে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিলেন।

আল কুরআনে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দিকনির্দেশনা থাকলেও তা চিকিৎসা শাস্ত্রের বই হিসেবে বিবেচিত হয় না। মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

এই সেই কিতাব যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর এটা পরহেজগারদের জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা।[২৯১] আল কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্য সরল ও সঠিক পথের নির্দেশক এবং তা পারলৌকিক ও পার্থিব জীবনের কল্যাণ নিশ্চিতকারী গ্রন্থ। আল কুরআনে চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করার অর্থ হলো মানুষের কল্যাণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্বকে তুলে ধরা। আল কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক দিকগুলোর একটি হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞান, যা বিশ্বের গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা যদি মনোযোগের সাথে কুরআনের আয়াতগুলো লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই, আসমানী এ গ্রন্থে মানুষের দৈহিক ও মানসিক রোগ নিরাময়ের বিষয়টি একইসঙ্গে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

তাদের অন্তরে রোগ আছে। আল্লাহ সেই রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।[২৯২] মহান আল্লাহ চিকিৎসা বিষয়ে বলেন,

لَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّـهِ

জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি লাভ করে।[২৯৩] পবিত্র আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সংকট ও সমস্যার মুহূর্তে ধৈর্য্য ধারণ করতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

[২৯০]. আল-কুরআন ১৭ : ৮২

[২৯১]. আল-কুরআন ২ : ২

[২৯২]. আল-কুরআন ২ : ১০

[২৯৩]. আল-কুরআন ১৩ : ২৮

হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[২৯৪] আল্লাহর স্মরণ মানুষকে আত্মিক প্রশান্তি দেয়, পাশাপাশি এর ফলে মানুষের কঠিন পরিস্থিতি ও সমস্যা মোকাবেলার শক্তিও বৃদ্ধি পায়। ইসলাম মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, আনন্দ এবং দু:খ-কষ্ট উভয়ই ক্ষণস্থায়ী। কাজেই মানুষকে যে কোন কঠিন পরিস্থিতির জন্যও সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে এবং দুঃখ-কষ্টকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করতে হবে। মহান আল্লাহ নানা ভাবে মানুষকে পরীক্ষা করেন। আর এর ফলে ঈমান আরও দৃঢ় হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন গোটা পৃথিবীর সকল সৃষ্টিজীবের প্রতি রহমতস্বরূপ। বিশেষ করে রোগীর প্রতি তাঁর আচার-আচরণ, মমত্ববোধ, ভালোবাসাও অফুরন্ত রহমতের অনন্য ধারায় সিঞ্চিত ছিলেন। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য যে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন, তার প্রতিটি পরতে পরতে প্রবাহিত হয়েছে অনন্ত রহমতের ফল্গুধারা। তাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য জীবনের পাশাপাশি আর্ত-মানবতার সেবার ক্ষেত্রেও তিনি অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন যা পৃথিবীতে নজিরবিহীন, অতুলনীয় ও অনুসরণীয়। মানব ইতিহাসে এমন ব্যক্তি বা নেতা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। যিনি আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে পুরোপুরি বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে রোগীর সেবায় নিঃস্বার্থ্ভাবে অত্যন্ত দরদ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকেও রোগী-সেবার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন। আর্ত-পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষার কাজ যে কতো মহৎ এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বেশ কিছু বক্তব্য তিনি রেখেছেন।[২৯৫] তিনি রোগীর সেবার অসংখ্য ফযীলতের কথাও বলেছেন এবং প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়েও তিনি বিশেষ নজর রাখতেন। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক্ব রয়েছে। (সেগুলো হলো) সালামের জবাব দেয়া, রোগীর সেবা-শশ্রূষা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা ও হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেয়া অর্থাৎ হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্য মুসলিম ভইয়ের জন্য তাই পছন্দ করা।"[২৯৬] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম- অমুসলিম, ধনী-দরিদ্র, বন্ধু-শত্রু, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সর্বশ্রেণীর আর্তের সেবায় আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর শত্রুর অসুস্থতাতেও তিনি তার শুশ্রূষা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আর এজন্যই তিনি 'রহমাতুল্লিল আলামীন' খেতাবের সার্থকতায় উদ্ভাসিত হতে পেরেছেন তৎকালীর সমাজে।[২৯৭]

---

[২৯৪]. আল-কুরআন ২ : ১৫৩

[২৯৫]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ. ৩৬

[২৯৬]. mnxn eLvix, প্রাগুক্ত, অধ্যায় জানাজা, হাদীস নং ১১৬১

[২৯৭]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ. ৩৭

রোগের প্রকারভেদ

রোগ সাধারণত ২ প্রকার। ১। আত্মিক বা মানসিক রোগ ২। দৈহিক রোগ

আত্মিক বা মানসিক রোগ

একদা হিপ্পোক্রেটকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, Which life is the best? He said, "Poverty with safty is better then welth with fear." অথাৎ কেমন জীবন সর্বোত্তম? তিনি উত্তর দেন, "নিরাপত্তার সাথে দরিদ্রতা, 'ভয়-ভীতির সাথে ধন-সম্পদশালী থাকা' থেকে উত্তম।[২৯৮]

পবিত্র আল কুরআনে এমন সব দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যা থেকে মানুষকে দূরে রাখে। যেমন ইসলামে তরুণদের বিয়ে এবং পরিবার গঠনের ওপর অপরিসীম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুরা রূমের **২১** নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।[২৯৯] ইসলাম ধর্ম পারিবারিক ও আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রাখার উপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে। সকল আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে পিতা-মাতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বারবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পারস্পরিক বন্ধন ও সুসম্পর্ক, মানুষকে মানসিক দিক থেকে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকতে সহায়তা করে। মুসলমানদেরকে পবিত্র আল কুরআন অধ্যয়ন, নামাজ আদায়, দোয়া করা এবং অন্যান্য এবাদতের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এর ফলে মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত হবে। মানুষ যদি মনপ্রাণ দিয়ে আন্তরিকতার সাথে তার সৃষ্টিকর্তাকে ডাকে তাহলে অবশ্যই সে তার ফল পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ।

হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।[৩০০]

লোকে দেহের রোগকেই সাধারণত রোগ বলে এবং তারই চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হয়। মনের সুস্থতা বা অসুস্থতা বড় একটা লক্ষ্য করে না। যখন মনের এরূপ পীড়া হয় যে, তার জন্য রোগীর দ্বারা আর সাংসারিক কাজ চলে না অর্থাৎ যাকে লোকে 'উম্মাদ' রোগ বলে তাই দেখা দেয়, তখনই কেবল তাকে সুস্থ করার জন্য চিকিৎসকের দ্বারস্থ্য হয়। যদি সাংসারিক কাজের কোন অসুবিধা না হয়, অর্থাৎ হিসাবনিকাশ বা লোকজনের সাথে ব্যবহারের বিষয়ে কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তবে মনের যে অবস্থাই হোক না কেন, তা কেউই নজর রাখে না এবং চিকিৎসার প্রয়োজন বলে মনে করে না। একটু যত্ন সহকারে লোক-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, শত-শত ব্যক্তির মধ্যে এক জনেরও বোধ হয় সুস্থ মন নেই। অথচ মনের রোগ আরোগ্য করার জন্য কারো মধ্যে বড় কোন আগ্রহ দেখা যায় না। অবস্থা দেখে মনে হয় যেন সম্পূর্ণ সমাজের একই অবস্থা। তাহলে কে কার অসুস্থতা বুঝতে পারবে?

---

২৯৮. Avm-mqZx, প্রাগুক্ত, পৃ-১১

২৯৯. আল-কুরআন ৩০ : ২১

৩০০. আল-কুরআন ১০ : ৫৭

মহান শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ তাঁদের শত চেষ্টা, যত্ন, উপদেশ শাসনাদির সাহায্যেও কোন কোন ছাত্রের চরিত্র সংশোধন করতে একেবারে অপারগ হন। একই শ্রেণীর ছাত্রগণ একই অধ্যাপকের কাছে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা লাভ করেও প্রত্যেকে বিভিন্ন ভাবে বিদ্যা অর্জন বা চরিত্র গঠন করে। এমন কি একই পিতামাতার সন্তানেরা বিভিন্ন চরিত্রের হতে দেখা যায়। যদি কেউ বার বার অন্যায় কাজ করে, লোকে তাকে দুষ্ট বলে। সকলেই শিশুকাল হতে বড়দের উপদেশ পেয়ে থাকে। 'সদা সত্য কথা বলবে' 'কখনও মিথ্যা বলবে না' 'অন্যের দ্রব্য না বলে নিবে না' সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিষেধ পালন করবে' প্রতিবেশীকে ভালবাসবে' ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে ঐ সব উপদেশ বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন রকম ফল প্রদান করে। চোরকে চুরি করো না বললে চোর কি চুরি না করে থাকতে পারে? কখনই না। সে কেন চুরি করে? যেহেতু সে চুরি না করে থাকতে পারে না। সাধারণ কথায় লোকে বলে থাকে, অভ্যাস দোষে চুরি করেছে। অভ্যাস দোষ বললে প্রকৃত দোষ বলা হয় না। একজন একই প্রকার কাজ করতে করতে ক্রমে তার অভ্যাস হয়ে যায় সত্য কথা, কিন্তু একই পিতামাতার সন্তান, একই বাড়িতে খেয়ে, একই পরিবেশে থেকে, একেকজন একেক প্রকার অভ্যাস করে কেন? চোর বা মিথ্যাবাদী, চুরি করা বা মিথ্যা কথা বলা অন্যায় বা পাপ তারা জানে। বার বার তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও চুরি না করে বা মিথ্যা কথা না বলে সে থাকতে পারে না।

আবার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করলে, বিভিন্ন রকমের চরিত্রের সমাহার দেখতে পায়। আপাতদৃষ্টিতে আমরা সবাই জানি দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষালয়ে ভর্তি হয়। তাহলে এতসব সন্ত্রাসী, মারামারি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, নারীঘটিত অপরাধ কেন? কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোন পিতামাতা এগুলো শিক্ষা দেননি। তারা জানে এসব কাজ বড় ধরনের অপরাধ। পরিবার, সমাজ, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক সবাই তাদের ঘৃণা করে। এর পরেও কি তারা এসব ত্যাগ করতে পারছে? এসব অপরাধ থেকে বার বার বিরত রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কতিপয় ছাত্র নামধারী ব্যক্তিকে এসব থেকে বিরত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আর এটাই বাস্তবতা। এসবের প্রকৃত কারণ কি? প্রকৃত কারণ তাদের মন অসুস্থ। সুস্থ মনে চুরি করার প্রবৃত্তিই আসবে না, বার বার অভ্যাস করা তো দূরের কথা। সুস্থ মনে মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছাই থাকে না। সুস্থ মনে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অপরাধ করা তো দূরের কথা, সে সব সময় অন্যের মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত থাকবে। পিতামাতা বা শিক্ষকগণ বালক-বালিকাদেরকে শাসন অথবা উপদেশ দিয়ে যথেষ্ট প্রতিকার করা হয়েছে বলে মনে করেন। কিছু কিছু পিতামাতা বা শিক্ষক মারধোর পর্যন্ত করতে ছাড়েন না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব পন্থায় প্রতিকার তো হয়ই না বরং খারাপই হয় বেশী। আজকাল প্রায়ই স্কুল-কলেজের ছাত্রকে অতি অল্প বয়স হতেই ইন্দ্রিয়সেবী হতে দেখা যায়। এর ফলে অবৈধ উপায়ে শরীর চিরজীবনের জন্য নষ্ট হতে থাকে। এর কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসুস্থ মন। তবে অতি অল্প সংখ্যক বালক-বালিকা, যারা কেবলমাত্র সঙ্গদোষে এই কাজ করে, তারা অতি শিঘ্রই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বিরত হয়। সামান্য উপদেশই তাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়। এমন কি নিজেদের ভুলের জন্য অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হয় এবং তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়। আমরা অবশ্য এসব বিষয়ে এতটা সূক্ষভাবে দেখি না এবং চিন্তাও করি না। কিন্তু এই কথা অতীব সত্য যে, সুস্থ মনে কোন অসৎ কাজ বা অসৎ চিন্তা আসতে পারে না।

প্রায়ই দেখা যায় যে, কোনও বাড়িতে হয়ত অতিশয় দুঃখজনক ঘটনা, যেমন কারো অকালমৃত্যু বা অগ্নিকান্ড অথবা ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ফলাফল, বাড়ির সকলের পক্ষে সমান ক্ষতিকারক হলেও কেউ বা অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ে, আবার কেউ বা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ প্রকার উপেক্ষা করতে সামর্থ হয় তার মন অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ, নতুবা সে ব্যক্তি মনকে কখনও দমন করতে পারতো না। দুর্বল বা অসুস্থ মনে সামান্য ঘটনাও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে, কিন্তু সুস্থ মনে তা হয় না। আমরা প্রায়ই দেখে থাকি যে, সবার মন সমান ক্রোধী নয়। কেউ হয়ত অতি সামান্য কারণে ভয়ানক অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে, অনেকের সহিষ্ণুতা অতীব প্রশংসনীয়। এই প্রকারের তারতম্য, কেবলমাত্র মনের সুস্থতা ও অসুস্থতার উপর নির্ভর করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মেজাজ খারাপ হলে, তারা তা চাপা দিয়ে বাইরে প্রফুল্লতার ভান করতে জানে না, কিন্তু বড় হলে ভিতরের ভাব ভিতরে রেখে, বাইরে ‘ভালোমানুষ’ সাজতে পারে। তাই বলে যে তারা মানসিক ভাবে সুস্থ, এ কথা বলা যায় না। এমন কি চাপা দিয়ে ‘ভাল মানুষ সাজবার’ প্রবৃত্তিটিও একটি কপটতা, যা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ।

যাবতীয় পীড়া মন হতেই দেহে বিকাশ পায়। দেহটিকে মনই পরিচালনা করে, এমন কি দেহটি মনেরই স্থুলরূপ মাত্র। মনটি যেমন, দেহটিও তেমনি হবে। মনটি অসুস্থ হলে দেহটি সুস্থ হতে পারে না। দেহটিকে সুস্থ রাখতে হলে, আগে মনটিকে সুস্থ করতে হবে, অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু এখন মনের দিকে কারো কোন দৃষ্টি নেই। শরীরের প্রকৃত সুস্থতা কিসে আসবে, সেদিকেও দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি কেবল একেবারে বাইরে, কেবল বাইরে ভাল চাই। ভিতরে ভিতরে যাই থাক না কেন, বাইরে ভাল থাকলেই হলো। মনের মধ্যে যথেষ্ট অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও দেখা হওয়া মাত্রই মুখে কপট হাসি দিয়ে ঘাড় নেড়ে বলে ভাল আছি। আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে এটাই চলে আসছে। আগের চেয়ে ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি আরো খারাপেরে দিকে যাচ্ছে। ভিতরটা কেউ দেখে না, বাইরে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। ফলে, ভিতরটি অতি ভয়ানক ব্যাধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ভয়ানক ব্যাধি শরীরে প্রকাশিত হলে আবার তা চাপা দেওয়ার ফলে ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন ব্যাধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তখন চিকিৎসার কোন উপায়ান্তর না পেয়ে আমরা ভাগ্যকে দোষারোপ করতে থাকি।[৩০১]

আমরা যাকে রোগ বলি তা রোগ নয়, রোগের ফল মাত্র। এই ফলস্বরূপ যে রোগ, তা চিকিৎসার বিষয় নয়। প্রকৃত চিকিৎসার বিষয় হল রোগী। এই রোগীকে তার বিশৃংখল অবস্থা হতে সুশৃঙ্খলা অবস্থায় আনাই সুচিকিৎসা এবং আনতে পারলে উক্ত ফলস্বরূপ রোগ এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। যদি মনের সুস্থতার উপরই শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে, যদি মনকে সুস্থ করাই প্রকৃত কাজ হয়, তবে কিভাবে তা করা যেতে পারে? কি উপায়ে মনকে নিরোগ করা যায়? তবে, এরও আগে দেখা প্রয়োজন মন কি জন্য রোগাক্রান্ত হয়? তাহলেই আমরা সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে সক্ষম হবো।

যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বিনা কারণে তীব্র ভৎসনা করে, ঐ ভৎসনা সর্বপ্রথম ব্যক্তির মনে আঘাত করে। তারপর হয়ত শারীরিক লক্ষণ যথা কান্না, হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ বৃদ্ধি, কম্পন, মূর্ছা এমনকি স্ট্রোক বা হার্টফেল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। অতএব কোন দোষ যখন ক্রিয়া করে তখন সর্বপ্রথম মনে ক্রিয়া করে। যদি মনটাকে সুস্থ এবং পবিত্র রাখা যায় তাহলে তার দ্বারা সমাজের শুধু

[৩০১]. ডাঃ নীলমণি ঘটক, cvPxb cxovi KviY I Zvnvi wPwKrmv, কলিকাতাঃ দি হ্যানিম্যান হোমিও ফার্মেসী, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০১ খ্রি. পৃ. ১৩-২৩

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র মঙ্গলই হতে পারে, অমঙ্গল হতে পারে না। মনের রোগ সম্পর্কে মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মহাবিজ্ঞানী মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াত নাযিল করেছেন। মনের পবিত্রতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّـهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।[৩০২]

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

এদের মনের ভিতর রয়েছে এক ধরণের মারাত্মক ব্যাধি, আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।[৩০৩]

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّـهُ أَضْغَانَهُمْ

যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না?[৩০৪]

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّـهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ

আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেস্তাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটাতো মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয়।[৩০৫]

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّـهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ

বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে তারা বলে আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয়। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যে দিন আল্লাহ তা'য়ালা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন। ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে।[৩০৬]

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَإِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যখন মোনাফেকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুতঃ যে ভরসা করে আল্লাহর উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল সুবিজ্ঞ।[৩০৭]

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

[৩০২]. আল-কুরআন ১৩ : ২৮
[৩০৩]. আল-কুরআন ২ : ১০
[৩০৪]. আল-কুরআন ৪৭ : ২৯
[৩০৫]. আল-কুরআন ৭৪ : ৩১
[৩০৬]. আল-কুরআন ৫ : ৫২
[৩০৭]. আল-কুরআন ৮ : ৪৯

বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষতার সাথে আরো কলুষতা বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করলো।[৩০৮]

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষাণ হৃদয় গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে।[৩০৯]

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّـهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়।[৩১০]

উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে একটি বিষয় গভীর ভাবে লক্ষণীয়। যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত তারা কখনও সঠিক চিন্তা-ভাবনা করতে পারেনি। তারা সব সময় ভুল চিন্তা করেছে কিন্তু তারা তা একটিবারের জন্যও বোঝেনি। উপরন্তু তারা সবসময় নিজেদের চিন্তা ধারাকেই সঠিক বলে দৃঢ়তা পোষণ করেছে। তারা নিজেদের কাজকর্মকে সঠিক এবং এর বিপরীত কাজকে বিশৃঙ্খলা এবং অপরাধ মনে করেছে। কারণ তাদের চিন্তা, জ্ঞান ও বিবেক তাদেরকে ভুল তথ্য দিচ্ছে। ফলে সমাজে তারা বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি করেছে, ফেতনা-ফ্যাসাদ তৈরী করেছে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এরা সব সময় সত্যের বাণী মহান রাব্বুল আলামিনের কুরআনের নির্দেশনার বিপরীত কাজে লিপ্ত থেকেছে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

তাদেরকে যখন বলা হয় তোমরা অশান্তি সৃষ্টি করো না। তারা তখন বলে, আমরাই শান্তি স্থাপনকারী।[৩১১] তারা যা বলেছে, তা তারা জেনে বুঝে বিশ্বাসের সাথেই বলেছে যে, তারা শান্তি স্থাপন কারী, আমরা অশান্তি সৃষ্টিকারী নই। কারণ, তাদের অন্তর রোগগ্রস্ত। রোগ গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন ভাল এবং মন্দকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারে না। তেমনি অন্তরের রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও কোনটি সঠিক এবং কোনটি সঠিক নয় এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে না। সে সব সময় মন্দটিকেই সঠিক মনে করে। কোন ব্যক্তি যখন সাপের কামড়ের ফলে সাপের বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন, তার নিকট কাঁচা মরিচ মিষ্টি মনে হয়। কিন্তু একজন সুস্থ ব্যক্তি কাঁচা মরিচ খেলে তার আসল বৈশিষ্ট ঝালযুক্তই পাবে। কোন ব্যক্তি যখন জ্বরে আক্রান্ত হয় তখন তার অনেক প্রিয় খাবারও মুখে অরুচি বোধ হয়। কারণ সে অসুস্থ এবং তার মুখটি জ্বরাগ্রস্ত।

পৃথিবীর বুকে সংঘঠিত সমস্ত খারাপ কাজ অন্তর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই হয়। কিন্তু যাদের অন্তর এমনই রোগগ্রস্ত, বড় বড় অপরাধ করেও তাদের বিন্দু মাত্র অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হয় না। তারা মনে করে, তাদের কাজটিই ঠিক হয়েছে, বরং অন্যদেরটি ভুল। পক্ষান্তরে, যারা অন্তর রোগে আক্রান্ত নয় তারা ভুলবশত কোন অন্যায় কাজ করলেও, পরক্ষণেই তাদের মধ্যে অনুশোচনাবোধ জন্ম নেয়। তারা নিজেরাই নিজেদের অন্যায় বুঝতে পারে। সামাজিক বিভিন্ন স্তরের অপরাধ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় এমনকি আন্তর্জাতিক বড় বড় অপরাধ অন্তর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। এদের অন্তর রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি নয়, বরং সমগ্র সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি

---

[৩০৮]. আল-কুরআন ৯ : ১২৫

[৩০৯]. আল-কুরআন ২২ : ৫৩

[৩১০]. আল-কুরআন ৩৩ : ১২

[৩১১]. আল-কুরআন ২ : ১১

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র বিশ্ববাসী পেতে পারে একটি সুন্দর জীবন ও একটি সুন্দর পৃথিবী। মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষের জন্য পবিত্র কুরআনকে অন্তর রোগের ওষুধ হিসাবে পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

'হে মানবকুল! তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং অন্তর রোগের ওষুধ এসেছে।[৩১২] হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম দাওয়া হলো কুরআন।[৩১৩]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সারাটিজীবন চেষ্টা করেছেন। মহান আল্লাহ মানুষের জন্য পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٨ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যাস্ত করেছেন, অতপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, যে নিজেকে শুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।[৩১৪] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথাগত কোন চিকিৎসক ছিলেন না। মহান আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, মানুষ অন্তর রোগে আক্রান্ত। অন্তরের অসুস্থতার কারনে তারা কোন সুস্থ চিন্তা ভাবনা করতে পারছে না। তাদেরকে আপনি উপদেশ দিন, তাহলে তারা আস্তে আস্তে আপনার দিকে ফিরে আসবে। ক্রমান্বয়ে দেখা গেল, তারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে ও বুঝতে পারলো। সমাজের মঙ্গলকামী লোকেরা ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হলো। পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতেও পারলো না, বুঝতে পারলো না।

চোখের রোগ হলে মানুষ যেমন সঠিকভাবে দেখতে পায় না, তেমনি অন্তরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও অন্তর রোগের কারণে সঠিকভাবে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন,

أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী।[৩১৫]

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে।[৩১৬]

মহান রাব্বুল আলামিন উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হিসাবে দুই ধরণের লোককে সতর্ক করেছেন। এরা হলো মুনাফেক এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে। যখন মানুষ সুস্থ থাকে, তখন তার জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এগুলোর মাধ্যমে সঠিক সময়ে,

---

[৩১২]. আল-কুরআন ১০ : ৫৭

[৩১৩]. আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল কাযবীনী, (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক), mbvb Be‡b gvRvn, চিকিৎসা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: কুরআন দ্বারা শিফা গ্রহণ, হাদীস নং ৩৫০১, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রি.

[৩১৪]. আল-কুরআন ৯১ : ৭-১০

[৩১৫]. আল-কুরআন ২৪ : ৫০

[৩১৬]. আল-কুরআন ৩৩ : ৬০

সঠিক ভাবে, সঠিক কাজ করতে পারে। কিন্তু যখন সে অসুস্থ হয় তখন তার ইন্দ্রীয়গুলো সঠিক ভাবে সাড়া দেয় না। আর অন্তর অসুস্থ হলে প্রথমত সে সঠিক কাজটি বুঝতেই পারে না, অপরদিকে সে বোঝেইনা যে, সে অসুস্থ। আর রোগগ্রস্ত অন্তর সঠিক কাজটি করতে পারে না। এই অন্তর রোগ, দেহ রোগ অপেক্ষাও মারাত্মক।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ

যারা মুমিন, তারা বলে, একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য।[৩১৭]

মদীনায় তখন আনসার, মুহাজির সব ধরণের মুসলমানের বসবাস। আবার এদের মধ্যে ধনী, গরীব, সবল, দূর্বল সবই আছে। কিন্তু মহান আল্লাহ দুর্বলদের কথা না বলে অন্তরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে কঠোর বাস্তবতা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। যেখানে অন্যান্য মুসলমানদের ঈমান বেড়ে যায়, সেখানে অন্তরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত তাকিয়ে থাকে। তারা অল্পতে কিভাবে আলোড়িত হয়। সঠিকতা এবং বাস্তবতা তারা অনুধাবন করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।[৩১৮]

নবী পত্নীগণ, উম্মূল মুমিনীন; তাঁরা সকল মুমিনদের মাতা, পরম শ্রদ্ধেয়া ব্যক্তিত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরেও তাঁদেরকে বিয়ে করা মুমিনদের জন্য নিষিদ্ধ। দুনিয়া এবং আখেরাত, উভয় জাহানের বাদশা, মহান আল্লাহর বন্ধু, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদেরকে 'যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' তাদের থেকে সতর্ক করে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন। অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সব সময় খারাপ চিন্তা করতে থাকে। তারা ভাল-মন্দ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে খারাপ কাজ করতে করতে তাদের অন্তর এমন হয়ে যায় যে তারা বিবেক বুদ্ধি শূন্য হয়ে পড়ে। বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত বড় বড় অপরাধিদেরকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা সেটা বুঝতে পারি। যাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোও সমীচীন নয়, তাদেরই কথা শুনতে পেয়ে অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে কুবাসনা জন্ম নেয়। অতএব উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, অন্তরের ব্যাধি কত মারাত্মক। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই ক্ষতিকর অন্তর রোগ থেকে পরিত্রাণের পথ বের করতে হবে।

[৩১৭]. আল-কুরআন ৪৭ : ২০

[৩১৮]. আল-কুরআন ৩৩ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরের এই ব্যাধি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। কোন ব্যক্তির একদিনের পাপের ফসল নয়। ব্যাধি এসেছে ধীরে-ধীরে। সৃষ্টির পর থেকে মানুষ আচারে-ব্যবহারে, বেশ-ভূষায়, আহারে-বিহারে, নিত্যকর্মে যতই কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছে ততই প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। মানুষ বিভিন্ন প্রকারের অপরাধে জড়িত হয়েছে। আর মানব শরীরের প্রতিরক্ষা শক্তিও ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়েছে। মানুষের মনও ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও অপরাধ প্রবণ হয়েছে। (মন অর্থে জ্ঞানশক্তি, বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, এই তিনটি শক্তির সমষ্টি) যদি মানুষের মনে রোগ হয়, তাহলে তার ফলে জ্ঞান, বোধ ও ইচ্ছা এই তিনটিই দূষিত হয়। যার যেমন মন, তার তেমনই চিন্তা এবং তেমনই কর্ম। আগে মনে ইচ্ছা ও কল্পনার সৃষ্টি হয়, পরে সেই ইচ্ছা ও কল্পনা অনুসারে কাজ হয়। দূষিত মনে, দূষিত ইচ্ছা ও দূষিত কল্পনাই হয়। আর দূষিত মনে, দূষিত ইচ্ছা ও দূষিত কল্পনা হতে যে কাজ হয় তা দূষিত হতে বাধ্য।

আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের অন্তরে কোন রোগ নেই। তারা সব সময়ই সত্য উপলব্ধী করতে পারে। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ٣٤ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

অতএব, তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও; যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ করে এবং নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৩১৯] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানবকুল! তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং অন্তর রোগের ওষুধ এসেছে।[৩২০]

এ বিধান মেনে চললেই আমাদের তথা আল্লাহর সৃষ্টির সর্বোচ্চ মঙ্গল হবে। এই শ্রেণীর লোকেরাই যুগ যুগ ধরে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে, এবং এরাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হয়েছে। এরা যেমন অন্তর রোগ হতে রক্ষা পেয়েছে, তেমনি রক্ষা পেয়েছে দেহ রোগ হতে। ফলে, তাঁরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে। সঠিক ভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে। আর ইসলামের এই সুমহান ব্যাবস্থা রয়েছে সবার জন্য উন্মুক্ত।

চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর নীতিশাস্ত্র। পবিত্র আল কুরআন একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের নীতিমালার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী, একজন মুসলিম চিকিৎসক, রোগীর সাথে সুন্দর আচরণ করতে বাধ্য। বলা হয়ে থাকে, ডাক্তারের আচার-ব্যবহার, রোগীকে অর্ধেক সুস্থ্য করে তোলে। আল কুরআনে সদাচরণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেমিনারে কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়- শিক্ষক ও ভ্রুণ বিশেষজ্ঞ কেইথ মোর বলেছেন, গবেষকরা নতুন নতুন বিষয় আবিস্কার করছে আর এটা বুঝতে পারছে যে, আল কুরআনে এ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে।

---

[৩১৯]. আল-কুরআন ২২ : ৩৪-৩৫

[৩২০]. আল-কুরআন ১০ : ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

দৈহিক রোগ

পবিত্র কুরআন, আত্মিক বা মানসিক সমস্যার সমাধানসূত্রের পাশাপাশি দেহের নানা রোগ নিরাময়েরও পথ বাতলে দিয়েছে। স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে মানবের দেহতত্ত্বের বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। দেহতত্ত্বের জ্ঞান বলতে দেহের বিভিন্ন অংশে কি কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে? তার চারপাশে কি কি আছে? তাদের সম্পর্ক কি, একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক, প্রতিটি যন্ত্রের রক্ত সরবরাহ, শিরা-ধমনী ও লিমফের প্রবাহের যোগাযোগ, স্নায়ু, একটির সঙ্গে অন্যটির কি কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।

মানুষের শরীর একটি জটিল যন্ত্রের সমাহার। এর প্রতিটি অংশ কিভাবে কাজ করে শরীর-বিজ্ঞানীরা তা আজও পুরোপুরিভাবে জানতে সক্ষম হননি। গবেষণার ফলে যতদুর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে শুধু মাত্র ততটাই মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আশারবাণী, গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং তা অব্যাহত রয়েছে। মানুষের শরীর সুস্থ রাখে জীবনী শক্তি। জীবনী শক্তি দেহের প্রতিটি জীবিত কোষের মধ্যে বিদ্যমান। জীবনী শক্তি বিহীন শরীরের কোন কোষ অবশ্যই মৃত। জীবনী শক্তিই কোষগুলোকে সঞ্জীবিত রাখে এবং কোন দেহে জীবনী শক্তির অনুপস্থিতির অর্থ হলো সে দেহ জীবিত নয় বরং মৃত। রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা রয়েছে। কিছু লোক রোগকে জ্বিন-ভুত এবং প্রেতাত্মার আছর বলে থাকে।[৩২১] আবার কিছু লোক রোগকে আল্লাহর গজব মনে করে। রোগ অর্থ পীড়া, ব্যাধি, অসুখ, ব্যারাম বা অসুস্থতা। এই অসুস্থতা সর্ব প্রথম মানুষের মনে দেখা দেয়। ধীরে ধীরে শরীর যন্ত্রের মধ্যে দেখা দিতে থাকে নানা রকম বিশৃংখলা। এই অসুস্থতা ও বিশৃংখলা হতে দ্রুত, বিনাকষ্টে, স্বল্পতম সময়ে, সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও নির্দোষ উপায়ে সহজবোধ্য নীতির সাহায্যে সামগ্রিকভাবে রোগের লক্ষণ দূরীকরণ ও বিনাশ সাধন এবং স্থায়ী ভাবে স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।[৩২২] ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধান ও মৌলিক বিষয়াদি সম্পূর্ণ স্বভাবগত ও যুক্তিযুক্ত। ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী অসুস্থতা বা রোগ আযাব নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্রও নয়; বরং এটা আল্লাহর রহমত লাভের একটি অসীলা মাত্র। অপরদিকে বালা-মুসীবত ও রোগের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের পরীক্ষা করে থাকেন। যেমন হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম দীর্ঘ দিন রোগে ভুগেছেন। তাই রোগ আমাদের জন্য রহমত, বরকত ও সফলতার সোপন হয়ে থাকে।[৩২৩] হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ যাকে কল্যাণ দান করতে চান বা ভালোবাসেন, তাকে কষ্টে বা মুসীবতে ফেলেন।"[৩২৪]

রুগ্ন মানব জাতির স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার মত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করতে হলে এক দিকে যেমন শরীর-বিজ্ঞানী, অপর দিকে তেমনি জীবন-শিল্পীর প্রয়োজন। জীবদেহ জৈব ও অজৈব পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ। এদের কোনটির ক্রিয়ার অভাব হলেই শরীর ব্যাধিযুক্ত হয়। জীবদেহের এই স্বভাব প্রকৃত অবস্থায় আছে কিনা তা নির্ধারণ করা এবং না থাকলে তাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যাধি নিরাময় করাই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য।

---

[৩২১]. প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, cÖv¸³, পৃ. ৪০

[৩২২]. ডাঃ জি. দীর্ঘাঙ্গী, AM¨vbb, কলিকাতাঃ রায় পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ১৬১

[৩২৩]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ. ১৭

[৩২৪]. mnxn eLvix, প্রাগুক্ত, অধ্যায় রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, হাদীস নং ৫২৩৩

'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এ প্রবাদটি সকলেই জানে। সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা ইসলামে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতিকে দেওয়া মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং আমানত হচ্ছে স্বাস্থ্য। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে আল্লাহর ইবাদত এবং অন্যান্য কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঈমানের পরেই স্বাস্থ্যের স্থান। স্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম যত্ন নেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। সুস্থ থাকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও নিতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য দিয়েছেন। আল্লাহর দেওয়া আমাদের এই দেহ ও স্বাস্থ্যের দেখভাল আমরা কেমন করেছি, এগুলোর ব্যাবহার আমরা কেমন করেছি, এর জন্য কিয়ামতের দিন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন ইসলামি জীবন-ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইসলামে এরূপ জীবন-ধারার সূচনা হয়েছে। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর সবকিছুই বিদ্যমান ইসলামী জীবন বিধানে। আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য এবং শরীর-স্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের বিস্তর দিক নির্দেশনা রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে। বস্তুত ইসলামী জীবনাচারণের মধ্যেই নিহিত আছে সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। অজু, গোসল, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতসহ ইসলামের প্রতিটি বিধানই স্বাস্থ্যকর। এছাড়া মুসলমানের খাওয়া-দাওয়া, সামাজিক আচরণ ইত্যদি সব কিছুই সুস্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক। অজু, গোসল, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত। অজু, গোসল, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম। নামাজের পূর্বে অজু করতে হয়। নামাজ জান্নাতের চাবি, আর নামাজের চাবি হলো অজু; এসবই স্বাস্থ্যকর বিধান।

রোগ প্রতিরোধ

এক আউন্স রোগ প্রতিরোধ এক টন রোগ নিরাময় থেকে উত্তম।[৩২৫] অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে রোগ নিরাময়ের চেয়ে সস্তা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ প্রতিরোধকল্পে বক্তব্য রেখেছেন ও ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন কোন চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট বা ডায়াটেসিয়ান হিসাবে ছিলোনা। তথাপিও আমরা দেখতে পাই যে স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ নিরাময় ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি বিষয়েই তিনি অনেক বক্তব্য রেখেছেন এবং দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যা পুরোপুরি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। তিনি তাঁর বক্তব্য এমন এক সময় পেশ করেছেন যখন বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানতোনা। He spoke on every aspect of health and wellness, sickness and cure, be it material, physical or spiritual. He was in fact a physician of the body and soul.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বছর পূর্বে আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছেন, "নিশ্চয়ই মানুষকে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন নিয়ামত প্রদান করা হয়নি।[৩২৬] সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহর নিয়ামত সমূহের মধ্যে দুটো নিয়ামত রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় পড়ে আছে।

[৩২৫]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, C√¸ ³, পৃ-৭৫

[৩২৬]. bvmvC, প্রাগুক্ত, অধ্যায় স্বাস্থ্য ও সুস্থতা চাওয়া, হাদীস নং- ১০৭২২

একটি স্বাস্থ্য আর অপরটি অবসর বা বিশ্রাম।"[৩২৭] মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "স্বাস্থ্য ও অবসর মহান আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে দুটি বিশেষ নিয়ামত। অধিকাংশ লোক এ দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে ক্ষতি ও ধোঁকায় পতিত হয়েছে।"[৩২৮] ইসলাম রোগ প্রতিরোধের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিসে এমন সব দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। যেমন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে তাকে ওই দিন কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।"[৩২৯] এছাড়া রমযানের রোযা রাখা, নিয়মিত সালাত আদায় করা, পাঁচবার উযূ করা, পরিমিত পরিমাণে নিয়মিত হালাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা ও হারাম খাদ্য বর্জন করা, দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন বৈধ নিয়ম-নীতি মেনে চলা, ব্যক্তিগত জীবনে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।[৩৩০] হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারব (রা.) হতে বর্ণিত, "মানুষ পেটের তুলনায় নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করেনা। আদম সন্তানের জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট যা তার মেরুদন্ড সোজা রাখে। তবে যদি এর অতিরিক্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"[৩৩১] বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ক্ষুধার্ত না হলে খেয়ো না এবং পেট পরিপূর্ণ হবার আগেই খাওয়া শেষ কর। রাসূল (সা.) ও ইমামগণ এমন সব খাদ্যদ্রব্যের নাম উল্লেখ করেছেন, যা ব্যাথা উপশমসহ নানা রোগ থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। একই সাথে কুরআনে অনেক খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেও বলা হয়েছে। মানুষের মন-মানষিকতার ওপর খাদ্যের প্রভাবের কথাও পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সূরা বাকারার ১৬৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে মানব-জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য আছে, তা হতে তোমরা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৩৩২] মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কিছু কিছু খাদ্য ও পানীয়কে হারাম বা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এসব খাদ্য ও পাণীয় মানুষের শরীর ও মনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে মদ, শুকরের গোশ্‌ত ও মৃত প্রাণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পবিত্র কুরআনে মানুষের সুস্থতার প্রতি ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রোযার বিধান অন্যতম। মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রোযা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মহানবী (সা.) বলেছেন, রোজা রাখুন তাহলে সুস্থ্য থাকবেন।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নামাযের আগে অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

---

[৩২৭]. mnxn Avj eLvix, cv¸³, অধ্যায় মর্মস্পর্শী হাদীস, হাদীস নং- ৫৯৬৪

[৩২৮]. gmbv‡' Avngv', প্রাগুক্ত, মু.আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হাদীস নং-২৩৪০

[৩২৯]. mnxn eLvix, প্রাগুক্ত, অধ্যায় খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যগ্রহণ অধ্যায়, হাদীস নং ৫০৪২

[৩৩০]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cv¸³, পৃ-৭১

[৩৩১]. wZiwghx, প্রাগুক্ত, অধ্যায় অধিক আহার নিষেধ, হাদীস নং-২৩৮০

[৩৩২]. আল-কুরআন ২ : ১৬৮

তোমরা যখন নামাযের জন্য দন্ডায়মান হবে, তখন তোমরা তোমাদের দু'হাত কনুই সহ ধৌত করবে, তারপর মাথা মাছেহ করবে, আর দুই পা গিরা পর্যন্ত ধৌত করবে।[৩৩৩] অযু করার সময় শরীরের এই সমস্ত অঙ্গ ধৌত করা ছাড়াও তিনবার করে হাত ধুতে হয়, কুলি করতে হয়, মুখমন্ডল ধুতে হয়, নাক পরিস্কার করতে হয়, এগুলো অযুর সুন্নাত। অযু যেমন আমাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র করে, তেমনি এর প্রতিটি ধাপ আমাদের শরীরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে সহয়তা করে, রোগ-ব্যাধি মুক্ত রাখতে সহয়তা করে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসলেরও নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের জন্য যে সব নিয়ম মেনে চলা জরুরী, যেগুলো মেনে চললে স্বাস্থ্য সুন্দর থাকে, রোগ ব্যাধি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চা। এগুলোর মধ্যে শারিরীক পরিচ্ছন্নতা, কাপড়-চোপড়ের পরিচ্ছন্নতা, হাত, মুখ, দাঁত, নখ, পা, ইত্যাদির যত্ন, খাওয়া-দাওয়ার সময় সতর্কতা, হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় সতর্কতা, থুথু ফেলায় সাবধানতা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, ইত্যাদি। পরিস্কার পচ্ছিন্নতা বা ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চার মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। ইসলামে মুসলমানদের সর্বোচ্চ পরিচ্ছন্নতা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর নিয়মগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে এর প্রতিটি পর্ব আমাদের শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে এবং রোগ-ব্যধি মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য তিনি বলেন,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّـهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ اللَّـهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ

(হে রাসূল!) আপনি তাদের বলুন, বল তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি; তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে।[৩৩৪]

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ٧١ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেস্তাগণকে বললেন, আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেও।[৩৩৫]

অতএব, মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মধ্যেই রয়েছে সকল প্রকার অনুগত্যতা ও পবিত্রতা।

গ্রামবাসীর শহর অভিমুখী হওয়া এবং শহরের বস্তিসমূহে অধিক সংখ্যক লোকের বসবাসের ফলে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে যা শহরে স্বাস্থ্যসেবার যথার্থ প্রয়োগকে জটিল করে তুলেছে। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রামের গরীব মানুষের জন্য এখনও সহজলভ্য নয়।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য একটি স্বীকৃত মানবাধিকার। সার্বিক জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সেবা প্রাপ্তিতে সাম্য, লিঙ্গ সমতা, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। জনগণের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন দারিদ্র নিরসনে অত্যাবশ্যকীয়।

---

[৩৩৩]. আল-কুরআন ৫ : ৬

[৩৩৪]. আল-কুরআন ৬ : ৪৬

[৩৩৫]. আল-কুরআন ৩৮ : ৭১-৭২

Dhaka University Institutional Repository

সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহিতা কেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি করা। রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেয়া এবং পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা। জনসাধারণ, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠর জন্য মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

হযরত আবূ মালিক আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।”[৩৩৬] পবিত্রতা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অনেক উর্ধ্বে। যার কাপড়, দেহ ও স্থান পবিত্র তার কাপড়, দেহ ও স্থান পরিচ্ছন্নও বটে। কিন্তু কাপড় পরিচ্ছন্ন হয়ে অপবিত্রও হতে পারে। বাহ্যিক পবিত্রতায় দেহ, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং স্থানের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেহের পবিত্রতায় মলমূত্র ত্যাগের পর শৌচকার্য সম্পন্নের পরই অযু-গোসল করতে হয়। নাপাক পানি দিয়ে কেউ কাপড় বা স্থান পরিস্কার করে না। কাজেই পবিত্রতার পূর্ব শর্ত হলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় হাদীসটি হচ্ছে, তোমরা যথাসম্ভব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থেকো। কারণ মহান আল্লাহ ইসলামের ভিত্তি রেখেছেন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর। জান্নাতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ প্রবেশ করবেনা।”[৩৩৭]

এ হাদীসে ব্যক্তির স্বাস্থ্যকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত হাদীস দুটোর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কমিউনিটি হেল্থ বা Public Health তথা জনস্বাস্থ্য অটুট রাখার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অপবিত্রতা, অপরিচ্ছন্নতা, নোংরামী পছন্দ করতেন না। সুতরাং আমাদের সকলকে সর্বদা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। বস্তুত পবিত্রতা অর্জন করাকে মহান আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসা লাভের উপায় বলে কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

আল্লাহ তওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যারা অতিমাত্রায় পবিত্র থাকে তাদেরকেও।[৩৩৮]

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য তৈরি হও, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত দুটি কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথার ওপর হাত বুলাও এবং পা দুটি গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করো। যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাকো, তাহলে গোসল করে পাক সাফ হয়ে যাও। যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও বা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা নারীদেরকে স্পর্শ করে থাকো এবং পানি না পাও, তাহলে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও। তার ওপর

[৩৩৬]. mnxn gmwjg, প্রাগুক্ত, পবিত্রতার অধ্যায়, হাদীস নং ৪২৭

[৩৩৭]. cv, ৩, জামে সগীর, আত-তাদভীন ফি আখবারে কাযভীন রির রাফিয়ী, হাদীস নং-৩৩৬৯, যয়ীফ

[৩৩৮]. আল কুরআন, ২:২২২

Dhaka University Institutional Repository

হাত রেখে নিজের চেহারা ও হাতের ওপর মাসেহ করে নাও। আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না; বরং তিনি চান তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে দিতে, হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।"[৩৩৯]

হাদীস শরীফেও এ বিষয়ে বর্ণনা এসেছে। রিওয়ায়াতটি মুসনাদে আল-বাযযার হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। উল্লেকযোগ্য বক্তব্য হলো, হযরত সালেহ ইবনে আবূ হাসসান রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত সাঈদ উবনুল মুসাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি যে নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্চন্ন, অতএব তিনি পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি দয়াময় ও দানশীল, তাই দানশীলতা ও বদান্যতা পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা বাড়ির আঙ্গিনা পরিস্কার রাখো। কিন্তু ইয়াহূদীদের অনুসরণ করো না।"[৩৪০]

যেহেতু ইয়াহূদীরা তাদের বাড়িঘর ও আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না, তাই তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রিওয়াতটি মুসনাদে আল-বাযযার হাদীস গ্রন্থেও উদ্ধৃত রয়েছে। এই হাদীসের শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে, আমাদেরকে বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাচারি, হাট-বাজার, বাড়ির উঠান এবং আঙ্গিনা ইত্যাদি সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে হবে। তাহলে আমরা অনেক অসুখ-বিসুখ থেকে দূরে থাকতে পারবো। তাছাড়া নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ময়লা-আবর্জনা সঠিকভাবে নির্দ্রিষ্ট স্থানে ফেলে দিতে এবং পরিবেশ দূষণ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন নিশ্চিত করা। জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা, বিশেষ করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা (Replacement level of Fertility) অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্য সেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করা। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা।

অতি দরিদ্র ও অল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গ্রহণযোগ্য করা ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।

চিকিৎসা সেবাসহ স্বাস্থ্য খাতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। সরকারি স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র ও হাসপাতাল সমূহে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল নিশ্চিত করা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনপূর্বক সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা। বেসরকারি মেডিকল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের সেবার মান নিশ্চিত করা এবং সেবা ও শিক্ষার ব্যয় জনসাধারণের নাগালের মধ্যে রাখা। সকল চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা ও মেডিকেল টেকনোলজি ও স্বাস্থ্যসেবা সহায়কদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগোপযোগী করা। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা নিশ্চিত করা।

---

[৩৩৯]. আল কুরআন, ৫:৬

[৩৪০]. wZiwghx, প্রাগুক্ত, অধ্যায় শিষ্টাচার-পরিচ্ছন্নতা, হাদীস নং-৩০২৯

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা এবং এ লক্ষে টিকাদান (Immunization) কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা ও শক্তিশালী করা। স্বাস্থ্য তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য বিপর্যয় ও রোগ-ব্যাধির গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য রাখা এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করা। বিকল্প চিকিৎসা (ইউনানি, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথি) পদ্ধতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্চা

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান উন্নয়ন করতে হবে এবং তা সর্বজনীন করা হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের কর্মকান্ড জোরালো করা হবে এবং স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর অংশীদারিত্বে পরিচালিত হবে। প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। তবে বিশেষ ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত কম জনগোষ্ঠীর জন্যও (যেমন-চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল) কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা যেতে পারে। দ্রুত নগরায়ণের ফলে শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার সাথে সাথে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পিত পরিবার গঠণ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। কার্যকর রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই জটিলতর রোগীদের পরবর্তী ধাপে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

জরুরী স্বাস্থ্য সেবা জীবন বাঁচাতে পারে বিধায় সর্বজনীন জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এ মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি কাজ বা অভ্যাসকে যথাযথ সুন্দরভাবে সমাধা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলোকে আমরা স্বভাবজাত কাজ বলি। কারণ এসব কাজ প্রত্যেক মানুষই স্বাভাবিকভাবে যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন করে থাকে। এগুলো প্রত্যেক মানুষ তথা মুসলমানদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ও রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার জন্যই প্রয়োজন। এসব কাজের স্বাস্থ্যগত মূল্য প্রচুর।[৩৪১] আরোগ্যমূলক ও পুনর্বাসন সেবাগুলোর সন্তোষজনক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ (Epidemiological Surveillance) পদ্ধতিকে বিস্তৃত করে রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের কতিপয় অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা, গোদ রোগ, কৃমি এবং কালাজ্বর, এইচআইভি/এইডসের হুমকি, জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইচআইভি/এইডসের ব্যাপারে যথাযোগ্য নজরদারি, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা, একাধিক ওষুধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মার জন্য কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং কালাজ্বর প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয়ে অগ্রগতি

[৩৪১]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, C৺, ३, পৃ-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি উন্নত স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফাইলেরিয়া এবং মাটিবাহিত কৃমি রোগ বিস্তার প্রতিরোধে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরবী ইবনে মাজাহ কিতাবের অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (২০০২) অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোগ সংক্রমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।"[৩৪২] অপরদিকে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসেও নবীজির একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে। "রোগ সংক্রমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কোনো উট চর্মরোগে আক্রান্ত হলে অন্য উট তার সংস্পর্শে এসে চর্ম রোগাক্রান্ত হয়। তখন তিনি বললেন, এটা তাক্‌দীর! তা না হলে প্রথম উটটিকে কে চর্ম রোগাক্রান্ত করেছে?"[৩৪৩]

উপরোক্ত সবগুলো রেওয়াতের ভাষ্য হচ্ছে রোগ সংক্রমণের কোন বাস্তবতা, অস্তিত্ব বা সত্যতা নেই। তবে অসূস্থ্য উটগুলোকে সুষ্থ্য উট থেকে দুরে রাখতে হবে। কারণ জীবাণু সংক্রমিত হওয়া অনেক সময় রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৩৪৪] যেমন অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী হয়। মহান আল্লাহ মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, মানুষকে ক্ষতিকর বস্তু থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। সঠিক ভাবে জীবন-যাপন করা মানুষের বুদ্ধিরই পরিচয়। কিন্তু মানুষ যদি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক বিধাণাবলী সঠিকভাবে মেনে না চলে তাহলে তার জীবনীশক্তি ক্রমান্বয়ে দূর্বল হতে থাকে। জীবনীশক্তি দূর্বল হলে রোগ প্রতিরোধ শক্তিও দূর্বল হয়ে পড়ে। দূর্বল জীবনীশক্তি খুব সহজেই রোগা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। ফলে, যে কোন প্রণীই খুব সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তার নিকটে যদি কোন রোগাক্রান্ত প্রাণী বা রোগ-জীবাণু অবস্থান করে তাহলে সে খুব সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। বস্তুঃত একেই আমরা ছোঁয়াচে রোগ বলি। একই পরিবেশে বসবাস করে জীবনীশক্তি সবল প্রাণী ছোঁয়াচে রোগে আক্রন্ত হয় না। রোগাক্রান্ত হওয়ার জন্য দূর্বল জীবণীশক্তি দায়ী। স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন-যাপন না করা এর মূল কারণ।

অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ

গতানুগতিক অসংক্রামক রোগ যেমন- ক্যান্সার, ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোক প্রভৃতির প্রকোপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়া গতানুগতিক নয় এমন রোগ যেমন- মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, সড়ক-রেল-নৌ দুর্ঘটনা, বিভিন্ন ধরণের দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্য-সমূহ, পানিতে ডোবা, পোড়া, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সমস্যা ইত্যাদি বর্তমানে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। বহু সংখ্যক মানুষ আর্সেনিক-দূষিত পানি ব্যবহার করছে এবং ফলশ্রুতিতে আর্সেনিক সংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। শৈশব-কালীন উন্নয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে মেধা উন্নয়নের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

---

[৩৪২]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৫৩৯

[৩৪৩]. cÖv¸³, হাদীস নং ৩৫৪০

[৩৪৪]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ-৬৫-৬৬

নতুন রোগের আবির্ভাব এবং পুনরাবির্ভাব

দেশে প্রায়ই নতুন রোগ ও স্বাস্থ্য সমস্যার আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব ও লক্ষণীয় যেমন: এভিয়ান ফ্লু, ডেঙ্গু, নিপা ভাইরাস ইত্যাদি। এ সকল রোগের উপর নজরদারি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থ্যা যথোপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত ব্যাধি, শৈত্য ও উষ্ণ প্রবাহ সংক্রান্ত ব্যাধি, পানিবাহিত রোগ, পরজীবীবাহিত রোগ যেমন-ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি এবং পুষ্টি-হীনতা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার ব্যাপারে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ।

এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল

বাংলাদেশের বর্তমান স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, সেবা গ্রহণে এলাকাভিত্তিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষার অগ্রগতির তারতম্য রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়ভাবে বৃহত্তম পরিকল্পনা কর্মকৌশলের পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক এবং অপেক্ষাকৃত কম অগ্রগতিসম্পন্ন এলাকায় বিশেষ কার্যক্রমের পরিকল্পনা কর্মকৌশল গ্রহণ করা;

(ক) স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ও লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থানীয়ভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা;

(খ) দেশের উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীকে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উপকূলীয় এলাকার বাস্তবতার আলোকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(গ) স্থানীয়ভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচীর সমন্বয় করা ও প্রয়োজনে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঘ) স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সক্ষম দম্পতিদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ভিত্তিতে বিভাজন (Client segmentation) করা ও উপযুক্ত সেবা নিশ্চিত করা।[৩৪৫]

নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ও বেসরকারি খাতে উচ্চ মূল্যের দরুন গরিব জনগণ, বিশেষত: বস্তিবাসীরা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন আরো বেশি বস্তি, জনবসতি, দুর্বল বাসস্থান অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং নিম্নমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সৃষ্টি করছে যা জীবনধারণ এবং স্বাস্থ্যের মানকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করছে। দ্রুত বর্ধনশীল দরিদ্র নগরবাসীর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ করা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকার বস্তি, ভাসমান ও দরিদ্রজনগোষ্ঠীর পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে

---

[৩৪৫]. evsjv‡`k RbmsL¨v bxwZ, প্রাগুক্ত 2012, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা। বিশেষ করে শহরে গ্রহীতামুখী সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা প্রয়োজন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো টাউন প্লানার বা road expert ছিলেন না। তবুও তাঁর মুখ থেকে আমরা রাস্তার প্রশস্ততা সম্পর্কিত নির্দেশনা পাই। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা কোন রাস্তার ব্যাপারে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে তখন তোমরা রাস্তা বা গলি সাত হাত প্রশস্ত রাখো।"[৩৪৬] ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, "তোমরা রাস্তার প্রস্থ নিয়ে মতানৈক্য করলে তা সাত হাত চওড়া করো।"[৩৪৭] যদিও ঐ সময়ে গাড়ি, বাস, ট্রাক ছিলোনা, তথাপিও তিনি রাস্তা বা গলি প্রশস্ত বরাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং রাস্তার প্রশস্ততা সাত হাত করতে বলেছেন। কোনো রাস্তা বা গলির প্রশস্ততা যদি সাত হাত হয় তাহলে সহজেই এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিসসহ সব রকম যানবাহন প্রবেশ করতে পারে। অতএব আমাদের কোন রাস্তাই সাত হাতের কম হওয়া উচিত নয়। তাহলে যেমন একদিকে প্রয়োজনীয় সময়ে সহজেই সেবা পাওয়া সম্ভব তেমনি হাদীসের নির্দেশনাও পালন হবে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শহরের তুলনায় কম। সে খানে স্বাস্থ্য সচেতনতাও কম। মলমূত্র ত্যাগ করা সকল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রাকৃতিক বিধান। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"তোমরা দুটো বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থেকো, যা আল্লাহর অভিসম্পাতের কারণ স্বরূপ। উপস্থিত সাহাবীরা বরে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! সে দুটো জিনিস কি? যা অভিসম্পাতের কারণ? তিনি উত্তর দেন, জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় এবং ছায়াপ্রদানকারী গাছের নিচে যেখানে লোকজন বিশ্রাম গ্রহণ করে ও আশ্রয় নেয়, সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা।"[৩৪৮] আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন," তোমাদের কেউই বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করবেনা, যে পানি প্রবাহিত হয়না এবং পরে সে পানিতে গোসল করা উচিত নয়।"[৩৪৯] সঠিক স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা যেমন বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করে তেমনি উত্তমরূপে শৌচকার্য করা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি ও পবিত্র লাভের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।[৩৫০] সঠিক স্থানে মলমূত্র ত্যাগ ও শৌচকার্যের উত্তম পদ্ধতি না জানার কারণে গ্রামের সাধারণ জনগণ নানা ধরণের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। কোন স্বাস্থ্য সচেতন লোক নিজের মলমূত্র নিজহাতে স্পর্শ করেনা। এটি রুচি বিরোধী ও অত্যান্ত অপবিত্র কাজ। এটি স্বাস্থ্যসম্মতও নয়। কারণ মলমূত্র থেকে অনেক জীবাণু হাতের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সংক্রমিত হতে পারে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সম্পর্কিত সুন্নাতগুলো পুরোপুরি আধুনিক ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইস্তিনজা করার সময় ডানহাত ব্যবহার করবেনা এবং কোনো

---

৩৪৬. Ave 'vD', প্রাগুক্ত, অধ্যায় বিচার, হাদীস নং ৩৫৯৪

৩৪৭. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় বিচার ও বিধান, হাদীস নং ২৩৩৯

৩৪৮. mnxn gmwjg, প্রাগুক্ত, অধ্যায় পবিত্রতা, হাদীস নং ৫১১

৩৪৯. mnxn Avj eLvix, প্রাগুক্ত, অধ্যায় অযু, হাদীস নং ২৩২

৩৫০. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cv, ³, পৃ-৮৬

বরতন বা পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করবেনা।"[৩৫১] হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবার লোকদের বললেন, মহান আল্লাহ তোমাদের পবিত্রতার খুবই প্রশংসা করেছেন। তিনি কুবার রোকদের নিকট জানতে চান এর রহস্য কি? তারা উত্তর দিলেন, আমরা ঢিলা ও পানি উভয়টি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করি।"[৩৫২] "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইস্তিনজার পর পবিত্রতা লাভের জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের আগে ঢিলা ব্যবহার করবে।"[৩৫৩] উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্যকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার উপরে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কমিউনিটি ক্লিনিক হবে স্বাস্থ্য সেবার প্রাথমিক স্তর। তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক-এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেফারেল ব্যবস্থার উন্নয়ন করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ কার্যক্রম

জনসংখ্যা, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য কার্যক্রমে আচরণ পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা:

(ক) মা ও শিশুমৃত্যু হ্রাস ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা এবং বিদ্যমান সুবিধা ও অসুবিধাসমূহসহ অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক এগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচারণা জোরদার করা প্রয়োজন।

(খ) প্রসব-পূর্ববর্তী সেবা এবং প্রসব-পরবর্তী সেবা গ্রহণে আচরণ পরিবর্তনে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(গ) প্রজননতন্ত্র ও যৌনরোগের সংক্রমন, এইচআইভি/এইডসহ যাবতীয় সংক্রামক ব্যাধি রোধকল্পে আচরণ পরিবর্তনমূলক প্রচারণায় সহায়তা করা প্রয়োজন।

(ঘ) সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং অন্যান্য গণযোগাযোগ মাধ্যমে জনসংখ্যা, পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি, মা ও শিশুস্বাস্থ্যসহ বহুমুখী এবং হৃদয়গ্রাহী জরুরি বার্তা নিয়মিত প্রচার নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) লিঙ্গভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ ও এর ব্যবহারের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করা প্রয়োজন।

(চ) তৃণমূল হতে জেলা পর্যায় পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন, সরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন, মহিলা নেতৃবৃন্দ, নবদম্পতি ইত্যাদির গ্রুপভিত্তিক বিষয় নির্বাচনপূর্বক অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা প্রয়োজন।

(ছ) অঞ্চলভিত্তিক ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বার্তা তৈরী ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোর সহায়তায় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উল্লিখিত বার্তা প্রচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

(জ) বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক তাদের প্রচারিত বিজ্ঞাপনে পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি বিষয়ক সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রচার করা। বিশেষ করে সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে বেসরকারি রেডিও ও টেলিভিশনে পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি বিষয়ক প্রচারণার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

---

[৩৫১]. Ave 'vD', প্রাগুক্ত, অধ্যায় পবিত্রতা, হাদীস নং ৭

[৩৫২]. cv¸ ³, অধ্যায় পবিত্রতা, হাদীস নং ৪৪

[৩৫৩]. Avb-bvmvC, প্রাগুক্ত, অধ্যায় পবিত্রতা, হাদীস নং ৪৪, ৪৫

(ঝ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।[৩৫৪]

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ধরণ ও জীবনযাপন রীতির পরিবর্তন

গত দু'দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ধরণ ও জীবনযাপন পদ্ধতির বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। বয়স্ক জনসংখ্যা এবং নগরায়ন বৃদ্ধির সাথে বাড়ছে রোগ-ব্যাধি ও মানসিক সমস্যা। জীবনযাত্রার রীতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে, যেমন চর্বিযুক্ত খাবার, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, বিনোদন সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা, তামাকের ব্যবহার, মাদক এবং পানীয়ের প্রতি আশক্তি, বেপরোয়া ড্রাইভিং, সহিংসতা ইত্যাদি এগুলো নগর এলাকার চিত্রকে আমল বদলে দিচ্ছে। নগরায়নের ফলে পরিবার কাঠামোতে এবং বসবাস ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে, শিশুদের ও বড়দের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছে।

খাদ্যদ্রব্য ও রোগব্যাধি

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষার এবং জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। স্বাস্থ্য রক্ষার মূল উপাদান সুষম খাদ্য। খাদ্য দ্রব্য শরীরের উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে। শরীর ভাল থাকলে মনও ভাল থাকে। তাতে নৈতিক চরিত্র উন্নত হয় এবং মন ভাল থাকলে আত্মাও ভাল থাকে। আবার খাদ্য দ্রব্যে হালাল হারামের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান মূলত তিন প্রকার। যথা: এক. তিব্বুন রূহানী বা দু'য়া-দরূদ এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনার মাধ্যমে চিকিৎসা। ইংরেজীতে এটাকে বলে spiritual medicine of the prophet (SAWS). দুই. তিব্বুন রিফায়ী, অর্থাৎ সঠিক পানাহার তথা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধমূলক ছিকিৎসা। That is, preventive medicine of the Prophet (SAWS). তিন. তিব্বুন তবয়ী বা তিব্বুন জিসমানী অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ বা গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে চিকিৎসা। এটাকে ইংরেজীতে বলা হয় physical medicine of the prophet (SAWS). আর এই তিনটির সমন্বয়ে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন, তাকে বলা হয় তিব্বুন নববী বা Prophetic medicine hf Medicine of the Prophet (SAWS).[৩৫৫]

বস্তুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পন্থায় যদি আমরা পানাহার করি অর্থাৎ পরিমিত পরিমাণ হালাল, ভালো ও পবিত্র খাদ্যদ্রব্য সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে গ্রহণ করি, তাহলে অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো। পবিত্র খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ ۖ **فَمَنِ اضْطُرَّ** غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

[৩৫৪]. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাগুক্ত, evsjv‡'k RbmsL¨v bxwZ 2012, পৃ. ৬

[৩৫৫]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ-৯০

তোমাদের জন্য মৃতদেহ, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম ঘোষণা করা হয়েছে সে সব প্রাণী হারাম করে দিয়েছেন, তবে কোন লোক যদি বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে সে তা বিদ্রোহী হিসেবে অথবা সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে না করে, তবে তাতে কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহ কারী।[৩৫৬]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ **فَمَنِ اضْطُرَّ** فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের জন্য মৃত প্রণীর মাংস, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবেহকৃত প্রাণীর মাংস, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর মাংস, কঠিন আঘাতে নিহত প্রাণীর মাংস, উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর মাংস, শিঙ্গের আঘাতে (পশু লড়াই) নিহত প্রাণীর মাংস, যে প্রাণীর কিছু অংশ কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে অবশ্য যদি তাকে যবেহ করার সুযোগ পাওয়া না যায় বা কোন বেদীর উপর বলি দেওয়া হয়েছে এবং যে মাংস তীর ছুড়ে (পাশা খেলার ন্যায়) ভাগ্য নির্ণয় করা হয়েছে, এসবই হারাম, এসবই ফাসেকি কাজ।[৩৫৭]

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

হে রাসূল, লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কোন্ কোন্ খাদ্য তাদের জন্য হালাল। বলুন, তোমাদের জন্য সকল পবিত্র জিনিষই হালাল এবং যদি তোমরা তেমাদের শিকারী প্রাণীকে আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে শিকার ধরা শিক্ষা দাও তবে তারা যে সব প্রাণী তোমাদের জন্য ধরে আনে তা খাও। তবে তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নিও। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হিসাব খুব তাড়াতাড়ি নেবেন।[৩৫৮]

খাদ্যই হচ্ছে শরীরের শক্তির মূল উৎস। খাদ্য গ্রহণের ফলে বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদানগুলো রক্তের ভেতরে চলে আসে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণকৃত অক্সিজেনের সাহায্যে সেগুলোর দহন ঘটে। ফলে দেহে তাপ শক্তি তৈরী হয়। প্রতিনিয়ত মানবদেহে ক্ষয় ঘটছে। মানবদেহের এই ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনের কাজটিও পালন করে খাদ্য। খাদ্য একদিকে যেমন ক্যালোরী তৈরী করে অন্যদিকে শরীরকে রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এন্টিবডি তৈরী করে। প্রকৃতির হাজার রকম ফল-মূল, শাক-সব্জি হতে পারে আমাদের খাদ্যের উৎস। আর এই খাদ্য বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শরীরের উপযোগী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শরীরযন্ত্র কখনও সম্পূর্ণ বিশ্রাম অবস্থায় থাকেনা। জাগ্রত অবস্থায়তো কাজ করেই, ঘুমের মধ্যেও আমাদের শরীর কিছু কিছু কাজ করতে থাকে। ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, কিডনীসহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনবরত কাজ করতে থাকে। সেই সঙ্গে দেহের প্রতিটি কোষের সূক্ষতর অংশের মধ্যে চলতে থাকে বিপাক প্রক্রিয়া। শরীরকে সচল রাখার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গে এই যে সব প্রক্রিয়া চলতে থাকে এটাই বিপাক প্রক্রিয়া। আর শরীরকে সচল রাখার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ন্যূনতম যে সব প্রক্রিয়া চলতে থাকে, তাকে বলা হয় ন্যূনতম বিপাক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় যে শক্তি বা ক্যালোরি ব্যয় হয় তার নাম নূন্যতম ক্যালোরি।

---

৩৫৬. আল-কুরআন ২ : ১৭৩

৩৫৭. আল-কুরআন ৫ : ৩

৩৫৮. আল-কুরআন ৫ : ৪

কোন কাজ না করলেও বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতিদিন প্রায় ১৪০০-১৮০০ কিলোক্যালোরি শক্তি ব্যায় হয়।[৩৫৯]

শারীরিক সুস্থতার জন্য স্বাস্থ্যকর খাবারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশসহ সব উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বাড়ার প্রবনতা আরও বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। দারিদ্র খাদ্যের অভাব জনিত পুষ্টিহীনতা জনশক্তিকে পর্যুদস্ত করার একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্যের মধ্যে যে সমস্ত মৌলিক উপাদান যেমন, আমিষ (Protein), স্নেহ (Fat) ও শর্করা (Carbohydrate) আছে তার মধ্যে শিশুদের দেহগঠন ও বর্দ্ধনের জন্য আমিষের গুরুত্ব সর্বাধিক। যদি কোন কারণে শিশু আমিষ হতে বঞ্চিত হয় এবং শরীরে তাপ সৃষ্টির মাত্রা (calorie) শর্করা জাতীয় উপাদান দিয়ে পূরণ করা হয় তাহলে শিশুর শরীরে প্রভাবিত হয়ে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে খাদ্যে আমিষ ঘাটতি জনিত অপুষ্টি বা সংক্ষেপে আমিষ ঘাটতি রোগ (Protein deficiency malnutrition or Kwashiorkor) বলে। সিসিলি ইউনিয়ন আফ্রিকা মহাদেশের ঘানায় 'সা' উপজাতীয়দের মধ্যে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই রোগের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। এর পূর্বে ১৯০৬ সালে জার্মানীতে, ১৯২৪ সালে ইন্দোচীনে, ১৯২৬ সালে মেক্সিকোতে এবং ১৯২৮ সালে পূর্ব আফ্রিকাতে এই রোগ পরিলক্ষিত হয়েছে বলে বিবরণ পাওয়া যায়। বর্তমানে এই রোগ এই ভূখন্ডের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিরাজমান। সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে পুষ্টির অভাব হয়:

১। দারিদ্রতা: দেহগত পুষ্টির জন্য আমিষের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। প্রাকৃতিক উপায়ে যে সমস্ত আমিষ জাতীয় খাদ্য পাওয়া যায় (যথা: মাছ, মাংশ, ডিম, দুধ, পনির ইত্যাদি) তার মূল্য তুলনামূলক ভাবে বেশী। আমাদের দেশ দরিদ্র সুতরাং জনসংখ্যার বিরাট অংশের পক্ষেই তাদের নিজের ও সন্তান-সন্ততিদের প্রতিপালনের জন্য এই মহার্ঘ বস্তুটির সংগ্রহ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। গর্ববতী মহিলাদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার দরুন কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মের হার বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশ।[৩৬০] ফলে, প্রকৃত পক্ষে শিশুরাই এই আমিষ ঘাটতি জনিত অপুষ্টি রোগের শিকার হয়।

২। অজ্ঞানতা: এদেশের বেশীর ভাগ লোকই খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া অতবা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আমিষজাতীয় খাদ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকায় তারা সন্তানদের খাদ্যে যথা সময়ে আমিষ অন্তর্ভূক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। ফলে দ্রুত শরীর গঠনের সময়, যখনই আমিষের প্রয়োজনের তাগিদ আসে, তখনই শিশুরা আমিষ হতে বঞ্চিত হওয়াতে তাদের দেহ গঠন প্রনালীর উপর প্রভাব সৃষ্টি হয়।

৩। খাদ্য সম্বন্ধে কুসংস্কার বা ভুল ধারণা: গ্রামাঞ্চলে স্থান ও সমাজ ভেদে খাদ্য সম্বন্ধে কুসংস্কার বা ভুল ধারণা দেখা যায়। যেমন কোন কোন স্থানে মাছ খেলে কুষ্ঠ বা শ্বেতকুষ্ঠ হয়। আবার কোথাও মাংস বা খেলে নানাবিধ কৃমি রোগ হয়। এ ধরনের অলিক বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমুল হয়। দৃষ্টান্ত ভেদে আবার কোথাও কোথাও চাউলের গুড়া বা ভাতের ফেন সম্বন্ধে সুফল প্রচারের মাত্রাধিক্য দেখা যায়। যেহেতু উপরোক্ত বস্তুদয় প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশই শর্করা উপাদান সমৃদ্ধ সেহেতু আহার্য কেবল তাতে সীমিত থাকলে আমিষের অভাব জনিত উপসর্গ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

---

[৩৫৯]. ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, tgŠjK cö6 ciiPZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৩৬০]. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৪। জীবাণুর সংক্রমণ: খাদ্যজনিত কারণ ছাড়াও আমিষ ঘাটতি রোগের কারণ অনুসন্ধান করলে শতকরা ষাট ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় উদরাময় ও কৃমি রোগের জন্য আহার্য বস্তু (বিশেষ ভাবে আমিষ জাতীয় উপাদানগুলি) অন্ত্র হতে বিশোষিত (absorption) হতে বাধাপ্রাপ্ত হয় ফলে আমিষের অপচয় হয়। শ্বাসযন্ত্রের রোগের কারনে বিশেষ ভাবে যক্ষা রোগ বা কাশি হলে শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশী পরিমাণে আমিষের প্রয়োজন হয়। আমিষের সম্পূরণ যথাযথভাবে না হলে তা অবস্থাকে আরো অবনতির দিকে ঠেলে দেয়। শতকরা ২০ হতে ৪০ ভাগ ক্ষেত্রেই হাম বা ম্যালেরিয়ার পরেই একক ভাবে মহামারীরূপে আমিষ ঘাটতি রোগের প্রাদূর্ভাব পরিলক্ষিত হয়।

৫। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্দকতা: দরিদ্র সন্তানের জন্য আমিষ ও কেলরির একমাত্র উৎস হচ্ছে মাতৃদুগ্ধ। যদি স্তনে দুধ কম বা বন্ধ হয়ে যায় অথবা পূণরায় গর্ভবতী হলে শিশুকে অন্য বিকল্প খাদ্য দিতে হয়, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তাহলে শিশুর পুষ্টি সাধনে বিঘ্ন ঘটে।
কোন কোন ক্ষেত্রে মায়ের অল্প বয়সের জন্য বা মায়ের অন্য কোন কারনে সন্তান লালন-পালনে অক্ষমতা থাকলে অথবা শহরে স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে অথবা নিজের চাকরীর কারনে মাকে রেহায় দেয়ার জন্য দেশে দাদী বা নানীরা সন্তান পালনের ভার নেন। যদিও তারা শিশুদের যত্নের ত্রুটি করেন না তবুও প্রায়ই দেখা যায় শিশুরা মাতা পিতার সান্নিধ্যের অভাবে মানসিক কারনে খিটখিটে মেজাজের হয়ে থাকে ও খাদ্য গ্রহণে অবাধ্যতা প্রকাশ করে। ফলে, শিশুর ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় এবং শিশু আমিষ ঘাটতি রোগের শিকার হয়।

রোগের লক্ষণ দ্বারা এই রোগ নিরূপন করা যায়। আমিষ ঘাটতি রোগের উপসর্গগুলো শিশু ভেদে ও স্থান ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এগুলিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যেতে পরে।
(ক) সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান উপসর্গ।

(খ) সাধারণ ক্ষেত্রে বিদ্যমান উপসর্গ।

(গ) কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যমান উপসর্গ ও লক্ষণ।

(১) দৈহিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত ও বয়সানুপাতে ওজনের স্বল্পতা।
(২) শোথ: সাধারণত পায়ের নিম্নাংশ ও পায়ের পাতায় পানি জমে ফুলে উঠে কিন্তু রোগ আরও কঠিন রূপ ধারণ করলে পেটের উপরিভাগ, যৌনাঙ্গ, হাত ও চোখের নীচে শোথ দেখা দেয়।
(৩) মাংসপেশী সমূহে ক্ষীনতা: যেহেতু পেশীর পুষ্টির জন্য আমিষের প্রয়োজন এবং যেহেতু এই রোগীদের ক্যালোরির বেশীর ভাগই স্নেহ বা শর্করা দ্বারা পূরণ হয় সেই জন্য পেশীর ক্ষয় হলেও চামড়ার নীচের পেশী ঠিকই থাকে। ফলে আপাত দৃষ্টিতে শিশুকে ক্ষীন মনে হয় না।
(৪) মানসিক পরিবর্তন: স্বাভাবিক শিশুসুলভ চাঞ্চল্য ও প্রফুলতার পরিবর্তে নিস্পৃহতা, ঘ্যানঘ্যানানি এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি ঔদাসিনতা পরিলক্ষিত হয়।
(ক) মাথার চুলে পরিবর্তন: কাল চুলের রং ক্রমশ হালকা হতে হতে বাদামী রং এমনকি সাদা হয়ে যায়। কুঞ্চিত ও দৃঢ় চুল সরল ও রেশমের মত মসৃন হয়। মাথার চুল কমে যায় এবং টানলে বিনা আয়াসে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল উঠে এবং তাতে শিশু ব্যাথা বোধ করে না।

(খ) ত্বকের পরিবর্তন: সমস্ত শরীরের বিশেষ করে মুখমন্ডলের চামড়া অন্যান্য দেহাংশ অপেক্ষা হালকা বর্ণ ধারণ করে।

(গ) পেটের অসুখ: মাত্রাতিরিক্ত শর্করা জাতীয় উপাদান খাওয়ার ফলে শিশু বার বার মলত্যাগ করে। এছাড়াও ত্বকের নীচে ক্ষত, যকৃতের আকৃতি বৃদ্ধি, ভিটামিন 'এ' এর অভাবে দৃষ্টি স্বল্পতা বা দৃষ্টি হীনতা এবং ভিটামিন 'বি' সমূহের মধ্যে রিবোফ্লাবিনের অভাবে ঠোটের কোনে, জিহবা ও তালুতে ক্ষতের সৃষ্টিসহ অন্যান্য রোগ হতে পারে।

পরামর্শ : প্রতিকারের ব্যবস্থাকে দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রতিকারের উপায় ও ইসলাম

১৮ হাজার মাখলুকাতের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ তার শারিরীক বিভিন্ন অসুস্থতার কারণে চিকিৎসকের শরণাপণ্য হয়। মানুষ অসুস্থতায় যাঁর কাছে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আশা ও আশঙ্কা নিয়ে ছুটে আসেন তিনি একজন চিকিৎসক। একজন দক্ষ ও ভাল চিকিৎসক রোগীর চোখে মহামানবের মতো উচ্চ আসনে বসবাস করেন। স্রষ্টাকে মানুষ দেখতে পান না কিন্তু একজন সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় মানুষ যখন আরোগ্য লাভ করেন তখন তিনি স্রষ্টাকে অনুভব করেন আর কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েন সেই চিকিৎসকের কাছে। এ কারণে চিকিৎসকের সঙ্গে সেবা কথাটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাধারণভাবে একজন চিকিৎসকের দুর্ব্যবহার, অদক্ষতা আর অনৈতিক আচরণ একজন নাগরিককে ক্ষুদ্ধ ও মর্মাহত করে। চিকিৎসাসেবা প্রদানে চারটি বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেসব যথাক্রমে– চিকিৎসক, রোগ নির্ণয় কেন্দ্র বা ল্যাব, হাসপাতাল-ক্লিনিক এবং ওষুধ।

১। স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা: যতদিন পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যপান করানো সম্ভব ততদিন পর্যন্ত স্তন্যপান করাতে উৎসাহিত করতে হবে। সকলকে সহজলভ্য প্রাকৃতিক আমিষযুক্ত খাদ্য সমূহের সাথে পরিচিতি করান এবং তার গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা উচিত। নিয়োমিত স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

২। দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা: দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণে জনস্বাস্থ্য বিভাগ, খাদ্য বিভাগ ও কৃষি বিভাগের যৌথ দ্বায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব-কর্তব্য

জনসাধারণের নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবার জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ

(ক) জনসমাজের পুষ্টির উন্নতি সাধন এবং পুষ্টি অবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ।

(খ) সংক্রামক ব্যধির প্রতিরোধ।

(গ) অপুষ্টি রোগের আশানিরূপণ ও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা।

(ঘ) শিশু মঙ্গল ও স্বাস্থ্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন এবং ঐ সব স্থানে শিশু খাদ্য সরবরাহ।

(ঙ) গ্রামে গ্রামে অপুষ্টি রোধের জন্য বাড়ী বাড়ী যেয়ে চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রকল্প বিবেচনা করা।

(চ) পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাত হতে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

খাদ্য ও কৃষি বিভাগের দায়িত্ব-কর্তব্য

জনসাধারণের নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবার জন্য খাদ্য ও কৃষি বিভাগের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ

(ক) উন্নতমানের আমিষবহুল রবিশষ্য ও তেলবীজের চাষ করতে জনসাধারণকে উৎসাহিত ও সাহায্য প্রদান করতে হবে।

(খ) ডিম, দুধ, মাছ ও পশুপালন ইত্যাদি সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান ও উপকরণসমূহ সুলভ মূল্যে বিতরণ।

(গ) দুধ বিশুদ্ধকরণ এবং টিনজাত করণ।

(ঘ) প্রত্যেক পরিবারের চিরাচরিত খাদ্যে আমিষের ঘাটতি থাকলে সম্পুরক আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

সমস্যাটি এককভাবে চিন্তা না করে জাতীয় সমস্যা বলে বিবেচনা করতে হবে। কারণ আজকের সুস্থ শিশু আগামীকালের সুস্থ নাগরিক এবং সুস্থ নাগরিক ব্যতীত জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো কিছুতেই শক্তিশালী হতে পারে না।[৩৬১]

প্রথম সন্তানের জন্য মায়ের স্বাস্থ্য-পুষ্টি বিষয়ে প্রস্তুতি অনেক বেশি থাকে। পরবর্তী সন্তানদের জন্য তেমন থাকেনা। আমাদের দেশের গ্রাম অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ গরিব হওয়ার কারণে এই অবস্থা ঘটে। প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণের পর পরিবারের উপর যে অর্থনৈতিক চাপ পড়ে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম গ্রহণের সময় সে চাপ অনেক পরিবারের পক্ষেয় কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয় না। ফলে, পরিবার পরিমাণ মতো পুষ্টির যোগান দিতে পারে না। এই সময়ে গর্ভবতী মহিলার যে পরিমাণ পুষ্টির প্রয়োজন সেই পরিমাণ পুষ্টি না পাওয়ার কারণে একদিকে যেমন প্রসূতি মাতা অপুষ্টিতে ভুগছে তেমনি ভূমিষ্ট সন্তানও অপুষ্টিতে ভুগছে। এই সময়ে অপর্যাপ্ত পুষ্টির কারণে প্রসূতি মাতা সদ্যজাত শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে না ফলে ঐ শিশু সারা জীবন অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে। দারিদ্রতাই এর প্রধান কারণ। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে সরকারকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ আজকের শিশুরাই আগামী দিনের সম্পদ। কিন্ত অপুষ্ট শিশু কখনও জাতীর ভবিষৎ হতে পারে না। হতে পারে জাতীর অভিশাপ, যা কারো কাম্য নয়।

সমতা ভিত্তিক সেবা প্রদান

জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের এবং বিশেষ করে শিশু ও নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতা ভিত্তিতে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ভোগ করতে প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় সচেতন ও সক্ষম করে তোলা ও সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাত্রা গ্রহণের জন্য আচরণের পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসমূহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের যে কোন ভৌগলিক অবস্থানের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়া। স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুবিধা বঞ্চিত, গরিব, প্রান্তিক, বয়স্ক ও শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী জনগণের অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য

[৩৬১] . ডাঃ আবুল খায়ের মোহাম্মদ কফিলউদ্দিন, †ivM Z_¨ weÁvb I msµvgK e¨wa, মিতা মুদ্রায়ণ, ঢাকাঃ ১৯৭৬ খ্রি. পৃ. ৫৮৬-৫৯২

সমস্যাগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া এবং এ লক্ষ্যে বিরাজমান সম্পদের প্রাধিকার, পূর্ণ বন্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দ্বায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় তহবিল গঠন, ব্যয়ন, পরিবীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পদ্ধতি পর্যালোচনাসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করা। সবার জন্য কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রয়াসের সুযোগ সৃষ্টি ও সহযোগিতা প্রদান করা এবং অংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে সরকারি স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহে উচ্চমূল্যের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি বেসরকারি অংশীদারিত্বে স্থাপনের বিষয়টি পরীক্ষা করা। স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, সেবা দান পদ্ধতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সেবাগুলিকে আরো জোরদার ও সেগুলোর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর, ফলপ্রসূ ও সুদক্ষ প্রযুক্তি গ্রহণ ও যথাযথ ব্যবহার, পদ্ধতি উন্নয়ন ও গবেষণা কর্মকে উৎসাহিত করা। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে স্বাস্থ্যের সাথে কার্যকর সমন্বয় করা।

দরিদ্র, সামাজিকভাবে বঞ্চিত, অশিক্ষিত, প্রান্তিক, দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, বিশেষত: গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং সেই কারখানার শ্রমিক সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও কিছু কর্মসূচী তাদের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কিন্তু এটা তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রবেশ করতে পারছে না। লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে উত্তম শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হবে। মাতৃ মৃত্যু ও এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার কমানোর উপর জোর দিয়ে নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা হবে। নারীদের বিশেষত: গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের এইডস এবং অন্যান্য যৌনরোগ হতে রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নারী বান্ধব কাঠামো তৈরী করতে হবে। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী সমূহের স্বাস্থ্য সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে। এজন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি তৈরি করা হবে।

কারখানার শ্রমিক, কৃষিখাত, পশুপাখি পালনে নিয়োজিত মানুষ, আদিবাসী, দুর্গম এবং দূরবর্তী এলাকাবাসীদের জন্য এবং নারীদের সমাজিক ও পারিবারিক সমস্যার সমাধানে, সহিংসতার বিরুদ্ধে এবং বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার প্রদান

জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকারের মাধ্যমে রোগকে অগ্রসর হতে না দেয়া এবং চিকিৎসাকে দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগ না দেয়া। দেশের প্রতিটি জেলা এবং উপজেলা হাসপাতালে জরুরী বিভাগ রয়েছে। তবে মাঝে মাঝে সঠিক ডাক্তার পাওয়া যায় না। দূর্ঘটনা, হার্টএ্যাটাক, স্ট্রোক এর মতো রোগসমূহ যদি আক্রমনের শুরুতে সঠিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে অনেকাংশেই রোগ বৃদ্ধি ঘটতে পারে না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করেনা, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।[৩৬২]

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّـهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।[৩৬৩] এ কারনে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

জনগণকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সংক্রান্ত জ্ঞান দান

মিকদাম ইবনে মাদীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আদম সন্তান তার পেটের চেয়ে খারাপভাবে আর কোনো পাত্রই পূর্ণ করেনা। মানুষের জন্য কোমর সোজা রাখার লক্ষ্যে কয়েক লোকমা বা সামান্য খাদ্যই যথেষ্ট। আর যদি একান্তই বেশি খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যদ্রব্য, আর এক-তৃতীয়াংশ পানীয় বা পানি দিয়ে পূর্ণ করবে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে।।"[৩৬৪] জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সংক্রান্ত জ্ঞান দান প্রয়োজন। আমাদের দেশে ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে শিক্ষিতের হার ৬০ শতাংশের কম। জনগণ এখনও বিভিন্ন ব্যাধি, সমস্যা অপুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। রোগীকে পরামর্শদান (Counselling) আমাদের সমাজে পেশা হিসাবে স্বীকৃত নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। জীবনযাপন পদ্ধতিকে আরো স্বাস্থ্যসম্মত ও উৎপাদনশীল করার জন্য সামাজিকভাবে শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নতকরণ

সরকারি স্বাস্থ্য অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার এবং এর দক্ষ ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার প্রধান বাধা হলো কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। কেন্দ্রে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর অধিক নির্ভরশীলতা কিংবা জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে সকল স্তরে না পৌঁছানোর কারণে কার্যকর সিদ্ধান্ত পালন দীর্ঘায়িত হয়।

স্বাস্থ্য-গবেষণা পদ্ধতির আধুনিকায়ন

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও কর্মসূচি, সেবা প্রদান ও দরিদ্র-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নে স্বাস্থ্য গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ ও প্রমাণের ভিত্তিতে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে অবশ্যই দুটো ওষুধ রয়েছে, একটি হচ্ছে কুরআন আর অপরটি মধু।"[৩৬৫] প্রাচীন ও আধুনিককালের সকল চিকিৎসাশাস্ত্রেই মধুর উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীনকালে গ্রিক ও মিসরীয়গণ মধু দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহকে যুগযুগ ধরে সংরক্ষিত করতো এবং মধুকে preservative হিসেবে ব্যবহার করতো।

---

৩৬২. আল-কুরআন ১০ : ১০০

৩৬৩. আল-কুরআন ৮ : ২২

৩৬৪. AvZ-wZiwghx, প্রাগুক্ত, অধ্যায় পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি অনাসক্ত, হাদীস নং ২৩২১

৩৬৫. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৪৫২

সাম্প্রতি এক গবেষণায় জানা যায় যে মধু ২২ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হলেও এর গুণাগুণের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়না। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগে এক মিসরীয় রাণীর কবরের ভেতর এক জার মধু পাওয়া যায়, ঐ মধুর তেমন কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেনি।

ওষুধশাস্ত্রের জনক হিসেব পরিচিত Hippocrates প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে তার রোগীর চিকিৎসায় মধু ব্যবহার করতেন। অ্যারিস্টটলও "নিয়মিত মধু সেবনে স্বাস্থ্যর উন্নতি ও দীর্ঘায়ু লাভ হয়" বলে বিশেষ ধারণা পোষণ করতেন। মধু সম্পর্কে গবেষণায় বলা হয়েছে যে মধু immunity system develop করতে সাহায্য করে। মধুতে anti-aging principles বা বার্ধক্য প্রতিরোধের উপাদান রয়েছে। অপর দিকে "কালোজিরা মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের ওষুধ।"[৩৬৬] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম মধু সম্পর্কে যা বলেছেন তা সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত। কালোজিরা ও মধু নিয়ে যদি উচ্চতর কোন গবেষণা করা সম্ভব হয় তাহলে অনেক জটিল ও কঠিন রোগের ওষুধ আবিস্কার হতে পারে। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ প্রয়োগধর্মী জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণা ব্যবস্থার অভাবের ফলে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং গবেষণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিঘ্নিত হয়। স্বাস্থ্য গবেষণার মান ও পরিধি বাড়াতে হবে। এ খাতে অর্থ বরাদ্ধ বাড়াতে হবে। জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতি, সামাজিক ও আচরণগত এবং প্রায়োগিক গবেষণার উপর জোর দিতে হবে। বাংলাদেশে যে সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, গবেষণায় সেগুলোর অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষার জোর দিতে হবে। বিশেষায়িত নার্সিং শিক্ষা (Specialized Nursing) যেমন- কার্ডিয়াক সার্জারি, নিউরো সার্জারি, করোনারি কেয়ার ও অন্যান্য বিশেষায়িত ডিসিপ্লিনে নার্সিং শিক্ষা শুরু করতে হবে। প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্ট সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞানসহ দক্ষতা অর্জনের উপর জোর দিতে হবে।

চিকিৎসা পেশায় নৈতিকতা চর্চা

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশব্যাপী সরকারি স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অবকাঠামো প্রশংসনীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। তবে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ওষুধ সরবরহের অপর্যাপ্ততা, জনবলের অভাব, যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা ও প্রশাসনের জটিলতা এবং সুসংগঠিত রেফারেল পদ্ধতি না থাকায় স্বাস্থ্য অবকাঠামোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।

দেশে চিকিৎসার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় প্রতি বছর আট লাখের বেশি রোগী সুচিকিৎসার খোঁজে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, চিকিৎসক ও ইমিগ্রেশনসহ বিভিন্ন সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। শুধু প্রতিবেশী দেশ ভারতেই চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর পাঁচ লাখের বেশি বাংলাদেশি যাচ্ছেন। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে এ খাতে। সংশ্লিষ্টরা জানান, ভারতে রোগী প্রতি গড়ে এক লক্ষ টাকা খরচ হলে বিদিশে চিকিৎসা বাবদ বছরে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যায় হচ্ছে। রোগীর সাথে স্বজনদের খরচ হিসাব করলে এ খরচের সাথে যোগ হবে আরো প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা।

---

[৩৬৬]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, C, ³, পৃ-২১৫-২১৭

Dhaka University Institutional Repository

ভারত ছাড়া সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক ও অন্যান্য দেশেও চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশীরা নিয়মিত যাচ্ছেন। এতে আরো আট হাজার কোটি টাকা যোগ হলে বছরে মোট ১৬ হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে বেরিয়ে যায়।[৩৬৭] ভারতের সাথে বাংলাদেশের সরাসরি বাস সার্ভিস চালুর পর একে 'অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস' নামে পরিচিতি লাভ করে। ভারতগামী বাস ও ট্রেনে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় অর্ধেকের বেশি যাত্রী রোগী এবং তার স্বজনেরা। ভারতে কেন চিকিৎসা-এমন প্রশ্নের জবাবে সেদেশ থেকে চিকিৎসা নিয়ে আসা রোগীরা বলেন, সবচেয়ে বড় ব্যাপার চিকিৎসক ও নার্সদের সুন্দর আচরণ। এ আচরণ ও ব্যবহারের কারণে রোগীরা ৫০ শতাংশ সুস্থ হয়ে যান। একই মানের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সেদেশে পরীক্ষার সঠিক ফল পাওয়া যায়। দেশে একেক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের একই রোগীর পরীক্ষার একেক ধরনের ফল মিলে। এর ফলে ভুল চিকিৎসা হয় অনেক ক্ষেত্রে। ভারত, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক থেকে চিকিৎসা গ্রহণ শেষে দেশে ফেরা বেশ ক'জন রোগী জানান চিকিৎসার নামে ঐ সব দেশে কোন ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়নি। ভুল চিকিৎসার ঘটনাও কম। একই ডায়াগনিস্টিক পরীক্ষা একাধিকবার করানো, রোগীকে সময় কম দেয়া, বাড়তি আয়ের জন্য রোগীকে অতিরিক্ত সময় কেবিন বা বিছানায় রাখার প্রবনতা নেই সেখানকার চিকিৎসা খাতে। ভুল চিকিৎসার জন্য মাশুল গুণতে হয় সেদেশের ডাক্তারদের। অভিযুক্ত ডাক্তারের লাইসেন্স বাতিল বা ফৌজদারি মামলা হয়। কঠোর আইনের মধ্যেই থাকতে হয় ডাক্তারদের। কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। ভুল চিকিৎসার জন্য রোগীর মৃত্যু ঘটলেও স্বজনেরা থাকেন অসহায়। ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। আমর ইবনে শু'য়াইব তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর পিতামহের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি কেউ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন না করে কারো চিকিৎসা করে, তাহলে সেই রোগীর জন্য সে সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে।[৩৬৮] আব্দুল আযীয ইবনে উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার নিকট যারা আসতেন তাদের বর্ণনা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ডাক্তার না হয়ে রোগীর চিকিৎসা করে এবং তার ডাক্তার হওয়া সম্পর্কে কেউ না জানে, তার চিকিৎসা দ্বারা কারো ক্ষতি হয়, তবে সে যিম্মাদার হবে। যেমন-কেউ যদি রক্তমোক্ষম করতে গিয়ে কোন শিরা কেটে ফেলে, অথবা বড় করে কাটে বা ফাঁড়ে, অথবা এমনভাবে দাগ দেয়, সযাতে রোগী মারা যায়, তবে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে।"[৩৬৯] বাংলাদেশে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা আইন এখনো হিমাগারে। সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারছে না সরকার। ফলে জনসাধারণ অনেকটাই জিম্মি হয়ে পড়েছে ডাক্তার, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর কাছে। জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি এ বিষয়টি বাস্তবায়নে ২০০৫ সালে একটি আইনের খসড়া চুড়ান্তকরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। কেবিনেট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের আগে নিয়মমাফিক ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় খসড়ার কপি। এরপর পাঠানো হয় জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য। উপস্থাপনের আগে ফাইলটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ফেরত আসে। রোগীর মৃত্যু ঘটলে মামলার ধারা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে ফাইলটি ফেরত আসে। বর্তমানে স্বাস্থ্যখাতে এ জাতীয় হাজারো সমস্যা বিদ্যমান। এ সকল সমস্য সমাধানে এবং যুগপোযোগী চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য সরকার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ প্রদান করেছেন। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রদানের চেয়ে

---

[৩৬৭]. শওকত উসমান রচি, ^'wbK bqv w'MšÍ, ঢাকা: ৩ মে ২০১৪ খ্রি. পৃ-১৬

[৩৬৮]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৪৬৬

[৩৬৯]. Ave 'vD', প্রাগুক্ত, অধ্যায় রক্তপণ, হাদীস নং ৪৫১৭

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়ন আরো বেশী কঠিন। সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে সাধারণ জনগণ তার সুফল অর্থাৎ সঠিক স্বাস্থ্যসেবা পায় না। আর স্বাস্থ্যসেবা এমনই বিষয় যার কোন বিকল্প নেই। ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ পূর্বক জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়ীত হলে স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের কাংখিত উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

যেহেতু প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ, পরিচালন ব্যয় এবং আইনি সহায়তার অভাবে নিয়ন্ত্রক পর্ষদসমূহ যথেষ্ট কার্যকর নয়, তাই চিকিৎসা চর্চা অথবা শিক্ষা এবং গবেষণায় নৈতিকতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতি হয়। এ সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা এবং যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

হাসপাতাল-ক্লিনিকের পরিবেশ ও সেবার মান উন্নত করণ

বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালে যেতে মানুষ ভয় পায়। হাসপাতাল শব্দটি মনে হলেই ভীড়, নোংরা পরিবেশ, কোলাহল, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, সময় নেই, দুর্গন্ধ, দুর্নীতি ইত্যাদি অনুষঙ্গ মনের কোণে পাখা মেলে এক কুশ্রী ছবি অঙ্কিত করে। এরই বিপরীতে রাজধানীর বড় বড় প্রইভেট হাসপাতালে গেলে দেখা যায় অন্য চিত্র। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসক-নার্সদের কর্তব্য পরায়ণতা, শিশুদের জন্য অজস্র খেলনার সমারোহ, ছিমছাম, ভীড়হীন একটি পরিবেশ মনে সুখী সুখী ভাব এনে দেয়। বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যে স্বাস্থ্যসেবা জনগণ পাচ্ছেন তা পরিসর ও গুণগত মানের দিক থেকে আরও উন্নীত করা প্রয়োজন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার জন্য উচ্চ ফি এবং অধিক রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষাকে ব্যায়বহুল চিকিৎসার একটি বড় কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়েও জনগণ সন্তুষ্ট নয়। জনবলের স্বল্পতা, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবকে দরিদ্র, দূরবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানো যাচ্ছে না।

চিকিৎসাসেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সরকারের পদ্ধতিগত ত্রুটিও কম নয়। আমাদের চিকিৎসাপদ্ধতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় উপজেলা হাসপাতালে। উপজেলা হাসপাতালে জরুরি বিভাগের জন্য কোন চিকিৎসক দেওয়া হয় না। এ কারণে যে কয়েকজন চিকিৎসক আছেন, তাঁদের দিয়েই চলে জরুরি সেবার কাজ। উপজেলা হাসপাতালগুলো আগে ছিল ৩১ শয্যার। সেগুলোর অধিকাংশই এখন ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। চিকিৎসকের সংখ্যা ৯ জনের স্থানে ২২ জন করার কথা থাকলেও সেই সংখ্যা ৯ জনই আছে। জেলা শহরের সবচেয়ে নিকটবর্তী উপজেলা ছাড়া কোন উপজেলায় পূর্ণসংখ্যক চিকিৎসক থাকেন না। কখনো কখনো আবাসিক চিকিৎসক এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ছাড়া মাত্র একজন মেডিকেল কর্মকর্তা দিয়েই চালানো হয় একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। পূর্ণসংখ্যক চিকিৎসক থাকলেও একেকজন মেডিকেল অফিসারকে দৈনিক গড়ে ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন চিকিৎসক নিয়মিত দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখন আর কোন কাজ করতে পারেন না, তখন তাঁরা ফাঁকির আশ্রয় নেন।

অনেক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি প্রসূতিসেবা পদ্ধতি সরকার চালু করলেও তা বাস্তবে অকার্যকর হয়ে আছে। প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ও আবেদনবিদকে বেলা দুইটার (অফিস টাইম) জরুরি সেবা দিতে হবে বলে তাঁরা প্রসূতিসেবার কোন কাজই করেন না। এ ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে অনেকগুলো উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে। খুবই ভালো উদ্যোগ। কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায়ে একজন চিকিৎসক থাকার

অবকাঠামোগত এবং নিরাপত্তাগত কোন ব্যবস্থা নেই। তাই ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন চিকিৎসক থাকতে চান না। অনেক সময় তাই চিকিৎসা কর্মকর্তা ইউনিয়ন পর্যায়ে পদায়ন করা থাকলেও উপজেলা হাসপাতালে তাদের সংযুক্তি হিসাবে কাজ করানো হয়। উপজেলা পর্যায়ে রাজনীতিকদের কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেটের এবং জোর করে রোগী ভর্তি করিয়ে রাখার জন্য চাপ থাকে।

জেলা পর্যায়ের হাসপাতালেও জরুরি বিভাগে কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকেন না। এমন কি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও জরুরি বিভাগে কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকেন না। দেশের সব চিকিৎসাকেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে আন্তর্বিভাগ এবং জরুরি বিভাগেও ২৪ ঘন্টা রাখার ব্যবস্থা করা অত্যন্তজরুরি। নন-প্রাকটিসিং চিকিৎসকদের জন্য বিশেষ ভাতা থাকা জরুরি। তা না হলে ব্যাসিক বিষয়ে পড়ানোর জন্য এখন যে চিকিৎসক-সংকট রয়েছে তা দূর হবে না।

হাসপাতালগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবল অপর্যাপ্ত। যে জনবল আছে, তাদের দিয়েও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ ঠিকভাবে করানো সম্ভাব হয় না, যার দায় বর্তায় চিকিৎসক কর্তাদের ওপর। হাসপাতাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বেসরকারি সংস্থাকে দ্বায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও বারডেম হাসপাতালে এই পদ্ধতি চালু আছে। হাসপাতালগুলোয় রোগীদের অপেক্ষা করার মতো কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে চিকিৎসা নিতে এসে তারা অপেক্ষা করতে চায় না। সে জন্য রোগীরা একটুতেই উত্তেজিত হয় এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। হাসপাতালগুলোয় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা রাখা জরুরি। বর্তমান চিকিৎসা-সংকট কাটাতে তাই চিকিৎসকদের যেমন নৈতিকতায় ফিরতে হবে, তেমনি সরকারি সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগও জরুরি। তা না হলে রোগীবান্ধব চিকিৎসা পদ্ধতি করা যাবে না।[৩৭০] প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব, পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই। তবুও প্রতিবছর নতুন করে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন পাচ্ছে। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসেও রাজনৈতিক বিবেচনায় ছয়টি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অল্প কয়েকটি ছাড়া অন্য সব বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে রোগী ছাড়াই কেবল থিউরি পড়ে ডাক্তার হয়ে বের হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এদের হাতে রোগীর নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। এর প্রভাব পড়ছে চিকিৎসার উচ্চশিক্ষায়। দেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার পরীক্ষায় (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হওয়ার কোর্স) ৬০ শতাংশের বেশি ডাক্তার চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি এমন নজির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে যে হারে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সে তুলনায় শিক্ষক তৈরি হচ্ছে না। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), পুরানো আটটি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারিভাবে মহাখালীর বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) ডাক্তারদের উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে। এর মধ্যে বিসিপিএসের উচ্চশিক্ষার কোর্স এবং পরীক্ষা পদ্ধতি জটিল বলে এখান থেকে বছরে অল্প ডাক্তার উচ্চশিক্ষার

[৩৭০]. ‰'wbK c_g Av‡jv, প্রাগুক্ত, ১ জুলাই ২০১৪ খ্রি. পৃ. ১১

সার্টিফিকেট পাচ্ছেন। পুরনো আটটি সরকারি মেডিকেল কলেজে রয়েছে শিক্ষক সঙ্কট। ফলে এগুলোও চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।

বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা

প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করা হবে। ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থায় তালবিনা বা যবের গুড়ার মর্যাদা অনেক। প্রখ্যাত হাকীম জালিনুস বলেন, যবের সমতুল্য আর কোনো খাদ্য সৃষ্টি করা হয়নি। কারণ এ খাদ্য সুস্থ্য-অসুস্থ দুই অবস্থায় কাজ করে। এজন্য রোগীকে যবের গুড়া খাওয়ানো হয়, গমের গুড়া খাওয়ানো হয় না। কারণ যবের গুড়া পিপাসা দূর করে, রক্তের চাপ কমায়, পিত্তাধিক্য দূর করে ও পাতস্থলী পরিস্কার করে। চিনির সাথে মেশালে এটি উত্তম খাদ্যে পরিণত হয়। মূলত সকল নবী-রসূল আলাহিমুস সালামের খাদ্য ছিলো যব বা বার্লি। আর এ জন্যই মুসলমানদের জন্য তা উত্তম খাদ্য। বর্তমানে বাজারে শিশুদের জন্য যেসব গুড়া খাদ্য পাওয়া যায় তাতে যবের গুড়া অন্যতম উপাদান হিসেবে থাকে।[৩৭১] হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, “নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের কারো জ্বর হলে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য ‘ডালিয়া’ পাকানোর নির্দেশ দিতেন। সে অনুযায়ী তা তৈরি করা হলে তিনি পরিবারের লোকদের বলতেন অসুস্থ রোগীকে পরিবেশন করতে। তিনি বলতেন, এটি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দূঃখ দূর করে, যেমন তোমাদের কোন মহিলা পানি দিয়ে তার চেহারার ময়লা দূর করে থাকে।”[৩৭২] সে লক্ষ্যে আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী ওষুধগুলি আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৩ সালে ২৭ই ফেব্রুয়ারি ড্রাগ প্রশাসনের ডাইরেক্টর ড. নুরুল আনোয়ারকে আহবায়ক করে আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথিক হতে তিনজন বিশেষজ্ঞসহ ১৩ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠণ করেন। কমিটি প্রায় ২৫,০০০ ধরনের ওষুধের মধ্যে ৪৩১টি ওষুধের জন্য সুপারিশ করেন। কমিটি সব ধরণের ওষুধের জন্য সর্বাধিক ৫% এ্যালকোহল সংমিশ্রনের সুপারিশ করেন। এ লক্ষ্যে সরকার যথাযথ সহায়তা প্রদান, অনুদান বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আমরা আশা করি।

ওষুধ ও ওষুধ তৈরির মাপকাঠি

যে দ্রব্য অসুস্থ শরীরে পরিমিত মাত্রা সেবনের ফলে ক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে রোগীর উন্নতি সাধন করে তাকে ওষুধ বলে।

১। এক এ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে অন্য কোনো এ্যান্টিবায়োটিক বা করটিকস্টিরয়েড বা অন্য কোনো দ্রব্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ করে ওষুধ তৈরি করা নিষিদ্ধ। শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক এ্যান্টিবায়োটিক যেমন টেট্রাসাইক্লিন, তরল আকারে তৈরি করা যাবে না।

২। এনালজেসিকসের কোন প্রকার সংমিশ্রণ তৈরি করা যাবে না, কেননা এর কোনো থেরাপিউটিক সুবিধা নাই। বরঞ্চ এটা বিষক্রিয়াতে সাহায্য করে যা বিশেষ করে কিডনির

---

[৩৭১]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, c৷, ³, পৃ-২৩৮

[৩৭২]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৪৪৫

জন্য ক্ষতিকারক। লৌহ, ভিটামিন বা মদের সঙ্গে সংমিশ্রণ করে এনালজেসিক ওষুধ তৈরি নিষিদ্ধ।

৩. কোডিন কোনো সংমিশ্রণে ব্যবহার করা যাবে না, কেননা এটা নেশা সৃষ্টি করে।

৪. সাধারণভাবে কোনো সংমিশ্রণ ওষুধ তৈরি করা যাবে না, যদি না কোনো প্রকারেই কোনো একক উপাদানের ওষুধ পাওয়া না যায় অথচ চিকিৎসার জন্য কোনো একক উপাদানের ওষুধ মূল্যের দিক দিয়ে যৌক্তিক কিছু নয়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম থাকবে, যেমন, চোখ, চর্ম, শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত ওষুধ, ম্যালেরিয়ার জন্য ওষুধ এবং ভিটামিন ও সালফার ড্রাগ ইত্যাদি।

৫. একমাত্র ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ব্যতীত সব ধরনের ভিটামিন একক উপাদানে আলাদাভাবে তৈরি করতে হবে। অবশ্য বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন বি^{১২} সংমিশ্রণ করা যাবে না। বি^{১২} সব সময়েই একক উপাদানে ইঞ্জেকশন হিসাবে তৈরি করতে হবে। বি-কমপ্লেক্সের উপাদানগুলি পৃথকভাবেও তৈরি করা যাবে। কিন্তু বি-ভিটামিন এর সঙ্গে অন্য কোনো উপাদান, যেমন খনিজ ইত্যাদি সংমিশ্রণ করা যাবে না। এসব ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইঞ্জেকশন রূপে তৈরি করা যাবে। ভিটামিন তরল আকারে তৈরি করা যাবে না, কেননা এতে খরচ বেশি পড়ে এবং ওষুধের অপব্যবহার হয়। তবে শিশুদের জন্য তরল মাল্টিভিটামিন তৈরি করা যাবে। কিন্তু এতে কোনো বি^{১২}, ই, কে অথবা খনিজ মেশান যাবে না।

৬. কোনো কাশের সিরাপ, কাশের লজেন্স, গ্রাইপ ওয়াটার, এ্যালকালিস ইত্যাদি তৈরি করা বা আমদানি নিষিদ্ধ। কেননা এইসব ওষুধে খুব অল্প পরিমাণে ওষুধিগুণ থাকে। এইসব ওষুধ আমদানিতে শুধু আমাদের বৈদেশিক টাকার অপচয় হয়।

৭. টনিক, এনজাইম সিরাপ এবং তথাকথিত শক্তি বর্ধক ওষুধ প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হয় মূলতঃ ক্রেতার অজ্ঞতার কারণে। "প্যানক্রিয়াটি" এবং ল্যাকটজ ব্যতীত অন্য ওষুধের কোন কার্যকারিতা নেই। কাজেই এখন হতে এ ধরনের ওষুধের আমদানি বা তৈরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য "প্যানক্রিয়াটি" এবং ল্যাকটজ একক উপাদান হিসাবে আমদানি বা তৈরি করা যাবে।

৮. কিছু কিছু ওষুধ গঠনের দিক দিয়ে অন্য ওষুধের তুলনায় খুব অল্প পরিমাণে ভিন্ন, কিন্তু রোগ নিরাময় ক্ষমতা একইরূপ । এর ফলে ডাক্তার ও রোগী উভয়েই বিভ্রান্ত হয়। এ ধরণের ওষুধ তৈরি নিষিদ্ধ।

৯. যে সমস্ত ওষুধে অতি অল্প মাত্রায় কিংবা আদৌ কোনো ওষুধিগুণ নেই, বরঞ্চ কখনো কখনো তা ক্ষতিকারক এবং যা অপব্যবহারে দুষ্ট, সে সমস্ত ওষুধ নিষিদ্ধ করা হবে।

১০. সমস্ত প্রেসক্রিপশন–রাসায়নিক ও গ্যালেনিক্যাল (Galenical) মিশ্রণ যা ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া বা ফার্মাসিউটিক্যাল কডেক্স এর সাম্প্রতিক সংস্কারণে উল্লেখিত নাই, তা নিষিদ্ধ হবে।

১১. নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ, যদিও তাদের গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং অপব্যবহারের সম্ভাবনা অজানা নয়, তবুও ঝুঁকি সত্ত্বেও তাদের নিরাময় করার ক্ষমতার জন্য, নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবহারের জন্য স্বল্প পরিমাণে তৈরি করার অনুমতি দেয়া হবে। এই ওষুধগুলি শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ-ডাক্তাররাই প্রেসক্রাইব করতে পারবেন।

১২. সমপ্রকৃতির কিংবা প্রায় কাছাকাছি কোন বিকল্প ওষুধ যা এদেশেই তৈরি করা যায় সে ধরনের কোনো ওষুধ আমদানি করা যাবে না। এটা করা হচ্ছে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার স্বার্থে। অবশ্য যদি কোনো ওষুধ চাহিদার তুলনায় স্বল্প মাত্রায় উৎপাদিত হতে থাকে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নিষেধের ব্যত্যয় ঘটান হবে।

১৩. ওষুধ তৈরির মৌল কাঁচামাল যদি যথেষ্ট পরিমাণে দেশেই উৎপাদিত হয় তবে সেটা বা তাঁর বিকল্প কাঁচামাল আমদনি করা যাবে না।

১৪. বহুজাতিক কোম্পানিগুলি যারা এদেশে ওষুধ সরবরাহ করছেন তাদেরকে প্রশংসা করতেই হয়। তাদের উন্নতমানের মেসিনপত্র ও কারিগরী জ্ঞান যাতে গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন ধরণের ওষুধ তৈরিতে নিয়োজিত থাকতে পারে, সেজন্য এন্টাসিড ও ভিটামিন এর মতন সাধারণ ওষুধগুলি তৈরির দায়িত্ব কেবলমাত্র দেশী কোম্পানিদের হাতেই থাকবে। বহুজাতিক কোম্পানিকে অবশ্য একক উপাদানে ভিটামিন ইঞ্জেকশন তৈরির অনুমতি দেয়া হবে।

১৫. কোনো বিদেশী ব্র্যান্ড ওষুধ লাইসেন্সের মাধ্যমে এদেশে কোন কারখানায় উৎপাদন করা যাবে না, যদি সেই ওষুধ বা সেই ধরনের ওষুধ এদেশে তৈরি বা সহজলভ্য হয়। কেননা এই নিয়মের ফলে ওষুধের অহেতুক মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং বিদেশে রয়ালটিও পাঠাতে হয়। এই নীতির আলোকে সমস্ত চালু লাইসেন্স চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

১৬. যেসব বহুজাতিক কোম্পানি নিজস্ব কোনো কারখানা এদেশে নাই, কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো কারখানায় টোলের বিনিময়ে ওষুধ তৈরি করতে চায়–সে সমস্ত কোম্পানিকে অনুমতি দেয় হবে না।[৩৭৩]

ওষুধনীতির মূল লক্ষ্যসমূহ

- সাধারণ মানুষ যাতে ক্রয়সাধ্য মূল্যে উপকারী, কার্যকর, নিরাপদ ও ভাল মানসম্পন্ন অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য ওষুধ সহজে পেতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিজ্ঞাপনের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা যাতে ওষুধ ও স্বাস্থ্য বিষয়াবলির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের দ্বারা সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হয়।
- নকল, ভেজাল, নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত, বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা এবং অনুরূপ কাজসমূহের দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।
- ওষুধ প্রস্তুতকারীগণকে তাদের সকল ওষুধ উৎপাদনের সর্বোত্তম পরিচয় প্রদানের উপযোগী জেনেরিক বা ফর্মুলারী নামে এবং পণ্য অথবা ব্রান্ড নামে ওষুধের উৎপাদন, বিতরণ ও বিক্রয় করার অনুমতি প্রদান।
- সরকার কর্তৃক সময়ে তালিকাভুক্ত ও হালনাগাদকৃত সাধারণভাবে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সমূহের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বর্তমান পদ্ধতি অব্যাহত রাখা।
- ব্যবস্থাপত্র প্রদানকারী (Prescriber) এবং প্রান্তিক ব্যবসায়ীদেরকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে দেশের ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়াসমূহের ADR (Adverse Drug Reaction) উপযুক্ত পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা।

---

[৩৭৩]. মজনু-নুল হক, wZ³ I la, iæMY wPwKrmv I wRw¤§ RbMY, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রি. পৃ. ৬৩-৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন নীতিমালা যুগোপযোগী করণ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটি স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ও পুষ্টিনীতির আলোকে কর্মকান্ড পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংস্কার, জনবল নিয়োগ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, কর্মীদের কর্মজীবন পরিকল্পনা, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনানীতিসহ, স্বাস্থ্যসেবার সঠিক উন্নয়ন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারে। সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজগুলো সম্পাদনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করে কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি যুগোপযোগী করণ

স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ অবস্থা; শুধুমাত্র রোগব্যাধি বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার। মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে স্বাস্থ্য সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

সুস্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগ চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ পানি, যথাযথ খাদ্য, দূষণমুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় রোগ চিকিৎসা ও কিছু প্রতিরোধমূলক কাজসহ চিকিৎসা শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্বাস্থ্যের অন্যান্য উপাদান নিশ্চিতকরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইত্যাদির সম্পৃক্ততা রয়েছে।

দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো সমাধান করে স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান অবস্থাকে আরো সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী খাত ও সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্ম-উদ্দীপিত ও আশান্বিত করার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয় এমন একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ পুনর্মূল্যায়নপূর্বক যুগের চাহিদা অনুযায়ী নবায়ণ করে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন প্রয়োজন।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশব্যাপী সরকারি স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অবকাঠামো প্রশংসনীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। তবে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ওষুধ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা, জনবলের অভাব, যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা ও প্রশাসালের জটিলতা এবং সুসংগঠিত রেফারেল পদ্ধতি না থাকায় স্বাস্থ্য অবকাঠামোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করে ‘ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান’ বইয়ের সম্মানিত লেখক বিশিষ্ট টিভি আলোচক, ইসলামী চিন্তাবিদ, খ্যাতনামা ভেষজ বিজ্ঞানী ও তিব্বুন নববীর গবেষক ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন বলেন, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী! আপনি যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা বিধান আমাদের স্বাস্থ্যনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে কৃতকার্য হন, তাহলে আপনার নাম বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে এবং আপনি এ মহান কাজের বিনিময়ে ইহকালে কল্যান লাভ

করবেন ও পরকালে জান্নাতের বিনিময়ে পুরস্কৃত হবেন ইনশাল্লাহ। আর এজন্য আপনি বাংলাদেশের সকল পেশা এবং রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সবার ভালোবাসা অর্জন করতে সমর্থ হবেন।"[৩৭৪]

বাংলাদেশে ১লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের মধ্যে প্রায় ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বসবাস করে। ঘনবসতির দিক থেকে যা নগর রাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বে সর্বাধিক। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭৬ শতাংশ গ্রামে এবং ২৪ শতাংশ শহরে বসবাস করে। ৪৩ শতাংশ জনগণের বয়স ১৫ বছরের নীচে; প্রতিবছর দেশে প্রায় ২০ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করছে যা দেশের খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের উপর বাড়তি চাপ এবং প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তবে এ সংক্রান্ত জাতীয় লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হলে এ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যে স্বাস্থ্যসেবা জনগণ পাচ্ছেন তা পরিসর ও গুণগত মানের দিক থেকে আরও উন্নীত করা প্রয়োজন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার জন্য উচ্চ ফি এবং অধিক রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষাকে ব্যয়বহুল চিকিৎসার একটি বড় কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়েও জনগণ সন্তুষ্ট নয়। জনবলের স্বল্পতা, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবাকে দরিদ্র, দূরবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানো যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা জনবলের ক্ষেত্রে সংকটাপন্ন ৫৭টি দেশের একটি। ডাক্তার ও নার্সের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত অনুপাত যেখানে ১:৩ সেখানে বাংলাদেশে সে অনুপাত ১:০.৪৮ যা অনাকাঙ্খিত। ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য জনশক্তির স্বীকৃত অনুপাত ১:৩:৫ হলেও আমাদের দেশে চিত্র তার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ফলে অদক্ষ সেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকেই রোগীদের প্রথম সেবা গ্রহণ করতে হয়। সরকারি বেসরকারি সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র জনগণের সার্বিক চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়। তার উপরে অনেক ক্ষেত্রে পেশাজীবীদের যোগ্যতাও কাঙ্খিত মানের নয়। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীগণ অতৃপ্ত থেকে যায়।

স্বাস্থ্যসেবার পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি খাতে অর্থের সংকুলান ও ব্যবস্থাপনা অপর্যাপ্ত। বাজেটের মাত্র ৭ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, যা জিডিপি-র মাত্র এক শতাংশ এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায়ও কম। বর্তমানে সরকরি খাতে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়ের পরিমাণ মাথাপিছু ৫ ডলার মাত্র। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্যসেবায় মাথাপিছু ৩৪ মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ড অনুসরণ করে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ বছরে অন্তত ২৪ ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। একটি ভালো স্বাস্থ্য অবস্থা তৈরির জন্য জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি যুগোপযোগীকরণ প্রয়োজন।

জাতীয় জনসংখানীতি যুগোপযোগীকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম অঙ্গীকার সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল

---

[৩৭৪]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, C৷¸ ³, পৃ-৭৯

নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[৩৭৫] দেশের মানুষের এ সকল সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যানে আয়োজিত এক জনসভায় যে বক্তব্য রাখেন তা' প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ভাইয়েরা আমার, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বৎসর আমাদের ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তা হলে ২৫-৩০ বৎসরে বাংলার কোন জমি থাকবে না হালচাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্লানিং করতে হবে।" এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতির একটি রূপরেখা প্রণীত হয়।[৩৭৬] এ প্রেক্ষাপটে, ২০০৪ সালে একটি সংখ্যা নীতি প্রণয়ন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করা হয়।[৩৭৭]

জনসংখ্যা নীতির রূপরেখায় মা ও শিশুর উন্নত স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার প্রয়াসে পরিবারের আকার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সার্বিক সামাজিক পূর্ণগঠন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের অত্যাবশ্যক
উপাদান হিসেবে বিচেনা করা হয়। এ রূপরেখায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং তদারকি ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গৃহীত কর্মসূচীগুলোর অন্যতম ছিল পছন্দ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম জোরদার করা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন। এতে আইনগত ব্যবস্থার আওতায় বিয়ের বয়স বৃদ্ধি করা এবং মৌলিক তথ্য নিবন্ধন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর জোর দেয়া হয়। ফলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৬১.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate-TER) ১৯৭৫ সালে ৬.৩ থেকে ২০১১ সালে ২.৩ এ নেমে এসেছে।[৩৭৮] জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৩ শতাংশ তেকে ২০১১ সালে ১.৩৪ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।[৩৭৯] তবে এ সফলতা জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৬৪ জন[৩৮০], বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশসমূহের অন্যতম) ছাড়াও বনভূমি ও চাষযোগ্য জমি হ্রাস, বায়ু ও পানি দূষণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, অপর্যাপ্ত বাসস্থান, বেকারত্ব, অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্য ও

---

[৩৭৫]. evsjv‡`k RbmsL¨v bxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[৩৭৬]. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, evsjv‡`k RvZxq RbmsL¨v bxwZ-GKwU i~c‡iLv, ঢাকা: জুন ১৯৭৬ খ্রি.

[৩৭৭]. evsjv‡`k RbmsL¨v bxwZ 2012, প্রগুক্ত, পৃ. ১

[৩৭৮]. *Bangladesh Demography and Health Servey (BDHS),* Perliminary Report-2011.

[৩৭৯]. *Population & Housing Census*, Preliminary Results, July 2011.

[৩৮০]. evsjv‡`k RbmsL¨v bxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

পুষ্টি খাতের ধীর অগ্রগতি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্তরায় সৃষ্টিকারী সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি ২০০৪ এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ২০১০ সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার-১ অর্জন করা, যাতে ২০৬০ সালে স্থিতিশীল জনসংখ্যা অর্জিত হয়। কিন্তু ২০১০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্র অনুযায়ী নীট প্রজজনন হার-১ অর্জন করা সম্ভব হয়নি বিধায় কর্মসূচিতে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে বর্তমান জনসংখ্যা নীতিকে হালনাগাদ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এছাড়া ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনাসহ Millennium Development Goals (MDG's), 1994 সালে অনুষ্ঠিত International Conference on Population and Development (ICPD) এবং Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১১ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ আদমশুমারির প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে ১৪ কোটি ২৩ লাখ।[৩৮১] এই সংখ্যা প্রতি বছর প্রায় ১৮-২০ লাখ করে বাড়ছে।[৩৮২] প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্তমানের ৯৬৪ থেকে ২০১৫ সালে ১০৫০ এ দাঁড়াবে। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন, পানি, পয়:নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল প্রকার সেবা ও অবকাঠামোয় প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া, দেশের বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে এবং এখনো দেশের কিছু কিছু এলাকা ও জনগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি ও কৌশলসমূহকে যুগোপযোগী করা অপরিহার্য।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে NRR-1 অর্জন করা প্রয়োজন এবং ২০১৫ সালের মধ্যে NRR-1 অর্জন করতে ব্যার্থ হলে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২২ কোটিতে দাঁড়াবে এবং ২০৭০ সালে তা ২৩-২৫ কোটিতে গিয়ে স্থির হবে।[৩৮৩] জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে সীমিত ভৌগোলিক পরিমন্ডলে ব্যাপক জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, জলবায়ু, পরিবেশ ও যোগাযোগ অবকাঠামোসহ মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা কষ্টসাধ্য হবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

নারী-পুরুষের সমতা (Gender equity) ও নারীর ক্ষমতায়ন (Women's empowement) নিশ্চিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনা, মাও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে লিঙ্গ বৈষম্য (Gender discrimination) নিরসালে কর্মসূচী জোরদার করা;

---

[৩৮১]. *Population & Housing Census*, Preliminary Results-July 2011

[৩৮২]. *Population Project of Bangladesh*: BBS, 2007

[৩৮৩]. evsjv‡'k RbmsL¨v bxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে সম্পৃক্ত করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

সকল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য সহজলভ্য করা।

জাতীয় ওষুধনীতি যুগোপযোগীকরণ

স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের জন্য স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধ নীতিকে আরও গ্রহণযোগ্য এবং উন্নত করতে হবে। বর্তমান সময়ের চাহিদা, নিরাপত্তা, উপকারিতা, ক্রয়ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বস্তরে জরুরী ওষুধের সহজপাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় ওষুধনীতিকে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

সেবার গুণগত মান নিশ্চিত করণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে যে সমস্ত চিকিৎসক বা শিক্ষার্থী সার্বক্ষণিক ও আবাসিক পদে এবং জরুরি বিভাগে কর্মরত আছেন এবং যারা Non-clinical Subject এর শিক্ষক তাদের প্রাইভেট প্রাকটিস থেকে বিরত রেখে নন-প্রাকটিসিং ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে রোগী পরিচর্যার ক্ষেত্রে মান সম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর একটি সহায়িকা তৈরী করা হবে।

সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য-কর্মীদের তাদের কর্মস্থলে উপস্থিতি ও সর্বোত্তম সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

সংক্রামক রোগসমূহ যেমন- শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি জোরদার করা হবে। যক্ষা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি জোরদার করা হবে। সংক্রামক রোগসমূহের নিরাময়মূলক সেবা জোরদার করা হবে।

অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। সমন্বিত উপায়ে সকল পর্যায়ে প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান অসংক্রামক রোগগুলো যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, আর্সেনিকোসিস সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে এবং জীবনধারা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ূ পরিবর্তনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মাঠ জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রোগগুলোর বোঝা কমাতে একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

টিকাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করে যত সংখ্যাক রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত করতে হবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ স্কুল হেল্‌থ কার্যক্রম চালু করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ জীবন-যাপনের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শিল্প ও কৃষি খাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের প্রয়োগ সম্প্রসারিত করা হবে। এজন্য দক্ষ জনবল তৈরী ও গবেষণার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশ হতে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে, বিশেষ করে মারাত্মক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এমন দেশ থেকে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে দেশে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটতে না পারে সে লক্ষ্যে স্থল, জল ও বিমান বন্দরসমূহে প্রত্যাগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হবে।[৩৮৪]

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের ভূমিকা

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের এনজিও এবং ব্যক্তিখাত স্বাস্থ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই সমস্ত কার্যক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। জেলা পর্যায় থেকে তৃণমুল পর্যায়ে অবস্থিত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন-হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে। এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের নীতি প্রণয়ন ও সমন্বয়সাধনের দায়িত্বও পালন করবে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের সহায়তায় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়ন করবে। অধিকন্তু, জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের সচিবালয় হিসেবে এ মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করবে এবং পরিষদের নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতি এবং জাতীয়, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পযায়ের স্টেকহোল্ডার কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। পাশাপাশি জনসংখ্যা কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি করবে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব অনুসারে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত কর্মকৌশল প্রণয়ন ও তদনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।[৩৮৫]

গত ২০১১ সালের ৫ ডিসেম্বর Medical Biochemists of Bangladesh এর জাতীয় কনফারেন্সে সম্মানিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য প্রকিমন্ত্রি দুজনেই গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। সেখানে মন্ত্রী মহোদয়কে Prophetic medical practices স্বাস্থ্যনীতির অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করলে তিনি আগামীতে দেখবেন এবং স্বাস্থ্যনীতিকে ঢেলে সাজানো হবে, সে লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করে

৩৮৪. RvZxq ¯v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১৩

৩৮৫. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৫

যাচ্ছেন বলে জানান।[৩৮৬] বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা জনবলের ক্ষেত্রে সংটাপন্ন ৫৭টি দেশের একটি। ডাক্তার ও নার্সের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত অনুপাত যেখানে ১:৩ সেখানে বাংলাদেশে সে অনুপাত ১:০.৪৮ যা অনাকাঙ্খিত। ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য জনশক্তির স্বীকৃত অনুপাত ১:৩:৫ হলেও আমাদের দেশে চিত্র তার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ফলে অদক্ষ সেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকেই রোগীদের প্রথম সেবা গ্রহণ করতে হয়। সরকারি বেসরকারি সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র জনগণের সার্বিক চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়। তার উপরে অনেক ক্ষেত্রে পেশাজীবীদের যোগ্যতাও কাঙ্খিত মানের নয়। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীগণ অতৃপ্ত থেকে যায়।

সরকারি স্বাস্থ্যখাতে চিকিৎসা সামগ্রী এবং উপকরণ সংগ্রহের জটিল ও সময় সাপেক্ষ ক্রয় প্রক্রিয়া বাজেট বরাদ্দের অপরিণত ব্যবহারের অন্যতম কারণ। প্রায়ই অনিয়মিত এবং অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এছড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট ও ব্যয় অপ্রতুল। দেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সৃষ্ট বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা পরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার দিক দিয়ে সন্তোষজনক নয়।

স্বাস্থ্যসেবার পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি খাতে অর্থের সংকুলান ও ব্যবস্থাপনা অপর্যাপ্ত। বাজেটের মাত্র ৭ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, যা জিডিপি-র মাত্র এক শতাংশ এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায়ও কম। বর্তমানে সরকরি খাতে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়ের পরিমাণ মাথাপিছু ৫ ডলার মাত্র। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্যসেবায় মাথাপিছু ৩৪ মার্কিন ডলার ব্যায় করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ড অনুসরণ করে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ বছরে অন্তত ২৪ ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।[৩৮৭]

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিসিএস প্রশাসন একাডেমির শিক্ষাক্রমে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ মন্ত্রণালয় বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ের প্রশাসনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।[৩৮৮] মানুষ যদি অসুস্থ না হয় তখন তার কোন ওষুধও প্রয়োজন হয় না এবং ডাক্তারেরও দরকার হয়না। ফলে নিঃসন্দেহে আর্থিক সাশ্রয় হবে। সবচেয়ে বড় কথা, তার দৈনন্দিন কর্মঘন্টা বেড়ে যাবে। কারণ অসুয্থ ব্যক্তি অফিস-আদালত ও কারখানায় কাজ করতে পারেনা। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।[৩৮৯]

---

[৩৮৬]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ. ৭৭-৭৮;

[৩৮৭]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৩৮৮]. cÖv¸³ RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৩৮৯]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ. ৭৮;

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী উন্নত মান বজায় রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা উৎসাহিত করার কার্যক্রম জোরদার করবে। এছাড়া বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও অপরাপর শিক্ষা উপকরণে অধিক জনসংখ্যা ও এর ভয়াবহতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবন-দক্ষতা শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সময়োপযোগী করে অন্তর্ভূক্ত করবে। একই ভাবে জনমিতি এবং জনসংখ্যা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোর্সের উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

এ মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী মান বজায় রেখে প্রাথমিক পর্যায়ে পরিকল্পিত পরিবার, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা উৎসাহিত করার কার্যক্রম জোরদার করবে। এছাড়া বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও অপরাপর শিক্ষা উপকরণে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবন- দক্ষতা শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সময়োপযোগী করে অন্তর্ভুক্ত করবে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সমাজের সকল স্তরে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে।[৩৯০] প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের preventive health বিষয়ক নির্দেশনাগুলো মেনে চলি। তাহলে আমরা অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে থাকতে পারবো ইনশাল্লাহ।[৩৯১]

কৃষি মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করবে। এ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়াধীন সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষিকাজে নিয়োজিত জনগণকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক পরিবারের আয়-বৃদ্ধিকরণ ও দুই সন্তানের পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়া কাউন্সেলিং দ্বারা শহরমুখী গমন নিরুৎসাহিত করতে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[৩৯২]

তথ্য মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসকারি বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য, নারী-পুরুষের সমতা, যৌনরোগ ও এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে তথ্য প্রচার সময় ও সম্পদ বরাদ্দ করবে। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ এমন কিছু ওষুধ রয়েছে, যার পাশ্ব প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর ওষুধ যেসব ওষুধের পাশ্ব প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি) অর্থাৎ

---

৩৯০. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৩৯১. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖ¸³, পৃ ৭৮

৩৯২. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

বিষময় ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩৯৩] এসব বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সকল শ্রেণির সংবাদপত্র ও বেসরকারি গণমাধ্যমকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে উৎসাহিত করবে।[৩৯৪]

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বর্তমান সময়ে সাধারণ জনগণ সামান্য একটু ঠান্ডা-কাশি হলেই ওষুধ সেবন করে ফলে, ঐ সময়ের জন্য সে উপকৃত হলেও জীবনীশক্তি ক্রমান্বয়ে দূর্বল হতে থাকে। এ বিষয়ে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আমি ইবনে আবজারুল আকবারের দাদা হাইয়ানকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন, যতোক্ষণ শরীর রোগ সইতে পারে ততোক্ষণ ওষুধ পরিহার করো।"[৩৯৫] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় যদি এসব বিষয়ে সাধারণ জনগণকে নসিহত করতো তাহলে একদিকে যেমন অকারণে মানুষের জীবনীশক্তি দূর্বল হওয়া থেকে রক্ষা পেতো অপর দিকে অনেক ওষুধ ও অর্থের সাশ্রয় হতো। মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এ ধরণের কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করতে পারে। বিদ্যমান জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি, থানা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি, ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কমিটি এবং ওয়ার্ড পরিবার পরিকল্পনা কমিটিকে সক্রিয় করে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে গতিময়তা (Momentum) আনা সম্ভব। থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটিগুলোর সভা আয়োজন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রজনন স্বাস্থ্য ও নারী পুরুষের সমতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহিলা সমবায় সমিতিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ সমিতিগুলো সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন সম্পর্কে দেশব্যাপী প্রচারণাসহ সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকাগুলোতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করতে পারে।[৩৯৬]

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশন

আহ্মদ ইবনে হাম্বল হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যান এবং বলেন, ডাক্তার ডেকে আনো। উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি বলে উঠেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনিও কি তাই বলছেন? তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাঁ, অবশ্যই। আল্লাহ কোনো রোগ-ব্যাধি পাঠাননি, যার নিরাময় বা ওষুধ তিনি

[৩৯৩]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৪৫৯

[৩৯৪]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৩৯৫]. ইমাম আবুল কাশেম সুলাইমান ইবনে আহম্মদ আশ-শামী আত-তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৬০-৩৬০ (হিজরী), Avj gÔRvgj Kvexi, কায়রো: মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া, ১৪০৪ হিজরী, ১৯৮৩ খ্রি. ও দারুত তুরাসিল আরাবী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪০৩ হিজরী, ১৯৮২ খ্রি. হাদীসু হাইয়্যান বিন আবযার, হাদীস নং ৩৫৭৬;

[৩৯৬]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

পাঠাননি।[৩৯৭] সরকারের নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সামগ্রিকভাবে দেশের জনসংখ্যা প্রাক্কলন, প্রদক্ষেপণ ও উন্নয়ন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এসব বিষয়কে সম্পৃক্ত করবে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে জনগণের স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসন সম্বলিত উপাদানসমূহ অন্তর্ভূক্ত করবে।[৩৯৮]

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম Self medication অর্থাৎ নিজের চিকিৎসা নিজে করা পছন্দ বা সমর্থন করতেন না। তিনি অসুস্থ্য হলে চিকিৎসকের নিকট যেতে পরামর্শ দিতেন। ডাক্তার ডাকতে বলতেন। কারণ চিকিৎসা বিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্র অতীব জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় যিনি তা অধ্যয়ন করেননি তার পক্ষে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়।[৩৯৯] সমাজের কল্যাণের জন্য বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবায় জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়াও মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচীর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এ সব কেন্দ্র থেকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের জন্য জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় ভূমিকা রাখবে। এছাড়া এ মন্ত্রণালয় থেকে অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নিবন্ধনকৃত এনজিওদের জন্য জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।[৪০০]

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা জনগণকে তুলনামূলক ভাবে সুস্থ্য রাখে, ফলে স্বাস্থ্য খাতের ব্যায় ও কষ্ট উভয়ই হ্রাস পায়।[৪০১] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমাজে প্রচার প্রচারণা চালিয়ে তাদেরকে সচেতন করা যেতে পারে। মহিলারাই মানব জীবনের প্রথম শিক্ষক এবং প্রথম চিকিৎসক। মহিলাদের দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তার ব্যবস্থাকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং মহিলাদের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে মহিলা কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে কলেজ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলার আয়োজন করতে পারে। এ বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে মহিলা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সহায়তা প্রদান করবে।[৪০২]

---

[৩৯৭]. gqvËv, প্রাগুক্ত, অধ্যায় রোগীর চিকিৎসা, হাদীস নং ১৭৫৭

[৩৯৮]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৩৯৯]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cv¸³, পৃ ৩৩১

[৪০০]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৪০১]. মজনু-নুল হক, cv¸³, পৃ. ১১

[৪০২]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

একজন রোগী যদি ধৈর্যশীল, শোকরগুযার ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে যায়, তখন তার প্রতি আল্লাহর রহমত বাড়তে থাকে। ফলে রোগ তার জন্য রহমতস্বরূপ হয়ে যায়। আর রোগের কারণে সে আল্লাহর প্রতি আরো নিবিষ্ট হয়।[৪০৩] আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের বিনোদন ও প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে, নাটকের মাধ্যমে, বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, " তুমি কোন রোগীকে দেখতে গেলে তখন তাকে তোমার জন্য দু'য়া করতে বলবে। নিশ্চই তার রোগীর) দু'য়া ফেরেশ্তাদের দু'য়ার মতো।"[৪০৪] পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়সাধন করতে এ মন্ত্রণালয় কাজ করবে।[৪০৫]

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

যে সমস্ত ভেষজ উপাদান দ্বারা ওষুধ তৈরি হয় তাদের মধ্যে গাছ-গাছড়া অন্যতম। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে আমি নবী করীম সাল্লাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কালোজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের চিকিৎসা (নিরাময়) নিহিত।[৪০৬] পরিকল্পিত বনায়নের মাধ্যমে আমরা এক দিকে যেমন ভেষজ উৎপাদান করতে পারি অন্য দিকে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি। জাতীয় পরিবেশ নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃক্ষরোপণে জনগণকে উৎসাহিত করা, বনাঞ্চলে জনবসতি স্থাপনকে নিরুৎসাহিত করা, পরিবেশ দূষণকারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করা, উন্নত প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচীতে জনসংখ্যা বিষয়কে গুরুত্বারোপ করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করি।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতি এবং যথাযথ ব্যবস্থ্যাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অর্জন করেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন, লবণাক্ততা এবং খরা, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহকে বাধাগ্রস্ত করেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর নতুন নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা এবং ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।[৪০৭] জাপানে ১৯৬০ সালে মহামারী আকারে SMON (Sub-acute myelo-optic neuropathy) নামে এক অসুখ দেখা দেয় যার প্রধান লক্ষণগুলি হল অবসন্নতা, পায়ে দূর্বলতা এবং

---

[৪০৩]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖ¸ ³, পৃ ২৪

[৪০৪]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় জানাযা, হাদীস নং ১৪৪১

[৪০৫]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৪০৬]. mnxn eLvix, প্রগুক্ত, অধ্যায় রোগ রোগী ও চিকিৎসা, হাদীস নং ৫২৭৭

[৪০৭]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

চোখের অসুখ। অনেকেই এই রোগে চিরদিনের জন্য অন্ধ বা পঙ্গু হয়ে গেছেন।[৪০৮] খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এ ধরণের আপদকালীন সময়ে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াতে হবে। এছাড়াও বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী এ ধরণের প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রমে জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, এ মন্ত্রাণালয় ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) সহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ তথা পরিকল্পিত পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।[৪০৯]

স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত শিক্ষামূলক কর্মসূচী পরিচালনা করতে পারে । সরকারী চিকিৎসকদের অফিস সময়ে প্রাইভেট প্রাকটিস নিষিদ্ধ। কিন্তু উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। চিকিৎসকদের ইচ্ছেমত দেরীতে আসা বা না আসা এখন অনেকটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্রাকটিস করার সময় রোগীকে যাতে ফি গ্রহণের রিসিট দেন সে নির্দেশও রয়েছে। এসব বিষয়ে স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে সহযোগীতা করতে পারে।[৪১০] তাছাড়া বাংলাদেশ পুলিশ, র‌্যাব, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণকে স্বাস্থ্য ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য উদ্বুকরণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও এইচআইভি/এইডসসহ বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।[৪১১]

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কাজ করে। সকল ডাক্তারই রোগীদের ধূমপান করতে নিষেধ করে থাকেন, বিশেষ করে যারা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা ও ফুসফুসের সংক্রমণে ভোগেন তাদের ব্যপারে এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।[৪১২] এ ছাড়াও এ মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চা-বাগানের ক্লিনিকসমূহ এবং অন্যান্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে পরিকল্পিত পরিবার গঠন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী চালু করা যেতে পারে। এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন শিল্প এলাকায় এ সকল কর্মসূচী জোরদার করতে পারে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাক্রমে পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।[৪১৩]

[৪০৮]. মজনু-নুল হক, c¨, ³, পৃ. ২৮
[৪০৯]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
[৪১০]. মজনু-নুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬
[৪১১]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
[৪১২]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, c¨, ³, পৃ ১৭৩
[৪১৩]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

লাইলা আল হেলু নামে জনৈকা মরোক্কান ভদ্রমহিলা ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং তার পুরো chest এ তা ছড়িয়ে পড়ে। তার চিকিৎসক তাকে বললেন যে তিন মাসের বেশি তিনি বাঁচবেন না। তার স্বামী তাকে পবিত্র মক্কা শরীফে ওমরাহ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি হেরেম শরীফে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত নামাযের স্থানে এক কোণায় নিজেকে আলাদা করে নিয়ে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে যমযমের পানি পান করতে থাকেন। আর খাদ্য হিসাবে শুধুমাত্র এক টুকরা রুটি ও একটি ডিম প্রতিদিন খেতেন। নামাযের সময় ছাড়া বাকী সব সময় তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনায় কান্নাকাটি করতেন এবং কুরআন পড়তেন। চারদিন তিনি বলতে পারেন নি যে কখন দিন বা রাত হয়েছে। এ সময়ের মাঝে তিনি বেশ কয়েকবার কুরআন খতম দিয়েছেন। তিনি তার সিজদার সময়কে দীর্ঘায়িত করতেন এবং জীবনে যে সমস্ত ইবাদত করতে পারেননি তার জন্য কাঁদতে থাকেন। আর তিনি সর্বদা যিকির ও দু'য়ায় লিপ্ত থাকতেন। এর কয়েকদিন পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে তার সারা শরীরে যে লালচে স্পট ছিলো তা দূর হয়ে গেছে এবং তিনি অন্তরে অনুভব করলেন যে তার কোন কিছু ঘটেছে। তিনি তখন প্যারিসে ফিরে গিয়ে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হলেন। চিকিৎসকরা তাকে কয়েকে বার পরীক্ষা করেও বুকে ক্যান্সারের কোনো জীবাণু পেলেন না।[৪১৪] এ ধরণের ঘটনাসমূহ ইসলামের দিক নির্দেশনামূলক চিকিৎসা বিষয়ক তথ্যাবলী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা যেতে পারে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় যৌনরোগ এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রামণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য আহরণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশ থেকে আগত শ্রমিকদের বিষয়ে নজরদারি করতে পারে। এছাড়া বিদেশগামী শ্রমিকদের এসব রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয় ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ধর্মীয় নেতা ও ইমামদের পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং যৌন রোগ ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করতে পারে। এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকাশনায় পরিকল্পিত পরিবার গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।[৪১৫] স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, নিরাময় ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকগুলো কুরআনের আয়াত এবং সহস্রাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে, বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে। এসব হাদীস আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে একটি হাদিসও আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় বরং সাদৃশ্যপূর্ণ।[৪১৬] আমি বিনীতভাবে ও দৃঢ়তার সাথে বলতে চায় যে, স্বাস্থ্য ও রোগ নিরাময় সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য তথা 'তিব্বুন নববী' আধুনিক এলোপ্যাথিক মেডিসিন, হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন বা হার্বাল মেডিসিনের সাথে অথবা পাশাপাশিভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের সমাজে চালু করা যেতে পারে।

[৪১৪]. ইউসুফ আলহাজ্ব আহমাদ কর্তৃক সংকলিত, হুদা খাত্তাব সম্পাদিত, Bmjvg K †gwWwmb, সৌদি আরব: দারুসসালাম, ২০১০ খ্রি. পৃ. ৪৪-৪৫

[৪১৫]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৪১৬]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ ৭৮

ভূমি মন্ত্রণালয়

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মদীনার উঁচু এলাকার আজওয়া খেজুর রোগ মুক্তির উপাদান রয়েছে।"[৪১৭] সঠিকভাবে ভূমি নির্বাচন করে বিভিন্ন ধরনের ওষুধীগাছ রোপনের মাধ্যমে দেশেই ওষুধের পর্যাপ্ত ভেষজ (কাঁচামাল) উৎপাদন সম্ভব। এছাড়া আদর্শ গ্রাম, ছিন্নমূল ও বস্তি পুনর্বাসনসহ মন্ত্রণালয় পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিকল্পিত পরিবার গঠন ও প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।[৪১৮]

শিল্প মন্ত্রণালয়

ওষুধ কোম্পানিগুলো প্রয়োজনীয় ও জীবন রক্ষাকারী ওষুধ তৈরির চাইতে বেশি পরিমানে ভিটামিনস, কাশির সিরাপ, টনিক ইত্যাদি প্রস্তুত করতে সব সময়ই বেশি আগ্রহী। ১৯৭১ সনে পাঁচটি বিদেশি কোম্পানির সমগ্র ওষুধ তৈরির অর্ধেক জুড়েই আছে ভিটামিনস, তরল এ্যাসপিরিণ এবং কাশির ওষুধ। দুইটি বড় কোম্পানি ভিটামিনস তৈরি করেছিল ১৮ ধরনের। এর বেশির ভাগই ব্যবহার করে থাকে বড় লোকেরা যাঁদের এ ধরণের কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে অপুষ্টির শিকার যারা তারা এসব কেনার ক্ষমতা রাখে না।[৪১৯] শিল্প মন্ত্রণালয় ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোকে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ প্রদান করতে পারে এবং প্রয়োজনে নজরদারীর মধ্যে রেখে প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরির ব্যবস্থা করতে পারে। এ ছাড়াও এ মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে গার্মেন্টসসহ শ্রমঘন (Labour intensive) কারখানাগুলোতে কর্মরত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে অবিবাহিত শ্রমিকদের বিলম্বে বিবাহে উৎসাহিত করা এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।[৪২০]

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় জনগণের জন্য শুধু বাসস্থান নিয়েই কাজ করেনা জনসাধারণ যাতে তার জন্মস্থান ছেড়ে শহরমুখি না হয় সেজন্য প্রয়োজন অনুসারে তাদের অন্যন্য সেবামূলক সূবিধাদির ও ব্যবস্থা করে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাধির প্রকার ও আকার নানা কারণে পরিবর্তিত হচ্ছে। এক সময় বাংলাদেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হয়েছে বলে দাবি করা হত। আজকে সে দাবি কেউ করছেনা। ম্যালেরিয়া আবার এদেশে ফিরে এসেছে, শুধু প্রত্যাবর্তনই নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই রোগে বহুল ব্যবহৃত ওষুধগুলি যেন আর কার্যক্ষম নয়। প্রকোপ বাড়ালেও বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্র দু'টি কোম্পানি ম্যালেরিয়ার ওষুধ প্রস্তুত করে। অন্য কোম্পানি এর উৎপাদনে আগ্রহী নয়, কেননা এই ওষুধের মুনাফা কম। এজন্যই প্রয়োজন সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যবাধকতার। আবার জনসচেতনতার মাধ্যমে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য

[৪১৭]. mnxn gmwjg, প্রাগুক্ত, অধ্যায় পানাহারের শিষ্টাচার ও রীতিনীতি, হাদীস নং ৫১৬৫, ৫১৬৬

[৪১৮]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৪১৯]. মজনু-নুল হক, cÖv¸³, পৃ. ৩৩

[৪২০]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

সচেতনতা জনগণকে তুলনামূলক ভাবে সুস্থ রাখে, ফলে ওষুধ খাতে ব্যয় বহুল অংশ হ্রাস পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাসস্থান, খাবার পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে ব্রিটেন ব্যাধির প্রকোপ ও মৃত্যুর হার অনেকাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়। তখনও আধুনিক ওষুধপত্র প্রচলিত হয়নি। এরই প্রমাণ আবারও পাই ভারতের কেরালা রাজ্যে। তুলনামূলক ভাবে দরিদ্র রাজ্য হওয়া সত্বেও ওষুধ ব্যবহারের বদলে মূলত মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধির উপর জোর দেওয়ায় সাধারণ অসুখে মৃতের হার এই রাজ্যে অনেক হ্রাস পায়। প্রতি হাজারে ভারতের উত্তর প্রদেশে যেখানে মৃত্যুর হার ১৯.২, সেখানে কেরালায় তা মাত্র ৭.২ (১৯৮০ পরিসংখ্যান মোতাবেক)। কাজেই শুধু রোগ নিরাময়ে নয়, বরঞ্চ রোগ প্রতিরোধে আমাদেরকে আর বেশি উদ্যোগী হতে হবে। বর্তমানে ভেজাল ওষুধ, কম মানের ওষুধ বা চোরাচালানী ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। এই জন্য কেউ কেউ ওষুধনীতিকে দায়ী করেন। এ অভিযোগ সত্য নয়। বরঞ্চ ড্রাগ প্রশাসনকে গতিশীল ও অর্থবহ করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল, প্রশিক্ষণ ও অর্থের ব্যবস্থা করে ওষুধ বাজারের দুস্কর্মকে রোধ করতে হবে। একবারের জন্য ব্যবহারযোগ্য ইনজেকশন যদি ধুয়ে-মুছে দ্বিতীয় বারের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, ব্যবহারের সময়সীমা অতিক্রান্ত ওষুধ যদি দোকানী আপনার হাতে গছিয়ে দেয়, কম মানের কিংবা জীবন বিনাশী ওষুধ যদি ওষুধ কোম্পানি তৈরি করে, তাহলে ওষুধনীতির কিইবা করার থাকে? আসলে ওষুধ বাণিজ্যে বেশীর ভাগ কোম্পানি সব দেশেই কম বেশি একই ধরনের কৌশল বা চাতুরী অবলম্বন করা হয়ে থাকে।[৪২১] আবার কিছু কিছু বেসরকারী-আধা সরকারী হাসপাতাল, কিছু রোগনির্ণয় ও গবেষণাকেন্দ্র, কিছু ওষুধ নির্মাতা, কিছু সংখ্যক দক্ষ, মানবদরদী ও ত্যাগী চিকিৎসক আমাদের সবারই শ্রদ্ধেয়। এসব প্রতিষ্ঠান এবং সৎ চিকিৎসকরা সমাজে আছেন বলেই আমরা ভাল-মন্দর পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। এদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে পরিকল্পিত আবাসন ও নগরায়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যাতে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা যায়।[৪২২]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়টির বড় বড় কোম্পানির জন্য একটি অতি আবশ্যকীয় ব্যবস্থা। নতুন নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের সূতিকাগৃহ এটি। এজন্য বছরের পর বছর ধরে এই গবেষণা কার্যক্রমে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।[৪২৩] আমেরিকার ওষুধ কোম্পানিগুলো দাবি করে যে, একটি নতুন ওষুধ উদ্ভাবনে ৮০২ প্রকান্তরে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়। উল্লেখ্য যে, এই হিসাবে অন্যান্য ওষুধ উদ্ভাবনে ব্যর্থতার আর্থিক হিসাব ও সম্পৃক্ত। আমেরিকার ওষুধ কোম্পানিগুলোর বাণিজ্য সংস্থা যা The pharmaceutical research and manufactures of America সংক্ষেপে PhRMA নামে পরিচিত, বরাবরের মতই দাবি করে থাকে যে, গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে অর্থহ্রাসের মানে হচ্ছে নতুন ওষুধ আবিষ্কার না হওয়া এবং যার ফলশ্রুতিতে সমস্ত মানুষের জীবন এক চরম সংকটের মধ্যে ভবিষ্যতে পতিত হবার সমূহ সম্ভাবনা। PhRMA -এর প্রেসিডেন্ট এক ভাষণে বলেন, "আমাকে

---

[৪২১]. মজনু-নুল হক, cv¸ 3, পৃ. ১১-১২

[৪২২]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৪২৩]. মজনু-নুল হক, cv¸ 3, পৃ. ৪২

বিশ্বাস করুন যদি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় হ্রাস করা হয় তা হলে আমাদের সন্তানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ আমেরিকানরাও সমূহ বিপদের সম্মুখীন হবেন।" এই বিপুল ব্যয়ের কারণ দেখিয়ে ওষুধ কোম্পানি দাবি করে থাকে যে কোন অবস্থাতেই ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করা উচিত হবে না। এখানে বিস্ময়ের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, সম্ভবত আমেরিকাই একটি দেশ যেখানে ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারের কোনো আইন প্রবল প্রতিবন্ধকতার মুখে আজও প্রণীত হয়নি। কিন্তু কোথা হতে এই ৮০২ বা ৫০০ মিলিয়ন ডলারের হিসাব আসল? আমেরিকার টাফটস্ সেন্টারের অধ্যাপক Joseph Di Masi-এর নেতৃত্বে একদল অর্থনীতিবিদ নভেম্বর, ২০০১ সালে ফিলাডেলফিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, প্রতিটি ওষুধ উদ্ভাবনে ব্যয় হয় ৮০২ মিলিয়ন ডলার।[৪২৪] এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং ওষুধ শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা ওষুধের মূল্য কেন বেশি হয় তার সার্থকতা খুঁজে পেলেন। কিন্তু কি তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই টাকার হিসাব এলো তা প্রকাশ করা হল না। প্রায় দেড় বছর পর জানা গেল যে, ১২টি কোম্পানি প্রায় এক যুগ ধরে যে ৬৮টি ওষুধ উদ্ভাবন করেছে তারই উপর নির্ভর করে এই খরচের হিসাব।[৪২৫] কিন্তু না জানা গেল ওষুধের নাম, না প্রকাশিত হলো কোন কোন কোম্পানি এই ব্যয় করেছে। যেন অন্ধকার জগতে রয়ে গেল হিসাবের মূল সূত্রগুলি। যে হিসাব কোম্পানিরা Tafts Center কে দিল তারই উপর ভিত্তি করে গবেষকরা কাজ করলেন। সেই উপাত্ত, তথ্য যাচাই বাছাই করার অধিকার যেন কারো নেই। কী ধরনের এই Tafts Center টি? Tafts বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এই Center টি'র প্রধান কাজ হচ্ছে ওষুধ উদ্ভাবনের তথ্যানুসন্ধান এবং এই center টি'র মূল অর্থ যোগানদার বড় বড় ওষুধ কোম্পানির অন্যতম মার্ক, ফাইজার এবং বেয়ার। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গবেষণায় জানা যায় যে, ওষুধ কোম্পানি সব ওষুধের উদ্ভাবনে আদৌও সম্পৃক্ত নয়। তাদের দাবিকৃত সব ওষুধ ও নতুন আবিস্কার নয়। তারা দাবি করে থাকেন যে, প্রতিটি ওষুধ আবিস্কারের প্রচুর অর্থলগ্নি করতে হয়। যেমন ৫০০/৮০২ মিলিয়ন ডলার, এবং এতে ঝুঁকিও কম নয়। আসলে এসব দাবি সত্যের অপলাপ মাত্র। ওষুধের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করার জন্যই এসব তুলে ধরা হয়। আমেরিকার সরকারী সংস্থা NTH (The National Institute of health) সবচেয়ে বেশি বিক্রিত হয় এমন ৫টি ওষুধের উপর ১৯৯৫ সালে গবেষণা করে। বহুল প্রচলিত এই ওষুধগুলি হচ্ছে Zantac (Ranitidin যা অম্ল/অন্ত্র এর ক্ষত এর জন্য ব্যবহৃত), Zovirax (Acyclovir যা Herpes Simplex রোগে ব্যবহৃত), Capoten (Captrol) ও Vasotec যা (Captrol এর একটি পরিবর্তিত রূপ) এই উভয় ওষুধই রক্তচাপ রোগে ব্যবহৃত, এবং Prozac (Flouxetine NIH Clinical Trials বিষন্নতা রোগে ব্যবহৃত)। দেখা যায় যে, এই ৫টি ওষুধ উদ্ভাবনে সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিদেশি একাডেমিক সংস্থাগুলির অবদান ৮৫% এবং বাকি ১৫% অবদান ওষুধ কোম্পানিদের। শুধু তাই নয় NIH মৌলিক গবেষণা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরঞ্চ Clinical Trials এ তাদের অংশগ্রহণ ৬১% ভাগ। ঝুঁকির কথা প্রায়ই বলা হয় কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে ওষুধ আবিস্কারের এক পর্যায়ে যখন নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই ওষুধ বাজারজাতকরণ সম্ভব হবে তখনই ওষুধ কোম্পানি এগিয়ে আসে। শুধু তাই নয়, মৌলিক ওষুধের

---

[৪২৪]. Pear, *"Research cost for new drugs"*.

[৪২৫]. Josph Di Masi & others, *The cost of Innovation in the Pharmaceutical Industry Journal of Health and Economic Review*.1991.

যাতে ঝুঁকি আছে বলে অনেকে মনে করেন তার কত অংশ কোম্পানিগুলো আবিষ্কার করেছে তারও একটি চিত্র দেখা যেতে পারে। ১৯৯২ সালের পূর্ব পর্যন্ত FDA (US Food and Drug Administration) প্রতিটি নতুন ওষুধকে তিন ভাগে ভাগ করত। যথা:

1A মৌলিক ওষুধ (Imprtant Therapeutic Gain, a breakthrough drug).

IB =স্বল্প মাত্রার মৌলিকত্ব আছে (Change in formulation so that the drug can be taken once insted of thrice or four a day.) আসলে এটাকে মৌলিক বলা সঠিক কি না সে বিষয় নিয়েও প্রশ্ন আছে।

IC = খুবই স্বল্প মাত্রায় কিংবা একেবারেই মৌলিকত্ব নেই। (এই ধরনের ওষুধকে সাধারণত: Me-Too বা Copy cat বলা হয়, যা সব অর্থেই বাজারে চালু ওষুধের কপি মাত্র) উপরিউক্ত শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিতে ১৯৮২-১৯৯১ সন পর্যন্ত FDA যে ওষুধগুলো অনুমোদন করে তা নিচের সারনীতে দেখান হলো[৪২৬]

সারণী

শ্রেণী বিভাগ	সংখ্যা	শতকরা হার
A 1	৪১	১৬%
I B	৮০	৩১%
IC	১৩৭	৫৩%
মোট	২৫৮	১০০%

উপরের সারণী মতে দেখা যায় মৌলিক ওষুধ মাত্র ১৬% এবং বাকি ৮৪% ওষুদের জন্য গবেষণায় খুব কমই অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। কিন্তু ওষুধ কোম্পানিগুলো FDA এর এই শ্রেণী বিভাগ নির্ণয় প্রবল আপত্তি তোলে। কেননা এই শ্রেণী বিভাগের ফলে চিকিৎসক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে কোন ওষুধ মৌলিক আর কোন ওষুধ ME-Too বা copy cat তা পরিস্কার হয়ে পড়ে। ফলে PhARMA (পূর্ব নাম PMA) এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে এক দুর্বার প্রচেষ্টা গড়ে তোলে যার ফলে সরকার ১৯৯২ সালে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ বাতিল করতে বাধ্য হয়। FDA পরবর্তীতে নিম্নোক্তভাবে ওষুধের শ্রেণী বিন্যাস করে:

PRIORITY REVIEW (অগ্রাধিকার বিবেচনা): বাজারে চালু ওষুধের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত।

STANDARD REVIEW (সাধারণ বিবেচনা): বাজারে চালু একটি বা একাধিক ওষুধের সমগুনসম্পন্ন। এই শ্রেণী বিভাগে কোন ওষুধ মৌলিক এবং কোনটি COPY CAT তা সাধারণভাবে দৃষ্টির বাইরে রাখা সম্ভব হল। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে ওষুধের শ্রেণীবিভাগ কতখানি প্রভাবমুক্ত সে বিষয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন। FDA ১৯৯২-১৯৯৯ সন পর্যন্ত নতুন শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতিতে যে অনুমোদন দেন তা নিম্নরূপ:

---

৪২৬. Donald Drake Marian Uhlam, *Making Medicine, Making Money*, 1993.

স্মারণী

শ্রেণী বিভাগ	ওষুধের সংখ্যা	শতকরা হার
অগ্রাধিকার বিবেচনা	১৭০	২৩.৪%
সাধারণ বিবেচনা	৫৬০	৭৬.৬%
	৭৩০	১০০%

উপরের সারণীতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রয়োজনীয় ও নতুন ওষুধের সংখ্যা সবসময় কম। যদিও এই শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি কারও কারও কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। ওষুধ শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন এ প্রচুর ঝুঁকি এবং এতে বিশাল অংকের টাকা লগ্নি করতে হয় এমনই দাবি ওষুধ কোম্পানির এবং তার ফলেই ওষুধের মূল্য বেশি রাখতে বাধ্য হয় তারা। কিন্তু কিভাবে এবং গবেষণা উন্নয়নে কত অর্থ লগ্নি করা হয় তা জানতে চাইলে আমেরিকা কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, তখন সরাসরি অপরাগতা জানাল ওষুধ কোম্পানী। বিষয়টি নিয়ে দুপক্ষে আইনি যুদ্ধ শুরু হল, যা চলল দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর, ১৯৭৪ হতে ১৯৮৩ সন পর্যন্ত। কংগ্রেসের দাবি যেহেতু তাদের নাগরিকদের জন্য চুক্তির মাধ্যমে ওষুধ কিনতে হয়, সেইহেতু তারা জানতে চান কি কি কারনে ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। কোম্পানির উত্তর তারা সেই হিসাবে দেখতে সম্মত যা এই চুক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত কিন্তু অনেক অপ্রত্যক্ষ ব্যয়ও R & D এর সঙ্গে জড়িত কাজেই তা তারা দেখতে রাজী নয়। অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট তাদের রায়ে জানাল যেহেতু কংগ্রেসই সীমাবদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেছে সেহেতু এর পরিবর্তনও কংগ্রেসের উপর বর্তায়। আসলে এই আদালত যুদ্ধের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না যদি কংগ্রেস তার আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিভিন্ন তথ্য চাইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের মত হচ্ছে সম্ভবত সেটা রাজনৈতিক বিবেচনায় সম্ভব ছিল না।[৪২৭]

গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়: বর্তমানে বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সাফল্যে এ কথা সঠিক নয় যে, R & D অতীতের মতই ব্যয়বহুল। গবেষণা এখন সময় লাগে কম। গবেষণার যোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়ছে এবং আমরা দেখেছি যে, বেশির ভাগ ওষুধ আবিস্কারই হচ্ছে সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে। কাজেই একইভাবে গবেষণা করার জন্য যে অর্থ ও সময় ওষুধ কোম্পানি লগ্নি করে বলে দাবি করে তা আদৌ সত্য নয়। এক যুগ পূর্বে যেখানে একজন দক্ষ রসায়নবিদ বৎসরে ৫০-১০০টি নতুন রাসায়নিক উপাদান তৈরি করতে পারতেন সেখানে বর্তমানে বিভিন্ন প্রযুক্তির কারণে একই সময়ে কয়েক হাজার রাসায়নিক উপাদান তৈরি করতে পারেন। তাছাড়া উচ্চগতি সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে খুব অল্প সময়ে নির্ণয় করা সম্ভব কোন Compounds সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় Molecules আছে। এর জন্য ওষুধ নির্বাচন পদ্ধতিতে সময় হ্রাস পেয়েছে সফলতার হার বেড়েছে এবং ফলে Pre Clinical ও Clinical পরীক্ষার ব্যয়ভার কমেছে। আমাদের হিসাবে প্রতি ওষুধ আবিষ্কারে কোম্পানিরা কমপক্ষে ২০০ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে পারে এবং সময়ে ব্যাপ্তিও কমেছে ২-৩ বৎসর।[৪২৮] Public Citizen's Congress

৪২৭. *"Issue Advertising in 1999-2000 election cycle"* Annenberg policy center of the university of Pennsylvania, Feb. 2001.

৪২৮. Price Water house Coopers, "Pharma 2005 Silicon Rally: The race to e-R&D," *Parexel's*

Watch এর জুলাই ২০০১ সালের প্রতিবেদনের একটি অংশ ছিল এই রকম Pharma এর নিজস্ব রিপোর্ট জানা যায় নব্বই দশকে আমেরিকা ও বিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলো ১৩৯.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে R&D তে। ঐ সময়ে FDA ৮৫৭টি নতুন ওষুধ অনুমোদন করেছে। তাদের হিসাব অনুসরণ করে সহজ বিভাজন করেই জানা যায় যে, প্রতিটি ওষুধ উদ্ভাবনে ব্যয় হয়েছে ১৬৩ মিলিয়ন ডলার। অন্য একটি সংস্থা দাবি করে যে, আসলে প্রতি ওষুধে R&D এর ব্যয় ৫৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি নয়।[৪২৯] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এ ধরণের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে ওষুধের মান এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রমে জনসংখ্যা, পরিকল্পিত পরিবার গঠন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় ই-গভর্নেন্স কর্মসূচীর ওয়েব-সাইটে জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং তাদের মাঝে এইচআইভি/এইডসহ বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পারে।[৪৩০]

স্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামের দিক-নির্দেশনা

বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে একটি জনবহুল মুসলিম দেশ। দেশেটি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছে। দেশটির ভূ-অবকাঠামোগত অবস্থান, আবহাওয়া, জলবায়ু, কষ্টসহিষ্ণু জনগোষ্ঠী প্রভৃতি দেশটির উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু সাম্প্রতি সময়ে খাদ্যে ভেজাল প্রবণতা দেশটিতে মারাত্নক আকার ধারণ করেছে। বিষয়টি দেশের জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশের খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সক্রিয় পদক্ষেপ যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে প্রচলিত আইন-কানুনের সাথে ইসলামী বিধি-বিধানের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য একটি কার্যকর পদক্ষেক গ্রহণ করা যায় বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই এর রয়েছে সুন্দর, সুস্পষ্ট, যথার্থ ও বিজ্ঞানসম্মত দিক নির্দেশনা। ইসলামে ভেজাল একটি ব্যপক অর্থবোধক শব্দ। তাই ভেজাল বলতে কেবল খাদ্যসামগ্রীতে বর্জ্যপদার্থ, ভিনজাতীয় পদার্থ বা বিষ মিশানোকেই বুঝায় না।

Pharmaceutical R&D Statistical Source Book, 2000.

[৪২৯]. মজনু-নুল হক, cÖv¸³, পৃ. ৪২-৪৫

[৪৩০]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

বরং ব্যবসায়িক লেন-দেন তথা ক্রয়-বিক্রয়ে বস্তুর দোষ-ত্রুটি গোপন করা, ওজনে কম দেয়া, মিথ্যা তথ্য দেয়া, ধোঁকা দেয়া, আসল কথার বিপরীত করা, ভালো মানের পণ্যতে নিম্নমানের পণ্য মিশ্রণ দেয়া, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করা ইত্যাদি ভেজালের অন্তর্ভুক্ত। আর খাদ্যসামগ্রীতে এ ধরনের ভেজাল দেয়া ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ। ভালো কোন কিছুর সাথে মন্দ কোন কিছু মেশানোকে মহান আল্লাহ্ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে আহলে কিতাবগণ![৪৩১] কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রত করছো এবং সত্যকে গোপন করছো, অথচ তোমরা তা জান।[৪৩২]

ইসলাম পূত-পবিত্র খাদ্যসামগ্রী এবং মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা হালাল বা বৈধ করেছে। আর যেসব খাবার অকল্যাণকর তা হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছে।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্র ঘোষণা-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে মানব জাতি! পৃথিবিতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৪৩৩]

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর প্রতি তোমরা মু'মিন।[৪৩৪]

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।[৪৩৫]

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল ঘোষণা করেছেন এবং যাবতীয় অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন।[৪৩৬]

আল-কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে জীবিকা তথা ভোগের ব্যাপারে 'হালাল' ও 'তায়্যিব' বা পবিত্র এ দু'টি নীতি উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৩৭] ভোগের ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য পবিত্র হতে হবে। পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্য যেমন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, অনুরূপ অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য তেমনি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন খাদ্যসামগ্রী ভোগ করতে হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক"।[৪৩৮] পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর খাবারের সাথে ভেজাল মিশিয়ে অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করা, বিভিন্ন বর্জ্যপদার্থ এমনকি রোগাক্রান্ত হওয়ার মত দূষিত উপকরণ মিশিয়ে

---

[৪৩১]. মূলত তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের অনুসারী তথা মূসা এবং ঈসা আ. এর অনুসারীগণকে আহলে কিতাব বলা হয়।

[৪৩২]. আল-কুরআন ৩ : ৭১

[৪৩৩]. আল-কুরআন ২ : ১৬৮

[৪৩৪]. আল-কুরআন ৫: ৮৮

[৪৩৫]. আল-কুরআন ২৩ : ৫১

[৪৩৬]. আল-কুরআন ৭ : ১৫৭

[৪৩৭]. মাওলানা হিফজুর রহমান, (মাওলানা আব্দুল আউয়াল অনূদিত), Bmjv‡g A_%bwZK e¨e¯'v, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ৪৪

[৪৩৮]. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আত-তহারাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল অযূ বৈরূতঃ দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১৪০; হাদীস নং-৫৫৬

খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা অপরাধমূলক কর্মকান্ডের অন্তর্ভূক্ত। যারা এসকল কাজ করে তারা দেশ ও জাতির বড় শত্রু। ইসলামের দৃষ্টিতে এরা মস্তবড় পাপী ও অপরাধী। কেননা এটি একটি হারাম কাজ। এভাবে ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে হালাল খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে তা হারাম করার সকল পন্থা ইসলামে নিষিদ্ধ। তা ক্রয়-বিক্রয় হোক কিংবা অন্যান্য মানবীয় ব্যাপারেই হোক, কোন ক্রমেই জায়িয নয়। ইসলামের দাবী হচ্ছে, সব ব্যাপারেই মুসলিম সততা ও ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করবে।[৪৩৯]

খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করা, হালাল খাবারে হারাম উপাদান মিশিয়ে তা হারাম করা, ব্যবসায় মিথ্যা বলা, ওজনে কম দেয়া, অত্যধিক প্রশংসা বা কসম করে পণ্য বিক্রি করা ইত্যাদি ইসলামের বাণিজ্যনীতি পরিপন্থী। যারা বিভিন্ন কৌশলে খাদসামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে ব্যবসা করে তারা গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়। এ কারণে ইসলাম তাদের এহেন অপরাধের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বিভিন্ন রকমের শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

যারা আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয় কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না।[৪৪০]

এতদ্ সম্পর্কিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, একদিন রসূলুল্লাহ (সা.) এক স্তুপ খাদ্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং খাদ্যে আর্দ্রতা অনুভব করলেন। অতঃপর বললেন, হে শস্যের মালিক! এমনটি কেন? মালিক বলল, বৃষ্টির পানিতে এমন হয়েছে। এরপর রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার দলভূক্ত নয়।[৪৪১] এভাবে প্রতারণা করে কিংবা ধোঁকা দিয়ে পণ্য সামগ্রী বিক্রি করা ভেজালের নামান্তর। কেননা উভয় ক্ষেত্রেই পণ্যের আসল রূপ গোপন রাখা হয়।

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বস্তুর দোষ-ত্রুটি গোপন করার অপরাধ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন কোন দু'ব্যক্তি স্বচ্ছতা ও সততার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করল, তখন তাদের এ বেচাকেনার মধ্যে কল্যাণ দান করা হয়। আর যদি তারা বিক্রিত বস্তুর দোষ-ত্রুটি গোপন করে এবং মিথ্যা কথা বলে তবে তাদের সে ক্রয়-বিক্রয়ের কল্যাণ (বরকত) উঠিয়ে নেয়া হয়।[৪৪২]

যারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশায়, মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিক্রি করে, ওজনে কম দেয়, প্রতারণা করে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে পাপী, জঘন্য অপরাধী, আর পার্থিব জীবনে তারা দেশ ও জাতির শত্রু। এ ধরনের ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা

---

৪৩৯. ইউসূফ আল-কারযাভী, Bmjv‡g nvjvj nviv‡gi weavb, (ভাষান্তর মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৪ খ্রি. পৃ. ৩৫৯

৪৪০. আল-কুরআন, ২ : ৯

৪৪১. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), (অনুবাদ মাওলানা আফলাতুন কায়সার), Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি স. মান গাশশানা ফালাইসা মিন্না, হাদীস নং-২৯৪, খ. ১, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৬৭

৪৪২. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায়ঃ আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদঃ আস-সিদকু ফিল বায় ওয়াল বায়ান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০; হাদীস নং-৩৯৩৭

মহাপাপী রূপে উত্থিত হবে। তবে সে সব ব্যবসায়ী নয়, যারা আলাহ্কে ভয় করবে, সৎভাবে লেনদেন করবে, সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করবে।[৪৪৩]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে ব্যবসায়ীরা পাপিষ্ঠ। তখন সাহাবা কিরাম রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ কি ব্যবসাকে হালাল করেননি? রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাব দিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু তারা কথায় কথায় মিথ্যা বলে এবং শপথ করে গুনাহে লিপ্ত হয়।[৪৪৪]

মহান আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে কল্যাণকর কাজ করতে এবং অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম উপাদান হল খাদ্য। ইসলাম মানুষের জন্য পূত-পবিত্র, হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

ا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

'হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'।[৪৪৫]

খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল দিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নিঃসন্দেহে অপরাধ ও পাপের কাজ। এহেন কর্মকান্ড পরিহারের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তাকে তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে'।[৪৪৬]

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ

আমি কত জনপদকে ধ্বংস সাধন করেছি, যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি।[৪৪৭]

মানবসমজে সৃষ্ট বা প্রচলিত অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি গুটিকয়েক লোক করে থাকে। আর এর ফলভোগ করে সমাজের সকলেই। তাই এহেন কর্মকান্ড প্রতিরোধ করা সমাজের সকলেরই দায়িত্ব। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়া একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ। সমাজের মানুষ যদি তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা না করে তাহলে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় দুস্কৃতিতে বাধা দিবে। যদি তা না কর, তবে অচিরেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের

---

[৪৪৩]. ইমাম তিরমিযী, Avm-mbvb, অধ্যায়: আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ: আত-তুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতুন নাবিয়্যি স. ইয়্যাহুম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫১৫, হাদীস নং-১২১০

[৪৪৪]. আহমদ ইবন হাম্বল, gmbv‡' Avng', হাদীস নং: ১৫৫৬৯; হাদীসটি সহীহ। দ্র. wmjwmjvZj Avnv'xQm mnxnv, খ. ১, হাদীস নং: ৩৬৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫,

[৪৪৫]. আল-কুরআন ২ : ১৬৮

[৪৪৬]. আল-কুরআন ২৪ : ২১

[৪৪৭]. আল-কুরআন ২১ : ১১

প্রতি আযাব নাযিল করবেন। তারপর তোমরা তাঁকে ডাকবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না'।[৪৪৮]

বাংলাদেশের খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল প্রতিরোধ করার জন্য মানুষের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মানসিকতা পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী। কেননা মুনাফার অতিমাত্রায় লোভ তাদের অন্তরকে কলুষিত করে তুলেছে। তাদের অন্তকরণ ঈমানের আলোকে আলোকিত করে পূত-পবিত্র করা দরকার। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'সাবধান! তোমাদের দেহের মধ্যে এক টুকরো মাংস রয়েছে।

যখন তা বিশুদ্ধ হয় তখন সমস্ত দেহটাই বিশুদ্ধ হয়, আর যখন তা কলুষিত হয় তখন সমস্ত দেহটাই কলুষিত হয়। আর তা হচ্ছে অন্ত-করণ'।[৪৪৯]

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়া ধোঁকা বা প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। তাই যেসব লেনদেনে ধোঁকা বা প্রতারণা নিহিত রয়েছে রসূলুল্লাহ স. সেসব প্রতারণামূলক লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন, পাথরের টুকরো মিশিয়ে বস্তু বা পণ্য কেনা-বেচা করা।[৪৫০] পণ্যে ভেজাল দিয়ে ধোঁকা বা প্রতারণার মাধ্যমে কেনা-বেচা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. এর সুস্পষ্ট ঘোষণা, 'যে ধোঁকা দেয় ও প্রতারণা করে সে আমাদের দলভূক্ত নয়'।[৪৫১]

সমাজে অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য ইসলাম পার্থিব শাস্তিকে যথেষ্ট মনে করেনি। তাই মানুষের মন-মানসিকতা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব-সমাজে ইসলামের উন্নত ও মহান চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সর্বাত্মক নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলাম মানুষের হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অপরাধ ও দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আর প্রকৃত ঈমান ও একনিষ্ঠ দৃঢ় প্রত্যয়ই হচ্ছে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ, নির্লজ্জতা ও হারাম কাজ অবলম্বনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ।

উপরন্তু একজন সত্যিকারের মুসলিম জানেন ও বিশ্বাস করেন যে, তিনি যা কিছুই করেন মহান আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। কারও কোন অপরাধ লোকজনের নিকট অজানা থাকলেও আল্লাহর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না। কেউ যদি অপরাধ করে দুনিয়ার শাস্তি থেকে নিস্তার পেয়েও যায়, তবুও পারলৌকিক শাস্তি থেকে সে কিছুতেই রেহাই পেতে পারে না। একজন মুসলিমের এহেন বিশ্বাস মানবসমাজে অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধক।[৪৫২] কাজেই

---

[৪৪৮]. ইমাম তিরমিযী, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-কিতান, অনুচ্ছেদ : আল-আমারু বিল মারূফ ওয়ান নাহয়ু আনিল মুনকার, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৬৮, হাদীস নং-২১৬৯

[৪৪৯]. ইমাম ইবনে মাজাহ, Avm-mbvb, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : আল-উকূফ ইনদাশ শুবহাত, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং-৩৯৮৪

[৪৫০]. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : বুতলানু বায়ঈল হাসাতি ওয়াল বায় ফীহি গারার, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩, হাদীস নং- ৩৮৮১

[৪৫১]. ইমাম মুসলিম, Avm-mnxn, অধ্যায় : আন-ঈমান, অনুচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি স. মান গাশ্‌শানা ফালাইসা মিন্না, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭, হাদীস নং-২৯৪

[৪৫২]. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, Av_-mvgwRK mgm¨v mgvav‡b Avj-nv'x‡mi Ae'vb:wc¶¶‡Z evsjv‡'k, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৩৯৬

কোন মানুষ যদি ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে তার দ্বারা খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল দেয়া সম্ভব নয়।

বর্তমান বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে ভেজাল একটি বড় রকমের সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। যার থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও মুক্ত নয়। এ দেশে ভেজাল মেশানোর প্রবণতা অসাধু ব্যবসায়ীদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। অসৎ ব্যবসায়ী সর্বদাই স্বল্প পূঁজিতে এবং স্বল্প সময়ে অত্যাধিক মুনাফা অর্জন করতে চায়। এ কারণে তারা নীতি-নৈতিকতা মেনে ব্যবসা-বাণিজ্য করে না। খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে পরিমাপে ও ওজনে কম দিয়ে, প্রতারণা করে, মজুদদারী করে, নিষিদ্ধ ও হারাম দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করে, অসাধু উপায়ে মানুষকে ঠকিয়ে মুনাফা অর্জন করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। মানুষের অধিকার, জনস্বার্থ, জনস্বাস্থ্য সর্বোপরি মানুষের জীবন তাদের কাছে একেবারেই তুচ্ছ বিষয়। অথচ আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জন ব্যবসায়ী মুসলিম। তারা সালাত আদায় করেন, রোযা রাখেন, হজ্জ করেন, অনেকে যাকাতও দেন। যাদের মধ্যে এমন ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ বিরাজমান, তারা কিভাবে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন কৌশলে খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশান? নিম্নমানের দ্রব্যকে 'এক নম্বর' বলে চালিয়ে দিয়ে প্রতারণা করেণ? খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর কেমিক্যাল, বিষ্ফোরক দ্রব্য, রং ও অরুচিকর উপাদান মেশান? বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক।

বাংলাদেশের হাট-বাজার, মার্কেট ও বিপণি-বিতানগুলো ভেজাল খাদ্যদ্রব্যে সয়লাব হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা পরকালের মুক্তি ও সাফল্য লাভের চাইতে দুনিয়ার জীবনের সাফল্য ও ভোগ-বিলাসকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। ফলে তাদের ঈমানের ভিত্তি ও শক্তি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী। আর এ জন্য প্রয়োজন ব্যপক ইসলামী জ্ঞান চর্চা, গণসচেতনতা ও ইসলামের বিধিগুলোর প্রচারণা। সরকারি-বেসরকারি ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এহেন প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি।

অতএব, বাংলাদেশে খাদ্যসামগ্রীতে যেভাবে ভেজাল মিশিয়ে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করা হচ্ছে তা জনসাধারণের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভেজাল মিশ্রিত এ ধরনের ক্ষতিকারক ব্যবসা ইসলামে সর্বাবস্থায় হারাম। একজন মুমিন-মুসলিম ব্যবসায়ী এহেন হারাম ও খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রিত ক্ষতিকারক ব্যবসা পরিত্যাগ করে হালাল ব্যবসা পরিচালনা করবেন, এটাই আমরা আশা করি। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা যদি ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধ লালন করে সৎভাবে ব্যবসা পরিচালনা করেন, ক্রেতাসাধারণ যদি সঠিক পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সচেতনতা অবলম্বন করেন, সর্বোপরি সরকারি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যদি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন, তাহলে বাংলাদেশে খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল প্রতিরোধের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে।

প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে তিব্বে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা Prophetic Medicine এর তুলনা মুলক আলোচনা

- আসমানী প্রত্যাদেশ বা অহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাই সর্বোত্তম এবং সন্দেহের রেশমুক্ত জ্ঞান।

- সকল নবী আলাইহিমুস সালাম পবিত্র, ধার্মিক, মহৎ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন।
- তাঁরা গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী।
- সকল নবী আলাইহিমসি সালামই সবচেয়ে উন্নত ও সর্বোত্তম চরিত্র ও মনের অধিকারী।
- তাঁরা যুক্তি, বুদ্ধি ও মেধায় যার যার সময়ে ছিলেন অদ্বিতীয় ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত।
- তাঁরা আল্লাহর সৃষ্টি জগতের বেতর সবচেয়ে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সত্যের ধারক-বাহক।

সুতরাং এঁরা যে অভ্যাস মেনে চলেন বা চলতে উপদেশ দেন, তা সর্বোত্তম এবং রোগ নিরাময়ের যেসব উপায়-উপকরণ বর্ণনা করেন, তা সর্বোৎকৃষ্ট।

অপরদিকে রোগ নিরাময়ে নবীগণের অনুসারী বা সাহাবীগণ যেসব উপায়-উপকরণ নির্ধারণ করেন ও ব্যবস্থাপত্র দেন, তাও নিঃসন্দেহে সাধারণ ডাক্তার বা চিকিৎসকের চেয়ে অনেক উত্তম ও কার্যকরী।

তিব্বুন নববী সাথে আধুনিক চিকিৎসার পার্থক্য

বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান তথা তিব্বুন নববীর সাথে অন্যান্য আধুনিক ও সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য সাধারণ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকের সাথে অর্ধশিক্ষিত হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার পার্থক্যের চেয়েও বেশি। বস্তুত তিব্বুন নববীর উৎসই হচ্ছে কিছু অহি বা প্রত্যাদেশ, কিচু ইলহাম ভিত্তিক অনুপ্রেরণা বা প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান।তবে এর সিংহভাগই সমাজে প্রচলিত পদ্ধতি এবং শ্রুত-অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞানের উৎকর্ষতার উপর নির্ভরশীল। আর সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থার বিত্তি হচ্ছে তার সবই অনুমান, অভিজ্ঞতা, ল্যাবরেটরিতে পরিক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণার ফলাফল।

Modern medicine is based on conjecture, suppositions and experimentation. অপরদিকে তিব্বুন নববী এসবের উপর নির্ভরশীল নয়। Medicine of the Prophet (SAWS) are not based on speculations or results of laboratory investigations. They are based on niche of the Prophecy and perfection of human intellect.[453]

মহানবী (সা.) এর চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

- Prophetic Medicine বা বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধানের ভিত্তি হচ্ছে কিছু আসমানী অহী বা প্রত্যাদেশ, কিছু শ্রুতি ও সামাজিক প্রথার অভিজ্ঞতা এবং তাওহীদ ও আখিরাতের চেতনা। অপরদিকে সাধারণ চিকিৎসকের দেয়া ওষুধের ভিত্তি হচ্ছে বস্তুবাদী গবেষণা ও অনুমানপ্রসূত মতামত।
- সাধারণ ডাক্তারের ওষুধ নির্ভর করে ধারণা, কল্পনা, অনুমান আর গবেষণার ফলাফলের উপর। অপরদিকে নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেডিসিন নির্ভর করে নবূয়্যতের বিশেষ মর্যাদা, বুদ্ধির পূর্ণতা ও জ্ঞানের উৎকর্ষতার উপর।

---

[৪৫৩]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, CV¸ 3, পৃ-৪৫-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

- সাধারণ ডাক্তারের বক্তব্য বা ব্যবস্থাপত্র নির্ভর করে মেজাজ, সমসাময়িক স্থান-কাল ও প্রথাসমূহের উপর, অন্যদিকে নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালামের মেডিসিন সকল কালের সকল এলাকার সকল লোকের স্বাস্থ্যের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য[৪৫৪]

আদর্শ পরিবার গঠন পদ্ধতি

আধুনিক বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো বাংলাদেশে যেমন দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি দিন দিন বেড়েই চলেছে নাগরিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তাসহ নানা ধরনের অসুবিধা। বর্তমানে অন্যান্য সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি আদর্শ ও গ্রহণযোগ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন। একদিকে সরকার বিভিন্ন প্রকার খাবারবড়ি, স্ট্রিপ, লাইগেশন, ভ্যাসেকটমিসহ নানা প্রকারের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচলন ঘটিয়েছে অন্যদিকে মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশের আলেম সমাজ এ সকল পদ্ধতিকে নাজায়েজ বলে ফতোয়া দিচ্ছেন। প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার অনাকাংখিত রোগ-ব্যাধির আবির্ভাব ঘটায় যা আমরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারি এবং এটা ব্যয় বহুলও বটে। বর্তমান সরকার আধুনিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গড়তে জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এমতাবস্থায় আদর্শ পরিবার গঠন কি পদ্ধতিতে হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। চলমান ব্যয়বহুল, বিতর্কিত এবং বহুরোগ সৃষ্টিকারী পদ্ধতির পরিবর্তে প্রস্তাবিত আদর্শ পদ্ধতি গ্রহণ করলে স্বল্প খরচে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে বিজ্ঞান সম্মত এই আদর্শ পরিবার গঠন পদ্ধতি পৌঁছে দেয়া সম্ভব। এছাড়া সবার মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনমূলক শিক্ষা প্রদান, প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতাসহ ধর্মীয় ভাবধারায় জীবন পরিচালনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

জনসংখ্যা বিজ্ঞান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাসের গতিধারা ও অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে। ঈসায়ী ২য় শতাব্দী হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ কোটি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি।[৪৫৫] সপ্তদশ শতাব্দী অর্থাৎ আধুনিক যুগ শুরু হবার পূর্বে মৃত্যুহার ছিল সবচেয়ে বেশী। তখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ খরা ইত্যাদি কারণে মৃত্যুহার ছিল ব্যপক। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুন্নত থাকায় শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশী। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অধুনিক যুগের শুরু হয়। তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মহামারি, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমতে থাকে কিন্তু জন্মের হার ঠিক থাকে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইউরোপে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে নতুন জনবসতি স্থাপিত হতে থাকে। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে জন্মের হার কমতে থাকে। বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থিতি লাভ করে। তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা তখন ভিন্নরূপ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ফললাভ অধিকাংশ দেশে পৌঁছেনি। ফলে মৃত্যুর হার ও তেমন একটা হ্রাস পায়নি। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্কুল-কলেজ স্থাপন, হাসপাতাল স্থাপন, অধুনিক শিক্ষার বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ইত্যাদি কারণে মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে জন্মের হার একই পর্যায়ে

---

[৪৫৪]. C\/¸ ³, পৃ-৪৬-৪৭

[৪৫৫]. Omran, *the Epidemiologic Transition*, Mibank Tournal, p. 509.

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে উন্নত বিশ্বের মতো সামাজিক ও স্বাস্থ্যসম্মত সুযোগ-সুবিধা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়নি। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে উন্নত বিশ্বের মতো সামাজিক ও স্বাস্থ্য সম্মত সুযোগ-সুবিধাসমূহ দ্রুত সম্প্রসারিত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যখন তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহে জন্ম হার ঠিকই রইলো কিন্তু মৃত্যু হার কমতে থাকলো, তখন সৃষ্টি হলো নতুন এক সমস্যা। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কিছুতেই তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলো না। কিছু অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ পরিবার পরিকল্পনা অভিযান শুরু করলো। এর উদ্দেশ্য হলো গর্ভধারণ এবং জন্মহার সীমিত করা, যাতে সম্পদের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামঞ্জস্য থাকে। আধুনিক যুগ শুরুর কারণে জীবন-যাত্রার মান এবং ব্যায় দু'ই বৃদ্ধি পেল। ফলে, শুরু হলো নতুন আরেক সমস্যা। জীবন-যাপনের মান বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজন হলো উন্নত আবাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধার। জীবন-যাপনের ব্যায় বৃদ্ধি পেল ফলে, পারিবারিক আয়ের উপর নতুন চাপ সৃষ্টি হলো। সমাজের শিক্ষিত এবং ধনী ব্যক্তিরা জন্মনিয়ন্ত্রণের তথ্য এবং উপকরণ সম্পর্কে প্রথমে অবহিত হয়ে পরিকল্পিত পরিবার গঠন শুরু করলো। সমাজে সৃষ্টি হলো জটিল আরেক অবস্থা। একই দেশের মধ্যে যাদের সম্পদ বেশী তার সন্তান কম এবং যার সম্পদ কম তার সন্তান বেশী। ফলশ্রুতিতে দেশের ৯০ ভাগ সম্পদের মালিক ১০ ভাগ জনগণ এবং ১০ ভাগ সম্পদের মালিক ৯০ ভাগ জনগণ। যারা অশিক্ষিত, অল্প আয়ে তুষ্ট, যাদের জীবনের চাহিদা কম তাদের পরিবারের আয়তন অন্যদের থেকে বড়। আর যারা শিক্ষিত, ধনী, ভালভাবে থাকতে চায়, উন্নততর জীবনযাত্রার স্বাদ গ্রহণ করতে চায় তাদের পরিবারের আয়তন অন্যদের থেকে সীমিত। সমাজের এক অংশ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে পরিবারের জনসংখ্যা সীমিত রাখতে পক্ষপাতী কিন্তু অপর অংশ এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত নয়। সমাজের ধার্মিক শ্রেণী একে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মেনে নিতে পারছে না। তারা বলে আল কুর'আনে মহান আল্লাহ বলেছেন, "ভাল ও মন্দ এক নহে যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে।"[৪৫৬] মহান আল্লাহ আরো বলেন, "যমিনের ওপর বিচরণশীল সকলের জীবিকার দায়ীত্ব আল্লাহ্‌র।"[৪৫৭]

পরিকল্পিত পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে একটি জনবহুল মুসলিম দেশ। দেশটি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছে। দেশটির ভূ-অবকাঠামোগত অবস্থান, আবহাওয়া, জলবায়ু, কষ্টসহিষ্ণু জনগোষ্ঠী প্রভৃতি দেশটির উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশটিতে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিষয়টি দেশের জনগণের খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম অঙ্গীকার সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রতিরোধে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। দেশের মানুষের এ সকল সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে

[৪৫৬]. আল-কুরআন ৫ : ১০০
[৪৫৭]. আল-কুরআন ১১ : ৬

আসছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যানে আয়োজিত এক জনসভায় যে বক্তব্য রাখেন তা' প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ভাইয়েরা আমার, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বৎসর আমাদের ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তা হলে ২৫-৩০ বৎসরে বাংলার কোন জমি থাকবে না হালচাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে।[৪৫৮] সে জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্লানিং করতে হবে।" এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতির একটি রূপরেখা প্রণীত হয়।[৪৫৯] জনসংখ্যা নীতির রূপরেখায় মা ও শিশুর উন্নত স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার প্রয়াসে পরিবারের আকার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সার্বিক সামাজিক পূর্ণগঠন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ রূপরেখায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং তদারকি ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গৃহীত কর্মসূচীগুলোর অন্যতম হল পছন্দ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম জোরদার করা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন। এতে আইনগত ব্যবস্থার আওতায় বিয়ের বয়স বৃদ্ধি করা এবং মৌলিক তথ্য নিবন্ধন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর ও জোর দেয়া হয়। ফলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৬১.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[৪৬০] পাশাপাশি মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate-TER) ১৯৭৫ সালে ৬.৩ থেকে ২০১১ সালে ২.৩ এ নেমে এসেছে।[৪৬১] জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৩ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে ১.৩৪ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।[৪৬২] তবে এ সফলতা জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৬৪ জন,[৪৬৩] বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশসমূহের অন্যতম) ছাড়াও বনভূমি ও চাষযোগ্য জমি হ্রাস, বায়ু ও পানি দূষণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, অপর্যাপ্ত বাসস্থান, বেকারত্ব, অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতের ধীর অগ্রগতি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্তরায় সৃষ্টিকারী সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০04 এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ২০১০ সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার-১ অর্জন করা, যাতে ২০৬০ সালে স্থিতিশীল জনসংখ্যা অর্জিত হয়। কিন্তু ২০১০ সালের মধ্যে

[৪৫৮]. evsjv‡'k RbmsL¨v bxwZ-2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[৪৫৯]. evsjv‡'k RvZxq RbmsL¨v bxwZ- GKwU iƒc‡iLv, প্রাগুক্ত, জুন ১৯৭৬ খ্রি. পৃ. ৬

[৪৬০]. evsjv‡'k RbmsL¨v bxwZ-2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৪৬১]. *Bangladesh Demography and Health Survey (BDHS),* Preliminary Report-2011.

[৪৬২]. evsjv‡'k RbmsL¨v bxwZ-2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৪৬৩]. *Population & Housing Cencus,* Preliminary Results-July 2011.

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নীট প্রজনন হার-১ অর্জন করা সম্ভব হয়নি বিধায় কর্মসূচিতে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে বর্তমান জনসংখ্যা নীতিকে হালনাগাদ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এছাড়া ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনাসহ Millennium Development Goals (MDG's), 1994 সালে অনুষ্ঠিত। International Conference on Population and Development (ICPD) এবং Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১১ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ আদমশুমারির প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ। এই সংখ্যা প্রতি বছর প্রায় ১৮-২০ লাখ করে বাড়ছে। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯৬৪ থেকে ২০১৫ সালে ১০৫০ এ দাঁড়াবে।[৪৬৪] ফলে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন, পানি, পয়:নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল প্রকার সেবা ও অবকাঠামোয় প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া, দেশের বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে এবং এখনো দেশের কিছু কিছু এলাকা ও জনগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠন করা অপরিহার্য।

২০০৪ সালের জনসংখ্যা নীতিতে ২০১০ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জনউর্বরতা (Replacement Level Fertility) এবং নীট প্রজনন হার (Net Replacement Rate NRR-1) অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বর্তমান জনউর্বরতার হার ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বিবেচনান্তে দেখা যায় যে, ওই সময়ের মধ্যে NRR-1 অর্জন করার সম্ভব হয়নি। এছাড়া গ্রহীতামুখী সেবা, যুব-বান্ধব সেবা, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা, দরিদ্র ও বয়স্ক-বান্ধব সেবা, মানব-সম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পনাসহ নানা প্রকার কর্মকৌশল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নসহ কর্মসূচিতে আশানুরূপ সাফল্য আসেনি। কম বয়সে বিয়ে ও সন্তান ধারণ, দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে গতিময় সৃষ্টি না হওয়ায় কর্মসূচিতে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। অধিকন্তু, কম অগ্রগতিসম্পন্ন অঞ্চলসহ দুর্গম এলাকায় এলাকাভিত্তিক যথেষ্ট সংখ্যক বিশেষ কর্মসূচী গৃহীত না হওয়ায় প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে NRR-1 অর্জন করা প্রয়োজন এবং ২০১৫ সালের মধ্যে NRR-1 অর্জন করা গেলে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২২ কোটিতে দাঁড়াবে এবং ২০৭০ সালে তা ২৩-২৫ কোটিতে গিয়ে স্থির হবে।[৪৬৫] যদি NRR-1 অর্জন বিলম্বিত হয় তাহলে কমবয়সী জনসংখ্যা কাঠামো থেকে সৃষ্ট গতিময়তার (Momentum) কারণে জনসংখ্যা স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছাতে আরও বিলম্ব হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে সীমিত ভৌগোলিক পরিমন্ডলে ব্যাপক জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, জলবায়ু, পরিবেশ ও যোগাযোগ অবকাঠামোসহ মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা কষ্টসাধ্য হবে।

[৪৬৪]. evsjv‡'k RbmsL¨v bxwZ-2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৪৬৫]. cv¸³, পৃ. ৩

বাংলাদেশ প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে এশিয়ার ৫ম এবং বিশ্বে ৮ম জনবহুল দেশ হিসাবে অবস্থান করছে। জনসংখ্যার আধিক্য এবং বৃদ্ধির হার বাংলাদেশে নানা জটিল সমস্যা সৃষ্টি করছে। কিন্তু সরকারের বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে মোট প্রজনন হার ২.৩ এ নেমে এসেছে এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬১.৭% এ উন্নীত হয়েছে। বিবিধ আর্থসামাজিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নারী শিক্ষার অগ্রগতি, জরুরি প্রসূতি সেবা সম্প্রসারণ, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি ও শিশুরোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশের জনমিতিক সূচকসমূহে অগ্রগতি বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচিতে গতি সৃষ্টি ও তদারকি কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে নতুনভাবে জনসংখ্যা নীতি ২০১২ জারি করা হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে এই নীতিমালা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরীতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে গণমাধ্যমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাধ্যমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কর্মসূচিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বিটিভি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল, বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেল, এভি ভ্যানের মাধ্যমে নাটক, শর্ট ফিল্ম, টিভি স্পট, রেডিও বার্তা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।[৪৬৬] এছাড়াও পল্লীগান, বিলবোর্ড, নিয়ন সাইন এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামের আলোকে পরিকল্পিত পরিবার গঠন কার্যক্রম প্রচারের জন্য ইমামদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ ও মহিলা) গ্রহণকারীর সংখ্যা ২,৪৯,৭৫৪ জন, দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ আইইউডি ২,৮১,১৬০ জন এবং ইমপ্যান্ট ২,৬৩,২৮৯ জন। ২০১৩ সাল পর্যন্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীসমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ওষুধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ ৩৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে।[৪৬৭] এই ক্রয়ের মাধ্যমে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় হচ্ছে। অপর দিকে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠন হলে রাষ্ট্র বিপুল অর্থ ও বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাবে।

বিজ্ঞানময় কুরআনে মানবসৃষ্টি ও মাতৃগর্ভে শিশু স্বাস্থ্য সংরক্ষণ

বিজ্ঞান বলছে মানব সন্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। পুরুষের বির্যে লক্ষ কোটি শুক্রাণু[৪৬৮] হতে মাত্র একটি[৪৬৯] সুস্থ-সবল শুক্রাণু স্ত্রীলোকের ডিম্বানুর সাথে ফ্যালোপিয়ান টিউবে মিলিত হয়ে তৈরী হয় 'জাইগোট'। পরে তা থেকে কোষ বিভাজন হয়ে এক কোষ থেকে দুই কোষ, দুই কোষ থেকে চার কোষ, চার কোষ থেকে আট কোষ, আট কোষ থেকে ষোল কোষে রূপান্তরিত হয়। এর কিছুদিন পর তা 'ব্লাস্টোসিস্ট' আকারে জরায়ুতে অবস্থান করে এবং নিরাপদ আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। জরায়ুতেই 'ব্লাস্টোসিস্ট' দিন-দিন বড় হতে থাকে। প্রথমে তৈরী হয় 'এক্টোডার্ম';

[৪৬৬]. 2012-2013 A_ eQ‡ii Kvhvewj m¤úwKZ ewlK cwZ‡e'b, প্রাগুক্ত, পৃ. ii

[৪৬৭]. cv¸³, পৃ. ii

[৪৬৮]. অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুলাহ্, Bmjvg I ¯v¯', ঢাকাঃ ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি. পৃ. ১২

[৪৬৯]. ড.মরিস বুকাইলি, (অনুবাদ আখ্তার-উল্-আলম), evB‡ej †KviAvb I weÁvb, ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, সপ্তম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ২৭৪

'এন্ডোডার্ম'; ও 'মেসোডার্ম' এই তিন স্তর বিশিষ্ট এমব্রায়োনিক ডিস্ক।[৪৭০] এই পর্যায়ে প্রতিনিয়ত আকৃতি পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথম প্রথম এটি দেখতে চেপ্টা ও প্রায় গোলাকার। ধীরে-ধীরে এটি লম্বা হতে থাকে। মাথার দিকটা মোটা হয় এবং নিচের দিকটা সরু হয়। দেখতে অনেকটা জোঁকের মতো। এই পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে জীবন সঞ্চিত হয়, হৃৎস্পন্দন শুরু হয়। ধীরে-ধীরে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হতে থাকে। ভ্রূণ বড় হতে থাকে আর এর বিভিন্ন স্থানে গুটি-গুটি ভাঁজ হতে থাকে। এ সময় ভ্রূণটি দেখতে চর্বিত মাংস খন্ডের মতো দেখায়। এরপর মস্তিষ্ক, হাড়, মাংস, চোখ, কান ইত্যাদি তৈরী হয়। ক্ষণে-ক্ষণে ভ্রূণটি জরায়ুর মধ্যে বড় হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পর ফুটফুটে সুন্দর মানব সন্তান প্রসব হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

"আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাকা থেকে, তারপর পূর্ণ ও অপূর্ণাকৃতির গোশতো পিন্ড থেকে; তোমাদের কাছে আমার কুদরত ব্যক্ত করার জন্য, আমার ইচ্ছামত জরায়ুতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখি' এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্ব প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।"[৪৭১] মহান আল্লাহ বললেন,

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

পুরুষ ও নারীর মিলিত শুক্রকীট থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়।[৪৭২] পুরুষের যে শুক্রকীট থাকে তাতে প্রায় দুই কোটি সন্তান জন্ম নিতে পারে। কিন্তু তার থেকে মাত্র ১টি কিংবা দু'টি সন্তানই সাধারণত জন্ম নেয়। এই শুক্রকীট যার থেকে একটা সন্তান জন্ম নেয় তার মধ্যে পুরুষের বীর্যে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজম এবং স্ত্রীর বীর্যে ২৩ জোড়া ক্রোমোজম। এর মধ্যে পুরুষের বীর্যে ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজম এবং নারীর বীর্যে ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজম থাকে। এরা সন্তান উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। অবশিষ্ট ২২ জোড়া কে বলা হয় অটজোম। বিজ্ঞান পুরুষের সেক্স ক্রোমোজম দু'টির নাম দিয়েছে x ও y, এবং নারীর সেক্স ক্রোমোজম দু'টির নাম দিয়েছে xx. এই ক্রোমোজমের মধ্যেও আল্লাহর বিধানানুযায়ী জোড়া রয়েছে। এটা এরূপ যে, মায়ের কাছ থেকে মাথা তৈরীর যে ক্রোমোজম সেটাকে আকর্ষণ করে পুরুষের কাছ থেকে আসা মাথা তৈরীর ক্রোমোজম। এভাবে প্রত্যেক স্বজাতীয় ক্রোমোজম একটি অপরটিকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। ফলে একই গুণ বিশিষ্ট ২২ জোড়া ক্রোমোজম (অটজোম) এক সঙ্গে জোড়া লেগে হয় ৪৪ জোড়া। অবশিষ্ট ২ জোড়া (পুরুষের ১ জোড়া এবং নারীর ১ জোড়া) বাকী থাকে তারাও একে অপরকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। এরপর পুরুষের কাছ থেকে যদি xy এর x এবং স্ত্রীর কাছ থেকে x x এর যে কোন একটি x এর

[৪৭০]. অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুলাহ্, Bmjvg I ¯^v¯'¨, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৪৭১]. আল-কুরআন ২২ : ৫

[৪৭২]. আল-কুরআন ৭৬ : ২

সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে পুরুষের কাছ থেকে আসা y এবং স্ত্রীর কাছ থেকে আসা অপর x নামক ক্রোমোজমটি নষ্ট হয়ে যায়। পূর্বের ৪৪ জোড়ায় কোন লিঙ্গ তৈরী হয় না বরং লিঙ্গ তৈরী হয় ২৩ নং জোড়ায়। ঐ জোড়ার মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রীর দু'টো x ক্রোমোজমের মাধ্যমে একটি ডিম্বকোষ তৈরী হয়। যার ফলে সন্তান হয় কন্যা, আর পুরুষের x ও y এর মধ্যে y এবং স্ত্রীর x x এর একটি যদি মিলিত হয় তবে এতে তৈরী হয় অন্ডকোষ, সন্তান হয় পুত্র। মানুষের দেহ গঠনের এটাই শেষ ব্যবস্থা নয়, এর সঙ্গে রয়েছে আরো অনেক সুক্ষ থেকে সুক্ষতর ব্যবস্থা। এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজমের বহু ছোট ছোট সেল রয়েছে মৌমাছি মৌচাকে তার বাচ্চা ও মধু রাখার যেরূপ একেকটা খোপ থাকে ঠিক তেমনি প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজমের থাকে বহু সেল।[৪৭৩] ক্রোমোজমের মধ্যে থাকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের উপাদান। যেগুলোর নাম দেয়া হয়েছে 'জীন'। সে জীন শব্দ থেকেই ইংরেজী 'জেনারেশন' শব্দের উৎপত্তি। ঐ জীনের মধ্যে থাকে সন্তানের দেহের রং তৈরীর উপাদান। চোখের মনির রঙ, চুলের রঙ, কানের পাতলা পর্দা তৈরীর উপাদান। এভাবে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরীর উপাদান। যদি কারো শুক্রকীটের মধ্যে চোখ তৈরীর জীন না থাকে তবে অন্ধ হয়ে তার জন্ম হবে। কারো জীন যদি কানের পাতলা পর্দার উপাদান শূন্য হয় অর্থাৎ কানের যে পর্দায় আওয়াজ ধরা পড়ে ঐ বিস্ময়কর পর্দা তৈরীর উপাদান না থাকে তবে তার কানের ঐ পর্দা ছাড়াই তার জন্ম হবে। সে হবে বধির। আর বধির হওয়ার কারণে সে কানে শুনবে না। আর কথা না শুনতে পারলে কথা শিখতেও পারবে না বলতেও পারবে না। ফলে বধির হওয়ার কারণে বোবাও হবে। এভাবে হাজারো লাখো ব্যবস্থাপনা রয়েছে মানবদেহ সৃষ্টির ব্যাপারে। আল্লাহ তা'আলা মানবদেহের মধ্যে ফুসফুসকে তৈরী করেছেন এমনভাবে যে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি তা ধরে রাখার মত ক্ষমতা তিনিই দিয়েছেন। আর হৃদপিন্ড বা হার্টকে আল্লাহ তা'আলা এমন কায়দায় সৃষ্টি করেছেন যে, শিরা প্রতিনিয়ত রক্ত শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে মিনিটে ৭২ থেকে ৮০ বার[৪৭৪] করে বয়ে নিয়ে আসে হার্টের মধ্যে যেখানে রক্ত ছাকাই হয়ে দুষিত অংশটুকু রেখে দিয়ে বিশুদ্ধ রক্ত পাঠিয়ে দেয় ফুসফুসের মধ্যে। সেখান থেকে ফুসফুসে ধরে রাখা অক্সিজেন রক্ত নিয়ে নেয়। এরপরে ঐ অক্সিজেন নিয়ে রক্ত আবার চলে যায় দেহের সর্বত্র। আল্লাহ যে কত বড় বিজ্ঞানী আর কুরআন যে কত বৈজ্ঞানিক সন্ধান দিয়েছে তা কি মানুষের ভেবে দেখা উচিৎ নয়? যারা এসব ভেবে দেখে না সেই সব হতভাগ্যদের ব্যাপারেই মহান আল্লাহ বলেন,

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

সে আমার জন্য উদাহরণ পেশ করে এবং তার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে ভুলে যায়।[৪৭৫] মানুষ যদি তার নিজের দেহের সৃষ্টি বিজ্ঞানটুকুই বুঝতে চেষ্টা করত! যা বোঝার জন্য আল্লাহ বারবার তাকিদ দিয়েছেন, তবে হয়তবা একটা মানুষও আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারতনা এবং আল্লাহর আইনেরও বিরোধিতায় লিপ্ত হতো না। সে স্বাস্থ্যকর সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবন-যাপন পরিচালনা করতে পারতো। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٥ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

তিনি পুরুষ ও নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, স্খলিত শুক্রবিন্দু থেকে।[৪৭৬]

---

[৪৭৩]. অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুলাহ্, m¯'¡¯'¨i Rb¨, ঢাকা: ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি. পৃ. ৭৯-৮০

[৪৭৪]. ডাঃ এস. এন. পান্ডে, wdwRI jRx wk¶v, কলিকাতা: আদিত্য প্রকাশালয়, পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৯৫

[৪৭৫]. আল-কুরআন ৩৬ : ৭৮

[৪৭৬]. আল-কুরআন ৫৩ : ৪৫-৪৬

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

তিনি বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।[৪৭৭]

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ١٨ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ

কোথা থেকে তাকে সৃষ্টি করলেন? বীর্য থেকে সৃষ্টি করে পরিমিত করলেন।[৪৭৮]

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

মানুষকে মিলিত বির্য থেকে সৃষ্টি করেছি।[৪৭৯]

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ٣٧ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ

সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? পরে সে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত হয়েছিল, তিনি তাকে মানব আকৃতি দান করেছেন।[৪৮০]

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ٦ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত, কি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে, যা বের হয়ে আসে (মানুষের) পিঠের (মেরুদন্ডের) ও বুকের (পাঁজরের) মাঝখান দিয়ে।[৪৮১]

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

মানুষকে আলাকা হতে সৃষ্টি করেছেন।[৪৮২] (আলাকা শব্দের অর্থ ঝুলন্ত, রক্ত পিন্ড ইত্যাদি। আলাকা অর্থ এমন কিছু যা লেগে থাকে)।

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ٢١ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ

অতঃপর আমি নিরাপদ স্থানে রেখেছি, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।[৪৮৩]

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাতৃগর্ভে ও ত্রিবিধ অন্ধকারে।[৪৮৪]

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

তিনি তাকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।[৪৮৫]

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

তাকে সুঠাম করলেন, তাতে নিজের পক্ষ থেকে রুহ প্রদান করলেন, কর্ণ, চক্ষু ও মন প্রদান করলেন।[৪৮৬] বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বহু পূর্বেই মানব শিশুর জন্মের বিবরণ পবিত্র কুরআনে কত সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এসব ভাবলে বিস্ময়ে সত্যিই মাথা নত হয়ে আসে; কত জ্ঞানগর্ভই না মহাগ্রন্থ আল-কুরআন! পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[৪৭৭]. আল-কুরআন ১৬ : ৪

[৪৭৮]. আল-কুরআন ৮০ : ১৮-১৯

[৪৭৯]. আল-কুরআন ৭৬ : ২

[৪৮০]. আল-কুরআন ৭৫ : ৩৭-৩৮

[৪৮১]. আল-কুরআন ৮৬ : ৫-৭

[৪৮২]. আল-কুরআন ৯৬ : ২

[৪৮৩]. আল-কুরআন ৭৭ : ২১-২২

[৪৮৪]. আল-কুরআন ৩৯ : ৬

[৪৮৫]. আল-কুরআন ৭১ : ১৪

[৪৮৬]. আল-কুরআন ৩২ : ৯

তিনি পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৪৮৭] মহান আল্লাহ যেখানে পৃথিবীর সমস্ত কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেখানে মানুষ সেগুলো থেকে উপকারের সন্ধান না করে সময় ব্যয় করছে মরণাস্ত্র তৈরীর পিছনে। সত্যিই ভাবনার বিষয়! আমাদের বিবেক বুদ্ধি ঠিক আছে তো?

অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও তার ক্ষতিকর দিক

মহান রাব্বুল আ'লামীন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত। কোন্ কাজে তার মঙ্গল এবং কোন্ কাজে তার অমঙ্গল তা সৃষ্টিকর্তার চেয়ে কে আর ভাল বুঝবে? মানুষ কিভাবে চলবে তিনি তা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, (হে নবী) তুমি মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহকে হেফাজত করে, এটাই (হচ্ছে) তাদের জন্য উত্তম পন্থা। (কেননা) তারা (নিজেদের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে) যা করে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবহিত রয়েছেন।

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(হে নবী,) একই ভাবে তুমি মুমিন নারীদেরও বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন না করে বেড়ায়, তবে (শরীরের) যে অংশ (সব সময়) খোলা থাকে (সে সব অংশের কথা আলাদা), তারা যেন তাদের বক্ষদেশকে মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের (সচরাচর মেলামেশার) মহিলা, নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসী, নিজেদের অধিনস্ত (এমন) পুরুষ যাদের (মহিলাদের কাছ থেকে) কোন কিছুই কামনা করার নেই; কিংবা এমন শিশু যারা এখনও মহিলাদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে কিছুই জানে না, (এসব মানুষ ছাড়া তারা যেন) অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, (চলার সময়) নিজেদের যমীনের উপর তারা এমন ভাবে পা না রাখে যে সৌন্দর্যকে তারা গোপন করে রেখেছিল তা (পায়ের আওয়াজে) লোকদের কাছে জানাজানি হয়ে যায়। হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তওবা করো, আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে।[৪৮৮] কিন্তু মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পৃথিবীতে যেমন নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে তেমনি আখেরাতের কঠিন আযাবের দিকে নিজেদের ঠেলে দিচ্ছে। সমাজের খুবই কম সংখ্যক মানুষ আল্লাহর এই বিধি-বিধান মেনে চলে, আর বেশির ভাগ মানুষই এর বিপরীত কাজ করে। এরই কারণে আমাদের সমাজে আজ যিনা-ব্যভিচারে ভরে গেছে। মানুষের শরীরে নানা প্রকারের রোগ-ব্যাধি বাসা বেঁধেছে। মানুষের জীবনী শক্তি ও রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হতে দুর্বলতর হচ্ছে। মানুষ নতুন নতুন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। সিফিলিস, গানোরিয়া, এইড্স, ক্যান্সার ইত্যাদি মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে

---

[৪৮৭]. আল- কুরআন ২ : ২৯

[৪৮৮]. আল-কুরআন ২৪ : ৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুবরণ করছে। অপর দিকে যারা বেঁচে থাকছে তারাও নানা প্রকার দূরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। বর্তমান সময়ে এমন একটি পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না যাদের মধ্যে শারীরিক অথবা মানসিক ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তি নেই। সমস্ত সমাজই আজ অশান্তিতে ভরপুর। গোটা পৃথিবীই যেন একটি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। মানুষের আত্মসম্মানবোধ লোপ পেয়েছে, লোপ পেয়েছে আত্মসম্ভ্রম বোধ। মানুষের প্রতি মানুষের কোন সম্মান বোধ নেই, নেই কোন সামাজিক শৃঙ্খলা।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের রীতি-নীতি মানুষের কল্যাণের জন্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধি-নিষেধ মেনে চলা শরীর ও মন উভয়ের জন্যই উপকারী। আর এই বিধি-বিধান না মেনে চললে শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ হয়। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে আজ সমাজে ঘটছে নানা প্রকারের অপরাধ। এর প্রভাবে বাড়ছে অবাধ মিলন, হচ্ছে অবৈধ গর্ভবতী। ফলে, অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকায় ১৯৬৩ সালে ২০ লাখ জারজ সন্তান জন্ম নিয়েছে।[৪৮৯] একজন যুবক যখন নিজেই নিজের যৌবনের অপব্যবহার করছে, তখন প্রথমে শরীরে কষা রোগের সৃষ্টি হয়। এর পর মাথা ব্যাথা, তারপর অনিদ্রা এবং রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। অবাধ যৌনাচারের ফলে মানুষের বিবেক কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আবার যিনা-ব্যভিচারের জন্য আমাদের সমাজ ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। এক পুরুষ বহু নারীতে এবং এক নারী বহু পুরুষে মেলামেশার কারণে একজনের শরীরের রোগ বহুজনের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে। এভাবে শত শত বছর ধরে রোগ-ব্যাধি ছড়ানো এবং এর সঙ্গে 'জিনেটিক' প্রভাবে গোটা বিশ্বে নির্মল চরিত্রের একটি পরিবারও পাওয়া যায় না। ফলে, ঘরের প্রশান্তি বিদূরিত হয়েছে, অশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষ যতই নিলর্জ্জ ও খারাপ হোক, সে কখনও বরদাশত করে না যে, তার স্ত্রী কয়েক রাত ঘরের বাইরে যাপন করুক। তার স্ত্রী আজ এক জনের বাহুবন্ধনে কাল আরেক জনের বাহুবন্ধনে। স্ত্রী একজনের আর থাকবে আরেক জনের সঙ্গে। স্ত্রী যদি ফুর্তিবাজ হয় তাহলে ঘর সামলাবে কে? আর স্বামী প্রশান্তির খোঁজে যাবে কোথায়? এ ধরনের কার্যকলাপের জন্য সমাজে নৈরাজ্য আর হতাশা চরম ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে আত্মহত্যা। আত্মহত্যা আমেরিকায় একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ ৬ মাসে আমেরিকার প্রসিদ্ধ শহর লস এঞ্জেলসে ৭৫ হাজার নারীপুরুষ আত্মহত্যা করেছে।[৪৯০] মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ٣٤ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

যখন কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হয় তখন তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু করে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানিনা। তারা আরো বলে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ, সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না।[৪৯১]

প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণের ভয়াবহ পরিণাম

নারী জাতি জন্মগতভাবে লজ্জাশীল জাতি। নারী জাতি আল্লাহভীতি ছাড়াও অবৈধ সন্তান জন্মের ফলে সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হওয়ার ভয়ে ব্যভিচার থেকে দূরে থাকে। আধুনিক সভ্যতার বদৌলতে নাচ,

[৪৮৯]. ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদ, হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, mbv‡Z ivmj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg I AvawbK weÁvb, c_g I wØZxq LÛ, ঢাকা: আল-কাওসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯ খ্রি. পৃ. ২৩৬

[৪৯০]. cÖv¸³, পৃ.২৩৮

[৪৯১]. আল-কুরআন ৩৪ : ৩৪-৩৫

গান, নৈশক্লাব ও শরাবের মজলিসে পুরুষের সাথে অবাধে মেলা-মেশা এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ফলে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে যেয়ে লজ্জাশীলতা এখন আর নারীর ভূষণ নয় বরং শোষন হিসেবে ধরা হয়। বাকী থাকলো ব্যাভিচার। জন্মনিয়ন্ত্রণের উপাদানগুলি সবার জন্য সহজলভ্য হওয়ার ফলে ব্যাভিচারের মাধ্যমে অবৈধ সন্তান জন্মের ঝুঁকি হয়েছে রোধ। বেঁচেছে নারী জাতির সম্মান (?) বেড়েছে কুৎসিত রোগ-ব্যাধি, প্রসারের সুযোগ ঘটেছে বিভিন্ন ধরণের যৌন-ব্যাধির, সমাজ হচ্ছে ধ্বংস। ব্যভিচার যেন সমাজে আজ 'ওপেন সিক্রেট'। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানী ড. সরোকিন নিম্ন বর্ণিত রিপোর্ট পেশ করেন।[৪৯২]

বিয়ের পূর্বে যৌনসম্পর্ক: নারী ৭%থেকে ৫০% এবং পুরুষ ২৭%থেকে ৮৭%

বিয়ের পরে অবৈধ যৌনসম্পর্ক: নারী ৫%থেকে ১৬% এবং পুরুষ ১০%থেকে ৪৫%

অবৈধ সন্তান প্রতি হাজারে ১৯২৭ সালে ২৮ জন এবং ১৯৪৭ সালে ৩৮৭ জন।

গর্ভপাত প্রতি বছর ৩৩,৩০০ থেকে ১০,০০,০০০ জন।

তিনি আরো মন্তব্য করেন, "এ বল্গাহীন যৌন উচ্ছৃংখলতার পরিণামে ব্যক্তি, সমাজ ও সমগ্র জাতি যে কি ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে তা প্রকাশ করা আমি দরকার মনে করি না। এর নাম যৌন-আজাদী বা যৌন-স্বেচ্ছাচার যাই বলুন না কেন এ বাস্তব সত্য তো পরিবর্তিত হতে পারে না। এ অবস্থায় এমন সূদূর প্রসারী প্রতিফল দেখা দেবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না।" এ মন্তব্য তিনি করেছেন ১৯৫৬ সালে। বর্তমানে জন্মনিরোধের প্রচার ঘরে ঘরে, ওষুধ ও উপকরণের বিক্রয় আসমান বরাবর উঁচু। আর ফলাফল আমাদের চোখের সামনে। সমাজবিজ্ঞানী ড. সরোকিনের আশংখা আজ আমাদের সমাজে প্রতিফলিত। অবৈধ যৌন সম্পর্ক এখন আর শতকরা হিসাবে করা যায় না। কারণ ব্যভিচার সমাজে আজ 'ওপেন সিক্রেট'। আর অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলাফল আজ সামাজিক জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে নৈতিক সত্তার প্রাধান্য চান। নৈতিকতাই মনুষ্যত্ব এবং নৈতিক চেতনাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। মানবদেহ বস্তুসত্তা বলেই বস্তুগত সুখের প্রিয়সী। নৈতিকতাবোধ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। বিবেক অন্যায় পথে দেহের দাবী পূরণে আপত্তি জানায় এবং অন্যায় করলে বিবেক দংশন করে। দেহ সত্তা ও নৈতিক সত্তার এই দন্দ্বে বিবেকের বিজয় হলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মানবতার কল্যাণ হয়। পিতা মাতার বস্তুগত আরাম-আয়েসের কুরবানীর উপরই সন্তানের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে। পিতা-মাতা সন্তানের বিকাশ ও কল্যাণের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে তৃপ্তি বোধ করেন। এটা এক পবিত্র আবেগ। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারাভিযান পিতামাতার এ পবিত্র আবেগকে ধ্বংস করে মানুষকে ত্যাগের বদলে ভোগের উস্কানী দিচ্ছে। সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা পশুর মধ্যেও আছে। ঐ মমতাবোধ মানুষের মন থেকেও কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সন্তান যাতে না হয় সে জন্য যারা প্রাণান্ত চেষ্টা করে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সন্তান জন্ম নেয় সে দুর্ভাগা কি পিতা-মাতার হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ মমতা পেতে পারে? এ ভাবেই জন্মনিয়ন্ত্রণ মানুষের বিবেক ও নৈতিকতার উপর আঘাত হানছে। অবৈধ গর্ভধারণ অবৈধ যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে সর্বশেষ বাধা, জন্মরোধ পদ্ধতি সমাজ থেকে সে বাধাও দূর করে দিয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে।

[৪৯২]. Sorkin Pitirm A, *The Amirican Sex Revolution,* Boston : 1956, P. 13-14

সমাজে দায়িত্বহীন যৌন সম্পর্কের সকল সুযোগ সৃষ্টির পর জন্মরোধ পদ্ধতি এক শ্রেণীর নারীকে ব্যভিচারীনী হতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছে। তবে যারা বিবাহ পূর্ব যৌন সম্পর্ককে মোটেই আপত্তিকর মনে করে না, আপত্তি মনে করে না নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে যদি অবাধ যৌন মিলনের পথ প্রশস্ত হয়, তাতে তাদের মাথা ব্যথা হবার কথা নয়। জন্মরোধ পদ্ধতির আশির্বাদে, বিভিন্ন হোটেল বা ক্লাবের মাধ্যমে যারা নারীকে প্রকাশ্যে পর পুরুষের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে উৎসাহিত করে, ফলে এক পুরুষে বহু নারী এবং এক নারীতে বহু পুরুষের অবৈধ মেলামেশার কারণে সমাজে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সোনার সংসার আজ গোরস্থানে পরিণত হয়েছে। এ সমস্ত রোগ-ব্যাধি পুরুষানুক্রমে আজ সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সিফিলিস, গানোরিয়া, এইড্স, ওভারীর টিউমার, বেদনা পূর্ণ ঋতুস্রাব, জরায়ুর ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, বন্ধাত্ব, কিডনী পীড়া, লীভার পীড়া ইত্যাদি রোগে আমাদের সমাজ আজ জরাগ্রস্থ। জন্মনিয়ন্ত্রণের ষ্টেরিলাইজেশন (পুরুষ এবং মহিলাদের স্থায়ী পদ্ধতি) ও MR পদ্ধতি আজ বিবাহিত ও অবিবাহিতদের নাগালের মধ্যে। গবেষণায় ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, যে সকল মহিলা সন্তান কম হওয়ার আশায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছে তাদের অবস্থা কিরূপ হয় নিম্নে তার কিছুটা চিত্র দেওয়া হলোঃ

এক মহিলা প্রায়ই বেহুঁশ হয়ে যেত। অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন, এমনকি পীর ফকিরের দরবারেও ঘুরেছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অবশেষে চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট আনা হল। উক্ত মহিলা কথা প্রসঙ্গে নিজেই বললেন, তিনি লজ্জাস্থানে 'প্রিভেন্টিভ ক্যাপ' রেখেছেন। যেদিন তা রেখেছেন সেদিন থেকে মাঝেমধ্যে বেহুঁশ হয়ে যান। এখন তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন এটা ব্যবহার করা তার জন্য সমীচীন নয়। যখন রোগ নির্ণয় করে লজ্জাস্থানে 'প্রিভেন্টিভ ক্যাপ' অপসারণ করা হলো এবং সামান্য কিছু পথ্য দেওয়া হল, তখন তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।
পাগল এক মহিলার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল, তিনি সুখী সংসার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২ মাস বড়ি ব্যবহার করেছেন। এভাবে কোন কোন মহিলার এ সকল ওষুধে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয়। কারও কারও পেট বড় হয়ে যায়, কারো বা শরীর ফুলে যায়। বিভিন্ন প্রকার জটিল রোগ সৃষ্টি হয়। মূলত যখনি আমরা স্বভাব সিদ্ধ (প্রাকৃতিক) নিয়ম ভঙ্গ করার চেষ্টা করি, তখনই আমাদের দিকে আল্লাহর চাবুক পড়তে থাকে। আমাদের উচিত মহান আল্লাহর নিয়ম-কানুনের দিকে ফিরে আসা। কিন্তু আমরা তার বিপরীত এমন চিকিৎসা আরম্ভ করি, যার ফলে তার শাস্তি দ্বিগুণ নেমে আসে।

আমেরিকার মেক্সিকো ইউনিভার্সিটির চীফ গাইনোকোলোজিষ্ট, ডাক্তার মেডিকিউন, মহিলাদেরকে সতর্ক করে বলেন, খবরদার! যদি সন্তান কম হওয়ার জন্য ওষুধ ব্যবহার কর, তবে অগণিত রোগ তোমাদের জড়িয়ে ধরবে। তুমি শুধু স্থায়ী রোগীই হবে না বরং ক্যান্সারের প্রবল সম্ভাবনা তোমার মাথায় দুলতে থাকবে। একজন অভিজ্ঞ সার্জন বলেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি যে, আপনি গাইনি ওয়ার্ডে গিয়ে জরিপ চালিয়ে দেখুন, জরায়ুর ক্যান্সারে সে সকল মহিলারাই বেশি আক্রান্ত হয়, যারা গর্ভপাত করিয়েছে। ইসলামের শিক্ষা হলো, অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীদেরকে তোমরা বিবাহ কর। পক্ষান্তরে "দু'টির বেশী সন্তান নয়, একটি হলে ভাল হয়" এ শ্লোগান নারীদের গর্ভপাত ঘটাতে উৎসাহিত করছে ফলে, নারীরা অসংখ্য রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গর্ভপাত ঘটালে অগণিত স্ত্রী রোগ

(Gyanaecological Disease) দেখা দেয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মহিলাদের ব্রেষ্ট এবং যোনীপথে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় প্রিভেন্টিভ ক্যাপ, দীর্ঘ সময় যাবত বড়ি সেবন ইত্যাদি ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। যে সকল মহিলা এ সকল ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার করেন, রিপোর্ট অনুযায়ী তারা যে কোন সময় ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন।[৪৯৩]

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ক্ষতিকর প্রভাব

বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব ফলাফল দেখা গেছে তা আলোচনা করলে দেখা যায় যে আন্দোলন বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করেছে এবং যার ফলাফল বার বার অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে তার ভাল মন্দ সর্ম্পকে সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য নিম্নের এই আলোচনা। ইংল্যান্ডের রেজিস্ট্রার জেনারেলের রিপোর্ট, ন্যাশনাল বার্থ কন্ট্রোল কমিশনের অনুসন্ধান এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত রয়েল কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই জন্মনিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। বেশীর ভাগ উচ্চ বেতন ভোগী কর্মচারী, উচ্চ শিক্ষিত ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত সচ্ছল লোক এবং ধনী, শাসক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণই জন্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস করেছে। আর নিম্ন শ্রেণির শ্রমজীবি পেশার লোকদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস একেবারেই সীমিত। এদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়নি, ধনীদের মতো জাঁক-জমকপূর্ণ সামাজিকতার প্রতিও এদের কোন লোভ নেই। এদের পরিবারগুলো বৃহদাকৃতির।[৪৯৪] জনসংখ্যা বিষয়ক মার্কিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ওয়ারেণ থম্পসন ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স ও সুইডেনের জনসংখ্যার শ্রেণিভিত্তিক পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শিক্ষার মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যায় অল্প শিক্ষিত লোকদের পরিবার উচ্চ শিক্ষিতদের পরিবারের তুলনায় অনেক বড়।[৪৯৫] প্রাচ্যের জন্মনিরোধ প্রসারের অন্যতম সমর্থক অলভাস হাক্সলী (Huxley) তাঁর প্রকাশিত পুস্তক Hldous, Brave New World Revisited -এ বলেন যে, আমাদের কার্যকলাপের ফলে আমাদের বংশবৃদ্ধি জৈবিক দিক দিয়ে নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত নিম্নমানের হতে চলেছে। নতুন ওষুধ-পত্র উন্নততর চিকিৎসার প্রচলন সত্ত্বেও নিয়মমাফিক যে শুধু উন্নত হয় না তাই নয় বরং নিম্ন হয়ে যাচ্ছে। আর স্বাস্থ্যের মান নিম্ন হওয়ার সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধিমত্তার মানও হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। অলভাস হাক্সলী (Huxley) আরো বলেন, বর্তমান অবস্থায় উচ্চ শ্রেণির লোকদের তুলনায় নিম্ন শ্রেণির লোকসংখ্যা অধিক পরিমাণে বেড়ে চলেছে। আমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে সাধারণ বুদ্ধিমত্তার মান অনেক নিম্ন।[৪৯৬] প্রাচ্যের জন্মনিরোধ প্রসারের আর এক ঘোর সমর্থক ইংল্যান্ডের বিখ্যাত চিন্তাবিদ বারট্রান্ড রাসেল অত্যান্ত উদ্বেগের সাথে বলেছেন যে, ইংল্যান্ডে দক্ষ কারিগর, উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক কমে যাচ্ছে অপর দিকে গরীব, দূর্বল মস্তিষ্ক, মাতাল ও নির্বোধ লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।[৪৯৭] তিনি আরো বলেন, বোধশক্তি সম্পন্ন মেধাবী ও প্রগতিশীল শ্রেণি তাদের সমসংখ্যক সন্তান জন্মাতে পারছে না। পক্ষান্তরে নিম্ন শ্রেণির লোকেরা উচ্চ

[৪৯৩]. ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, C/, ³ , খন্ড ১ - ২, পৃ. ৩৭০-৩৭২

[৪৯৪]. *Britaint An Official Handbook*, London : 1954, P. 8

[৪৯৫]. Thompson Warren, s. *Population Problem*, New York : 1953, P. 195

[৪৯৬]. Huxley, Hldous, *Brave New World Revisited*, 1959, P. 28

[৪৯৭]. Bertrand Russel, *Principles of Socoal Reconstruction*, London : 1951, P. 24

শ্রেণির সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের পরিবারে দু'টির বেশী সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে এরা বরাবর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।[৪৯৮] এভাবে সমাজে শ্রেণিগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

অতএব, এসব আলোচনার পর একথায় উপনীত হওয়া যায় যে, প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে অর্থনৈতিক মানদন্ড, নৈতিক মান, স্বাস্থ্যগত অবস্থা ইতিমধ্যে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। উচ্চ মেধাসম্পন্ন জনসংখ্যা এবং সভ্য লোকদের সংখ্যা শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং অসুস্থ্য ও অনুর্বর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজ থেকে উত্তম অংশ হ্রাস পাচ্ছে, আর যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তারা বোধশক্তি, দৈহিক শক্তি, বিচক্ষণতা, চিন্তা শক্তি এবং জ্ঞানের আধুনিকতায় অধোগতি। এরা নির্বুদ্ধিতায়, নিষ্ক্রয়তায় চিন্তাশক্তিহীনতায় এবং আসক্তিতে সকলের উর্ধে। এর ফলে সমাজে দৈহিক পরিশ্রমকারীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং যারা অধিক বুদ্ধি ও বিবেচনার অধিকারী, যাদের কর্ম পরিচালনা ও নেতৃত্বদানের যোগ্যতা রয়েছে তাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কোন জাতির এ ধরণের অবস্থা অত্যন্ত বিপদজনক। কারণ, এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে নেতৃত্বদানকারী লোকের অভাব। আর নেতৃত্বদানকারী লোকের অভাব দেখা দিলে কোন জাতিই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও আদর্শ পরিবার গঠন পদ্ধতি

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে দুটি মত প্রচলিত রয়েছে। এর ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা বোধ করছে। একদল লোক ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে কাজ করছে, সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিরাট অংকের টাকা এ খাতে খরচ করছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য জন্মহার কমানো। তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই দেশের এক নম্বর সমস্যা মনে করছেন। জন্মহার কমাতে পারলেই প্রধান সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে তারা প্রচার করছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে ফ্যমিলি প্লানিং কাজে নিয়োজিত মাঠকর্মী পর্যন্ত দেশবাসীকে অবিরত নসীহত করে চলেছেন। এমনকি মসজিদের ইমাম এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণকেও এ কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করার সাথে সাথে উপর থেকে চাপও সৃষ্টি করা হচ্ছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম বিনামূল্যে ও সস্তায় অতি সহজ লভ্য করার কারণে সমাজ ও পরিবারে যে নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। তারা অন্ধের মতো একদিকে উৎসাহিত করে যাচ্ছেন অপর দিকে এর পরিণাম চিন্তা করার কোন অবসর তাদের নেই। এর কুফল ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত করেছে সে দিকে খেয়াল করার মত কোন চেতনাই তাদের নেই।

অপরদিকে দেশের আলেম সমাজ ও ধার্মিক লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সংগত কারণেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে অশ্লীল প্রচারাভিযানের ফলে অবিবাহিতদের মধ্যে ব্যাপক যৌন অনাচার, পত্রিকায় কুমারী মাতার করুণ কাহিনীর খবর, যুব সমাজে যৌতুক ছাড়া বিয়ের প্রতি অনিহা ইত্যাদি কারণে আলেম সমাজ ও ধার্মিক লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি ঘৃনা প্রকাশ করেন এবং জন্মনিয়ন্ত্রণকে জায়েয মনে করেন না। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে দেখা

---

[৪৯৮]. *Ibid*, P. 124-125

প্রয়োজন, এই পদ্ধতি আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী না ক্ষতিকর। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সব ব্যাপারেই জ্ঞান বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেকের প্রতি মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। অতএব, পবিত্র কুরআন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী জ্ঞান বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেক দ্বারা পর্যালোচনা করা হল:

আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইসী বলেন, আমি শুনেছি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মসজিদের মিম্বারের উপর উঠে বলছিলেন; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সব কাজই নিয়াত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোন মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।[৪৯৯] এই বিখ্যাত হাদীসটির মাধ্যমে জানা যায় মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিয়তের উপর প্রত্যেক কাজের বিচার করে থাকেন। অতএব, জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও নিয়তের প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক। জন্মনিয়ন্ত্রণের যে আন্দোলন আজ পৃথিবীব্যাপী চালু হয়েছে তা কোন্ উদ্দেশ্যে বা কোন্ নিয়তে? পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব। মানুষ বাড়ছে জ্যামিতিক হিসাবে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য বাড়ছে গাণিতিক হারে। তাই মানুষের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যতীত খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব নয় (?)। এ হলো জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান যুক্তি। এদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো, যে হারে মানুষ বাড়ছে, তাতে কয়েকশ বছর পর পৃথিবীতে দাঁড়াবার স্থানও পাওয়া যাবে না (?)। এজন্য এখন থেকে মানব সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, যাতে পৃথিবী এত বড় সমস্যার সম্মুখীন না হয়। এ ব্যাপারে মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজীদে বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

তোমরা অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও (আমি দেব)।[৫০০]

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দ্বায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয়।[৫০১]

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

কত প্রাণীই রয়েছে যারা তাদের রিযিক বহন করে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদের ও তোমাদের রিযিক দান করেন।[৫০২]

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই আসমান ও যমীনের যাবতীয় ভান্ডারের অধিকারী। তিনি যাকে খুশী বেশী এবং যাকে খুশী কম রিযক দান করেন।[৫০৩]

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

নিশ্চয় আমি যাবতীয় বস্তু পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছি।[৫০৪]

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

[৪৯৯]. ইমাম বুখারী (র), CV¸ ³, খন্ড ১ম, ওহীর সূচনা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১, হাদীস নং ১

[৫০০]. আল-কুরআন ১৭ : ৩১

[৫০১]. আল-কুরআন ১১ : ৬

[৫০২]. আল-কুরআন ২৯ : ৬০

[৫০৩]. আল-কুরআন ৪২ : ১২

[৫০৪]. আল-কুরআন ৫৪ : ৪৯

আমার নিকট সব জিনিসের ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ (সেখান থেকে) নাযিল করে থাকি।[৫০৫]

আলকামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর সাথে মিনাতে গমনকালে উসমান (রা.) এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে নির্জন আলাপের জন্য অনুমতি চান। অতঃপর যখন আব্দুল্লাহ দেখতে পান যে, তাঁর বিবাহের কোন প্রয়োজন নেই, তিনি আমাকে বলেন হে আলকামা! আমার নিকট এসো! আমি তাঁর নিকট এলে উসমান (রা.) তাঁকে বলেন, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কুমারী নারীর সাথে বিবাহ দেব না? যাতে তুমি তোমার শারীরিক শক্তি-সামর্থ ও বলবীর্য ফিরে পাও। আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন আমি তা এজন্য বলছি যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সংবরণকারী, লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণকারী। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে অসমর্থ, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। কেননা তা তার জন্য কামস্পৃহা দমনকারী।[৫০৬] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অধিক প্রসবদায়ীণী নারীদের বিবাহ কর। কেননা আমি কিয়ামতের দিন তাদের (আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য) নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করবো।[৫০৭]

পবিত্র কুরআন মজীদ ও হাদীসের উপরোক্ত বাণীসমূহ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি যত মানুষ সৃষ্টি করেন প্রয়োজনানুপাতিক হারে তাদের রিযকও সৃষ্টি করেন। অথচ আমরা এ ব্যাপারে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করছি যে কিভাবে সন্তান কম হয় এবং সুখী সংসার গড়ে উঠে। ‘তিনি পৃথিবীতে মানুষ পাঠিয়ে দেন, আর তাদের খাদ্য পাঠান না’ একথা যারা মনে করেন, তাদের ধারণা যে আল্লাহ তাদের মতোই অমনোযোগী ও অবিবেচক। মহান আল্লাহ সৃষ্টি সম্পর্কে মোটেই অমনোযোগী নন।

যৌবনাগমণের পর থেকেই পুরুষের Testis এর Seminiferous Tube এ স্পারমেটোজোয়া (Spermatozoa) বা শুক্রকীটের সৃষ্টি হয় এবং নারীদের ওভারীর Matured Graffian Follicle থেকে Ova বা Egg সৃষ্টি হয়। এই সময় তাদের মধ্যে যৌনমিলন ঘটলে ফ্যালোপিয়ান টিউবের Ampulla-তে একটি শুক্রকীট ও একটি Ova মিলিত হয়ে Zygote সৃষ্টি করে।[৫০৮] এটি নির্ভর করে নারীর Menstruation বা ঋতুচক্রের উপর। ডিম্ববাহী নালীতে পূর্ণ ডিম্বটি এসে নির্দিষ্ট সময় ধরে অবস্থান করে। ঐ সময়ে নারীর সঙ্গে পুরুষের যৌনমিলন হলে তার গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে। কিন্তু তা না হলে এ ডিম্বটি বিনষ্ট হয় ও বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর যে Endometrium-টি তৈরী হয়েছিল সন্তান ধারণের জন্যে তার কিছু অংশ ও রক্ত, মিউকাস প্রভৃতিসহ বেরিয়ে আসার নামই ঋতুস্রাব। প্রতি ২৮ দিন[৫০৯] অন্তর চক্রাকারে হতে থাকে বলে একে ঋতুচক্র বলা হয়। একটি আদর্শ ঋতুচক্রকে সাধারণত ৪টি স্তরে ভাগ করা হয়।

[৫০৫]. আল-কুরআন ১৫ : ২১

[৫০৬]. ইমাম আবূ দাঊদ (র), C/¸ ³, খন্ড ৩য়, বিবাহের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯৬, হাদীস নং ২০৪২

[৫০৭]. মুসনাদে আহমদ, C/¸ ³, ২য় খন্ড, পৃ ১৭২; রিয়াদ, পৃষ্ঠা ৫০০ হাদীস নং ৬৫৯৭

[৫০৮]. ডাঃ এস. এন. পান্ডে, C/¸ ³, পৃ. ২২৯-২৩০

[৫০৯]. C/¸ ³, পৃ. ২৪২

১. Bleeding Phase- বা প্রথম স্তর (1st-4th) দিন। গর্ভসঞ্চার না হলে এই সময় Ova টি ফেটে যায় এবং রক্ত, মিউকাস প্রভৃতি বের হয়। সাধারণত ১-৪ দিন এই অবস্থা থাকে। অনেক সময় এই অবস্থা ৫-৬ দিন পর্যন্ত চলতে পারে।

২. Resting Phase- বা দ্বিতীয় স্তর (5th-7th) দিন। রক্তপাত বন্ধ হবার পর এই স্তর শুরু হয়। জরায়ুর Endometrium ধীরে ধীরে গঠিত হয় ও তা মাত্র ১ মিলিমিটার মোটা হয়। এদিকে ডিম্বাশয়ে Primordial Follice থেকে আবার একটি Graffian Follicle গঠন শুরু হয়। এই সময় Oestrone এর ক্রিয়া চলতে থাকে।

৩. Proliferative Phase- বা তৃতীয় স্তর (8th-14th) দিন। এন্ডোমেট্রিয়াম আরও মোটা হয়-প্রায় ৩ মিলিমিটার। গ্রন্থিগুলি ক্রমশঃ কর্ক স্ক্রুর আকার ধারণ করতে থাকে। ক্রমশঃই সেলগুলি ফোলাফোলা ও লম্বা হতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে Graffian Follicle পূর্ণ ও Mature হয় ও ঠিক ১৪দিনের দিন পূর্ণ ডিম্ব ওভারি থেকে ডিম্ববাহী নালীতে বেরিয়ে আসে।[৫১০]

৪. Progestational Phase- বা চতুর্থ স্তর (15th-28th) দিন। এই সময় এন্ডোমেট্রিয়াম খুব বেশি ফুলে ওঠে ও প্রায় ৬ মিলিমিটার মোটা হয়। সঠিক সময়ে শুক্রাণুর সহিত মিলিত না হলে ২৮ দিন পর ফেটে যায়। এভাবে চক্র চলতে থাকে।

Graffian Follicle পূর্ণ ও Mature হয় ও ঠিক ১৪ দিনের দিন পূর্ণ ডিম্ব ওভারি থেকে বেরিয়ে এসে শুক্রাণুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ডিম্ববাহী নালীতে অপেক্ষা করে। এই ১৪তৃম দিন (২৪ ঘন্টার মধ্যে) যদি স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয় তাহলেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়। প্রতি ২৮ দিন অন্তর একটি করে পরিপক্ক ডিম্ব ওভারি থেকে ডিম্ববাহী নালীতে বেরিয়ে আসে[৫১১] এবং ২৮ দিন পর ফেটে যায়। এভাবেই ঋতুচক্র চলতে থাকে। ১৪তৃম দিনের ২৪ ঘন্টাকে পাওয়ার জন্য ১৩তৃম, ১৪তৃম, এবং ১৫তৃম দিনে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলে গর্ভবতী হওয়ার সুযোগ থাকে এবং এই তিন দিন মিলন থেকে বিরত থেকে ঋতুচক্রের অন্যান্য দিনগুলি স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলেও গর্ভধারণ হয় না (ঋতু গোলযোগের কারণে যাদের চক্র ২৪ দিনের কম অথবা ৩২ দিনের বেশী ব্যবধানে হয় চিকিৎসা ব্যতিত তাদের গর্ভধারণ সাধারণত হয় না)।

এই পদ্ধতি কাজে লাগানো গেলে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের/জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা বা ওষুধপত্রের প্রয়োজন হয় না। ফলে, একদিকে যেমন পৃথিবীব্যাপি সাশ্রয় পাবে কোটি কোটি ডলার, অন্য দিকে অযাচিত রোগ-ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা পাবে কোটি কোটি মানুষ। এই পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে অবৈধ যৌন-মিলনের ফলে ক্ষতিকর রোগ-ব্যাধির ব্যপক প্রচার করতে হবে যাতে পদ্ধতির অপপ্রয়োগ না হয়।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বছরের শুরুতেই প্রতিটি দম্পতির নিকট একটি করে বাৎসরিক ক্যালেন্ডার পৌঁছে দিতে হবে। তাদের বলতে হবে যেদিন থেকে ঋতুস্রাব শুরু হয় সেদিনটিকে ১ম দিন হিসাব করে গর্ভধারণের জন্য ঋতুস্রাবের ১৩তম, ১৪তম, এবং ১৫তম দিনে স্বামী-স্ত্রী মিলিত হতে হবে এবং গর্ভনিরোধের জন্য ১৩তম, ১৪তম, এবং ১৫তম দিনে স্বামী-স্ত্রীর মিলন থেকে বিরত থাকতে হবে (অধিক সতর্কতার

---

[৫১০]. C\, 3, পৃ. ২৪১
[৫১১]. C\, 3, পৃ. ২৩৫

জন্য ১২তম দিনেও বিরত থাকা যেতে পারে)। এই দিনগুলো লাল রঙের বিত্ত দ্বারা চিহ্নত করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মীগণ তাদের ডায়েরিতে এ সক্রান্ত রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সচেতন করবেন।

অতএব, দ্বিধাহীন চিত্তে একথা বলা যায় পরিকল্পিত পরিবার গঠনের প্রচেষ্টায় আমরা যেভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রির অপব্যবহার করছি ফলে এক দিকে যেমন আমাদের প্রচুর অর্থ ব্যায় হচ্ছে তেমনি অপর দিকে রোগ-ব্যাধিতে ভরে যাচ্ছে সমাজ। ঘটছে সামাজিক অবক্ষয় যা বর্তমানে জাতিয় অবক্ষয়ের রূপ নিয়েছে। অথচ আমরা যদি বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসরণ করি অথাৎ গর্ভধারণের জন্য ঋতুস্রাবের ১৩তম, ১৪তম, এবং ১৫তম দিনে স্বামী-স্ত্রীর মিলন এবং গর্ভনিরোধের জন্য ১৩তম, ১৪তম, এবং ১৫তম দিনে (অধিক সতর্কতার জন্য ১২তম দিনেও বিরত থাকা যেতে পারে) স্বামী-স্ত্রীর মিলন থেকে বিরত থাকি; তাহলে এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হবে অপর দিকে মানবজাতি রক্ষা পাবে নানা ধরণের রোগ-ব্যাধি থেকে। পদ্ধতিটি প্রকৃতিলব্ধ জ্ঞান থেকে হওয়ার কারণে বিশ্ব মানবতার ধর্মসহ কোন ধর্মই এর বিরোধিতা করার সুযোগ নেই। এই পদ্ধতি এই সংক্রান্ত প্রচলিত সকল পদ্ধতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে আমরা বিশ্বাস করি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ পরিচিতি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল রাষ্ট্র। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ভূ-রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মায়ানমার ও দক্ষিণ উপকূলের দিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের ভূখন্ড ভৌগোলিকভাবে একটি উর্বর ব-দ্বীপের অংশ বিশেষ। পার্শ্ববর্তী দেশের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাসহ বাংলাদেশ একটি ভৌগোলিকভাবে জাতিগত ও ভাষাগত "বঙ্গ" অঞ্চলটির মানে পূর্ণ করে। "বঙ্গ" ভূখন্ডের পূর্বাংশ পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল, যা বর্তমানে বাংলাদেশ নামের দেশ। পৃথিবীতে যে ক'টি রাষ্ট্র জাতিরাষাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।[৫১২]

বাংলাদেশের বর্তমান সীমান্ত তৈরি হয়েছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাবসানে, বঙ্গ (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) এবং ব্রিটিশ ভারত বিভাজন করা হয়েছিল। বিভাজনের পরে বর্তমান বাংলাদেশের অঞ্চল তখন পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল, যেটি নবগঠিত দেশ পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। পাকিস্তান অধিরাজ্যে থাকাকালীন 'পূর্ব বাংলা' থেকে 'পূর্ব পাকিস্তান' এ নামটি পরিবর্তিত করা হয়েছিল। শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্যপীড়ীত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ; এছাড়াও প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পুনঃপৌনিক সামরিক অভ্যুত্থান এদেশের সামগ্রীক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বারংবার ব্যাহত করেছে। গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি বর্তমান। সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত দুই দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ও সমৃদ্ধি সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম যদিও আয়তনের হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯৪তম; ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর নবম। মাত্র ৫৬ হাজার বর্গমাইলেরও কম এই ক্ষুদ্রায়তন দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫.৫৯ কোটির বেশি অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি ২৪৯৭ জন।[৫১৩]

জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা; শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ ছিল ১১,৯৮,৯২৩ কোটি টাকা (চলতি বাজারমূল্যে) যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি লাভ করে ১৩,৫০,৯২০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। একই সঙ্গে জনগণের মাথাপিছু বার্ষিক আয় পূর্ববর্তী বৎসরের ১,০৪৪ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ৯২,৫১০ টাকা।[৫১৪] দারিদ্রের হার ২৬.২০ শতাংশ, অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১১.৯০ শতাংশ, এবং বার্ষিক

---

৫১২. https://bn.wikipedia.org/s/924

৫১৩. https://Worldpopulationreview.com

৫১৪. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা: ৫ জুন ২০১৪ ইং তারিখের প্রতিবেদন

দারিদ্র হ্রাসের হার ১.৫ শতাংশ। এই উন্নয়নশীল দেশটি প্রায় দুই দশক যাবৎ বার্ষিক ৫ থেকে ৬.২ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অর্জনপূর্বক "পরবর্তী একাদশ" অর্থনীতিসমূহের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরের পরিবর্ধন বাংলাদেশের এই উন্নতির চালিকাশক্তিরূপে কাজ করছে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে কাজ করেছে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ত্বরিত বিকাশ এবং একটি সক্ষম ও সক্রিয় উদ্যোক্তা শ্রেণীর আর্বিভাব। বাংলাদেশের রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্প সারা বিশ্বে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। জনশক্তি রপ্তানীও দেশটির অন্যতম অর্থনৈতিক হাতিয়ার।

গঙ্গা-ব্রক্ষপুত্রের উর্বর অববাহিকায় অবস্থিত এই দেশটিতে প্রায় প্রতি বছর মৌসুমী বন্যা হয়; আর ঘূর্ণিঝড় ও খুব সাধারণ ঘটনা। নিম্ন আয়ের এই দেশটির প্রধান সমস্যা পরিব্যাপ্ত দারিদ্র গত দুই দশকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে এসেছে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুত, জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অর্জিত হয়েছে অভূতপূর্ব সফলতা। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।[৫১৫] তবে, বাংলাদেশে এখনো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে যার মধ্যে রয়েছে পরিব্যাপ্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা। এছাড়া একটি সর্বগ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থার রূপ নিয়ে নতুনভাবে সামাজিক বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ও বিমসটেক এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়া দেশটি জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব শুল্ক সংস্থা, কমনওয়েলথ অফ নেশনস, উন্নয়নশীল ৮টি দেশ, জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন, ওআইসি, ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংঘের সক্রিয় সদস্য।[৫১৬]

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

দারিদ্রপীড়িত বাংলাদেশে অপুষ্টি একটি বড় ধরণের সমস্যা যা স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অপুষ্টিজনিত কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে পরিচিত শিশুরা বিশ্ব ব্যাংকের জরীপে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করেছে যা মোটেই কাঙ্খিত নয়।[৫১৭] মোট জনগোষ্ঠীর ২৬% অপুষ্টিতে ভুগছে।[৫১৮] ৪৬% শিশু মাঝারী থেকে গভীরতর পর্যায়ে ওজনজনিত সমস্যায় ভুগছে।[৫১৯] ৫ বছর বয়সের পূর্বেই ৪৩% শিশু মারা যায়। প্রতি পাঁচ শিশুর একজন ভিটামিন এ এবং প্রতি দু'জনের একজন রক্তস্বল্পতাজনিত রোগে ভুগছে।[৫২০] তবে গত দুই শতকে মানুষের খাদ্যগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১৩: ২০৪০ গ্রাম দৈনিক) এবং সুষম খাদ্যাভাস গড়ে উঠেছে যার ফলস্বরূপ অকাল মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে এবং জনগণের গড় আয়ু ৬৯ বৎসরে (২০১৩ খ্রি:) উন্নীত হয়েছে। বহু সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল এবং ১৩ হাজার কমিউনিটি হাসাপাতালের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মান

---

৫১৫. https://Bangladesh - Country Profile

৫১৬. https://bn.wikipedia.org/s/924

৫১৭. "Child and Maternal Nutrition in Bangladesh"

৫১৮. "The state of food insecurity in the food 2011"

৫১৯. "THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2011"

৫২০. "High Malnutrition in Bangladesh prevents children from becoming "Tigers""

অনেকাংশে উন্নীত হয়েছে। জন্মকালে শিশু মৃত্যু হার (২০১৩: হাজারে ৫৩ জন) ও মাতৃমৃত্যুর হার (২০১৩: হাজারে ১৪৩ জন) উল্লেখযোগ্য হারেহ্রাস পেয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।[৫২১] স্বাস্থ্য জনশক্তি (Health Manpower) চিকিৎসক, চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ, সেবিকা ও প্যারা-চিকিৎসক প্রমুখ প্রশক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি। বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে অন্য শ্রেণীর কর্মীরা নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে। এই কর্মীদল মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে গঠিত। এরা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ লাভ করে। প্রশিক্ষণ সাধারণত প্রযুক্তিভিত্তিক নয়। কর্মীরা সতর্কতামূলক কর্মকান্ডসহ কমিউনিটি স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষ সেবা প্রদানে নিবেদিত হয়। এছাড়া সেখানে রয়েছেন হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদীশাস্ত্র অনুসারে চিকিৎসা সেবা দানকারী চিকিৎসকবৃন্দ।

নিচের সারণিতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেক্টরে বর্তমানে কর্মরত জনশক্তি দেখানো হলো:

সারণি ২০০৮-০৯ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেক্টরের জনশক্তি।[৫২২]

নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা	৪৯৯৯৪
গড়ে জনগণের মাথাপিছু চিকিৎসকের সংখ্যা	২৮৬০
নিবন্ধনকৃত সেবিকার সংখ্যা	২৩৭২৯
নিবন্ধনকৃত ধাত্রীর সংখ্যা	২২২৫৩

সম্প্রতি অধিকাংশ চিকিৎসক নগর ও শহরে বাস করেন এবং তারা জনসাধারণের মাত্র শতকরা ২০ ভাগকে চিকিৎসা সেবা দান করছেন। বাংলাদেশের জনগণের বৃহদাংশ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে এবং ফলে এরা সহজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের চিকিৎসা লাভে সক্ষম হয় না। কারণ গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল।

জাতীয় স্বাস্থ্য জনশক্তির বড় অংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন। কারণ, স্বাস্থ্য যত্নদানের ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারি দায়িত্বের আওতাভুক্ত। শুধু নগরে ও শহরে বেসরকারিভাবে চিকিৎসাদানরত চিকিৎসক সহজলভ্য হয় এবং সম্প্রতিকালের বছরগুলিতে বেসরকারি পর্যায়ে রোগ নির্ণায়ক ও হাসপাতাল বেশ ভালভাবে গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে ঢাকা মহানগরীতে ও দেশের কয়েকটি বড় বড় শহরে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করবে এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য জাতীয় পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার ২০০০ সালে জনগণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করেন। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আশানুরূপ নয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব,

---

[৫২১]. *Bangladesh Marching Ahead,* Prime Minister's Office, March 2014

[৫২২]. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সংকলন, ২০০৯ ইং।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য দক্ষ লোকের অভাব, চিকিৎসক-নার্স-টেকনিশিয়ানের অপ্রতুলতা, অনিয়ম, প্রতিষ্ঠানসমূহের নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগী সেবার প্রতি আন্তরিকতা ও সহানুভূতির অভাব, পানি-বিদ্যুৎ সংকট, ওষুধ চুরি, নিম্নমানের খাবার, হাসপাতালে দালাল-টাউট-সন্ত্রাসীদের অবস্থান, কোথাও কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের দৌর্দণ্ড প্রতাপ, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার অভাব এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক দুর্বলতা পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। সরকারি এই স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে এ দেশের সরকার কখনোই মোট বাজেটের শতকরা ৩ ভাগের বেশি বরাদ্দ করেনি। বর্তমান সরকার এখাতে ব্যয় বাড়ানো সত্ত্বেও এখনও সরকার স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করছে মাথাপিছু ৩.৬ মার্কিন ডলার মাত্র। হিসাব করে দেখা গেছে ন্যূনতম স্বাস্থ্য সেবা পেতে হলে মাথাপিছু অন্তত: ১২ মার্কিন ডলার প্রয়োজন। ২০০০ সালের হিসাব মতে দেখা যায় দেশের ১৩ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় ২৭,৫৪৬ জন, রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা প্রায় ১৫,৮০৪ জন। দেশে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে মোটেও সন্তোষজনক নয়। প্রতি ৪,৭১৯ জন মানুষের জন্য আছে ১ জন ডাক্তার ও ৮,২২৬ জন মানুষের জন্য আছে ১ জন নার্স। গ্রামীণ হিসাবে আলাদা করলে অনুপাত আরও অসন্তোষজনক প্রতীয়মান হবে। দেশে বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ভিন্ন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাথে এর সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। পুষ্টিজ্ঞান এবং দেশব্যাপী পুষ্টি ব্যবস্থা কার্যক্রম এখনও গড়ে উঠেনি।

পাশাপাশি একথাও স্বীকার্য যে এতকিছু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে যদিও তা কাঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছাতে আরও দৃঢ় পদক্ষেপ দরকার। স্বাস্থ্যখাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হচ্ছে সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচী। টিকাদান কর্মসূচী বিগত ৫ বছরে শতকরা ১০ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬৮.৭ ভাগে পৌঁছেছে। ২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে বর্তমানে এ হার আরও বেশি।

সরকারী হিসাব (২০০০ সন) মতে, অপুষ্টির হার আশংকাজনক। এখনও প্রতি বছর আমাদের দেশে ডায়রিয়ায় মারা যাচ্ছে হাজার হাজার শিশু। ৫ বছরের নিচে যত শিশু মারা যায় তার ২৫% মারা যাচ্ছে ডায়রিয়া জনিত রোগে। এ প্রসঙ্গে প্রয়াত ড.আখতার হামিদ খানের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য- "প্রতি বছর ডায়রিয়া বিশ্বে ২২ লক্ষ শিশুর জীবন কড়ে নেয়। ডায়রিয়ার কারণে আরও লক্ষ লক্ষ শিশুর ওজনহীনতা এবং দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব দেখা দেয়, তারা সহজেই মারাত্মক রোগব্যাধির শিকার হয়। এর ফলে তাদের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। কোনো জাতি কী করে আশা করতে পারে যে, সে অগ্রগতি অর্জন করবে যদি তার প্রধান সম্পদ তার জনগণ জীবনের শুরু থেকেই এত প্রাণশক্তিহীন হয়ে পড়ে? দেশের নেতারা কী করে এই সত্যকে উপেক্ষা করবেন যে এই মানুষগুলো কোনো অদম্য শত্রু বা নিরাময়ের অযোগ্য রোগ ব্যাধির দ্বারা নিঃশেষ হচ্ছে না, বরং নিঃশেষ হচ্ছে ডায়রিয়ার মত পার্থিব ও সহজে প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগের দ্বারা।

২০০০ সালে গৃহীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে ১৫টি মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে এবং এই লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১০টি মূলনীতি (Policy principles) ও ৩২টি কর্মকৌশল (Policy

Strategies)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। মূল স্বাস্থ্যনীতিতে সুপরিকল্পিতভাবে যথেষ্ট আশা জাগানো এবং আদর্শিক বলে মনে করার উপযুক্ত কারণ আছে বলে অনুভূত হয়।[৫২৩]

বাংলাদেশের এই জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। অনেক উন্নত দেশের স্বাস্থ্যনীতির সমকক্ষ বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু পার্থক্য একটি জায়গায়, বিদেশীরা তাদের জাতীয় যে কোনো নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, আর আমরা সেখানে অক্ষরে অক্ষরে তা অবহেলা করি। আমরা ভাল আইন, উত্তম কর্মকৌশল প্রণীত করি তা ভাঙার জন্য। জনগণের উন্নত পরিসেবার মানসে একই অঙ্গীকার নিয়ে সরকার ২০০০ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি আরও সময়োপযোগী করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার পর ২০০৬ সালের গোড়ার দিকে একটি খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি উপস্থাপন করে। কিন্তু তা জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। এক তথ্যসূত্রে জানা যায়, সরকারী চিকিৎসকদের প্রাইভেট সংক্রান্ত একটি বিধি-নিষেধ সংবলিত অনুচ্ছেদ থাকার জন্য চিকিৎসক সমিতির কাছে তা গ্রহণীয় হয়নি। ফলে ২০০০ হতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রাপ্তির সুযোগ জনগণের হয়নি। অবশ্য স্বাস্থ্যনীতি, ওষুধনীতি সবসময়ই একটি স্পর্শকাতর বিষয়। তাই আমরা দেখি যুগে যুগে দেশে বিদেশে চিকিৎসক সমাজের একটি বড় অংশ এই নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে বিরোধিতা করে এসেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আরো যুগোপোযোগী করে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা:[৫২৪]

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেয়া এবং পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা, সরকারি স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র ও হাসপাতাল সমূহে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করাসহ সরকারি ও বেসরকারি খাতের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রোগ ও চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানবজাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসে গেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে (রোগ-ব্যাধি) তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য পথ নির্দেশনা (হিদায়াত) ও রহমত।"[৫২৫] রোগ ও চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে ইসলামে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতএব, সকলের জন্য চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা মানবতা ও ইসলামের দাবী।

---

৫২৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2000

৫২৪. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৫২৫. আল-কুরআন ১০ : ৫৭

২. সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহিতা কেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি করা:[৫২৬]

জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী, অতিদরিদ্র, অল্প আয়ের জনগোষ্ঠী ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজননসেবা এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ইসলাম উক্ত বিষয়ে সমর্থন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ

আমি কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছি তা মুমিনদের জন্য সকল রোগের নিরাময় (চিকিৎসা) ও রহমত।[৫২৭]

৩. রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা:[৫২৮]

রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে রোগ নিরাময়ের চেয়ে উত্তম। ইসলাম রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন কোন চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট বা ডায়াটেসিয়ান হিসাবে ছিলোনা। তথাপিও তিনি স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ নিরাময় ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি বিষয়েই দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যা পুরোপুরি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। ইসলাম রোগ প্রতিরোধের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিসে এমন সব দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। যেমন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে তাকে ওই দিন কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।"[৫২৯] এছাড়া রমযানের রোযা রাখা, নিয়মিত সালাত আদায় করা, পাঁচবার উযূ করা, পরিমিত পরিমাণে নিয়মিত হালাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা ও হারাম খাদ্য বর্জন করা, দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন বৈধ নিয়ম-নীতি মেনে চলা, ব্যক্তিগত জীবনে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।[৫৩০] হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারব (রা.) হতে বর্ণিত, "মানুষ পেটের তুলনায় নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট যা তার মেরুদন্ড সোজা রাখে। তবে যদি এর অতিরিক্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"[৫৩১] অর্থাৎ ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি মেনে সঠিকভাবে জীবন-যাপনের মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

---

৫২৬. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৫২৭. আল-কুরআন ১৭ : ৮২

৫২৮. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৫২৯. mnxn eLvix, প্রাগুক্ত, অধ্যায় খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যগ্রহণ অধ্যায়, হাদীস নং ৫০৪২

৫৩০. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cv¸³, পৃ-৭১

৫৩১. wZiwghx, প্রাগুক্ত, অধ্যায় অধিক আহার নিষেধ, হাদীস নং-২৩৮০

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর মূল লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

প্রথম লক্ষ্য : চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেয়া এবং পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা।[৫৩২] ইসলাম এ ধরণের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায়। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

এদেরকে বলো, এ কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়াত (পথ-নির্দেশ) ও রোগমুক্তির কারণ (ব্যাধির প্রতিকার) বটে।[৫৩৩] স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা এবং জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। স্বাস্থ্য রক্ষার মূল উপাদান সুষম খাদ্য। খাদ্য দ্রব্য শরীরের উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে। শরীর ভাল থাকলে মনও ভাল থাকে। ফলে, নৈতিক চরিত্র উন্নত হয় এবং মন ভাল থাকলে আত্মাও ভাল থাকে। আবার খাদ্য দ্রব্যে হালাল হারামের ব্যবস্থা রয়েছে। হালাল খাদ্য বলতে ঐ খাদ্যকে বুঝায় যেগুলো খেতে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলো গ্রহণ করেছেন অথবা গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়েছেন। পুষ্টিকর হালাল খাদ্র গ্রহণে মন ও শরীর উভয়ই সুস্থ থাকে। রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত শিক্ষা, পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং চিকিৎসার মৌলিক উপকরণসমূহ জনসাধারণের জন্য সহজ প্রাপ্য ও হাতের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় লক্ষ্য : মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণ

জনসাধারণ, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।[৫৩৪] ওষুধ ও চিকিৎসাসেবার উচ্চমূল্যের জন্য দরিদ্ররা অনেকাংশেই চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে রোগমুক্ত করেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে,

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্ন দান।[৫৩৫] অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে সকল যুগেই অভাব বিদ্যমান ছিল। মহান আল্লাহ মানুষের উপকার করার বিনিময়ে দুনিয়া অথবা আখেরাতে অথবা উভয় স্থানে প্রতিদান দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা কতইনা উত্তম। আর যদি দান গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। মহান আল্লাহ তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। মহান আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন।[৫৩৬] জনসাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সর্বপ্রকার সাহায্যের মহান আল্লাহ মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

---

[৫৩২]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫৩৩]. আল-কুরআন ৪১ : ৪৪

[৫৩৪]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫৩৫]. আল-কুরআন ৯০ : ১৪

[৫৩৬]. আল-কুরআন ২ : ২৭১

<u>তৃতীয় লক্ষ্য : কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন নিশ্চিতকরণ</u>

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন নিশ্চিত করা।[৫৩৭] বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কারণে এবং দূরবর্তীস্থানে বসবাসসহ বিবিধ কারণে সমাজের দরিদ্র, সামাজিকভাবে বঞ্চিত, অশিক্ষিত, প্রান্তিক, দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, বিশেষত: গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং কারখানার শ্রমিকগণ সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও কিছু কর্মসূচী তাদের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কিন্তু এটা তাদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। কারখানার শ্রমিক, কৃষিখাত, পশুপাখি পালনে নিয়োজিত মানুষ, আদিবাসী, দুর্গম এবং দূরবর্তী এলাকাবাসীদের জন্য এবং নারীদের সমাজিক ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানে, সহিংসতার বিরুদ্ধে এবং বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইসলামের আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে মানুষ দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির হাত হতে সহজেই রক্ষা পেতে পারে। চিকিৎসাসেবা একটি মহৎ ও উৎকৃষ্ট মানের কাজ। ইসলামী নিয়মনীতি ও বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা সকল নাগরিকের সম-অধিকার। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে রোগমুক্ত করেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে,

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

আমি যখন অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে রোগমুক্ত করেন।[৫৩৮]

<u>চতুর্থ লক্ষ্য : জরুরী চিকিৎসাসেবাকে অগ্রাধিকার প্রদান</u>

জরুরী চিকিৎসাসেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া।[৫৩৯] জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকারের মাধ্যমে রোগকে অগ্রসর হতে না দেয়া এবং চিকিৎসাকে দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগ না দেয়া। দেশের প্রতিটি জেলা এবং উপজেলা হাসপাতালে জরুরী বিভাগ রয়েছে। তবে মাঝে মাঝে সঠিক ডাক্তার পাওয়া যায় না। দূর্ঘটনা, হার্টএ্যাটাক, স্ট্রোক এর মতো রোগসমূহ যদি আক্রমনের শুরুতে সঠিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে অনেকাংশেই রোগ বৃদ্ধি ঘটতে পারে না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করেনা, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।[৫৪০]

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।[৫৪১] এ কারনে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

---

৫৩৭. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫৩৮. আল-কুরআন ২৬ : ৮০

৫৩৯. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫৪০. আল-কুরআন ১০ : ১০০

৫৪১. আল-কুরআন ৮ : ২২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম লক্ষ্য : শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হারহ্রাসকরণ

শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা, বিশেষ করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা।[৫৪২] বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১.৩৭ এবং ২০০৮ সালে তা ছিল ১.৪১ জন। বাংলাদেশে মহিলা প্রতি গড় সন্তান গ্রহণের হার বর্তমানে ২.৩ এবং ২০০৭ সালে তা ছিল ২.৭ জন। মাতৃমৃত্যু হ্রাস পেয়ে বর্তমানে প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৯৪-এ দাঁড়িয়েছে; ২০০১ সালে তা ছিল ৩২০জন। শিশু মৃত্যু (৫ বছরের নিচে) হ্রাস পেয়ে বর্তমানে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৪১-এ দাঁড়িয়েছে; ২০০৭ সালে যা ছিল ৬৫ জন।[৫৪৩] অর্থাৎ বাংলাদেশ শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে। শুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নবজাতক ও প্রসূতিমৃত্যুর হার হ্রাস করা সম্ভব। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ইসলামের সুমহান নীতি-পদ্ধতি পালনের মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির বাস্তবায়ন করা সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন,

اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে।[৫৪৪]

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ

অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।[৫৪৫]

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৫৪৬] গর্ভকালীন সময়ে মায়ের সঠিক চিকিৎসা করা, শিশুকে সঠিকভাবে ভূমিষ্ঠ হতে সহায়তা করা এবং জন্মের পর শিশুদেরকে সঠিকভাবে লালন-পালন করা ইসলামের নির্দেশনা। শিশুদের স্বাস্থের যত্ন নেওয়া এবং তাদের রোগ-ব্যাধিতে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রতিটি মানুষেরই দায়িত্ব। লিঙ্গ ভেদে শিশুর যত্নে তারতম্য ঘটানো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অতএব, গর্ভকালীন সময়ে মায়ের সঠিক পরিচর্চা করা, পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রতিটি অভিভাবকেরই কর্তব্য। এ কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হবে। পবিত্র কুরআনের এসকল জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার মাধ্যমে মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হারকে আরও হ্রাস করা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ষষ্ঠ লক্ষ্য : পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাকে জোরদার ও গতিশীল করা

আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা (Replacement level of Fertility) অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করা।[৫৪৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম অঙ্গীকার সকল নাগরিকের আর্থ-

[৫৪২]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
[৫৪৩]. বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম, ¯^v¯' Lv‡Z mvd‡j¨i cvP eQi, পৃ. ১-৭
[৫৪৪]. আল-কুরআন ১৩ : ৮
[৫৪৫]. আল-কুরআন ৩২ : ৮
[৫৪৬]. আল-কুরআন ৩২ : ৯
[৫৪৭]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

সামাজিক উন্নয়ন। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যানে আয়োজিত এক জনসভায় বলেন, "ভাইয়েরা আমার, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বৎসর আমাদের ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তা হলে ২৫-৩০ বৎসরে বাংলার কোন জমি থাকবে না হালচাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্লানিং করতে হবে।"[৫৪৮] জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৩ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে ১.৩৪ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য নীট প্রজনন হার-১ অর্জন করা, যাতে ২০২১ সালে স্থিতিশীল জনসংখ্যা অর্জিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে সীমিত ভৌগোলিক পরিমন্ডলে ব্যাপক জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, জলবায়ু, পরিবেশ ও যোগাযোগ অবকাঠামোসহ মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা কষ্টসাধ্য হবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলাই এই নীতির উদ্দেশ্য। ইসলাম জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের বিপক্ষে নয়। তবে, যে কারনে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় ইসলাম তার বিপক্ষে। এ ব্যাপারে মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজীদে বলেছেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

তোমরা অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও (আমি দেব)।[৫৪৯]

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দ্বায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয়।[৫৫০]

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّـهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

কত প্রাণীই রয়েছে যারা তাদের রিযিক বহন করে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদের ও তোমাদের রিযিক দান করেন।[৫৫১]

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই আসমান ও যমীনের যাবতীয় ভান্ডারের অধিকারী। তিনি যাকে খুশী বেশী এবং যাকে খুশী কম রিযক দান করেন।[৫৫২]

إِنا كُل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

নিশ্চয় আমি যাবতীয় বস্তু পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছি।[৫৫৩]

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

---

৫৪৮. evsjv‡'k RvZxq RbmsL¨v bxwZ-2012, পৃ. ১

৫৪৯. আল-কুরআন ১৭ : ৩১

৫৫০. আল-কুরআন ১১ : ৬

৫৫১. আল-কুরআন ২৯ : ৬০

৫৫২. আল-কুরআন ৪২ : ১২

৫৫৩. আল-কুরআন ৫৪ : ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

আমার নিকট সব জিনিসের ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ (সেখান থেকে) নাযিল করে থাকি।[৫৫৪] ইসলাম প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিকে সমর্থন করে না। এ ধরনের পদ্ধতি শারীরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়েই ক্ষতিকর। মানুষ রিযিকের ভয়ে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে। যা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধি।

হযরত আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইসী বলেন, আমি শুনেছি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মসজিদের মিম্বারের উপর উঠে বলছিলেন; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সব কাজই নিয়াত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোন মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।[৫৫৫]

অতএব, বিবিক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠনের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জনউর্বরতা এবং স্থীতিশীল জনসংখ্যার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এই পদ্ধতি এক দিকে যেমন অর্থের অপচয় হয় অন্য দিকে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি করে।

সপ্তম লক্ষ্য : মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা

মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা।[৫৫৬] মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার যদিও ক্রম হ্রাসমান তবুও প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত এখনও বেশি। প্রজনন-কালীন রুগ্নতা, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী মৃত্যুই এ উচ্চ হারের মূল কারণ। এছাড়া এ উচ্চহারের অন্যান্য প্রধান কারণ হলো: প্রাথমিক এবং মাতৃসেবার অপর্যাপ্ততা, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে সচেতনতার অভাব, শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর অপর্যাপ্ততা। শুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নবজাতক ও প্রসূতিমৃত্যুর হার হ্রাস করা সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।[৫৫৭] পবিত্র কুরআনের এসকল জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ইসলামের সুমহান নীতি-পদ্ধতি পালনের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। ইসলাম এ ধরণের কর্মকে আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করে।

---

[৫৫৪]. আল-কুরআন ১৫ : ২১

[৫৫৫]. ইমাম বুখারী (র), cv¸ ³, খন্ড ১ম, ওহীর সূচনা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১, হাদীস নং ১

[৫৫৬]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫৫৭]. আল-কুরআন ৪৬ : ১৫

অষ্টম লক্ষ্য : পরিকল্পিত পরিবার গঠন কর্মসূচি গ্রহণযোগ্য ও সহজতর করা

অতি দরিদ্র ও অল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গ্রহণযোগ্য করা ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।[৫৫৮] ইসলাম প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিকে সমর্থন করে না। এ ধরনের পদ্ধতি শারীরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়েই ক্ষতিকর। মানুষ রিযিকের ভয়ে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে। যা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধি। এ ব্যাপারে মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজীদে বলেন,

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً

তোমরা অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও (আমি দেব)।[৫৫৯] মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا

যমিনের ওপর বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর নয় ।[৫৬০]

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এক দিকে যেমন অর্থের অপচয় হয় অন্য দিকে নতুন করে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি করে।

একজন সুস্থ্য মহিলার ঋতুস্রাবের ঠিক ১৪ দিনের দিন পূর্ণ ডিম্ব ওভারি থেকে বেরিয়ে এসে শুক্রাণুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ডিম্ববাহী নালীতে অপেক্ষা করে। এই ১৪তৃম দিনে (২৪ ঘন্টার মধ্যে) যদি স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয় তাহলেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়। প্রতি ২৮ দিন অন্তর একটি করে পরিপক্ক ডিম্ব ওভারি থেকে ডিম্ববাহী নালীতে বেরিয়ে আসে[৫৬১] এবং ২৮ দিন পর ফেটে যায়। এভাবেই ঋতুচক্র চলতে থাকে। ১৪তৃম দিনের ২৪ ঘণ্টাকে পাওয়ার জন্য ১৩তৃম, ১৪তৃম, এবং ১৫তৃম দিনে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলে গর্ভবতী হওয়ার সুযোগ থাকে এবং এই তিন দিন মিলন থেকে বিরত থাকলে গর্ভধারণ হয় না (ঋতু গোলযোগের কারণে যাদের চক্র ২৪ দিনের কম অথবা ৩২ দিনের বেশী ব্যবধানে হয় চিকিৎসা ব্যতিত তাদের গর্ভধারণ সাধারণত হয় না)।

এই পদ্ধতির মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বা ওষুধপত্রের প্রয়োজন হয় না। ফলে, এক দিকে যেমন পৃথিবীব্যাপি সাশ্রয় পাবে কোটি কোটি ডলারের ওষুধ, অন্য এই ওষুধের ফলে সৃষ্ট অযাচিত রোগ-ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা পাবে কোটি কোটি মানুষ। এই পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে অবৈধ যৌন-মিলনের ফলে ক্ষতিকর রোগ-ব্যাধির ব্যপক প্রচার করতে হবে যাতে পদ্ধতির অপপ্রয়োগ না হয়।

নবম লক্ষ্য : স্বাস্থ্যসেবায় সমতা নিশ্চিত করা

স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।[৫৬২] জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের সমতা ভিত্তিতে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করা ইসলামীক রীতি সম্মত। ইসলামে মানুসে মানুষে কোন ভেধাভেদ নেই। নারী ও পুরুষের অধিকার সম্পর্কে মহান আল্লাহ কোন বৈষম্য সৃষ্টি করেন নি।

---

[৫৫৮]. RvZxq ¯'v¯'bxiZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫৫৯]. আল-কুরআন ১৭ : ৩১

[৫৬০]. আল-কুরআন ১১ : ৬

[৫৬১]. cv¸3, পৃ. ২৩৫

[৫৬২]. RvZxq ¯'v¯'bxiZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন।[৫৬৩]

<u>দশম লক্ষ্য : তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা</u>

চিকিৎসা সেবাসহ স্বাস্থ্য খাতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।[৫৬৪] বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা উন্নত করার উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার এখনো যথেষ্ট নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ ক্ষেত্রে জনশক্তির আগ্রহ ও দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অপ্রতুলতা প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বিরাজ করছে। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ই-হেলথ, টেলি মেডিসিন এবং ই-তথ্যের সম্ভাবনার দ্বারা উন্মোচিত হয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত মাননীয় সরকারের পক্ষে একটি ভালো উদ্যোগ। মহৎ উদ্দেশে ইসলাম গবেষণাগত জ্ঞানকে সমার্থন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।"[৫৬৫] এ সকল প্রযুক্তিগত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমরা দ্রুততম সময়ে রোগী/চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিন ব্যক্তিবর্গের সহিত যোগাযোগ করতে পারি। তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সের করে আন্তঃদেশীয় ও বহিঃদেশীয় মিটিং এর মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। এছাড়াও আমরা তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে একই সাথে সারাদেশের হাসপাতালসমূহ মনিটরিং করতে পারি।

<u>একাদশ লক্ষ্য : স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা</u>

সরকারি স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র ও হাসপাতালসমূহে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল নিশ্চিত করা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনপূর্বক সেবার গুণগত মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।[৫৬৬] স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের জন্য এটা একটা ভালো পদক্ষেপ। বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান দূর্বল। বিশেষ করে জনসংখ্যা অনুপাতে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা কম হওয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। দক্ষ মানব সম্পদের সংখ্যা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ নার্স, প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরি, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ নার্স তৈরির জন্য পর্যপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। ইসলামের আলোকে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীই শিক্ষা গ্রহণ, তথা জ্ঞান সম্পর্কিত। মহান আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

"পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পড়ুন এবং আপনার প্রতিপালক অতিব সম্মানিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা, যা সে জানত না।"[৫৬৭] শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের নীতি হলো- শিক্ষা

---

৫৬৩. আল-কুরআন ৪২ : ৮

৫৬৪. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫৬৫. আল-কুরআন ২৯ : ৬৯

৫৬৬. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫৬৭. আল-কুরআন ৯৬ : ১-৫

সকল মুসলিমের উপর ফরয। মহানবী (সা.) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) উপর অত্যাবশ্যক।"[৫৬৮]

দ্বাদশ লক্ষ্য : স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়হ্রাস করা

বেসরকারি মেডিকল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের সেবার মান নিশ্চিত করা এবং সেবা ও শিক্ষার ব্যয় জনসাধারণের নাগালের মধ্যে রাখা।[৫৬৯] বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মাধ্যমে যে স্বাস্থ্যসেবা জনগণ পাচ্ছেন তা পরিসর ও গুণগত মানের দিক থেকে আরও উন্নীত করা প্রয়োজন। এছাড়াও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার জন্য উচ্চ ফি এবং অধিক রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষাকে ব্যায়বহুল চিকিৎসার একটি বড় কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়েও জনগণ সন্তুষ্ট নয়। অত্যধিক ব্যায় বহুল হওয়ার কারণে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবকে দরিদ্র, দূরবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানো যাচ্ছে না, ফলে মূল লক্ষ্য অর্জন ব্যহত হচ্ছে। বেসরকারি মেডিকল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের সেবার মান নিশ্চিত করা এবং সেবা ও শিক্ষার ব্যয় জনসাধারণের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অর্থ ব্যায় করা প্রয়োজন। পরোপোকারের জন্য অর্থ ব্যায় সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ ، ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।[৫৭০]

ত্রয়োদশ লক্ষ্য : শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা

সকল চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, মেডিকেল টেকনোলজি ও স্বাস্থ্যসেবা সহায়কদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগোপযোগী করা।[৫৭১] এ ধরনের সময়োপযোগী উদ্যোগ এ দেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালে যেতে মানুষ ভয় পায়। হাসপাতাল শব্দটি মনে হলেই ভীড়, নোংরা পরিবেশ, কোলাহল, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, সময় নেই, দুর্গন্ধ, দুর্নীতি ইত্যাদি। প্রচলিত সকল ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষা খাতে ব্যায় বৃদ্ধি করতে হবে। এই ব্যায় দ্বারা অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ যথাপোযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"আল্লাহ তা'য়ালা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"[৫৭২]

---

[৫৬৮]. ইবনে মাজা, cv¸ ৩, কিতাবুল মুকাদ্দিমাহ, অধ্যায়: ১৭
[৫৬৯]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
[৫৭০]. আল-কুরআন ২ : ২৬২
[৫৭১]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
[৫৭২]. আল-কুরআন ১৩ : ১১

চর্তুদশ লক্ষ্য : জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পৃক্ত সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা নিশ্চিতকরণ

জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা নিশ্চিত করা।[৫৭৩] স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ অবস্থা; শুধুমাত্র রোগব্যাধি বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সুস্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগ চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ পানি, যথাযথ খাদ্য, দূষণমুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় রোগ চিকিৎসা ও কিছু প্রতিরোধমূলক কাজসহ চিকিৎসা শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্বাস্থ্যের অন্যান্য উপাদান নিশ্চিতকরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইত্যাদির সম্পৃক্ততা রয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষের মঙ্গলের জন্য চিকিৎসসেবার মতো সৎকর্ম করতে অনুপ্রানিত করেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৫৭৪]

স্বাস্থ্যসেবায় বেসরকারি সংস্থাসমূহ (NGO's in health services) বাংলাদেশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। স্বাস্থ্য খাতে বিশিষ্ট বেসরকারি সংস্থার মধ্যে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট আইসিডিডিআর,বি উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার কর্মপরিধি বিস্তৃত করে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার সংস্থাগুলিই নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহে কাজ করে থাকে। সাধারণত, শিক্ষা কর্মসূচি এবং মাদকাসক্তি দূরীকরণ বা টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি অগ্রাধিকার পায়। বর্তমানে বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেসব ক্ষেত্রে তৎপর তার মধ্যে আছে যৌনরোগের মাধ্যমে ছড়ানো রোগসমূহ, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, পেটের কৃমি এবং পরিবার পরিকল্পনা। বেশির ভাগ বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে আছে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান বিতরণ। ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশে পোলিও নির্মূল অভিযানের অংশ হিসেবে পাঁচ বছরের কম বয়স্ক এবং শিশুদের ক্ষেত্রে মুখে খাবার পোলিও টিকা প্রদানের কর্মসূচি চালু হয়। এই টিকাদান কর্মসূচিতে বেসরকারি সংস্থাসমূহ তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োজিত করে। এছাড়া বেসরকারি সংস্থাসমূহ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে যাতে শিশুদের প্রতিষেধকযোগ্য ছয়টি শিশুরোগের বিরুদ্ধে টিকাদান করা হয়।[৫৭৫] বর্তমান সময়ে এদেশে সরকারি চিকিৎসা ব্যাবস্থার পাশাপাশি অনেক ব্যক্তি বা সংস্থা বেসরকারি প্রতিষ্ঠনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। মরহুম ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বারডেম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ইসলামিক ব্যাংক হাসপাতাল এবং ডাঃ শেখ মহিউদ্দিন পরিচালিত আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সারা দেশে রোগীদের স্বল্প মূল্যে উন্নত সেবা প্রদান করছে।

---

[৫৭৩]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫৭৪]. আল-কুরআন ৫ : ৯

[৫৭৫]. *http://bn.banglapedia.org/index.php?title*

<u>পঞ্চদশ লক্ষ্য : রোগ প্রতিরোধ ও টিকাদান কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা</u>

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা এবং এ লক্ষে টিকাদান (Immunization) কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা ও শক্তিশালী করা।[৫৭৬] এক আউন্স রোগ প্রতিরোধ এক টন রোগ নিরাময় থেকে উত্তম।[৫৭৭] অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে রোগ নিরাময়ের চেয়ে সস্তা। নবী করীম সাল্লাল্লাহি আলাহিওয়াসাল্লাম তথাকথিত কোন চিকিৎসক ছিলেন না। তথাপিও আমরা দেখতে পাই যে তিনি স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ নিরাময় ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি বিষয়েই সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যা পুরোপুরি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। ইসলাম রোগ প্রতিরোধের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ সংক্রান্ত কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিসের দিক-নির্দেশনাসমূহ রোগ প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। যেমন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে তাকে ওই দিন কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।"[৫৭৮] এছাড়া রমযানের রোযা রাখা, নিয়মিত সালাত আদায় করা, পাঁচবার উযূ করা, পরিমিত পরিমাণে নিয়মিত হালাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা ও হারাম খাদ্য বর্জন করা, দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন বৈধ নিয়ম-নীতি মেনে চলা, ব্যক্তিগত জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধের উত্তম পন্থা।[৫৭৯] হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারব (রা.) হতে বর্ণিত, "মানুষ পেটের তুলনায় নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করেনা। আদম সন্তানের জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট যা তার মেরুদন্ড সোজা রাখে। তবে যদি এর অতিরিক্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"[৫৮০]

<u>ষষ্ঠদশ লক্ষ্য : স্বাস্থ্য তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা</u>

স্বাস্থ্য তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা।[৫৮১] বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা উন্নত করার উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার এখনো যথেষ্ট নয়। ফলে, জনগণ সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পাচ্ছে না। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ই-হেলথ, টেলি মেডিসিন এবং ই-তথ্যের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। টিকা বিষয়ক তথ্যসমূহ বর্তমানে মোবাইলের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক তথ্য প্রদান করা হয়। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা দ্রুত তথ্য পেয়ে থাকি। দ্রুত তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

আর আমি সোলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত।[৫৮২]

---

[৫৭৬]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫৭৭]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cv¸³, পৃ-৭৫

[৫৭৮]. mnxn eLvix, প্রাগুক্ত, অধ্যায় খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যগ্রহণ অধ্যায়, হাদীস নং ৫০৪২

[৫৭৯]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cv¸³, পৃ-৭১

[৫৮০]. wZiwghx, প্রাগুক্ত, অধ্যায় অধিক আহার নিষেধ, হাদীস নং-২৩৮০

[৫৮১]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫৮২]. আল-কুরআন ৩৪ : ১২

সপ্তদশ লক্ষ্য : অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।[৫৮৩] সঠিক ওষুধ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। বাংলাদেশে ওষুধের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। সরকার এ ব্যাপারে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ওষুধের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। দরিদ্র দেশগুলি তুলনামূলকভাবে তাদের বাজেটের একটি বড় অংশ শুধুমাত্র ওষুধ কিনতেই ব্যয় করে যা ধনী দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি। বিশ্বাস্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ মতে, প্রধানতঃ তৃতীয় বিশ্বের উচিত ওষুধ আমদানি, তৈরি এবং বিপণনের ব্যাপারে ২২৫টি প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকার মধ্যে সীমাবন্ধ থাকা, কেননা এই ওষুধগুলি দ্বারা সাধারণ এবং মারাত্মক অসুখ নিরাময় করা সম্ভব। বস্তুতঃ ডা. মাহ্‌লার একবার বলেছিলেন "গ্রাম এবং বস্তিবাসীদের জন্য মাত্র অনুর্ধ্ব ৩০ ধরণের ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক কান্ড ঘটানো সম্ভব।"[৫৮৪]

অষ্টদশ লক্ষ্য : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত রোগ-ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য বিপর্যয় ও রোগ-ব্যাধির গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য রাখা এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করা।[৫৮৫] বিশ্বায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন- শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত ব্যাধি, শৈত্য ও উষ্ণ প্রবাহ সংক্রান্ত ব্যাধি, পানিবাহিত রোগ, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি এবং পুষ্টি-হীনতা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার ব্যাপারে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য সরকারের নেয়া উদ্দোগ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিভিন্ন সময়ে বন্যা, জলচ্ছাস, ঘুর্ণিঝড় এ সকল প্রাকৃতিক দূর্যোগের পূর্বাভাস পেলে প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ সকল বিপদ-আপদ আসে মানুষের কৃতকর্মের ফলে। পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষ বিভিন্ন প্রকার সমস্যায় পতিত হয়। সঠিকভাবে মহান আল্লাহর এবাদত পালন এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পথে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও এ সকল রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৫৮৬]

উনবিংশ লক্ষ্য : বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা

বিকল্প চিকিৎসা (ইউনানি, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথি) পদ্ধতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা।[৫৮৭] প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করলে বেশি সংখ্যক জনগণ চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এটা চিকিৎসাসেবা বৃদ্ধির জন্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যে কোন ভাল কাজকে ইসলাম সাধুবাদ জানাই। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিকিৎসা ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থায় তালবিনা বা যবের গুড়ার মর্যাদা অনেক। প্রখ্যাত হাকীম জালিনুস বলেন, যবের সমতুল্য

[৫৮৩]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫৮৪]. The meaning of Health for all by the year 2000, *World Health forum*, Vol-2-No-1, WHO, 1981

[৫৮৫]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫৮৬]. আল-কুরআন ৩০ : ৪১

[৫৮৭]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

আর কোনো খাদ্য সৃষ্টি করা হয়নি। কারণ এ খাদ্য সুস্থ-অসুস্থ দুই অবস্থায় কাজ করে। এজন্য রোগীকে যবের গুড়া খাওয়ানো হয়, গমের গুড়া খাওয়ানো হয় না। কারণ যবের গুড়া পিপাসা দূর করে, রক্তের চাপ কমায়, পিত্তাধিক্য দূর করে ও পাতস্থলী পরিস্কার করে। চিনির সাথে মেশালে এটি উত্তম খাদ্যে পরিণত হয়। মূলত সকল নবী-রসূল আলাহিমুস সালামের খাদ্য ছিলো যব বা বার্লি। আর এ জন্যই মুসলমানদের জন্য তা উত্তম খাদ্য। বর্তমানে বাজারে শিশুদের জন্য যেসব গুড়া খাদ্য পাওয়া যায় তাতে যবের গুড়া অন্যতম উপাদান হিসেবে থাকে।[৫৮৮] হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের কারও জ্বর হলে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য 'ডালিয়া' পাকানোর নির্দেশ দিতেন। সে অনুযায়ী তা তৈরি করা হলে তিনি পরিবারের লোকদের বলতেন অসুস্থ রোগীকে পরিবেশন করতে। তিনি বলতেন, এটি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দূঃখ দূর করে, যেমন তোমাদের কোন মহিলা পানি দিয়ে তার চেহারার ময়লা দূর করে থাকে।"[৫৮৯] সে লক্ষ্যে আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার যথাযথ সহায়তা প্রদান, অনুদান বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আমরা আশা করি।

---

[৫৮৮]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, c়, ³, পৃ-২৩৮

[৫৮৯]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৪৪৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর মূলনীতি : ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ

মূলনীতিসমূহ:

মূলনীতি - ১

জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের এবং বিশেষ করে শিশু ও নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতা ভিত্তিতে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ভোগ করতে প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় সচেতন ও সক্ষম করে তোলা ও সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাত্রা গ্রহণের জন্য আচরণের পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া।[৫৯০] রোগী সুরক্ষা আইন ২০১৪ এর ধারা ৫ এ উল্লেখিত স্বাস্থ্যসেবা দানকারী ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রসঙ্গে নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে:

ক) শপথ :- চিকিৎসক হিপ্রোক্রিটাস শপথ, জেনেভা ঘোষণা (ওয়ার্ল্ড মেডিকেল এসোসিয়েশন ২০০৬ অথবা সর্বশেষ সংস্করণ), হেলসিনকি ঘোষণা (ওয়ার্ল্ড মেডিকেল এসোসিয়েশন ২০১৩ অথবা সর্বশেষ সংস্কার), সেবক ও সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল শপথ (সর্বশেষ সংস্করণ) অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা দানকারীগণ রোগী, জনগণ এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবেন;

খ) রোগীর প্রতি দায়িত্ব: মানসম্মত সেবা প্রদান রোগী ও রোগীর অনুসঙ্গীদের (Attendant) নিকট চিকিৎসা বিষয়ে তথ্য প্রদান, চিকিৎসা প্রদানের অনুমতি গ্রহণ এবং জরুরী সেবা প্রদান;

গ) মানসম্মত সেবা: প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসা প্রদানে সাধারণ মানসম্মত যত্ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ, যা মানসম্মতভাবে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন; যথা-

(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্তৃক কার্যকর যন্ত্রপাতি, ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ও অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(২) জটিল রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিষয় ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট বিলম্ব না ঘটিয়ে প্রেরণ করা;

(৩) সকল রোগীর রোগের যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল, অনুমতি রোগ, প্রদত্ত চিকিৎসা এবং শৈল্য চিকিৎসা যা প্রদান করা হয়েছে তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা;

(৪) সরকারের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিংহোম ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র সমূহের পরিচালনা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৫) কোন প্রকার দুর্ঘটনা অনুমতি হইবার সংগে সংগে তার প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৬) সকল ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা পালন করা;

(৭) মানবিক কারণে স্বাস্থ্যসেবা দানকারী ব্যক্তি বা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীকে প্রাথমিক ও জরুরী চিকিৎসা সেবা দিতে বাধ্য থাকবে।

(ঘ) রোগী ও রোগীর অনুসংগীত (Attendant) তথ্য প্রদান:

(১) রোগী ও রোগীর অনুসঙ্গীকে প্রয়োজনীয় ও বিকল্প চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞাত করা এবং

---

৫৯০. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

চিকিৎসাকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং অস্ত্রোপ্রচারের জটিলতা সম্বন্ধে জ্ঞাত করা;

(২) রোগীর চিকিৎসার ব্যয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী (Expeanditure Break up) এবং চিকিৎসার জন্য সময়ের বিষয়ে রোগী ও রোগীর অনুসংগীকে জ্ঞাত করা।

(ঙ) সর্বসাধারণের প্রতি দায়িত্ব:

স্বাস্থ্য সেবা দানকারী কর্তৃক সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য শিক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলায় চিকিৎসা সেবা প্রদান ও বাধ্যতামূলক জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করণে ভূমিকা রাখা;

(চ) আইন শৃংখলা বিষয়ক:

(১) হত্যা, আত্মহত্যা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, লাঞ্চিত বা প্রহৃত হওয়ার জন্য ক্ষতি, বিষপ্রয়োগ অন্যের দ্বারা যে কোনও ধরণের আঘাত জনিত ক্ষতি, অগ্নিদগ্ধ হওয়া, বেআইনী গর্ভপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুলিশকে অবহিত করণ;

(২) মৃত্যুকালীন ঘোষনা (dying declaration) এর ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ।[৫৯১]

এ সকল তথ্যাদি সময়ে সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদানকারীদেরকে তাদের করণীয় সম্পর্কে এবং জনসাধারণকে তাদের প্রাপ্য সম্পর্কে সচেতন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

আল-কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের মঙ্গলের জন্য। জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার বিষয়ে আল-কুরআনে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছি তা হলো মুমিনদের জন্য সকল রোগের নিরাময় (চিকিৎসা) ও রহমত।[৫৯২]

মূলনীতি - ২

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসমূহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের যে কোন ভৌগলিক অবস্থানের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়া।[৫৯৩] স্বাস্থ্যসেবা রাষ্ট্রের নিকট জনগণের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) অনুসারে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এবং অনুচ্ছেদ ১৮ (১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত রয়েছে। ইসলামে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব হলে সকলেই উপকৃত হবে। প্রত্যেক নাগরিককে গুরুত্ব প্রদান প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

[৫৯১]. ‡ivMx mi¶v AvBb, 2014
[৫৯২]. আল-কুরআন ১৭ : ৮২
[৫৯৩]. RvZxq ¯v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।[৫৯৪]

মূলনীতি - ৩

স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত, গরিব, প্রান্তিক, বয়স্ক ও শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী জনগণের অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া এবং এ লক্ষ্যে বিরাজমান সম্পদের প্রাধিকার, পূর্ণ বন্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।[৫৯৫] ইসলামের আলোকে কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে মানুষকে দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির হাত হতে সহজেই রক্ষা করা সম্ভব। চিকিৎসাসেবা একটি মহৎ ও উৎকৃষ্ট মানের কাজ। ইসলামী নিয়মনীতি ও বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা সকল নাগরিকের সম-অধিকার। ওষুধ ও চিকিৎসাসেবার উচ্চমূল্যের জন্য দরিদ্ররা অনেকাংশেই চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্চে। মানুষকে সেবা করতে হলে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দান করতে হবে। ইসলাম এজন্য যাকাতের ব্যবস্থা চালু রেখেছে। মানুষের উপকারের বিনিময়ে প্রতিদান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা কতইনা উত্তম। আর যদি দান গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। মহান আল্লাহ তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। মহান আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন।[৫৯৬] মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে রোগমুক্ত করেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে,

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

আমি যখন অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে রোগমুক্ত করেন।[৫৯৭]

মূলনীতি - ৪

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় তহবিল গঠন, ব্যয়ন, পরিবীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পদ্ধতি পর্যালোচনাসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করা।[৫৯৮] স্বাস্থ্যসেবা খাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইনের ২৪ ধারায় নিম্নোক্ত ভাবে তহবিল গঠন করেন: উপধারা

(১) কর্তৃপক্ষের, জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকবে।

(২) উক্ত তহবিল নিম্নবর্ণিত অর্থের সমন্বয়ে গঠিত হবে-

(ক) সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ;

(খ) কার্ডধারীদের দ্বারা প্রদেয় চাঁদা;

---

৫৯৪. আল-কুরআন ৪৯ : ১৩

৫৯৫. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫৯৬. আল-কুরআন ২ : ২৭১

৫৯৭. আল-কুরআন ২৬ : ৮০

৫৯৮. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

(গ) সরকার বা অন্য কোন সংস্থার অনুদান;

(ঘ) কোন জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণকৃত অর্থসমূহ;

(চ) কর্তৃপক্ষের বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে অর্জিত আয় আথবা মুনাফা;

(জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সেবার জন্য কোন পারিশ্রমিক অথবা মূল্য;

(ঝ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকার অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।[৫৯৯]

জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মহান আল্লাহ রাসূল (সা.)কে উদহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বরত ব্যক্তিবর্গকেও জনসাধারণের উপকারার্থে অনুরূপ অনুসরণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন।[৬০০]

মূলনীতি - ৫

সবার জন্য কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রয়াসের সুযোগ সৃষ্টি ও সহযোগিতা প্রদান করা এবং অংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে সরকারি স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহে উচ্চমূল্যের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি বেসরকারি অংশীদারিত্বে স্থাপনের বিষয়টি পরীক্ষা করা।[৬০১] জনসাধারণের চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চমূল্যের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি স্থাপন প্রয়োজন। চিকিৎসা কোন ব্যবসা নয়; সেবা। মহান আল্লাহর নিকট মানুষের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির মর্যাদা অতি উচ্চে। মহান আল্লাহ মানুষের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য শিক্ষামূলক বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّـهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।[৬০২]

---

৫৯৯. RvZxq ¯^v¯' mi ÿv AvBb 2014

৬০০. আল-কুরআন ৩ : ১৫৯

৬০১. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৬০২. আল-কুরআন ২ : ৮৩

অতএব, সরকার এ বিষয়ে যে নীতি নির্ধারণ করেছে নিঃসন্ধেহে তা জনগণের জন্য মঙ্গলজনক এবং ইসলাম সমর্থিত এবং সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই নীতি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

মূলনীতি - ৬

স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, সেবাদান পদ্ধতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা।[৬০৩] স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলাম মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য যে বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ, তা হলো শিক্ষা। সঠিক শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। কেবলমাত্র শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেবাদান পদ্ধতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মানব সম্পদ উন্নয়ন করা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীই হলো শিক্ষা তথা জ্ঞান সম্পর্কে। মহান আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۙ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۚ

"পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পড়ুন এবং আপনার প্রতিপালক অতিব সম্মানিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা, যা সে জানত না।"[৬০৪] মহানবী (সা.) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) উপর অত্যাবশ্যক।"[৬০৫] নিরোগ বা স্বাস্থ্যবান না হলে মানুষের পক্ষে উপার্জনাক্ষম হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার উৎপাদন ও কর্মে সম্পৃক্ত হতে হলে রোগ-ব্যাধিহীন হওয়া দরকার। এ কারণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানব স্বাস্থ্য উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সাধারণ নীতিমালা ঘোষণা করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

"তোমরা খাও এবং পান কর; তবে অপচয় করো না।"[৬০৬] নৈতিক উন্নয়ন ছাড়া যে কোন উন্নয়নই ব্যর্থতায় পর্যবষিত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ্ববাসীকে নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.)এর বাণী, 'আমি প্রেরিত হয়েছি সুমহান নৈতিক গুণাবলীর পূর্ণতা সাধনের জন্য'।[৬০৭]

মূলনীতি - ৭

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সেবাগুলিকে আরো জোরদার ও সেগুলোর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর, ফলপ্রসূ ও সুদক্ষ প্রযুক্তি গ্রহণ ও যথাযথ ব্যবহার, পদ্ধতি উন্নয়ন ও গবেষণা কর্মকে উৎসাহিত করা।[৬০৮] সঠিকভাবে প্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান বৃদ্ধি ও বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সেবার মানকে জনগণের নাগালের মধ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। মহানবী (সা.) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) উপর

---

৬০৩. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৬০৪. আল-কুরআন ৯৬ : ১-৫

৬০৫. ইবনে মাজা, cÖ¸ ³, কিতাবুল মুকাদ্দিমাহ, অধ্যায়ঃ ১৭

৬০৬. আল-কুরআন ৭ : ৩১

৬০৭. ইমাম মালেক ইবনু আনাস, মুয়াত্তা, cÖ¸ ³, অধ্যায় কিতাবুল হুসনিল খুলক, হাদীস নং ০৮

৬০৮. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

অত্যাবশ্যক।"[৬০৯] মহানবী (সা.)কে উন্নত চরিত্রের মডেল হিসাবে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে মানুষের চরিত্র গঠনের জন্য। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর ঘোষণা,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا

নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমাদের রাসূলের মধ্যে।[৬১০]

অতএব, গবেষণা কর্মকে উৎসাহিত করে যথাপোযুক্ত প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জন ও গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সেবাগুলিকে আরো জোরদার ও সেগুলোর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে স্বাস্থ্যনীতিকে বাস্তবায় করা যেতে পারে।

মূলনীতি - ৮

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে স্বাস্থ্যের সাথে কার্যকর সমন্বয় করা।[৬১১] আধুনিক বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও যেমন দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি দিন দিন বাড়ছে নাগরিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তাসহ নানা ধরনের অসুবিধা। এ সকল সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় জনগণ বিভিন্ন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করছে। একদিকে সরকার বিভিন্ন প্রকার খাবারবড়ি, স্ট্রিপ, লাইগেশন, ভ্যাসেকটমিসহ নানা প্রকারের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচলন ঘটিয়েছে অন্যদিকে মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশের আলেম সমাজ এ সকল পদ্ধতিকে নাজায়েজ বলে ফতোয়া দিচ্ছেন। প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার অনাকাংখিত রোগ-ব্যাধির আবির্ভাব ঘটায় যা আমরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারি এবং এটা ব্যয় বহুলও বটে। বর্তমান সরকার আধুনিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গড়তে জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এমতাবস্থায় প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পরিবর্তে আদর্শ পরিবার গঠন পদ্ধতি গ্রহণ করার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব। চলমান ব্যয়বহুল, বিতর্কিত এবং বহুরোগ সৃষ্টিকারী পদ্ধতির পরিবর্তে প্রস্তাবিত আদর্শ পরিবার গঠন পদ্ধতি গ্রহণ করলে স্বল্প খরচে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে বিজ্ঞান সম্মত এই আদর্শ পরিবার গঠন পদ্ধতি পৌঁছে দেয়া সম্ভব। এছাড়া, সবার মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনমূলক শিক্ষা প্রদান, প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতাসহ ধর্মীয় ভাবধারায় জীবন পরিচালনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ বলেন,

قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّـهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ভাল ও মন্দ এক নহে যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে।[৬১২] মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا

যমিনের ওপর বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর নয়।[৬১৩]

মূলনীতি - ৯

পুষ্টি কার্যক্রমকে স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় করা।[৬১৪] সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পুষ্টিহীনতা বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পুষ্টি কার্যক্রমকে স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় করার নীতিকে ইসলাম সাধুবাদ জানায়। একমাত্র

---

[৬০৯]. ইবনে মাজা, cv¸ ³, কিতাবুল মুকাদ্দিমাহ, অধ্যায়: ১৭

[৬১০]. আল-কুরআন ৩৩ : ২১

[৬১১]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৬১২]. আল-কুরআন ৫ : ১০০

[৬১৩]. আল-কুরআন ১১ : ৬

[৬১৪]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

ইসলামী জীবন-বিধানের মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব। মানুষের মঙ্গলের জন্য মহান আল্লাহ খাদ্য-দ্রব্যের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। যমিনে খাদ্য ও পুষ্টি তৈরি এবং চাষাবাদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ
مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এ গুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে।[৬১৫]

মূলনীতি - ১০

স্বাস্থ্যসেবার সাথে সর্ম্পকিত বিষয়ে সকল নাগরিকের অধিকার, সুযোগ, দায়িত্ব-কর্তব্য ও বিধি-নিষেধের ব্যাপারে সচেতন করা।[৬১৬] রোগী সুরক্ষা আইন ২০১৪ এর ধারা ৫ এ উল্লেখিত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে সকল নাগরিকের অধিকার, সুযোগ, দায়িত্ব-কর্তব্য ও বিধি-নিষেধের বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে:

খ) রোগীর প্রতি দায়িত্ব: মানসম্মত সেবা প্রদান রোগী ও রোগীর অনুসঙ্গীদের (Attendant) নিকট চিকিৎসা বিষয়ে তথ্য প্রদান, চিকিৎসা প্রদানের অনুমতি গ্রহণ এবং জরুরী সেবা প্রদান;

গ) মানসম্মত সেবা: প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসা প্রদানে সাধারণ মানসম্মত যত্ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ, যা মানসম্মতভাবে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন; যথা-

(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্তৃক কার্যকর যন্ত্রপাতি, ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ও অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(২) জটিল রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিষয় ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট বিলম্ব না ঘটিয়ে প্রেরণ করা;

(৩) সকল রোগীর রোগের যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল, অনুমতি রোগ, প্রদত্ত চিকিৎসা এবং শৈল্য চিকিৎসা যা প্রদান করা হয়েছে তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা;

(৪) সরকারের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিংহোম ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র সমূহের পরিচালনা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৫) কোন প্রকার দুর্ঘটনা অনুমতি হইবার সংগে সংগে তার প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৬) সকল ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা পালন করা;

(৭) মানবিক কারণে স্বাস্থ্যসেবা দানকারী ব্যক্তি বা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীকে প্রাথমিক ও জরুরী চিকিৎসা সেবা দিতে বাধ্য থাকবে।

---

[৬১৫]. আল-কুরআন ৬ : ৯৯

[৬১৬]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

(ঘ) রোগী ও রোগীর অনুসংগীত (Attendant) তথ্য প্রদান:

(১) রোগী ও রোগীর অনুসঙ্গীকে প্রয়োজনীয় ও বিকল্প চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞাত করা এবং চিকিৎসাকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং অস্ত্রোপ্রচারের জটিলতা সম্বন্ধে জ্ঞাত করা;

(২) রোগীর চিকিৎসার ব্যয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী (Expeanditure Break up) এবং চিকিৎসার জন্য সময়ের বিষয়ে রোগী ও রোগীর অনুসংগীকে জ্ঞাত করা।

(ঙ) সর্বসাধারণের প্রতি দায়িত্ব:

স্বাস্থ্য সেবা দানকারী কর্তৃক সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য শিক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলায় চিকিৎসা সেবা প্রদান ও বাধ্যতামূলক জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করণে ভূমিকা রাখা।[৬১৭]

এটা একটি জনকল্যাণকর নীতি। প্রতিটি জনকল্যাণকর নীতি ইসলাম সমর্থন করে। জনগণ এখনও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সংক্রান্ত জ্ঞান শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। রোগীকে পরামর্শদান আমাদের সমাজে পেশা হিসাবে স্বীকৃত নয়। নবী করিম (সা.) মানুষকে উন্নত নৈতিকতা শিক্ষাদানের শিক্ষক হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।[৬১৮]

মূলনীতি - ১১

জনগণের আকাঙ্খা ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সার্বিক সুস্থতা ও সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্চা ও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার অন্তর্নিহিত মূলনীতি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করা।[৬১৯] ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য একটি সর্বজনীন কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা উপহার দিতে চায়। বিষয়টি কুরআন মাজীদে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار

"হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে পরম কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও সৌন্দয্য দান কর এবং পরকালেও পরম কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও সৌন্দয্য দান কর। আর জাহান্নামের আগুন হতে আমাদের বাঁচাও"।[৬২০] ইসলাম স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলাম সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য বিবাহ প্রথা প্রচলন করেছে এবং জিনা-ব্যবিচারকে হারাম ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।[৬২১]

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করতে পারবে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করতে পারবে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।[৬২২] মহান আল্লাহ বলেন,

---

[৬১৭]. ‡ivMx mi¶v AvBb, 2014

[৬১৮]. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজা, mbvb Be‡b gvRv, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ.১২০

[৬১৯]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৬২০]. আল-কুরআন ২ : ২০১

[৬২১]. আল-কুরআন ১৭ : ৩২

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।[৬২৩]

'তোমরা যথাসম্ভব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থেকো। কারণ মহান আল্লাহ ইসলামের ভিত্তি রেখেছেন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর। জান্নাতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রবেশ করবেনা।[৬২৪]

অতএব, ইসলাম সর্বক্ষেত্রে জনগণের আকাঙ্খা ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সার্বিক সুস্থতা ও সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্চা ও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর।

মূলনীতি - ১২

স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল স্তরে প্রয়োজনীয় ও মানসম্পন্ন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সহায়ক প্রশিক্ষিত পেশাজীবি কর্মী-বাহিনী গড়ে তোলা।[৬২৫] সুস্বাস্থের জন্য উক্ত নীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসহায়ক প্রশিক্ষিত পেশাজীবি কর্মী-বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যতিত স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ মানসম্পর্ন্ন হতে পারে না। আর মানসম্পন্ন পেশাজীবি কর্মী-বাহিনী গড়ে তুলতে হলে অবশ্যয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[৬২৬] শু'আয়েব (রা.) এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে (অন্যের) চিকিৎসা করে, অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান আছে বলে ইতিপূর্বে জানা যায়নি তাহলে মন্দ কিছু হলে সেই দায়ী হবে।[৬২৭]

মূলনীতি - ১৩

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উদ্ভাবনী প্রয়োগ এবং ই-হেল্থ ও টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।[৬২৮] আধুনিক যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান যুগে জরুরী প্রয়োজনে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা গ্রহণ সহজ হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জনগণ এক দেশে থেকে অন্য দেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা করতে পারছে। ইসলাম সবসময় ভালো কাজের সমর্থন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّـهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

---

[৬২২]. আল-কুরআন ২৪ : ৩

[৬২৩]. আল-কুরআন ২৪ : ৩০

[৬২৪]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুশাইন, cÖv¸³, পৃ. ৫৩

[৬২৫]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৬২৬] আল-কুরআন ১৭ : ৩৬

[৬২৭]. ইমাম ইব্ন মাজাহ, cÖv¸³, অনুচ্ছেদ চিকিৎসা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা করা, হাদীস নং ৩৪৬৬

[৬২৮]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।[৬২৯]

অতএব, সময়োপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উদ্ভাবনী প্রয়োগ এবং ই-হেল্থ ও টেলি মেডিসিনের যথাযত প্রয়োগের মাধ্যমে এর সুফল কাজে লাগাতে হবে।

মূলনীতি - ১৪

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ (Essential Drugs) এর তালিকা হালনাগাদ করা ও সর্বত্র সেগুলোর যথাযথ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। দেশীয় ওষুধ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৬৩০] ইসলাম মানব কল্যাণে এ সকল কাজকে সমর্থন করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দরিদ্রের জন্য কী করে ওষুধপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার প্রচেষ্টা হিসেবে ২২৫টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের (Essential Drugs/Medicine) ওষুধের তালিকা প্রস্তুত করে। ১৯৭৭ সালে প্রথম এই অত্যাবশকীয় ওষুধের তালিকা প্রকাশিত হলেও বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের বাধার কারণে তা কার্যকরী করা যায়নি।[৬৩১] ১৯৮২ সালে এক আন্তর্জাতিক সভায় পুনরায় অধিকাংশ সরকার প্রধানগণ ভোটাভুটির মাধ্যমে এই তালিকা কার্যকরী করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। WTO (World Trade Organization) এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেন। বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা বিশেষ করে MSF(Medicines Sans Frontieres) ভোক্তা স্বার্থ রক্ষার্থে উচ্চকণ্ঠ হল। ২০০১ সালে WTO এর সদস্যদের এক সভা কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মন্ত্রীপর্যায়ের সভায় Declaration on the TRIPS (Trade Relared Aspects of Intellectual Proerty Rights) Agreement and Public Health, পরবর্তীতে যা দোহা ঘোষণা নামে সমধিক পরিচিত, গৃহীত হয়। এই ঘোষণা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে, ওষুধের সহজলভ্যতাকে বাণিজ্যিক স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়া হবে। দোহা ঘোষণার নিম্নোক্ত ৪ ও ৬ অনুচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য যেখানে বলা হয়েছে–"We Agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent members from taking measures to prevent public health. Accordingly, while reiterating out commitment to the TRIPS Agreement, we affirm that Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supporive of WTO Member's right to protect public health and, in paricular, to promote access to medicines for all."

And "paragraph 6" instructed the TRIPS council to find an expeditious solution by the end 2002 so that countries without drug production capacity could make use of compulsory licencens to import generics when necessary.

যদিও অনেক আশা নিয়ে দোহা ঘোষণা গৃহীত হয় যাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ দরিদ্রদের নাগালের মধ্যে আসার কথা কিন্তু বাস্তবে ছিল এক কঠিন বিরোধিতা। শক্তিধর রাষ্ট্ররা যেমন আমেরিকা, ইউরোপিয়ান

---

[৬২৯]. আল-কুরআন ৮ : ২২

[৬৩০]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৬৩১]. TI Report 2006

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, জার্মান TRIPS Council সভায় এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা এমন সব অনুচ্ছেদ, ব্যাখ্যা, শর্ত উপস্থাপন করেন যাতে মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়। Medicines Sans Frontiers ২০০৩ সালে Avmboe 5g WTO Ministerial Conference এর জন্য যে Briefing Paper তৈরি করেন তাতে উল্লেখ করা হয়– "The US has been pursuing a number of regional or bilateral trade agreements that would, in effect, weaken or even completely annul the Doha Declaration- by exerting pressure in countries to adopt TRIPS-plus provisions, the US is going back on to word and breaching the commitments it made when it agreed back to the Doha Declaration two years ago." উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ২০০৩ এর প্রথম দিকে Combodia যখন একটি আইন পাশ করল এই মর্মে যে দোহা ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৬ সন পর্যন্ত ওষুধের পেটেন্ট সুরক্ষা রহিত করা হল, যাতে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পেটেন্ট নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে তৈরি বা আমদানী করা যায়। কিন্তু আমেরিকার জোর জবরদস্তি এবং বিভিন্ন শর্ত আরোপ করার ফলে এই আইন পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য ব্যতিক্রমী কিছু দেশের দৃষ্টান্তও আছে যারা বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি ও তাদের দেশগুলির চাপের কাছে নতি স্বীকার করেনি। যেমন ১৯৭৫ হতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ১,৩৯৩টি নতুন ওষুধ নিবন্ধীকৃত হয়, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ১৬টি ওষুধ উষ্ণমন্ডলীয় অসুখের (Tropical Diseases) ও যক্ষ্মার জন্য।[৬৩২] বাংলাদেশ সরকার সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৯৮২ সালে এক যুগান্তকারী ওষুধনীতি ঘোষণা করে যার ফলে সব ধরনের ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ১৯৯৪ সালে ওষুধ কোম্পানির ক্রমাগত বিরোধিতা ও অন্যান্য প্রভাবের কারণে সরকার মাত্র ১১৭টি ওষুধকে নিত্য ব্যবহার্য হিসাবে নির্ধারিত করে অন্য সব ধরনের ওষুধ হতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন। যে ১১৭টি ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারের হাতে আছে, সেগুলোর মধ্যে ১৫-১৬টি ছাড়া বাকি ওষুধগুলি এখন আর কোম্পানিগুলি তৈরি করছে না।[৬৩৩] মূল্য নিয়ন্ত্রনের ফলে এক্ষেত্রে লভ্যাংশ কম, ফলে কোম্পানি এ ধরনের ওষুধ তৈরিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং বেসরকারী ওষুধ কোম্পানিদের অত্যাধিক মুনাফার অভিঘাত প্রতিরোধে সরকার অনেক পূর্বেই এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানি নামে দুইটি ওষুধ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দুইটি কারখানার একটি বগুড়ায় অন্যটি টঙ্গীতে। বগুড়ার কারখানাটি CGMP (Current Good Manufacturing Practices) প্রযুক্তিতে উন্নীত। মূলতঃ হাসপাতালে সরবরাহ করা হয় এমন ১৮ ধরনের ওষুধ এই কারখানাগুলিতে তৈরি করা হয়। যদিও প্রয়োজনীয় সব ওষুধই এখানে তৈরি করা অত্যাবশ্যক।

মূলনীতি - ১৫

দুর্যোগ কবলিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের শিকার জনগণের কাছে জরুরী ত্রাণ হিসাবে স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা।[৬৩৪] প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতি এবং যথাযথ ব্যবস্থ্যাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অর্জন করেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন, লবণাক্ততা এবং খরা, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক

---

[৬৩২]. মজনু-নুল হক, cÖv¸³, c. 97-98

[৬৩৩]. mvßvwnK 2000, ২২ এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.

[৬৩৪]. RvZxq ¯v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

পদক্ষেপসমূহকে বাধাগ্রস্ত করেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর নতুন নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা এবং ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।[৬৩৫] জরুরী ত্রাণ হিসাবে স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সমগ্রীসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এ ধরণের আপদকালীন সময়ে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াতে হবে। এছাড়াও বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী এ ধরণের প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রমে স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, এ মন্ত্রাণালয় ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ)সহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের পরিকল্পিত পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।[৬৩৬] আপদকালীন সময়ে জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকারের মাধ্যমে রোগকে অগ্রসর হতে না দেয়া এবং চিকিৎসাকে দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগ না দেয়া। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করেনা, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।[৬৩৭] এ কারনে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

মূলনীতি - ১৬

প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতিসমূহ (যেমন- হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, আয়ুর্বেদীয় ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা।[৬৩৮] প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করা বাংলাদেশ সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ। এর ফলে, অনেক রোগী তাদের পছন্দ মতো সেবা গ্রহণ করতে পারবে। বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি ইউনানি চিকিৎসাসেবার ব্যবহার সম্পর্কে প্রখ্যাত হাকীম জালিনুস বলেন, যবের সমতুল্য আর কোনো খাদ্য সৃষ্টি করা হয়নি। কারণ এ খাদ্য সুস্থ্য-অসুস্থ দুই অবস্থায় কাজ করে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের কারো জ্বর হলে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য 'ডালিয়া' পাকানোর নির্দেশ দিতেন। সে অনুযায়ী তা তৈরি করা হলে তিনি পরিবারের লোকদের বলতেন অসুস্থ রোগীকে পরিবেশন করতে। তিনি বলতেন, এটি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দূঃখ দূর করে, যেমন তোমাদের কোন মহিলা পানি দিয়ে তার চেহারার ময়লা দূর করে থাকে।"[৬৩৯] সে লক্ষ্যে আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিকল্প চিকিৎসা হিসাবে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

---

[৬৩৫]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৬৩৬]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৬৩৭]. আল-কুরআন ১০ : ১০০

[৬৩৮]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৬৩৯]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৪৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ : ইসলামের আলোকে উত্তোরণের উপায়

চ্যালেঞ্জসমূহ[৬৪০]

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য খাতে উন্নতি সত্ত্বেও অনেক চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। সমাজের বিভিন্ন স্তরের জন-গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা এবং তা ভোগের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান। এ সকল বৈষম্য সমষ্টিগতভাবে দেশের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে চাহিদা ও সরবরাহ উভয় ধরণেরই সমস্যা রয়েছে। এহেন অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(১) সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে

ক. দুর্বল ব্যবস্থাপনা
খ. সম্পদের সীমাবদ্ধতা
গ. সেবার দুর্বল গুণগত মান।

ক. দুর্বল ব্যবস্থাপনা

দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাত আন্তর্জাতিক মানের হতে পারেনি। আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যায় এবং গুণগতমানে বিপুল ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে এ দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ অজ্ঞ ও অদক্ষ লোকের স্বাস্থ্যসেবা নিতে বাধ্য হচ্ছে, যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।[৬৪১] দক্ষ মানব সম্পদের সংখ্যা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ নার্স, প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরি, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ নার্স তৈরির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। নিরোগ বা স্বাস্থ্যবান না হলে মানুষের পক্ষে উপার্জনাক্ষম হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার উৎপাদন ও কর্মে সম্পৃক্ত হতে হলে রোগ-ব্যাধিহীন হওয়া দরকার।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত দেশসমূহে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নূতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ হচ্ছে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জটিল রোগসমূহের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা অপ্রতুল যা চিকিৎসা খাতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি, রাষ্ট্রকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হলে সর্বপ্রথম এদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে হবে।

খ. সম্পদের সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে চিকিৎসা বিভাগের সার্বিক উন্নয়নের পথে সম্পদের সীমাবদ্ধতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। চিকিৎসকদের শিক্ষা-গবেষণা ও দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে গড়ে তোলান জন্য বড় ধরনের অর্থ ব্যয় হয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পায় না। দেশে সম্পদ সীমিত, চাহিদা অসীম। এই সীমিত সম্পদের মাধ্যমে অসীম চহিদা

---

৬৪০. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, c. 6-9

৬৪১. cÖv¸³, পৃ. ৮

পূরণ সম্ভব নয়। সম্পদের স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গ. সেবার দূর্বল গুণগত মান

বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান দূর্বল। বিশেষ করে জনসংখ্যা অনুপাতে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা কম হওয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকা এবং বিশেষতঃ দরিদ্র, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সহজে সেবা প্রদানকারীর কাছে পৌছানোর ব্যর্থতা সেবার মানকে আরও দূর্বল করে দিচ্ছে। সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতার অভাব, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, ওষুধ-পত্রের অভাব, সেবা প্রদানের স্থান ও সেবা প্রদানকারীর স্বল্পতা চিকিৎসা খাতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কথায় বলে সুস্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। অসুস্থ্য মানুষ নিজেকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করতে পারে না। এ কারণে জনসাধারণকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও নৈতিক চরিত্র গঠণের মাধ্যমে সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী।

(২) সেবা গ্রহীতার তথা চাহিদার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে

ক. স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সামর্থহীনতা

খ. জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ না করা।

(ক) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সামর্থহীনতা

এদেশে অর্থনৈতিক কারণে এবং দূরবর্তীস্থানে বসবাসসহ বিবিধ কারণে সমাজের দরিদ্র, সামাজিকভাবে বঞ্চিত, অশিক্ষিত, প্রান্তিক, দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, বিশেষতঃ গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং কলকারখানার শ্রমিক সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও কিছু কর্মসূচী তাদের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কিন্তু এটা তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রবেশ করতে পারছে না।[৬৪২] এটি বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

(খ) জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ না করা।

জনগণ এখনও বিভিন্ন ব্যাধি, সমস্যা অপুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। রোগীকে পরামর্শদান (Counselling) আমাদের সমাজে পেশা হিসাবে স্বীকৃত নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। জীবন-যাপন পদ্ধতিকে আরো স্বাস্থ্যসম্মত ও উৎপাদনশীল করার জন্য সামাজিকভাবে শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ না করার কারণে জনসাধারণ নানাবিধ রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে; ফলে, বিষয়টি স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। জনগণ এখনও বিভিন্ন ব্যাধি, অসুবিধা, অপুষ্টি, সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়।

[৬৪২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ:

দুর্বল ব্যবস্থাপনা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সেবার দুর্বল গুণগত মান, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সামর্থহীনতা, জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ না করা এ সকল কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিম্নবর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখিন হচ্ছে:

(ক) মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার

বাংলাদেশে যদিও ক্রম হ্রাসমান তবুও প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত এখনও বেশি। প্রজনন-কালীন রুগ্নতা, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী মৃত্যুই এ উচ্চহারের মূল কারণ। এছাড়া এ উচ্চহারের অন্যান্য প্রধান কারণ হলো: প্রাথমিক এবং মাতৃসেবার অপর্যাপ্ততা, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে অসচেতনতা শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর অপর্যাপ্ততা।

(খ) শিশু মৃত্যুর হার

বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য সকল কার্যাবলীর সফল প্রয়োগ সত্ত্বেও মাতৃমৃত্যুর মত শিশু মৃত্যুর হারের পার্থক্য লক্ষ্যণীয় (শহরের বস্তি, পাহাড়ি এবং উপকূলবর্তী এলাকা, পরিবেশগত সংকটাপন্ন অঞ্চলে তা বেশি)। এর ফলে সরকারি সেবাসমূহ সাধারণ জনগণের নিকট সার্বিকভাবে পৌঁছানো যাচ্ছে না। শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো হলো: নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, পানিতে ডুবে যাওয়া, বিষক্রিয়া এবং আঘাত; এ বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত স্তন্যপান এবং যথাসময়ে তোলা খাবার প্রদানের প্রতিও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

(গ) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা, গোদ রোগ, কৃমি এবং কালাজ্বর, এইচআইভি/এইডসের হুমকি, জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইচআইভি/এইডসের ব্যাপারে যথাযোগ্য নজরদারি, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা, একাধিক ওষুধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মার জন্য কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং কালাজ্বর প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয়ে অগ্রগতি ইত্যাদি উন্নত স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফাইলেরিয়া এবং মাটিবাহিত কৃমি রোগ বিস্তার প্রতিরোধে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

(ঘ) অসংক্রামক রোগসমূহ

বাংলাদেশে গতানুগতিক অসংক্রামক রোগ যেমন- ক্যান্সার, ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোক প্রভৃতির প্রকোপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়া গতানুগতিক নয় এমন রোগ যেমন- মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, সড়ক-রেল-নৌ দুর্ঘটনা, বিভিন্ন ধরণের দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্য-সমূহ, পানিতে ডোবা, পোড়া, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সমস্যা ইত্যাদি বর্তমানে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। বহু সংখ্যক মানুষ আর্সেনিক-দূষিত পানি ব্যবহার করছে এবং ফলশ্রুতিতে আর্সেনিক সংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। শৈশব-কালীন উন্নয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে মেধা উন্নয়নের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

(ঙ) নতুন রোগের আবির্ভাব এবং পুনরাবির্ভাব

দেশে প্রায়ই নতুন রোগ ও স্বাস্থ্য সমস্যার আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব লক্ষণীয় যেমন: এভিয়ান ফ্লু, ডেঙ্গু, নিপা ভাইরাস ইত্যাদি। এ সকল রোগের উপর নজরদারি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথোপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন।

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন

বিশ্বায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে সৃষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত ব্যাধি, শৈত্য ও উষ্ণ প্রবাহ সংক্রান্ত ব্যাধি, পানিবাহিত রোগ, পরজীবীবাহিত রোগ যেমন-ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি এবং পুষ্টি-হীনতা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার ব্যাপারে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ।

(ছ) খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশে পুষ্টি-হীনতা সংক্রান্ত ব্যাধিসমূহ, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের হার কমেছে। আবার লিঙ্গ বৈষম্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে পুষ্টি-হীনতার দরুন কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মের হার বাংরাদেশে ৪৩ শতাংশ এবং স্থান ও আর্থ-সামাজিত অবস্থাভেদে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তস্বল্পতার পরিমাণ ৬০-৮০ শতাংশ।

(জ) নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শহরগুলোতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ও বেসরকারি খাতে উচ্চ মূল্যের দরুন গরিব জনগণ, বিশেষত: বস্তিবাসীরা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন আরো বেশি বস্তি, জনবসতি, দুর্বল বাসস্থান অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং নিম্নমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সৃষ্টি করছে যা জীবনধারণ এবং স্বাস্থ্যের মানকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করছে। দ্রুত বর্ধনশীল দরিদ্র নগরবাসীর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ করা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

(ঝ) গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্যকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কমিউনিটি ক্লিনিক হবে স্বাস্থ্য সেবার প্রাথমিক স্তর। তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক-এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেফারেল ব্যবস্থার উন্নয়ন করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

(ঞ) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ধরণ ও জীবন-যাপন রীতির পরিবর্তন

গত দু'দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ধরণ ও জীবন-যাপন পদ্ধতির বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। বয়স্ক জনসংখ্যা এবং নগরায়ন বৃদ্ধির সাথে বাড়ছে রোগ-ব্যাধি ও মানসিক সমস্যা। জীবনযাত্রার রীতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে, যেমন চর্বিযুক্ত খাবার, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব,

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদন সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা, তামাকের ব্যবহার, মাদক এবং পানীয়ের প্রতি আশক্তি, বেপরোয়া ড্রাইভিং, সহিংসতা ইত্যাদি এগুলো নগর এলাকার চিত্রকে আমল বদলে দিচ্ছে। নগরায়নের ফলে পরিবার কাঠামোতে এবং বসবাস ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে, যা শিশুদের ও বড়দের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছে।

(ট) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের বিপুল ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অজ্ঞ ও অদক্ষ লোকের সেবা নিতে বাধ্য হচ্ছে। দক্ষ মানব সম্পদের সংখ্যা ও বিশেষত: নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা ও মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত দেশসমূহে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নূতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ হচ্ছে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জটিল রোগসমূহের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

(ঠ) গুণগত মান

প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার মান সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অনেকগুলো কারণের মধ্যে সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকা এবং সহজে সেবা প্রদানকারীর কাছে পৌঁছানোর ব্যর্থতা বিশেষত: দরিদ্র, প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। অন্যান্য কারণসমূহ হলো- সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ওষুধ-পত্র ও সেবা প্রদানকারীর স্বল্পতা।

বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এজন্য বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

(ড) কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার এবং এর দক্ষ ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থ্যাপনার প্রধান বাধা হলো কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। কেন্দ্রে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর অধিক নির্ভরশীলতা কিংবা জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে সকল স্তরে না পৌঁছানোর কারণে কার্যকর সিদ্ধান্ত পালন দীর্ঘায়িত হয়।

(ঢ) স্বাস্থ্য-গবেষণা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচি, সেবা প্রদান ও দরিদ্র-বান্ধব স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণয়নে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ ও প্রমাণের ভিত্তিতে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা উত্তম। পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ প্রয়োগধর্মী জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণা ব্যবস্থার অভাবের ফলে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং গবেষণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিঘ্নিত হয়।

(ণ) তথ্য, যোগাযোগ প্রযুক্তি ও রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা উন্নত করার উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার এখনো যথেষ্ট নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য জনশক্তির আগ্রহ ও দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অপ্রতুলতা প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বিরাজ করছে। রোগ তাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ সামর্থ্য সত্ত্বেও নিয়োমিতভাবে করা হয় না। আচরণগত পরিবীক্ষণের কথা খুব কমই চিন্তা করা হয়। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ই-হেল্থ, টেলি-মেডিসিন এবং ই-তথ্যের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এখনও হয়নি।

(ত) সমতা ভিত্তিক সেবা

বাংলাদেশে দরিদ্র, সামাজিকভাবে বঞ্চিত, অশিক্ষিত, প্রান্তিক, দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, বিশেষত: গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকরা সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও কিছু কর্মসূচী তাদের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কিন্তু এটা তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রবেশ করতে পারছে না। কারখানার শ্রমিক, কৃষিখাত, পশুপাখি পালনে নিয়োজিত মানুষ, আদিবাসী, দুর্গম এবং দূরবর্তী এলাকাবাসীদের জন্য এবং নারীদের সমাজিক ও পারিবারিক সমস্যার সমাধানে, সহিংসতার বিরুদ্ধে এবং বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(থ) চিকিৎসা পেশায় নৈতিকতা

বাংলাদেশে যেহেতু প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ, পরিচালন ব্যয় এবং আইনি সহায়তার অভাবে নিয়ন্ত্রক পর্ষদসমূহ যথেষ্ট কার্যকর নয়, তাই চিকিৎসা চর্চা অথবা শিক্ষা এবং গবেষণায় নৈতিকতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতি হয়। এ সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা এবং যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

(দ) জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সংক্রান্ত জ্ঞান

বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে শিক্ষিতের হার ৬০ শতাংশের কম। জনগণ এখনও বিভিন্ন ব্যাধি, সমস্যা অপুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। রোগীকে পরামর্শদান (Counselling) আমাদের সমাজে পেশা হিসাবে স্বীকৃত নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। জীবন-যাপন পদ্ধতিকে আরো স্বাস্থ্যসম্মত ও উৎপাদনশীল করার জন্য সামাজিকভাবে শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ ইসলামের আলোকে উত্তোরণের উপায়

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়ন স্বাস্থ্য খাতে অগ্রগতি সত্ত্বেও অনেক চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা এবং তা ভোগের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান। এ সকল বৈষম্য সমষ্টিগতভাবে দেশে স্বাস্থ্যখাতের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্যতার মধ্যে চাহিদা ও সরবরাহ উভয় ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও রয়েছে। রোগী, চিকিৎসক, নার্স ও রোগ নির্ণয়কেন্দ্র বা হাসপাতালের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে চিকিৎসা ব্যবস্থা। চিকিৎসকের পরামর্শে সুন্দর পরিবেশে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে চলে চিকিৎসা সেবা। দক্ষ চিকিৎসক, কর্তব্যপরায়ণ নার্স ও যোগ্য ফার্মাসিস্টের অভাব, দুর্বল ব্যবস্থাপনা, সেবার দুর্বল গুণগত মান, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, জনগণের

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সামর্থহীনতা, জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ না করা, ওষুধজনীত সমস্যা ইত্যাদি কারণে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ ইসলামের আলোকে উত্তোরণের উপায় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানবজাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসে গেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে (রোগ-ব্যাধি) তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য পথ-নির্দেশনা (হিদায়াত) ও রহমত।[৬৪৩]

(ক) <u>মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার</u>

মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার যদিও ক্রম হ্রাসমান তবুও প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত এখনও বেশি। প্রজনন-কালীন রুগ্নতা, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী মৃত্যুই এ উচ্চ হারের মূল কারণ। এছাড়া এ উচ্চহারের অন্যান্য প্রধান কারণ হলো: প্রাথমিক এবং মাতৃসেবার অপর্যাপ্ততা, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে সচেতনতার অভাব, শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর অপর্যাপ্ততা।[৬৪৪] শুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নবজাতক ও প্রসূতিমৃত্যুর হার হ্রাস করা সম্ভব। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ইসলামের সুমহান নীতি-পদ্ধতি পালনের মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّـهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।[৬৪৫] সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে ২০০১ সালের ৩২২ থেকে কমে ২০১০ সালে ১৯৪ হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে সম্পাদিত সার্ভের ফলাফল অনুযায়ী প্রতি প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণকারীর হার (কমপক্ষে এক বার) ২০০১ সালের ৪৭.৬% থেকে ২০১১ সালে ৬৮% এ উন্নীত হয়েছে, দক্ষ সেবা গ্রহণকারীর সহায়তায় প্রসবের হার ২০০১ সালের ১২% থেকে ২০১১ সালে ৩২% এ উন্নিত হয়েছে, প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণকারীর হার ২০০১ সালের ১০.৬% থেকে ২০১১ সালে ২৭% এ উন্নীত হয়েছে, প্রসব সম্পর্কিত জটিলতার জন্য সেবা গ্রহীতার হার ২০০১ সালের ৫২.৭% থেকে ২০১০ সালে ৬৭.৯% এ উন্নীত হয়েছে এবং জন উর্বরতার হার (TFR) ২০০৭ সালের ২.৭ থেকে কমে ২০১১ সালে ২.৩ হয়েছে।[৬৪৬] মহান আল্লাহ বলেন,

---

৬৪৩. আল-কুরআন ১০ : ৫৭

৬৪৪. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৬৪৫. আল-কুরআন ৩১ : ৩৪

৬৪৬. 2010-2011 I 2011-2012 A_© eQ‡ii Kvh©ewj mš¦wKZ ewlK cwZ‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।[৬৪৭] পবিত্র কুরআনের এসকল জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার মাধ্যমে মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হারকে আরও হ্রাস করা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি।

(খ) <u>শিশু মৃত্যুর হার</u>

বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য সকল কার্যাবলীর সফল প্রয়োগ সত্ত্বেও মাতৃ মৃত্যুর মত শিশু মৃত্যুর হারের পার্থক্য লক্ষ্যণীয় (শহরের বস্তি, পাহাড়ি এবং উপকূলবর্তী এলাকা, পরিবেশগত সংকটাপন্ন অঞ্চলে বেশি পরিলক্ষিত হয়)। এর ফলে সরকারি সেবাগুলো সাধারণ জনগণের নিকট সার্বিকভাবে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো হলো: নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, পানিতে ডুবে যাওয়া, বিষক্রিয়া এবং আঘাত। এ সকল বিষয়সমূহ স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার জন্য এ বিষয়গুলোতে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত স্তন্যপান এবং যথাসময়ে তোলা খাবার প্রদানের প্রতিও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।[৬৪৮] ইসলামের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ পরিচালিত হলে এ ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহজ হবে এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। মানব সৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণ থেকে; আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই তাদের পালনকর্তা আল্লাহকে এই বলে ডাকল যে, তুমি যদি আমাদিগকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব।[৬৪৯]

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে।[৬৫০]

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ

অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।[৬৫১]

---

[৬৪৭]. আল-কুরআন ৪৬ : ১৫

[৬৪৮]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৬৪৯]. আল-কুরআন ৭ : ১৮৯

[৬৫০]. আল-কুরআন ১৩ : ৮

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৬৫২] গর্ভকালীন সময়ে মায়ের সঠিক চিকিৎসা করা, শিশুকে সঠিকভাবে ভূমিষ্ঠ হতে সহায়তা করা এবং জন্মের পর শিশুদেরকে সঠিকভাবে লালন-পালন করা ইসলামের নির্দেশনা। শিশুদের স্বাস্থের যত্ন নেওয়া এবং তাদের রোগ-ব্যাধিতে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রতিটি মানুষেরই দায়িত্ব। লিঙ্গ ভেদে শিশুর যত্নে তারতম্য ঘটানো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ

স্বীয় সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই।[৬৫৩]
অতএব, গর্ভকালীন সময়ে মায়ের সঠিক পরিচর্চা করা, পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রতিটি অভিভাবকেরই কর্তব্য। এ কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হবে।

(গ) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের কতিপয় অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা, গোদ রোগ, কৃমি এবং কালাজ্বর, এইচআইভি/এইডসের হুমকি, জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইচআইভি/এইডসের ব্যাপারে যথাযোগ্য নজরদারি, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা, একাধিক ওষুধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মার জন্য কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং কালাজ্বর প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয়ে অগ্রগতি ইত্যাদি উন্নত স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফাইলেরিয়া এবং মাটিবাহিত কৃমি রোগ বিস্তার প্রতিরোধে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।[৬৫৪] এ সকল বিষয়সমূহ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে বড় বাধা সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ইসলামী রীতি-পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরবী ইবনে মাজাহ কিতাবের অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (২০০২) অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোগ সংক্রমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।"[৬৫৫] অপরদিকে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসেও নবীজির একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে। "রোগ সংক্রমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কোনো উট চর্মরোগে আক্রান্ত হলে অন্য উট তার সংস্পর্শে এসে চর্ম রোগাক্রান্ত হয়। তখন তিনি বললেন, এটা তাক্‌দীর! তা না হলে প্রথম উটটিকে কে চর্ম রোগাক্রান্ত করেছে?"[৬৫৬]

[৬৫১]. আল-কুরআন ৩২ : ৮
[৬৫২]. আল-কুরআন ৩২ : ৯
[৬৫৩]. আল-কুরআন ৬ : ১৫১
[৬৫৪]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭
[৬৫৫]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৫৩৯
[৬৫৬]. cÖv¸³, হাদীস নং ৩৫৪০

উপরোক্ত সবগুলো রেওয়াতের ভাষ্য হচ্ছে রোগ সংক্রমণের কোন বাস্তবতা, অস্তিত্ব বা সত্যতা নেই। তবে অসূস্থ উটগুলোকে সুস্থ্য উট থেকে দুরে রাখতে হবে। কারণ জীবাণু সংক্রমিত হওয়া অনেক সময় রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৬৫৭] যেমন অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী হয়। মহান আল্লাহ মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, মানুষকে ক্ষতিকর বস্তু থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। সঠিকভাবে জীবন-যাপন করা মানুষের বুদ্ধিরই পরিচায়ক। কিন্তু মানুষ যদি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক বিধাণাবলী সঠিকভাবে মেনে না চলে তাহলে তার জীবনীশক্তি ক্রমান্বয়ে দূর্বল হতে থাকে। জীবনীশক্তি দূর্বল হলে রোগ প্রতিরোধ শক্তিও দূর্বল হয়ে পড়ে। দূর্বল জীবনীশক্তি খুব সহজেই রোগা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। ফলে, যে কোন প্রাণীই খুব সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তার নিকটে যদি কোন রোগাক্রান্ত প্রাণী বা রোগ-জীবাণু অবস্থান করে তাহলে সে খুব সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। বস্তুত একেই আমরা ছোঁয়াচে রোগ বলি। একই পরিবেশে বসবাস করে জীবনীশক্তি সবল প্রাণী ছোঁয়াচে রোগে আক্রন্ত হয় না। রোগাক্রান্ত হওয়ার জন্য দুর্বল জীবণীশক্তি দায়ী। ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন-যাপন না করা এর মূল কারণ। অতএব, ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন-যাপনের মাধ্যমে সংক্রামক ব্যাধি হতে রক্ষা পেতে পারি।

(ঘ) অসংক্রামক রোগসমূহ

বাংলাদেশে গতানুগতিক অসংক্রামক রোগ যেমন- ক্যান্সার, ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোক প্রভৃতির প্রকোপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়া গতানুগতিক নয় এমন রোগ যেমন-মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, সড়ক-রেল-নৌ দুর্ঘটনা, বিভিন্ন ধরণের দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যতা, পানিতে ডোবা, পোড়া, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সমস্যা ইত্যাদি বর্তমানে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। বহু সংখ্যক মানুষ আর্সেনিক-দূষিত পানি ব্যবহার করছে এবং ফলশ্রুতিতে আর্সেনিক সংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে।[৬৫৮] মহান আল্লাহ জীবন-যাপনের জন্য সঠিক নিয়ম প্রণয়ন করেছেন। রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি সৃষ্টির সকল জীবকে বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাতে বলেছেন। তদুপরি সড়ক দূর্ঘটনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রোগ-ব্যাধিসহ বিভিন্নভাবে মানুষ মৃত্যুবরণ করবে এটাও স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ

বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে।[৬৫৯] এছাড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঠিক তদারকির মাধ্যমে সড়ক দূর্ঘটনা বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে অনেক লোকের মৃত্যু হয় এবং অনেকে আহত হয়। সমাজে শান্তি আনায়নের মাধ্যমে সকল প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামার পথ রোধ করতে হবে। ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন, অসংক্রামক রোগ-ব্যধি থেকে মুক্ত থাকার একমাত্র উপায়।

(ঙ) নতুন রোগের আবির্ভাব এবং পুনরাবির্ভাব

দেশে প্রায়ই নতুন রোগের আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব লক্ষণীয় যেমনঃ এভিয়ান ফ্লু, ডেঙ্গু, নিপা ভাইরাস ইত্যাদি। এ সকল রোগের উপর নজরদারি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথোপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। পবিত্রতা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অনেক ঊর্ধ্বে। কাজেই যার কাপড়, দেহ ও স্থান

---

[৬৫৭]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ-৬৫-৬৬

[৬৫৮]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৬৫৯]. আল-কুরআন ৬২ : ৮

পবিত্র তার কাপড়, দেহ ও স্থান পরিচ্ছন্নও বটে। দেহের পবিত্রতায় মলমূত্র ত্যাগের পর শৌচকার্য সম্পন্নের পরই উযু-গোসল করতে হয়। শরীর, ঘর-বাড়ি, বাড়ির অঙ্গিনা, পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[৬৬০]

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন

বিশ্বায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত ব্যাধি, শৈত্য ও উষ্ণ প্রবাহ সংক্রান্ত ব্যাধি, পানিবাহিত রোগ, পরজীবিবাহিত রোগ যেমন- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি এবং পুষ্টি-হীনতা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার ব্যাপারে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ।[৬৬১] সঠিকভাবে মহান আল্লাহর এবাদত পালন এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পথে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৬৬২] দেশে প্রায়ই নতুন রোগ ও স্বাস্থ্য সমস্যার আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব ও লক্ষণীয় যেমনঃ এভিয়ান ফ্লু, ডেঙ্গু, নিপা ভাইরাস ইত্যাদি। এ সকল রোগের উপর নজরদারি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থ্যা যথোপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে জীববৈচিত্র বিলুপ্ত হচ্ছে, নতুন নতুন বিভিন্ন রোগের উদ্ভব হওয়ায় মানুষও ক্রমাগত হুমকির মুখে পড়ছে। কিন্তু এ বিষয়ে কেউ সচেতন হচ্ছে না।[৬৬৩] পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ

এবং নিদর্শন রয়েছে আদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু।[৬৬৪]

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ

তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন।[৬৬৫]

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্জাবায়ু দ্বারা।[৬৬৬]

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ

আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্জাবায়ু এক চিরাচারিত অশুভ দিনে।[৬৬৭]

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

(অতঃপর) তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[৬৬৮]

---

[৬৬০]. সহিহ মুসলিম, Cv¸ ³, অধ্যায় পাক-পবিত্রতা, হাদিস নং ৪২৭

[৬৬১]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৬৬২]. আল-কুরআন ৩০ : ৪১

[৬৬৩]. http://*www.jugantor.com*/news/2016/06/15

[৬৬৪]. আল-কুরআন ৫১ : ৪১

[৬৬৫]. আল-কুরআন ৫৩ : ৫০

[৬৬৬]. আল-কুরআন ৬৯ : ৬

[৬৬৭]. আল-কুরআন ৫৪ : ১৯

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

তার পালনকর্তার আদেশে সে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি।[৬৬৯]

وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا

আমি ধ্বংস করেছি আদ ও সামুদদের এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে।[৬৭০]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রর্থনা কর। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের জন্য তা কঠিন নয়।[৬৭১]

(ছ) খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশে পুষ্টি-হীনতা সংক্রান্ত ব্যাধিসমূহ, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের হার কমেছে। আবার লিঙ্গ বৈষম্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে পুষ্টি-হীনতার দরুন কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মের হার বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশ এবং স্থান ও আর্থ-সামাজিত অবস্থাভেদে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তস্বল্পতার পরিমাণ ৬০-৮০ শতাংশ।[৬৭২] সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পুষ্টিহীনতা বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। একমাত্র ইসলামী জীবন-বিধানের মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব। মানুষের মঙ্গলের জন্য মহান আল্লাহ খাদ্য-দ্রব্যের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।[৬৭৩] মহান আল্লাহ আরও বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কন্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ তা ব্যতিত। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহর কাজ।[৬৭৪]

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

---

৬৬৮. আল-কুরআন ৪৬ : ২৪

৬৬৯. আল-কুরআন ৪৬ : ২৫

৬৭০. আল-কুরআন ২৫ : ৩৮

৬৭১. আল-কুরআন ২ : ৪৫)

৬৭২. RvZxq ¯^v¯’bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৬৭৩. আল-কুরআন ৮০ : ২৪

৬৭৪. আল-কুরআন ৫ : ৩

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন, তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।[৬৭৫] মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

দু'টি সমুদ্র সমান হয় না। একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য অলংকার আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৬৭৬]

اللَّـهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

আল্লাহ তোমাদের জন্যে চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোনটিকে ভক্ষণ কর।[৬৭৭] যমিনে খাদ্য ও পুষ্টি তৈরি এবং চাষাবাদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এ গুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে।[৬৭৮]

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

আমি তাতে সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং সেখানে প্রবাহিত করি ঝর্ণাধারা।[৬৭৯]

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ

এবং দন্ডায়মান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর।[৬৮০]

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ

সেখানে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ।[৬৮১]

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সংক্রান্ত এমডিজি ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সংক্রান্ত সেক্টর কর্মসূচি এইচপিএনএসডিপি যথাসময়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা এবং

[৬৭৫]. আল-কুরআন ৫ : ৪
[৬৭৬]. আল-কুরআন ৩৫ : ১২
[৬৭৭]. আল-কুরআন ৪০ : ৭৯
[৬৭৮]. আল-কুরআন ৬ : ৯৯
[৬৭৯]. আল-কুরআন ৩৬ : ৩৪
[৬৮০]. আল-কুরআন ৫০ : ১০
[৬৮১]. আল-কুরআন ৫৫ : ১১

এইচপিএনএসডিপি’র বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংয়ের জন্য গঠিত প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিএমএমইউ)-কে পূর্নাঙ্গরূপে কার্যকর করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।[৬৮২] বর্তমান স্বাস্থ্য খাতে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনসাধারণকে বর্ধিত চাহিদা মোতাবেক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্য খাতে সমারোহ বৃদ্ধি করা এবং দেশের আপামর জনসাধারণ বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ঝুকি হ্রাস করে সাশ্রয়ীমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বরাদ্দকৃত সীমিত সম্পদের সফল বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে অধিকতর সুফল লাভের জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজ করা প্রয়োজন। বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ ইসলামের আলোকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। ফলে, গ্রামীণ দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের দোরগোড়ায় মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সাথে একটি কার্যকরী রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

মহান আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য আসমান ও যমিনের সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জীবন ধারণের ব্যবস্থা ও মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তার খাবার কিভাবে উৎপন্ন হবে, পুষ্টিগুণ কোথা থেকে পাবে এ সকল তথ্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তদ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে।[৬৮৩]

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ

এবং যমিনে বিভিন্ন শস্য ক্ষেত্র রয়েছে-একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙ্গুরের বাগান আছে আর শস্য ও খেজুরের বাগান রয়েছে-একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত।[৬৮৪] স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১- ২০১৬ মেয়াদে ৫৬,৯৯৩.৫৪ (ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত তিরানব্বই) কোটি টাকা ব্যয় প্রস্তাব সম্বলিত Health Population & Nutrition Sector Development (HPNSD) শীর্ষক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায় করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো জনগণ বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধা বঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্যে তিনস্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে

---

[৬৮২]. 2010-2011 I 2011-2012 A_ eQ‡ii Kvhvewj m¤úwKZ ewlK cwZ‡e‘b, প্রাগুক্ত, পৃ. iii

[৬৮৩]. আল-কুরআন ৩৯ : ২১

[৬৮৪]. আল-কুরআন ১৩ : ৪

তুলতে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।[৬৮৫]

(জ) নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শহরগুলোতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ও বেসরকারি খাতে উচ্চ মূল্যের দরুন গরিব জনগণ, বিশেষত: বস্তিবাসীরা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন আরও বেশি বস্তি, জনবসতি, দুর্বল বাসস্থান অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং নিম্নমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সৃষ্টি করছে যা জীবনধারণ এবং স্বাস্থ্যের মানকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করছে। দ্রুত বর্ধনশীল দরিদ্র নগরবাসীর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ করা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়েছে।[৬৮৬] শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকার বস্তি, ভাসমান ও দরিদ্রজনগোষ্ঠীর পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা। বিশেষ করে শহরে গ্রহীতামুখী সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা প্রয়োজন। নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইসলামের আলোকে পরিচালিত হলে স্বাস্থ্যসেবায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো টাউন প্লানার বা road expert ছিলেন না। তবুও তাঁর মুখ থেকে আমরা রাস্তার প্রশস্ততা সম্পর্কিত নির্দেশনা পাই। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা কোন রাস্তার ব্যাপারে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে তখন তোমরা রাস্তা বা গলি সাত হাত প্রশস্ত রাখো।"[৬৮৭] ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, "তোমরা রাস্তার প্রস্থ নিয়ে মতানৈক্য করলে তা সাত হাত চওড়া করো।"[৬৮৮] যদিও ঐ সময়ে গাড়ি, বাস, ট্রাক ছিলো না, তথাপিও তিনি রাস্তা বা গলি প্রশস্ত বরাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং রাস্তার প্রশস্থতা সাত হাত করতে বলেছেন। কোনো রাস্তা বা গলির প্রশস্থতা যদি সাত হাত হয় তাহলে সহজেই এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিসসহ সব রকম যানবাহন প্রবেশ করতে পারে। অতএব, আমাদের কোন রাস্তাই সাত হাতের কম হওয়া উচিত নয়। তাহলে যেমন একদিকে প্রয়োজনীয় সময়ে সহজেই সেবা পাওয়া সম্ভব তেমনি হাদীসের নির্দেশনাও পালন হবে। প্রতিটি মানুষেরই একটি নির্ধারিত নিয়ম-কানুনের মধ্য থেকে জীবন-যাপন করতে হয়। যখনই তার ব্যতিক্রম ঘটে তখনি বিভিন্ন ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব, তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহবান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই আছেন।[৬৮৯] জীবনের প্রয়োজনে পানি প্রয়োজন। শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পর্যপ্ত পরিমাণ পানির প্রয়োজন। পানি বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

---

৬৮৫. ewlK cwZ‡e'b (2010-2011 I 2011-2012), প্রাগুক্ত, পৃ. iii

৬৮৬. RvZxq ¯v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৬৮৭. Ave 'vD', প্রাগুক্ত, অধ্যায় বিচার, হাদীস নং ৩৫৯৪

৬৮৮. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় বিচার ও বিধান, হাদীস নং ২৩৩৯

৬৮৯. আল-কুরআন ২২ : ৬৭

তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষদর্শী, সর্ববিষয়ে খবরদার।[৬৯০]

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত অতঃপর আমি যমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম।[৬৯১] অতএব, ইসলাম নির্দেশিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মেনে চললে নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন করা সম্ভব।

(ঝ) <u>গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা</u>

বাংলাদেশে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যথেষ্ট দূর্বল যা সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সরকারের পরিকল্পনার রয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্যকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কমিউনিটি ক্লিনিক হবে স্বাস্থ্য সেবার প্রাথমিক স্তর। তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক-এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেফারেল ব্যবস্থার উন্নয়ন করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।[৬৯২] গ্রামীণ স্বাস্থ্য সুবিধা শহরের তুলনায় কম। সেখানে স্বাস্থ্য সচেতনতাও কম। গ্রামের জীবন-ধারা অতি-প্রাকৃতিক। সেখানে রোগ-ব্যাধির প্রকোপও কম। গ্রামের মানুষ প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে মিশে রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত আলো, বাতাস, শাক-সবজী এ সকল নেয়ামতের সঠিকভাবে ব্যবহারের কারনে গ্রামের লোকেদের রোগ-ব্যাধি কম হয়। এ সকল নেয়ামত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয় আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।[৬৯৩]

মলমূত্র ত্যাগ করা সকল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রাকৃতিক বিধান। মলমূত্র ত্যাগের স্থান সম্পর্কে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা দুটো বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থেকো, যা আল্লাহর অভিসম্পাতের কারণ স্বরূপ। উপস্থিত সাহাবীরা বরে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! সে দুটো জিনিস কি? যা অভিসম্পাতের কারণ? তিনি উত্তর দেন, জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় এবং ছায়াপ্রদানকারী গাছের নিচে যেখানে লোকজন বিশ্রাম গ্রহণ করে ও আশ্রয় নেয়, সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা।"[৬৯৪] আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউই বদ্ধ পানিতে

৬৯০. আল-কুরআন ২২ : ৬৩

৬৯১. আল-কুরআন ২৩ : ১৮

৬৯২. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৬৯৩. আল-কুরআন ২ : ১৬৪

৬৯৪. mnxn gmwjg, প্রাগুক্ত, অধ্যায় পবিত্রতা, হাদীস নং ৫১১

প্রস্রাব করবেনা, যে পানি প্রবাহিত হয়না এবং পরে সে পানিতে গোসল করা উচিত নয়।"[৬৯৫] সঠিক স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা যেমন বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করে তেমনি উত্তমরূপে শৌচকার্য করা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি ও পবিত্র লাভের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।[৬৯৬] সঠিক স্থানে মলমূত্র ত্যাগ ও শৌচকার্যের উত্তম পদ্ধতি না জানার কারণে গ্রামের সাধারণ জনগণ নানা ধরণের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। কোন স্বাস্থ্য সচেতন লোক নিজের মলমূত্র নিজহাতে স্পর্শ করেনা। এটি রুচি বিরোধী ও অত্যান্ত অপবিত্র কাজ। এটি স্বাস্থ্যসম্মতও নয়। কারণ মলমূত্র থেকে অনেক জীবাণু হাতের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সংক্রমিত হতে পারে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সম্পর্কিত সুন্নাতগুলো পুরোপুরি আধুনিক ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইস্তিনজা করার সময় ডানহাত ব্যবহার করবেনা এবং কোনো বরতন বা পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করবেনা।"[৬৯৭] হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবার লোকদের বললেন, মহান আল্লাহ তোমাদের পবিত্রতার খুবই প্রশংসা করেছেন। তিনি কুবার রোকদের নিকট জানতে চান এর রহস্য কি? তারা উত্তর দিলেন, আমরা ঢিলা ও পানি উভয়টি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করি।"[৬৯৮] "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইস্তিনজার পর পবিত্রতা লাভের জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের আগে ঢিলা ব্যবহার করবে।"[৬৯৯] অতএব, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইসলামের আলোকে পরিচালিত হলে স্বাস্থ্যসেবায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব।

(ঞ) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ধরণ ও জীবন-যাপন রীতির পরিবর্তন

গত দু'দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ধরণ ও জীবন-যাপন পদ্ধতির বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। বয়স্ক জনসংখ্যা এবং নগরায়ন বৃদ্ধির সাথে বাড়ছে রোগ-ব্যাধি ও মানসিক সমস্যা। জীবন-যাত্রার রীতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে, যেমন চর্বিযুক্ত খাবার, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, বিনোদন সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা, তামাকের ব্যবহার, মাদক এবং পানীয়ের প্রতি আশক্তি, বেপরোয়া ড্রাইভিং, সহিংসতা ইত্যাদি এগুলো নগর এলাকার চিত্রকে আমল বদলে দিচ্ছে। নগরায়নের ফলে পরিবার কাঠামোতে এবং বসবাস ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে, শিশুদের ও বড়দের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছে;[৭০০] যা স্বাস্থ্য নীতি **২০১১** বাস্তবায়নের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। মহান আল্লাহ বলেন,

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব, তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহবান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই আছেন।[৭০১] মহান আল্লাহ মানুষের জীবন-যাপন ও

---

৬৯৫. mnxn Avj eLvix, প্রাগুক্ত, অধ্যায় অজু, হাদীস নং ২৩২
৬৯৬. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cv¸³, পৃ-৮৬
৬৯৭. Ave ‘vD‘, প্রাগুক্ত, অধ্যায় পবিত্রতা, হাদীস নং ৭
৬৯৮. cv¸³, অধ্যায় পবিত্রতা, হাদীস নং ৪৪
৬৯৯. Avb-bvmvC, প্রাগুক্ত, অধ্যায় পবিত্রতা, হাদীস নং ৪৪, ৪৫
৭০০. RvZxq ¯v¯’bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৭০১. আল-কুরআন ২২ : ৬৭

এবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথই জীবন-যাপন রীতির_সঠিক পথ। এখন থেকে এ সকল বিষয়ে সচেতন হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্ধারিত রীতি-নীতি ও পদ্ধতি পালনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, স্বাস্থ্য সম্মত খাবার গ্রহণ, সুস্থতার প্রয়োজনে ফাস্টফুডসহ সকল প্রকার ক্ষতিকর খাবার বর্জন, পরিমিত আহার ও নিয়োমিত ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ জীবন তথা সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

এছাড়াও যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঠিক তদারকির মাধ্যমে সড়ক, নৌ, রেল দূর্ঘটনা বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে অনেক লোকের মৃত্যু হয় এবং অনেকে আহত হয়। সমাজে শান্তি আনায়নের মাধ্যমে সকল প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামার পথ রোধ করতে হবে। ইসলামী বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে এদেশের সামাজিক পরিবেশ এমনি ভাবে গড়ে তুলতে হবে যা বিশ্ববাসীর নিকট অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারে।

(ট) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান দূর্বল। বিশেষ করে জনসংখ্যা অনুপাতে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা কম হওয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ সকল বিষয়ের জন্য দূর্বল ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে দায়ী। আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের বিপুল ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে জনসংখ্যার বিরাট অংশ অজ্ঞ ও অদক্ষ লোকের স্বাস্থ্যসেবা নিতে বাধ্য হচ্ছে, যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।[৭০২] দক্ষ মানব সম্পদের সংখ্যা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ নার্স, প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরি, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ নার্স তৈরির জন্য পর্যপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়নে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো শিক্ষা। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীই হলো শিক্ষা তথা জ্ঞান সম্পর্কিত। মহান আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

"পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পড়ুন এবং আপনার প্রতিপালক অতিব সম্মানিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা, যা সে জানত না।"[৭০৩] শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের নীতি হলো- শিক্ষা সকল মুসলিমের উপর ফরয। মহানবী (সা.) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) উপর অত্যাবশ্যক।"[৭০৪]

নিরোগ বা স্বাস্থ্যবান না হলে মানুষের পক্ষে উপার্জনাক্ষম হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার উৎপাদন ও কর্মে সম্পৃক্ত হতে হলে রোগ ব্যাধিহীন হওয়া দরকার। এ কারণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানব স্বাস্থ্য উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সাধারণ নীতিমালা ঘোষণা করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

[৭০২]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[৭০৩]. আল-কুরআন ৯৬ : ১-৫

[৭০৪]. ইবনে মাজা, Cv¸ 3 , কিতাবুল মুকাদ্দিমাহ, অধ্যায়: ১৭

"তোমরা খাও এবং পান কর; তবে অপচয় করো না।"[৭০৫] নৈতিক উন্নয়ন ছাড়া যে কোন উন্নয়নই ব্যর্থতায় পর্যবষিত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ্ববাসীকে নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বাণী, 'আমি প্রেরিত হয়েছি সুমহান নৈতিক গুণাবলীর পূর্ণতা সাধনের জন্য'।[৭০৬] উন্নত মানব সম্পদ গঠনের লক্ষে মহানবী (সা.)কে উন্নত চরিত্রের মডেল হিসাবে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে মানুষের চরিত্র গঠনের জন্য। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর ঘোষণা,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমাদের রাসূলের মধ্যে।[৭০৭] মূলত তিনি মানুষকে উন্নত নৈতিকতা শিক্ষাদানের শিক্ষক হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, 'আমি তোমাদের মধ্যে শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।[৭০৮] মানুষকে তার নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে ইসলামের যে জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনে অত্যাবশ্যক তা অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয। জ্ঞানগত ফরয পালনে জনসাধারণের পেশাগত দক্ষতা ও মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত দেশসমূহে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নূতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ হচ্ছে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জটিল রোগসমূহের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা অপ্রতুল যা চিকিৎসাখাতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি, রাষ্ট্রকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত, জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হলে সর্বপ্রথম এদেশের জনগণকে উন্নত মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। মানব উন্নয়ন মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ অর্থাৎ উৎপাদন কর্মে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে মানুষের কারিগরী দক্ষতা বা ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধিকরণ।[৭০৯] It is about creating an environment in which people can develop their full potential and lead productive, creative lives in accord with their needs and interests.[710] The most basic capabilities for human development are to lead long and healthly lives, to be knowledgeable, to have access to the resources needed for a decent standard of living and to be able to participate in the community.[711] মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব গোষ্ঠীর সুপ্ত প্রতিভা, প্রচ্ছন্ন শক্তি, লুকায়িত সামর্থ্য, অন্তর্নিহিত কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা ও মেধাকে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার উপযোগী করার উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র তৈরী করা হয়। It is a process of opportunities for education, healthcare, income, employment and covering the full range of mankind from sound physical environment to

---

[৭০৫]. আল-কুরআন ৭ : ৩১

[৭০৬]. ইমাম মালেক ইবনু আনাস, মুয়াত্তা, C\/¸ 3, অধ্যায় কিতাবুল হুসনিল খুলক, হাদীস নং ০৮

[৭০৭]. আল-কুরআন ৩৩ : ২১

[৭০৮]. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজা, mb\/b Be‡b g\/R\/, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ.১২০

[709]. *Budapest Statement on Human Resource Development in Changing World*, New York, UNDP, 1987.

[710]. *Human Development Report 2001*, UNDP, New York, 2001.

[711]. *Human Development Past, Present and Future, Human Development Report 2001*, UNDP, New York, 2001.

economic and political freedom.[712] মানব সম্পদ উন্নয়নের চুড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে মানব কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানব কল্যাণের জন্য মানব স্বাস্থ্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র স্বাস্থ্যবান জাতি সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। Thus good health has its contribution both to human well being and in economic performance.[713] মানব উন্নয়নে স্বাস্থ্য সেক্টরে সেবার মান, জীবনের গড় আয়ু, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যাবহারের প্রাপ্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেছেন, Mortality as the criteria for judging development success and failure of nations. বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ইসলামের আলোকে বাস্তবায়ন করতে হলে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টসহ দেশের আপময় জনসাধারণকে মানব সম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসহ সামগ্রীক উন্নয়ন করা সম্ভব। ইসলামী আদর্শের মূল কথা হলো মানুষ ও মানুষের উন্নয়ন। একজন মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত, নৈতিক গুণসম্পন্ন, কর্মক্ষম, কর্মদক্ষ ও উন্নত করে গড়ে তোলার মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তরের সার্বিক শিক্ষা রয়েছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায়। কেননা, মানুষকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রে নানামুখি সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যহত হয়। শিক্ষা, নৈতিক চরিত্র, সুস্বাস্থ্য, কাজের মর্যাদা ও কর্মপ্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা যায়। বিশ্বমানবের জন্য একটি সর্বজনীন কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা হিসেবে স্বাস্থ্যখাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি কুরআন মাজীদে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে পরম কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও সৌন্দয্য দান কর এবং পরকালেও পরম কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও সৌন্দয্য দান কর। আর জাহান্নামের আগুন হতে আমাদের বাঁচাও"।[৭১৪] ইসলামী নীতি ও শিক্ষা মেনে চললে জনসংখ্যা অনুপাতে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য সকল পর্যায়ের একাডেমিক ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব।[৭১৫]

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নূতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হচ্ছে ও উন্নত দেশসমূহে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জটিল রোগসমূহের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা দরকার। স্বাস্থ্য খাতে ব্যাবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়ের উপর চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যখাতে নিয়োজিত অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ থেকে জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ সুফল অর্জনের লক্ষ্যে সর্বস্তরের জন্য ইসলামী নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী একটি সঠিক ও চাহিদাভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট,

[৭১২]. মোহাম্মদ রফিকুল এমরান, gvbe m¤ú' Dbqb : †cÖÿ Z agxq †bZv‡'i m¤ú³KiY, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি.

[৭১৩]. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, gvbe m¤ú' Dbqb : †cÖÿ ‡Z Bmjvg, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ১১

[৭১৪]. আল-কুরআন ২ : ২০১

[৭১৫]. evsjv‡'k RbmsL¨v bxwZ-2012, প্রগুক্ত, পৃ. ৯

ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্টসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মীর সল্পতা ও অসম বন্টন ব্যবস্থা, দক্ষতা সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভারসাম্যহিনতা, ন্যায়বিচার ও প্রণোদনার অভাব দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। চাহিদা যাচাই করে অতিরিক্ত জনশক্তি (ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, প্যারামেডিক প্রভৃতি) তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য জনশক্তির সকল স্তরে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির স্বচ্ছ নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, প্যারামেডিক ও টেকনোলজিস্টদের শিক্ষা, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী, গণমুখী ও দেশের প্রয়োজনভিত্তিক করতে হবে। চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় সেবার মান, রোগীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, মমত্ববোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আদর্শের মূল কথাই হলো- মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানানো, উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা। মোটকথা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং মানব সম্পদ থেকে যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মদক্ষতার সুফল পেতে হলে উন্নত নৈতিক চরিত্র অপরিহার্য। ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, প্যারামেডিক এ সকল পেশার লোকদের কর্মদক্ষতার পাশাপাশি ইসলামের আলোকে নৈতিক চরিত্র বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, মমত্ববোধ ইত্যাদির মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সেবার মান বৃদ্ধি সম্ভব।

(ঠ) স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান

বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান দূর্বল। বিশেষ করে জনসংখ্যা অনুপাতে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা কম হওয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকা এবং বিশেষত: দরিদ্র, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সহজে সেবা প্রদানকারীর কাছে পৌঁছানোর ব্যর্থতা সেবার মানকে দূর্বল করে দিচ্ছে। সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ওষুধ-পত্র, সেবা প্রদানের স্থান ও সেবা প্রদানকারীর স্বল্পতা চিকিৎসা খাতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।[৭১৬] বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতালে যেতে মানুষ ভয় পায়। হাসপাতাল শব্দটি মনে হলেই ভীড়, নোংরা পরিবেশ, কোলাহল, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, সময় নেই, দুর্গন্ধ, দুর্নীতি ইত্যাদি অনুষঙ্গ মনের কোণে পাখা মেলে এক কুশ্রী ছবি অঙ্কিত করে। বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়েও জনগণ সন্তুষ্ট নয়। জনবলের স্বল্পতা, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবকে দরিদ্র, দূরবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানো যাচ্ছে না; যা বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ। মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যায়, তারা কোথাও সেবা পায় না, পায় সেবার পরিবর্তে অবজ্ঞা, অবহেলা। অন্যদিকে, রাজধানীর বড় বড় প্রইভেট হাসপাতালে গেলে দেখা যায় চিকিৎসা সেবার ভালো চিত্র। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসক-নার্সদের কর্তব্য পরায়ণতা, শিশুদের জন্য অজস্র খেলনার সমারোহ, ছিমছাম, ভীড়হীন একটি পরিবেশ মনে সুখী সুখী ভাব এনে দেয়। বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যে স্বাস্থ্যসেবা জনগণ পাচ্ছেন তা পরিসর ও গুণগত মানের দিক থেকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার জন্য উচ্চ ফি ও রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা ব্যায়বহুল হওয়ায় চিকিৎসা সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই রয়েছে।

---

৭১৬. RvZxq ¯^v¯’¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি, আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবাখাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এছাড়াও বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতের প্রভূত উন্নয়নসাধন ও স্বাস্থ্যসেবা খাতের আধুনিকায়ণের মাধ্যমে সকলের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক ইসলামী নীতি-পদ্ধতি মেনে চলা প্রয়োজন। রোগ হলে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকার শিক্ষা মহানবী (সা.) দেন নি; বরং তিনি চিকিৎসা দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষায় উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার জন্য আরোগ্যের ব্যবস্থা রাখেননি।"[৭১৭] "প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে। যখন কোন রোগের সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করা হয়, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তা নিরাময় হয়।"[৭১৮] স্বাস্থ্য বিষয়ক ইসলামী নীতি-পদ্ধতি মেনে চলার মাধ্যমেই স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করা জরুরী। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও আধুনিক যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার, গ্রাজুয়েট পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও দেশে প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষাদান ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়াসহ চিকিৎসকদের পেশাগত মান বজায় রাখার জন্য দেশে ও বিদেশে Continuting Medical Education ও প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টার্নিশীপ বিদ্যমান এক বৎসরের পরিবর্তে দুই বৎসরে উন্নীত করে তার মধ্যে অন্ততঃ এক বৎসর গ্রাম পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে তাদের কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মেডিকেল প্রাকটিশনাদের রেজিস্ট্রেশন, পেশাগত মান এবং এথিক্যাল প্রাকটিস সংক্রান্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে তদারকি করার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

(ড) কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার এবং এর দক্ষ ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থ্যাপনার প্রধান বাধা হলো কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। কেন্দ্রে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর অধিক নির্ভরশীলতা কিংবা জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে সকল স্তরে না পৌঁছানোর কারণে কার্যকর সিদ্ধান্ত পালন দীর্ঘায়িত হয়। একজন মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত, নৈতিক গুণসম্পন্ন, কর্মক্ষম, কর্মদক্ষ ও উন্নত করে গড়ে তোলার মাধ্যমে মানব সম্পদ রূপান্তরের সার্বিক শিক্ষা রয়েছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায়। কেননা, মানুষকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রে নানামুখি সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যহত হয়। সঠিকভাবে নেতৃত্বদান ও যোগ্য ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। ইসলামী নীতি ও শিক্ষা মেনে চলনে জনসংখ্যা অনুপাতে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য সকল পর্যায়ে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

---

৭১৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আর-বুখারী, C¨, 3, অধ্যায় ৭৬/১, পৃ. ৩১৭

৭১৮. ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, mnxn gmwjg, প্রাগুক্ত, ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, খ. ৭, অধ্যায় ৪০, হাদীস নং ৫৫৭৮

(ঢ) স্বাস্থ্য-গবেষণা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচি, সেবা প্রদান ও দরিদ্র-বান্ধব স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণয়নে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ ও প্রমাণের ভিত্তিতে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণা ব্যবস্থার অভাবে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং গবেষণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিঘ্নিত হচ্ছে।[৭১৯] স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং কোন বিষয়ের সূক্ষ তথ্য জানতে স্বাস্থ্য বিষয়ক ইসলামী নীতি-পদ্ধতি মেনে গবেষণা প্রয়োজন। কুরআন মাজীদে গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও, না যমিনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।[৭২০]

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডোলে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ-সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।[৭২১] ইসলামে কর্মপ্রেরণা, কর্মস্পৃহা ও কাজের মর্যাদার আদর্শিক ভিত্তি রয়েছে। কাজ করার শক্তি মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর এক পরম দান। এ শক্তির বলে মানুষ সৃষ্টির অন্যান্য জীবের ওপর প্রাধান্য রেখেছে এবং নিজের জীবনকে করেছে সুন্দর ও মহান। শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রগতি নির্ভর করে গুণাত্মক শ্রমের মানের ওপর। মানব সন্তানের কর্মমুখরতা ও গবেষণা কার্যক্রম বিশ্বের শান্তিধারার অন্যতম উৎস। আল্লাহ কোনো ব্যক্তির বা জাতির ভাগ্য তাদের প্রচেষ্টা ব্যতিত পরিবর্তন করেন না। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“আল্লাহ তা‘য়ালা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।”[৭২২] যদি মানুষকে যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করা না যায়, তবে কোন ব্যবস্থাই সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অথবা স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি তৈরি ও ব্যবহার সম্ভব হয় না। ব্যক্তি মানুষকে তার সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সীমিত সম্পদের সর্বাধিক দক্ষতার সাথে ব্যবহার নিশ্চিত করতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অপরিশীম। ইসলামী জীবনাদর্শনে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা সহকারে চেষ্টা সাধনা করে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

এদেরকে বলো, এ কুরআন মু’মিনদের জন্য হিদায়াত (পথ-নির্দেশ) ও রোগমুক্তি (ব্যাধির প্রতিকার) বটে।[৭২৩] মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

[৭১৯]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
[৭২০]. আল-কুরআন ১০ : ৬১
[৭২১]. আল-কুরআন ৩৪ : ৩
[৭২২]. আল-কুরআন ১৩ : ১১
[৭২৩]. আল-কুরআন ৪১ : ৪৪

"মানুষের জন্য প্রাপ্য কিছুই নেই। আছে শুধু তা যা পাওয়ার জন্য সে প্রকৃত চেষ্টা করে।"[৭২৪] অতএব, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনে ইসলামের আলোকে স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করা ইসলামেরই নির্দেশিত পথ।

(ণ) তথ্য, যোগাযোগ প্রযুক্তি ও রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা উন্নত করার উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার এখনো যথেষ্ট নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য জনশক্তির আগ্রহ ও দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অপ্রতুলতা প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বিরাজ করছে। রোগ তাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ সামর্থ্য সত্ত্বেও নিয়োমিতভাবে করা হয় না। আচরণগত পরিবীক্ষণের কথা খুব কমই চিন্তা করা হয়। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ই-হেলথ, টেলি মেডিসিন এবং ই-তথ্যের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এখনও হয়নি।[৭২৫] যা আমাদের স্বাস্থ্যখাতে বড় চ্যালেঞ্জ। মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।"[৭২৬] তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ই-হেল্‌থ, টেলি-মেডিসিন এবং ই-তথ্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এখনও হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ইসলামের আলোকে বাস্তবায়ন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পবিত্র কুরআন মানব জাতিকে সর্ব প্রথম তথ্য প্রযুক্তির ধারণা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ

ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়।[৭২৭]

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا

আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জলন্ত উল্কাপিন্ড ওঁত পেতে থাকতে দেখে।[৭২৮]

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষন করি।[৭২৯]

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

আর আমি সোলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত।[৭৩০] বর্তমান সময়ে কোন সংবাদ দ্রুত পৌঁছাতে হলে তথ্য, যোগাযোগ প্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই। যন্ত্রের মাধ্যমে প্রেরিত সংবাদ সর্বনিম্ন আকাশে বাতাসের মাধ্যমে ভেসে

---

[৭২৪]. আল-কুরআন ৫৩ : ৩৯

[৭২৫]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৭২৬]. আল-কুরআন ২৯ : ৬৯

[৭২৭]. আল-কুরআন ৩৭ : ৮

[৭২৮]. আল-কুরআন ৭২ : ৯

[৭২৯]. আল-কুরআন ২৫ : ৪৮

[৭৩০]. আল-কুরআন ৩৪ : ১২

যায়, অন্য প্রান্ত থেকে যন্ত্রের মাধ্যমেই এই সংবাদ গ্রহণ করতে হয়। যন্ত্র ব্যতিত এই সংবাদ প্রেরণ বা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।[৭৩১] পূর্বে তথ্য ব্যবস্থা নিরাপত্তার জন্য উল্কাপিন্ড নিক্ষিপ্ত হতো, বর্তমানেও এর নিরাপত্তা প্রয়োজন।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি।[৭৩২]

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ

কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জল উল্কাপিন্ড।[৭৩৩]

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন?[৭৩৪]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান।[৭৩৫]

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত।[৭৩৬] বর্তমান যুগকে বলা হয় প্রচারের যুগ। ইসলামী জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নিম্ন উল্লেখিত পদ্ধতির মাধ্যমে জনসাধারণকে যেমন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করে তোলা যায় তেমনি বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে পূর্বপ্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করাও সম্ভব:

- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের মাধ্যমে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে।
- বিশ্ব তামাক দিবস, বিশ্ব অটিজম দিবস, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় ও বিটিভিতে স্বাস্থ্য বার্তা প্রচারের মাধ্যমে এই দিবসের তাৎপর্য জনসাধারণকে সহজে বুঝানো সম্ভব।
- ডায়রিয়া প্রতিরোধে দৈনিক পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে সহজেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা যায়।

---

[৭৩১]. আল-কুরআন ৬৭ : ৪

[৭৩১]. 2012-2013 A_ eQ‡i i Kvhµwe eiYx mgvµKZ ewl K cwZ‡e`b

[৭৩২]. আল-কুরআন ৬৭ : ৫

[৭৩৩]. আল-কুরআন ১৫ : ১৮

[৭৩৪]. আল-কুরআন ২৭ : ৬৩

[৭৩৫]. আল-কুরআন ৩০ : ৪৬

[৭৩৬]. আল-কুরআন ৩৮ : ৩৬

- নিপাহ ভাইরাসসহ অন্যান্য সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতার লক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় ও বিটিভিতে স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা।[৭৩৭]
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনে বাংলাদেশ টেলিভিশনে টক-শো আয়োজন করা।
- সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে টেলিভিশনে স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা।[৭৩৮]
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক জারীগান আয়োজন করা।[৭৩৯]
- স্বাস্থ্য সেক্টরের অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বিতরণ করা।
- বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের হেলথ সুপারভাইজারদের স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও বিতরণ করা।[৭৪০]
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও প্রজেকশন স্ক্রীণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচার করা।[৭৪১]
- জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম বার্ষিকী উদযাপনের মাধ্যমে শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা তথ্য জনসাধারণকে অবহিত করা যেতে পারে।[৭৪২]
- সকল জেলায় মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদার করা সম্ভব।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহসহ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে জনগণকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।
- প্রচারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করা এবং চলমান স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর প্রেস আধুনিকায়ন করতে হবে।[৭৪৩]

(ত) সমতা ভিত্তিক সেবা

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কারণে এবং দূরবর্তীস্থানে বসবাসসহ বিবিধ কারণে সমাজের দরিদ্র, সামাজিকভাবে বঞ্চিত, অশিক্ষিত, প্রান্তিক, দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, বিশেষত: গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং কারখানার শ্রমিক সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও কিছু কর্মসূচী তাদের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কিন্তু এটা তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রবেশ করতে পারছে না।[৭৪৪] এটি বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারখানার শ্রমিক, কৃষিখাত, পশুপাখি পালনে নিয়োজিত মানুষ, আদিবাসী, দুর্গম এবং দূরবর্তী এলাকাবাসীদের জন্য এবং নারীদের সমাজিক ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানে,

---

৭৩৭. 2012-2013 A_ eQ‡ii Kvh©eiYj m¤úwKZ ev‡lK c‡Z‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৭৩৮. 2010-2011 I 2011-2012 A_ eQ‡ii Kvh©eiYj m¤úwKZ ev‡lK c‡Z‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৭৩৯. 2012-2013 A_ eQ‡ii Kvh©eiYj m¤úwKZ ev‡lK c‡Z‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
৭৪০. 2010-2011 I 2011-2012 A_ eQ‡ii Kvh©eiYj m¤úwKZ ev‡lK c‡Z‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৭৪১. 2012-2013 A_ eQ‡ii Kvh©eiYj m¤úwKZ ev‡lK c‡Z‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৭৪২. 2010-2011 I 2011-2012 A_ eQ‡ii Kvh©eiYj m¤úwKZ ev‡lK c‡Z‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৭৪৩. 2012-2013 A_ eQ‡ii Kvh©eiYj m¤úwKZ ev‡lK c‡Z‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
৭৪৪. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

সহিংসতার বিরুদ্ধে এবং বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইসলামের আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ করে মানুষ দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির হাত হতে সহজেই রক্ষা পেতে পারে। চিকিৎসাসেবা একটি মহৎ ও উৎকৃষ্ট মানের কাজ। ইসলামী নিয়মনীতি ও বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা সকল নাগরিকের সম-অধিকার। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে রোগমুক্ত করেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে,

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

আমি যখন অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে রোগমুক্ত করেন।[৭৪৫]

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্ন দান।[৭৪৬] অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে সকল যুগেই অভাব বিদ্যমান ছিল। যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

হে নবী, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই।[৭৪৭]

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎ কর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।[৭৪৮] সামর্থহীনতাও মহান আল্লাহর একটি পরীক্ষা। বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক এ সকল বিকল্প চিকিৎসা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বল্প খরচে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করা সম্ভব।[৭৪৯] মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ

আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন।[৭৫০]

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের জন্য অর্থ একটি বড় বিষয়। বাংলাদেশের অর্থ-ব্যবস্থা ইসলামের আলোকে পরিচালিত হলে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব।

(থ) চিকিৎসা পেশায় নৈতিকতা

বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ, পরিচালন ব্যয় এবং নিয়ন্ত্রক পর্ষদসমূহ যথেষ্ট কার্যকর না থাকায় চিকিৎসা শিক্ষা, চর্চা এবং গবেষণা কাজে নৈতিকতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতি হয়। একজন চিকিৎসককে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি তাদের ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লেখার জন্য সবসময়ই প্রভাব বিস্তার করে। কেননা ওষুধ যত কার্যকরীই হোক তা ক্রয় করতে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র আবশ্যিক। যদিও সব মানুষের মতই চিকিৎসকেরও স্বাধীনতা থাকে একই ধরনের ওষুধ হতে তার ইচ্ছেমত একটি ওষুধ পছন্দ করা, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। প্রায়শঃ দেখা গেছে প্রচারাভিযান চিকিৎসকের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। সুইজারল্যান্ডে এক গবেষণায় দেখা যায়, যে ওষুধ যত প্রবলভাবে প্রচার করা হয় সেই

---

৭৪৫. আল-কুরআন ২৬ : ৮০

৭৪৬. আল-কুরআন ৯০ : ১৪

৭৪৭. আল-কুরআন ৩৩ : ২৮

৭৪৮. আল-কুরআন ৩৩ : ২৯

৭৪৯. বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৭৫০. আল-কুরআন ৪২ : ৮

ওষুধ তত বহুল ভাবে প্রেসক্রাইব করা হয়।[৭৫১] এ ছাড়াও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তিতে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে। এ সকল চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের পথ একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব। বর্তমান সময়ে ভূয়া ডাক্তারের কারণে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কোন সার্টিফিকেট না থাকলেও ডাক্তার পরিচয়ে চিকিৎসার নামে রোগীর ক্ষতি করছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[৭৫২]

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

বস্তুত তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে।[৭৫৩] মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন তৈরি করা প্রয়োজন। ব্রিটেনের কোনো হাসপাতালে যদি কোনো রোগীর অজ্ঞাত কারণে কিংবা ডাক্তারের অবহেলায় মৃত্যু ঘটে তখন ঘটনাস্থলে করোনারস কোর্ট (করোনার আদালতে) বসবে। ব্রিটেনের সরকার ও বিরোধীদলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাণী কর্তৃক নিয়োজিত এই করোনার কোর্ট বিচারক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাঁরা এই ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার রোগীটির ব্যাধি, তার চিকিৎসা কার্যক্রম প্রভৃতির আদ্যোপান্তে রিপোর্ট তৈরি করেন এবং তার সঙ্গে মৃতদেহের পোস্টমর্টেম রিপোর্টও যুক্ত করেন। করোনারস আদালতে পুরো ঘটনাটির দায় দায়িত্ব অনুসন্ধান ও বিচার অনুষ্ঠানের দ্বারা রায় দেবে। এতে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের ভুল কিংবা চিকিৎসা তৎপরতায় অবহেলা, অদক্ষতা ধরা পড়লে সেই ডাক্তারকে ব্রিটেন আর চিকিৎসকের কাজ করতে দেয়া হয় না। অর্থাৎ ডাক্তার হিসেবে তিনি ঐ দেশে পুরো অযোগ্য ঘোষিত হবেন। একই ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু হলে দ্বায়িত্বশীলতা এবং সেবার মান অনেক বৃদ্ধি পেত। পৃথিবীর অনেক দেশেই এরকম ব্যবস্থা চালু রয়েছে।[৭৫৪] আমাদের দেশে করোনারস্ কোর্টের মতো এই ধরনের কোর্ট থাকলে এবং ইসলামের আলোকে নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে একজন চিকিৎসকের দায়িত্ববোধ, জবাবদিহিতা, অনুসন্ধিৎসা, সহমর্মিতা অনুশীলনের শুভ সূচনা হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

(দ) জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সংক্রান্ত জ্ঞান

বাংলাদেশের জনগণ এখনও বিভিন্ন ব্যাধি, সমস্যা অপুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। রোগীকে পরামর্শদান (Counselling) আমাদের সমাজে পেশা হিসাবে স্বীকৃত নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। জীবনযাপন পদ্ধতিকে আরো স্বাস্থ্যসম্মত ও উৎপাদনশীল করার জন্য সামাজিকভাবে শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ না করার কারণে জনসাধারণ নানাবিধ রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে ফলে, বিষয়টি স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। জনগণ এখনও বিভিন্ন ব্যাধি, সমস্যা অপুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। জীবনযাপন পদ্ধতিকে আরো

[৭৫১]. *Journal Swiss de Medicine*, 109, No3, p-1194.

[৭৫২]. আল-কুরআন ১৭ : ৩৬

[৭৫৩]. আল-কুরআন ১০ : ৩৬

[৭৫৪]. মজনু-নুল হক, ïZ³ Ila, iæMY ïPïKrmv I ïRï¤§ RbMY, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩৪

স্বাস্থ্যসম্মত ও উৎপাদনশীল করার জন্য সামাজিকভাবে শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।[৭৫৫] ইসলামী জীবন-যাপন পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব। আল্লামা আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "দিনের বেলার ঘুম স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। এটি মানুষের চেহারায় পরিবর্তন আনে, রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং মানুষকে অলস করে তোলে।"[৭৫৬] পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমন্ডোল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন।[৭৫৭] মহান আল্লাহ অন্ধোকারকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য এবং আলোকে সৃষ্টি করেছেন কর্মের জন্য। বিশ্রাম ব্যতিত মানুষ একাধারে কাজ করতে পারে না। বিশ্রামের মাধ্যমে ক্লান্তি দুর হয় তখন আবার সে নতুন উদ্বমে কাজ করতে পারে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমণের জন্য।[৭৫৮] এদেশের সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সচেতনতার অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ না করার কারণে অসুস্থতার অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদেশের সাধারণ জনগণের ইসলামী স্বাস্থ্য বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।[৭৫৯] স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অনেক দিক-নির্দেশনা বর্ণনা করেছেন। স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপনে বিবাহের গুরুত্ব অপরিশিম মহান আল্লাহ বিবাহ সম্পর্কে বলেন,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[৭৬০]

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَـٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

দুশ্চরিত্রা নারীকূল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।[৭৬১]

---

৭৫৫. RvZxq ¯^v¯’bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৭৫৬. আস-সুয়ূতী, cÖv¸³, পৃ. ১৯৮
৭৫৭. আল-কুরআন ৬ : ১
৭৫৮. আল-কুরআন ২৫ : ৪৭
৭৫৯. RvZxq ¯^v¯’bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৭৬০. আল-কুরআন ২৪ : ৩২
৭৬১. আল-কুরআন ২৪ : ২৬

Dhaka University Institutional Repository

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّـهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

যারা বিবাহে সামর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে, অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কারো না। যদি কেহ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৭৬২] যিনা ব্যবিচার সমাজে রোগ-ব্যধি ছড়িয়ে সমাজকে রুগ্ন ও কলুষিত করে। এহেন খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।[৭৬৩]

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৭৬৪] সমাজে অশান্তি নিবারণের জন্য বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি।[৭৬৫] অন্যের গৃহে অনাধিকার প্রবেশের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার অনাচার সৃষ্টি হয়। এহেন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।[৭৬৬]

---

[৭৬২]. আল-কুরআন ২৪ : ৩৩

[৭৬৩]. আল-কুরআন ২৪ : ৩০

[৭৬৪]. আল-কুরআন ২৪ : ৩১

[৭৬৫]. আল-কুরআন ২৪ : ২৩

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা ভালোভাবে জানেন।[৭৬৭]

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।[৭৬৮]

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত।[৭৬৯] পবিত্র কুরআনের এ সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন পালন করা সম্ভব।

ইসলামের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে নিম্নোক্ত কর্মকৌশল গ্রহণ করা ও অব্যহত রাখা প্রয়োজন:

- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম।
- ডায়রিয়ার জন্য ওরাল স্যালাইন, আয়রণ ও ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ।
- বিনামূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ বিতরণ ও নিরাপদ ওষুধ সেবন নিশ্চিত করণ।
- গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'র স্বাস্থ্য সেবা স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তা, নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
- শিশুদের ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, নিউমোনিয়া, হাম, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা প্রদান।
- ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে টিকাদান কাযক্রম আরও জোরদার করণ।
- মেডিসিন, শল্য চিকিৎসা, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, হাড়ের রোগ, চক্ষুরোগ ও নাক কান গলা ও অন্যান্য রোগ সম্পর্কিত বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা প্রদান।
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- জটিল রোগীর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে প্রেরণ।
- কিশোর-কিশোরী এবং সক্ষম দম্পতিদের প্রজনন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান।
- মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
- যক্ষ্মা, গর্ভকালীন বিপদজনক অবস্থা, মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা, এনথ্রাক্স সহ বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি চিহ্নিত করণ।
- হাসপাতালভিত্তিক সার্বক্ষণিক জরুরি স্বাস্থ্যসেবা/প্রসূতিসেবা প্রদান।

---

[৭৬৬]. আল-কুরআন ২৪ : ২৭
[৭৬৭]. আল-কুরআন ২৪ : ২৮
[৭৬৮]. আল-কুরআন ২৪ : ২৯
[৭৬৯]. আল-কুরআন ২৪ : ২৪

- জেলা হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU/CCU সেবা প্রদান।
- সকল ধরণের রোগ নির্ণয়ক পরীক্ষাকরণ।
- যক্ষ্মা রোগীর কফ পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে যক্ষ্মা/কুষ্ঠ রোগের ওষুধ বিতরণ।
- পুষ্টিজ্ঞান প্রদান ও সম্পূরক খাদ্য বিতরণ।
- অপুষ্টি জনিত রোগ চিহ্নিত করা, মারাত্মক অপুষ্টি জনিত রোগীর চিকিৎসা ও উচ্চতর কেন্দ্রে প্রেরণ করা।
- রক্ত পরীক্ষা ও নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম।
- পর্যাপ্ত সংখ্যক সেবিকা, প্রশিক্ষিত ধাত্রী, প্যারামেডিক্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী তৈরি করা।
- পরিকল্পিত পরিবার গঠন এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য ইলেক্ট্রনিক্স, প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা।

জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের নিয়ম-নীতি ও উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের জবাবদিহীতার অভাব, অনৈতিকতা, প্রতারণা, ইত্যাদি মানবিক অবক্ষয় এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর ভয় অন্তরে না থাকার কারণে কোন কর্মকৌশলই জাতির স্বাস্থ্য সেবার মানে কাংঙ্খিত উন্নয়ন করতে পারেনি। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সময়োপযোগী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি আজও কার্যকর করা যায়নি। ১৯৯০ সালে যে স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা কার্যকর করা যায়নি। পরবর্তীতে ২০০০ এবং ২০০৬ সালে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির খসড়া প্রণীত হয়, যদিও এই দুই স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে অভিযোগ যে, উভয় স্বাস্থ্যনীতিতে জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। সরকারী চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও কোনো সুপারিশ ছিল না। উভয় স্বাস্থ্যনীতিতে কেবল চিকিৎসকদের স্বার্থ বিবেচনা করা হয়েছে। ২০০৮ সালে পুনরায় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির খসড়া প্রস্তাব প্রণীত হয়। এবং পরবর্তী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ প্রণীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের কর্মকৌশল : ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ

জাতি, ধর্ম, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদান, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গ্রাহক কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিস্তৃতকরণ, মান উন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাধিকারপূর্ণ বন্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রমকে সমন্বয়সাধন ও বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত কর্মকৌশলসমূহ ইসলামের আলোকে বাস্তবায়ন করা হলে স্বাস্থ্যসেবায় যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। নিম্নে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বাস্তবায়নের কিছু কর্মকৌশল ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।

কর্মকৌশল - ১ : জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠন

সরকার প্রধানের নেতৃত্বে জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠন করতে হবে। এ কাউন্সিলে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বেসরকারি খাতের স্টেকহোল্ডার ও এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কাউন্সিল স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ে কাউন্সিলের কাছে দিক-নির্দেশনা চাওয়া হবে।[৭৭০] সরকার প্রধানের নেতৃত্বে কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে পরামর্শক্রমে কাজ করা ইসলামের নীতি। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।[৭৭১] স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি জনগণের মৌলিক অধিকার। 'সুস্থ জাতি উন্নত দেশ' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশের জনগণের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য খাতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতি পাঁচ বছর পর পর এদেশের মানুষের চাহিদার নিরিখে নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সেক্টরে নানাবিধ কর্মসূচি প্রণয়ন করছে। Health Population Nutrition Sector Development Program নামে পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এর আলোকে স্বাস্থ্য সেক্টরে Multisectoral Approach এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। শিশু মৃত্যু বর্তমানে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৪৩ যা সম্ভব হয়েছে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, শিশু রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ডায়রিয়া এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ জনিত রোগের সঠিক ব্যাস্থাপনার মাধ্যমে। বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃত বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছ এবং দেশের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।

---

[৭৭০]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৭৭১]. আল-কুরআন ৪২ : ৩৮

এ ধরণের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এ ধরণের বিশেষজ্ঞ কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। ইসলাম সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে যে কোন ভাল উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায়।

কর্মকৌশল - ২ : নির্বাহী কমিটি গঠন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ও পুষ্টিনীতির আলোকে কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবে। তাছাড়া কমিটি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংস্কার, জনবল নিয়োগ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, কর্মীদের কর্মজীবন পরিকল্পনা, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা নীতিসহ, স্বাস্থ্যসেবার সঠিক উন্নয়ন পরামর্শ প্রদান করতে পারে। সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।[৭৭২] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। রুলস অব বিজিনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দাায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন।[৭৭৩] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের একটি পরিচালনা পরিষদ থাকবে যা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে-

ক. মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি পরিষদের সভাপতিও হবেন;

খ. নির্বাহী চেয়ারম্যান, যিনি পরিষদের সচিবও হবেন;

গ. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

ঘ. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

ঙ. মহা হিসাব-নিরীক্ষক;

চ. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

ছ. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

জ. সদস্য, অর্থনৈতিক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

ঝ. উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়;

ঞ. সভাপতি বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন;

ট. সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল;

ঠ. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

ড. সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন মানবাধিকার কর্মী;

ঢ. সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন নারী, যিনি নারী অধিকার আদায় কার্যে অনূন্য ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;

৭৭২. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৭৭৩. ¯^v¯' Lv‡Z mvd‡j¨i cvP eQi, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

গ. বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত একজন সাংবাদিক যিনি স্বাস্থ্য খাতে অনূন্য ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।[৭৭৪]

ইসলাম পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে এবং জনগণের উন্নতি সাধনে নির্দেশ দিয়েছে। জনসাধারণের উন্নয়নের ও উপকারের জন্য তাদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

তারপর আল্লাহর করুণার ফলেই তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে। আর তুমি যদি রুক্ষ ও কঠোর-হৃদয় হতে তবে নিঃসন্দেহ তারা তোমার চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। অতএব, তাদের অপরাধ মার্জনা করো, আর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর তাদের সঙ্গে কাজেকর্মে পরামর্শ করো। আর যখন সংকল্প গ্রহণ করেছ তখন আল্লাহর উপরে নির্ভর করো। নিঃসন্দেহ আল্লাহ ভালোবাসেন নির্ভরশীলদের।[৭৭৫]

<u>কর্মকৌশল - ৩ : সমন্বিত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ</u>

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজগুলো সম্পাদনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করে কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করার ব্যবস্থা করতে হবে।[৭৭৬] জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের এনজিও এবং ব্যক্তিখাত স্বাস্থ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমন্বয়ের মাধ্যমে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।[৭৭৭] বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই সমস্ত কার্যক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। জেলা পর্যায় থেকে তৃণমুল পর্যায়ে অবস্থিত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে। এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন কার্যক্রমের নীতি প্রণয়ন ও সমন্বয়সাধনসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের সহায়তায় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়ন করবে। অধিকন্তু, জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের সচিবালয় হিসেবে

---

[৭৭৪]. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, RvZxq ¯^v¯' mi¶v AvBb 2014

[৭৭৫]. আল-কুরআন ৩ : ১৫৯

[৭৭৬]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৭৭৭]. আল-কুরআন ৪২ : ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

এ মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করবে এবং পরিষদের নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতি এবং জাতীয়, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পযায়ের স্টেকহোল্ডার কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। পাশাপাশি জনসংখ্যা কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি করবে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব অনুসারে পরিকল্পিত পরিবার গঠন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত কর্মকৌশল প্রণয়ন ও তদনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।[৭৭৮]

<u>কর্মকৌশল - ৪ : প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন</u>

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান উন্নয়ন করতে হবে এবং তা সার্বজনীন করা হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নে কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের কর্মকান্ড জোরালো করতে হবে এবং স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর অংশীদারিত্বে পরিচালিত করতে হবে। প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। তবে বিশেষ ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত কম জনগোষ্ঠীর জন্যও (যেমন-চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল) কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা যেতে পারে। দ্রুত নগরায়নের ফলে শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার সাথে সাথে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। কার্যকর রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই জটিলতর রোগীদের পরবর্তী ধাপে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।[৭৭৯] বাংলাদেশের জনগণের প্রধান ৫টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। উক্ত অধিকার বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; বিশেষায়িত হাসপাতাল; জেলা হাসপাতাল; উপজেলা হাসপাতাল; ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।[৭৮০] স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২,২৩৬ (দুই হাজার দুইশত ছয়ত্রিশ) টি সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে।[৭৮১] তাছাড়া বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে উন্নয়ন খাতভুক্ত (প্রতি ৬০০০ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে) প্রস্তাবিত ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে এ পর্যন্ত ১২,৪৪৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা তথা স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের চাহিদার আলোকে আরও নতুন নতুন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ২০১২-২০১৩ সালে মোট ২৫০৯ টি শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে ৩০ শে জুন, ২০১৩ইং পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত ৩৫১৬টি হাসপাতাল; ক্লিনিক; নাসিংহোম এবং ৬১০০টি

---

[৭৭৮]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৫

[৭৭৯]. RvZxq ¯^v¯’¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৭৮০]. 2010-2011 I 2011-2012 A_© eQ‡ii Kvh©ewj m¤úwKZ ewl©K cwZ‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

[৭৮১]. 2012-2013 A_© eQ‡ii Kvh©ewj m¤úwKZ ewl©K cwZ‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত উক্ত প্রতিষ্টানগুলোর সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন; হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও গবেষণা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, এমআইএস, রোগ নিয়ন্ত্রণ, ভান্ডার ও সরবরাহ, হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা, এমবিডিসি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো শাখা কাজ করছে।[৭৮২] স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক ইসলামী নীতি-পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। রোগ হলে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকার শিক্ষা মহানবী (সা.) দেন নি; বরং তিনি চিকিৎসা দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষায় উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার জন্য আরোগ্যের ব্যবস্থা রাখেননি।"[৭৮৩] "প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে। যখন কোন রোগের সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করা হয়, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তা নিরাময় হয়।"[৭৮৪] স্বাস্থ্য বিষয়ক ইসলামী নীতি-পদ্ধতি মেনে চলার মাধ্যমেই স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করা জরুরী। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও আধুনিক যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার, গ্রাজুয়েট পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও দেশে প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষাদান ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া প্রয়োজন।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিশেষ করে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণে ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষ ভেদে জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটছে। বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মানসম্পন্ন বিকল্প চিকিৎসা কার্যক্রমের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও দেশীয় গ্রহণযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতি নারী পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সবার কাছে সহসলভ্য হবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। স্কুল পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভূক্তকরণ এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক তথ্যভিত্তিক প্রচারণার ফলে হতদরিদ্র নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে দারিদ্রদের চিকিৎসাসেবা প্রদান সম্ভব হবে।[৭৮৫] গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক একটি সফল অধ্যায়ের নাম।[৭৮৬] সঠিক চিকিৎসা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন ২০১৪ এর ধারা (৩৬) অনুযায়ী একজন কার্ডধারী বা সুবিধাভোগী সাধারণবৃত্তিক চিকিৎসকের নিকট হতে রেফারেল প্রাপ্ত হয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে।[৭৮৭]

অতএব, ইসলামের সুমহান আদর্শ কাজে লাগিয়ে উক্ত কৌশলটি আরো কার্যকরী করা সম্ভব।

[৭৮২]. 2010-2011 I 2011-2012 A_ eQ‡ii Kvhvewj m¤úwKZ ewlK cwZ‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

[৭৮৩]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আর-বুখারী, cv¸³, অধ্যায় ৭৬/১, পৃ. ৩১৭

[৭৮৪]. mnxn gmwjg, প্রাগুক্ত, ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, খ. ৭, অধ্যায় ৪০, হাদীস নং ৫৫৭৮

[৭৮৫]. evrmwiK ev‡RU 2014-2015, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পৃ. ৫

১৩. ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃ. iii

[৭৮৭]. RvZxq ¯^v¯’¨ mi¶v AvBb 2014, cv¸³

কর্মকৌশল - ৫ : জরুরী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা

জরুরী স্বাস্থ্য সেবা জীবন বাঁচাতে পারে বিধায় সার্বজনীন জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।[৭৮৮] জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকারের মাধ্যমে রোগকে অগ্রসর হতে না দেয়া এবং চিকিৎসাকে দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগ না দেয়া। দেশের প্রতিটি জেলা এবং উপজেলা হাসপাতালে জরুরী বিভাগ রয়েছে। তবে মাঝে মাঝে সঠিক ডাক্তার পাওয়া যায় না। দূর্ঘটনা, হার্টএ্যাটাক, স্ট্রোক এর মতো রোগসমূহ যদি আক্রমনের শুরুতে সঠিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে অনেকাংশেই রোগ বৃদ্ধি ঘটতে পারে না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।[৭৮৯]

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّـهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।[৭৯০] এ কারনে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন ২০১৪ এর ধারা (৩৮) অনুযায়ী জরুরী অবস্থায়, যেখানে রোগীর জীবন সংকটের সম্মুখীন, সেখানে ধারা ৩৬ এর অধীন আনুষ্ঠানিক রেফারেলের প্রয়োজন হবে না; তবে, সেবা প্রদানকারী নিধারিত পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসার ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস হতে প্রাপ্ত হবে।[৭৯১]

অতএব, ইসলামের আদর্শে আদর্শিত হয়ে জরুরী চিকিৎসাসেবাকে আরো কার্যকরী করতে হবে।

কর্মকৌশল - ৬ : রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এ মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আরোগ্যমূলক ও পুনর্বাসন সেবাগুলোর সন্তোষজনক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।[৭৯২] হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহি আলাহিওয়াসাল্লাম এক বছর পূর্বে আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছেন, "নিশ্চয়ই মানুষকে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন নিয়ামত প্রদান করা হয়নি।[৭৯৩] সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, "মহান আল্লাহর নিয়ামত সমূহের মধ্যে দুটো নিয়ামত রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় পড়ে আছে। একটি স্বাস্থ্য আর অপরটি অবসর।"[৭৯৪] মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "স্বাস্থ্য ও অবসর মহান আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে দুটি বিশেষ নিয়ামত। অধিকাংশ লোক এ দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে ক্ষতি ও ধোঁকায় পতিত হয়েছে।"[৭৯৫] ইসলাম রোগ প্রতিরোধের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

---

[৭৮৮]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৭৮৯]. আল-কুরআন ১০ : ১০০

[৭৯০]. আল-কুরআন ৮ : ২২

[৭৯১]. RvZxq ¯^v¯'¨ mi¶v AvBb 2014

[৭৯২]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৭৯৩]. bvmvC, প্রাগুক্ত, অধ্যায় স্বাস্থ্য ও সুস্থতা চাওয়া, হাদীস নং- ১০৭২২

[৭৯৪]. mnxn Avj eLvix, cv¸³, অধ্যায় মর্মস্পর্শী হাদীস, হাদীস নং- ৫৯৬৪

[৭৯৫]. gmbv‡`‘ Avngv`‘, প্রাগুক্ত, মু.আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হাদীস নং-২৩৪০

রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে রোগ নিরাময়ের চেয়ে উত্তম। এক আউন্স রোগ প্রতিরোধ এক টন রোগ নিরাময় থেকে উত্তম।[৭৯৬] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ প্রতিরোধকল্পে বক্তব্য রেখেছেন ও ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন কোন চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট বা ডায়াটেসিয়ান হিসাবে ছিলোনা। তথাপিও আমরা দেখতে পাই যে স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ নিরাময় ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি বিষয়েই তিনি অনেক বক্তব্য রেখেছেন এবং দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যা পুরোপুরি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। তিনি তাঁর বক্তব্য এমন এক সময় পেশ করেছেন যখন বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানতোনা। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে তাকে ওই দিন কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।"[৭৯৭] এছাড়া রমযানের রোযা রাখা, নিয়মিত সালাত আদায় করা, পাঁচবার উযূ করা, পরিমিত পরিমাণে নিয়মিত হালাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা ও হারাম খাদ্য বর্জন করা, দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন বৈধ নিয়ম-নীতি মেনে চলা, ব্যক্তিগত জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।[৭৯৮] হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারব (রা.) হতে বর্ণিত, "মানুষ পেটের তুলনায় নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করেনা। আদম সন্তানের জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট যা তার মেরুদন্ড সোজা রাখে। তবে যদি এর অতিরিক্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"[৭৯৯] বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ক্ষুধার্ত না হলে খেয়ো না এবং পেট পরিপূর্ণ হবার আগেই খাওয়া শেষ কর। রাসূল (সা.) ও ইমামগণ এমন সব খাদ্যদ্রব্যের নাম উল্লেখ করেছেন, যা ব্যাথা উপশমসহ নানা রোগ থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। একই সাথে কুরআনে অনেক খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে। মানুষের মন-মানষিকতার ওপর খাদ্যের প্রভাবের কথাও পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে মানব-জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য আছে, তা হতে তোমরা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৮০০] মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নামাযের আগে অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

তোমরা যখন নামাযের জন্য দন্ডায়মান হবে, তখন তোমরা তোমাদের দু'হাত কনুই সহ ধৌত করবে, তারপর মাথা মাছেহ করবে, আর দুই পা গিরা পর্যন্ত ধৌত করবে।[৮০১] অযু করার সময় শরীরের এই সমস্ত অঙ্গ ধৌত করা ছাড়াও তিনবার করে হাত ধুতে হয়, কুলি করতে হয়, মুখমন্ডল ধুতে হয়, নাক পরিস্কার করতে হয়, এগুলো অযুর সুন্নাত। অযু যেমন আমাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র করে,

---

৭৯৬. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ-৭৫

৭৯৭. mnxn eLvix, প্রাগুক্ত, অধ্যায় খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যগ্রহণ অধ্যায়, হাদীস নং ৫০৪২

৭৯৮. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ-৭১

৭৯৯. wZiwghx, প্রাগুক্ত, অধ্যায় অধিক আহার নিষেধ, হাদীস নং-২৩৮০

৮০০. আল-কুরআন ২ : ১৫৮

৮০১.আল-কুরআন ৫ : ৬

তেমনি এর প্রতিটি ধাপ আমাদের শরীরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে সহয়তা করে, রোগ-ব্যাধি মুক্ত রাখতে সহয়তা করে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসলেরও নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের জন্য যে সব নিয়ম মেনে চলা জরুরী, যেগুলো মেনে চললে স্বাস্থ্য সুন্দর থাকে, রোগ ব্যাধি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চা। এগুলোর মধ্যে শারিরীক পরিচ্ছন্নতা, কাপড়-চোপড়ের পরিচ্ছন্নতা, হাত, মুখ, দাঁত, নখ, পা, ইত্যাদির যত্ন, খাওয়া-দাওয়ার সময় সতর্কতা, হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় সতর্কতা, থুথু ফেলায় সাবধানতা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, ইত্যাদি। পরিস্কার পচ্ছিন্নতা বা ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চার মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। ইসলামে মুসলমানদের সর্বোচ্চ পরিচ্ছন্নতা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর নিয়মগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে এর প্রতিটি বিষয় আমাদের শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে এবং রোগ-ব্যধি মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। অতএব, মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মধ্যেই রয়েছে সকল প্রকার মঙ্গল।

কর্মকৌশল - ৭ : রোগ নির্ণয়ে যথাযথ পদ্ধতি গ্রহণ

রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ (Epidemiological Surveillance) পদ্ধতিকে বিস্তৃত করে রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।[৮০২] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোগ সংক্রমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।"[৮০৩] অপরদিকে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসেও নবীজির একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে। "রোগ সংক্রমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কোনো উট চর্মরোগে আক্রান্ত হলে অন্য উট তার সংস্পর্শে এসে চর্ম রোগাক্রান্ত হয়। তখন তিনি বললেন, এটা তাক্‌দীর! তা না হলে প্রথম উটটিকে কে চর্ম রোগাক্রান্ত করেছে?"[৮০৪]

উপরোক্ত হাদীসসমূহের ভাষ্য হচ্ছে রোগ সংক্রমণের কোন বাস্তবতা, অস্তিত্ব বা সত্যতা নেই। তবে অসূস্থ উটগুলোকে সুস্থ উট থেকে দুরে রাখতে হবে। কারণ জীবাণুর সংক্রামন অনেক সময় রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৮০৫] পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী হয়। মহান আল্লাহ মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, মানুষকে ক্ষতিকর বস্তু থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। সঠিকভাবে জীবন-যাপন করা মানুষের বুদ্ধিরই পরিচয়। কিন্তু মানুষ যদি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক বিধাণাবলী সঠিকভাবে মেনে না চলে তাহলে তার জীবনীশক্তি ক্রমান্বয়ে দূর্বল হতে থাকে। জীবনীশক্তি দূর্বল হলে রোগ প্রতিরোধ শক্তিও দূর্বল হয়ে পড়ে। দূর্বল জীবনীশক্তি খুব সহজেই রোগ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। ফলে, যে কোন প্রণীই খুব সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তার নিকটে যদি কোন রোগাক্রান্ত প্রাণী বা রোগ-জীবাণু অবস্থান করে তাহলে সে খুব সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। বস্তুঃত একেই আমরা ছোঁয়াচে রোগ বলি। একই পরিবেশে বসবাস করে জীবনীশক্তি সবল প্রাণী ছোঁয়াচে রোগে আক্রন্ত হয় না। রোগাক্রান্ত হওয়ার জন্য দূর্বল জীবণীশক্তি দায়ী। স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন-যাপন না করা এর মূল কারণ। বর্তমান যুগকে বলা হয় প্রচারের যুগ। ইসলামী জ্ঞান কাজে লাগিয়ে

৮০২. RvZxq ¯v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৮০৩. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৫৩৯

৮০৪. cÖv¸³, হাদীস নং ৩৫৪০

৮০৫. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ-৬৫-৬৬

বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে জনসাধারণকে যেমন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ (Epidemiological Surveillance) পদ্ধতিকে বিস্তৃত করে রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

কর্মকৌশল - ৮ : গ্রহণযোগ্য ওষুধনীতি প্রণয়ন

স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের জন্য স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধ নীতিকে আরও গ্রহণযোগ্য এবং উন্নত করতে হবে। বর্তমান সময়ের চাহিদা, নিরাপত্তা, উপকারিতা, ক্রয় ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বস্তরে জরুরী ওষুধের সহজ পাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।[৮০৬] স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের জন্য স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধ নীতিকে আরও গ্রহণযোগ্য এবং উন্নত করতে হবে। আন্তার্জাতিক মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদন, যৌক্তিক মূল্যে জনগণের কাছে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ ও বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ওষুধনীতি যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। ওষুধ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও উৎপাদিত ওষুধ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় ওষুধনীতি-২০০৫ আধুনিকায়ন ও যুগপযোগীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। ওষুধের আইন-কানুন (ড্রাগ-এ্যাক্ট-১৯৪০, ড্রাগ রুলস ১৯৪৫, ১৯৪৬, ড্রাগ অর্ডিনেন্স ১৯৮২ এর সংশোধনীসহ ওষুধ নীতি-২০০৫) সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। Essential Drug List বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ Model List অনুসরণে হালনাগাদ করা হয়েছে। ওষুধ শিল্পে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রবর্তিত জি. এম. ডপ. গাইড লাইন অনুসরণে Inspection Cheak List মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়েছে। ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী, ঢাকাকে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতায় ন্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবরেটরীকে ইতোমধ্যে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এন. ডস. এল) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এন. সি. এল. এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি ও স্থাপন করা হয়েছে। ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহারের (Rational use of Drug) উদ্দেশ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোষ্টার, A.D.R. Form, Code of Pharmaceutical Marketing মুদ্রণ ও পুনঃমুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে। ওষুধ শিল্পে কর্মরত অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট ও কেমিস্টদের জি.এম.পি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে অব্যাহত রয়েছে।[৮০৭]

ওষুধনীতিতে ওষুধ তৈরির মাপকাঠিতে নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন:

- এক এ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে অন্য কোনো এ্যান্টিবায়োটিক বা করটিকস্টিরয়েড বা অন্য কোনো দ্রব্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ করে ওষুধ তৈরি করা নিষিদ্ধ। শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক এ্যান্টিবায়োটিক যেমন টেট্রাসাইক্লিন, তরল আকারে তৈরি করা যাবে না।
- এনালজেসিকসের কোন প্রকার সংমিশ্রণ তৈরি করা যাবে না, কেননা এর কোনো থেরাপিউটিক সুবিধা নাই। বরঞ্চ এটা বিষক্রিয়াতে সাহায্য করে যা বিশেষ করে কিডনির জন্য ক্ষতিকারক। লৌহ, ভিটামিন বা মদের সঙ্গে সংমিশ্রণ করে এনালজেসিক ওষুধ তৈরি নিষিদ্ধ।
- কোডিন কোনো সংমিশ্রণে ব্যবহার করা যাবে না, কেননা এটা নেশা সৃষ্টি করে।

---

৮০৬. RvZxq ¯^v¯’bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৮০৭. evrmwiK ev‡RU 2014-2015, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

- সাধারণভাবে কোনো সংমিশ্রণ ওষুধ তৈরি করা যাবে না, যদি না কোনো প্রকারেই কোনো একক উপাদানের ওষুধ পাওয়া না যায় অথচ চিকিৎসার জন্য কোনো একক উপাদানের ওষুধ মূল্যের দিক দিয়ে যৌক্তিক কিছু নয়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম থাকবে, যেমন, চোখ, চর্ম, শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত ওষুধ, ম্যালেরিয়ার জন্য ওষুধ এবং ভিটামিন ও সালফার ড্রাগ ইত্যাদি।
- একমাত্র ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ব্যতীত সব ধরনের ভিটামিন একক উপাদানে আলাদাভাবে তৈরি করতে হবে। অবশ্য বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন বি^{১২} সংমিশ্রণ করা যাবে না। বি^{১২} সব সময়েই একক উপাদানে ইঞ্জেকশন হিসাবে তৈরি করতে হবে। বি-কমপ্লেক্সের উপাদানগুলি পৃথকভাবেও তৈরি করা যাবে। কিন্তু বি-ভিটামিন এর সঙ্গে অন্য কোনো উপাদান, যেমন খনিজ ইত্যাদি সংমিশ্রণ করা যাবে না। এসব ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইঞ্জেকশন রূপে তৈরি করা যাবে। ভিটামিন তরল আকারে তৈরি করা যাবে না, কেননা এতে খরচ বেশি পড়ে এবং ওষুধের অপব্যবহার হয়। তবে শিশুদের জন্য তরল মাল্টিভিটামিন তৈরি করা যাবে। কিন্তু এতে কোনো বি^{১২}, ই, কে অথবা খনিজ মেশান যাবে না।
- কোনো কাশের সিরাপ, কাশের লজেন্স, গ্রাইপ ওয়াটার, এ্যালকালিস ইত্যাদি তৈরি করা বা আমদানি নিষিদ্ধ। কেননা এইসব ওষুধে খুব অল্প পরিমাণে ওষুধিগুণ থাকে। এইসব ওষুধ আমদানিতে শুধু আমাদের বৈদেশিক টাকার অপচয় হয়।
- টনিক, এনজাইম সিরাপ এবং তথাকথিত শক্তি বর্ধক ওষুধ প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হয় মূলতঃ ক্রেতার অজ্ঞতার কারণে। "প্যানক্রিয়াটি" এবং ল্যাকটজ ব্যতীত অন্য ওষুধের কোন কার্যকারিতা নেই। কাজেই এখন হতে এ ধরনের ওষুধের আমদানি বা তৈরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য "প্যানক্রিয়াটি" এবং ল্যাকটজ একক উপাদান হিসাবে আমদানি বা তৈরি করা যাবে।
- কিছু কিছু ওষুধ গঠনের দিক দিয়ে অন্য ওষুধের তুলনায় খুব অল্প পরিমাণে ভিন্ন, কিন্তু রোগ নিরাময় ক্ষমতা একইরূপ। এর ফলে ডাক্তার ও রোগী উভয়েই বিভ্রান্ত হয়। এ ধরণের ওষুধ তৈরি নিষিদ্ধ।
- যে সমস্ত ওষুধে অতি অল্প মাত্রায় কিংবা আদৌ কোনো ওষুধিগুণ নেই, বরঞ্চ কখনো কখনো তা ক্ষতিকারক এবং যা অপব্যবহারে দুষ্ট, সে সমস্ত ওষুধ নিষিদ্ধ করা হবে।
- সমস্ত প্রেসক্রিপশন–রাসায়নিক ও গ্যালেনিক্যাল (Galenical) মিশ্রণ যা ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া বা ফার্মাসিউটিক্যাল কডেক্স এর সাম্প্রতিক সংস্কারণে উল্লেখিত নাই, তা নিষিদ্ধ হবে।
- নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ, যদিও তাদের গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং অপব্যবহারের সম্ভাবনা অজানা নয়, তবুও ঝুঁকি সত্ত্বেও তাদের নিরাময় করার ক্ষমতার জন্য, নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবহারের জন্য স্বল্প পরিমাণে তৈরি করার অনুমতি দেয়া হবে। এই ওষুধগুলি শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ-ডাক্তাররাই প্রেসক্রাইব করতে পারবেন।
- সমপ্রকৃতির কিংবা প্রায় কাছাকাছি কোন বিকল্প ওষুধ যা এদেশেই তৈরি করা যায় সে ধরনের কোনো ওষুধ আমদানি করা যাবে না। এটা করা হচ্ছে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার স্বার্থে। অবশ্য যদি কোনো ওষুধ চাহিদার তুলনায় স্বল্প মাত্রায় উৎপাদিত হতে থাকে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নিষেধের ব্যত্যয় ঘটান হবে।

- ওষুধ তৈরির মৌল কাঁচামাল যদি যথেষ্ট পরিমাণে দেশেই উৎপাদিত হয় তবে সেটা বা তাঁর বিকল্প কাঁচামাল আমদনি করা যাবে না।
- বহুজাতিক কোম্পানিগুলি যারা এদেশে ওষুধ সরবরাহ করছেন তাদেরকে প্রশংসা করতেই হয়। তাদের উন্নতমানের মেসিনপত্র ও কারিগরী জ্ঞান যাতে গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন ধরণের ওষুধ তৈরিতে নিয়োজিত থাকতে পারে, সেজন্য এন্টাসিড ও ভিটামিন এর মতন সাধারণ ওষুধগুলি তৈরির দায়িত্ব কেবলমাত্র দেশী কোম্পানিদের হাতেই থাকবে। বহুজাতিক কোম্পানিকে অবশ্য একক উপাদানে ভিটামিন ইঞ্জেকশন তৈরির অনুমতি দেয়া হবে।
- কোনো বিদেশী ব্র্যান্ড ওষুধ লাইসেন্সের মাধ্যমে এদেশে কোন কারখানায় উৎপাদন করা যাবে না, যদি সেই ওষুধ বা সেই ধরনের ওষুধ এদেশে তৈরি বা সহজলভ্য হয়। কেননা এই নিয়মের ফলে ওষুধের অহেতুক মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং বিদেশে রয়ালটিও পাঠাতে হয়। এই নীতির আলোকে সমস্ত চালু লাইসেন্স চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।
- যেসব বহুজাতিক কোম্পানি নিজস্ব কোনো কারখানা এদেশে নাই, কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো কারখানায় টোলের বিনিময়ে ওষুধ তৈরি করতে চায়–সে সমস্ত কোম্পানিকে অনুমতি দেয় হবে না।[৮০৮]

ওষুধনীতির মূল লক্ষ্যসমূহে নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন:

- সাধারণ মানুষের ক্রয়সাধ্য মূল্যে উপকারী, কার্যকর, নিরাপদ ও ভাল মানসম্পন্ন অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য ওষুধ সহজে পেতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিজ্ঞাপনের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা যাতে ওষুধ ও স্বাস্থ্য বিষয়াবলির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের দ্বারা সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হয়।
- নকল, ভেজাল, নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত, বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা এবং অনুরূপ কাজসমূহের দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।
- ওষুধ প্রস্তুতকারীগণকে তাদের সকল ওষুধ উৎপাদনের সর্বোত্তম পরিচয় প্রদানের উপযোগী জেনেরিক বা ফর্মুলারী নামে এবং পণ্য অথবা ব্রান্ড নামে ওষুধের উৎপাদন, বিতরণ ও বিক্রয় করার অনুমতি প্রদান।
- সরকার কর্তৃক সময়ে তালিকাভুক্ত ও হালনাগাদকৃত সাধারণভাবে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সমূহের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বর্তমান পদ্ধতি অব্যাহত রাখা।
- ব্যবস্থাপত্র প্রদানকারী (Prescriber) এবং প্রান্তিক ব্যবসায়ীদেরকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে দেশের ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়াসমূহের ADR (Adverse Drug Reaction) উপযুক্ত পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা।

[৮০৮]. মজনু-নুল হক, wZ³ I la, iæMY wPwKrmv I wRw¤§ RbMY, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রি. পৃ. ৬৩-৬৫

Dhaka University Institutional Repository

<u>কর্মকৌশল - ৯ : পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদারকরণ</u>

জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন, সহজপ্রাপ্যতা, ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।[৮০৯] জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে সীমিত ভৌগোলিক পরিমন্ডলে ব্যাপক জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, জলবায়ু, পরিবেশ ও যোগাযোগ অবকাঠামোসহ মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা কষ্টসাধ্য হবে। প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইসলাম সমর্থন করে না। আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইসী বলেন, আমি শুনেছি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মসজিদের মিম্বারের উপর উঠে বলছিলেন; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সব কাজই নিয়াত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোন মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।[৮১০] প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে এক দিকে যেমন অর্থের অপচয় হয় অন্য দিকে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি করে। জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিত পরিবার গঠন করে জনসংখ্যাকে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলায় ইসলামের উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে মহান রাব্বুল আল-আমীন পবিত্র কুরআন মজীদে বলেছেন,

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

তোমরা অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও (আমি দেব)।[৮১১]

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا

পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দ্বায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয়।[৮১২]

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّـهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ

কত প্রাণীই রয়েছে যারা তাদের রিযিক বহন করে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদের ও তোমাদের রিযিক দান করেন।[৮১৩]

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

তিনিই আসমান ও যমীনের যাবতীয় ভান্ডারের অধিকারী। তিনি যাকে খুশী বেশী এবং যাকে খুশী কম রিযক দান করেন।[৮১৪]

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

নিশ্চয় আমি যাবতীয় বস্তু পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছি।[৮১৫]

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

আমার নিকট সব জিনিসের ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ (সেখান থেকে) নাযিল করে থাকি।[৮১৬]

---

[৮০৯]. RvZxq ¯^v¯¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৮১০]. ইমাম বুখারী (র), Cv¸³, খন্ড ১ম, ওহীর সূচনা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১, হাদীস নং ১

[৮১১]. আল-কুরআন ১৭ : ৩১

[৮১২]. আল-কুরআন ১১ : ৬

[৮১৩]. আল-কুরআন ২৯ : ৬০

[৮১৪]. আল-কুরআন ৪২ : ১২

[৮১৫]. আল-কুরআন ৫৪ : ৪৯

[৮১৬]. আল-কুরআন ১৫ : ২১

অতএব, জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন, সহজপ্রাপ্যতা, ও সরবরাহের বিষয়ে মননিবেশ না করে ওষুধ ব্যতীত পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

কর্মকৌশল - ১০ : পুষ্টি শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি পুষ্টি এবং একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট থাকবে। এগুলোর কর্মকান্ড প্রত্যান্ত অঞ্চল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সমন্বিত ভাবে উপজেলা পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।[৮১৭] স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের জন্য এটা একটা ভালো পদক্ষেপ। বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান দূর্বল। বিশেষ করে জনসংখ্যা অনুপাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ নার্স, প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা কম হওয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। দক্ষ মানব সম্পদের সংখ্যা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ নার্স, প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরি, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ নার্স তৈরির জন্যও পর্যপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ সকল প্রশিক্ষিত জনবলের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মানকে উন্নত করা সম্ভব। ইসলামের আলোকে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে এ সকল নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীই হলো শিক্ষা তথা জ্ঞান সম্পর্কিত। মহান আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۙ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۚ

"পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পড়ুন এবং আপনার প্রতিপালক অতিব সম্মানিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা, যা সে জানত না।"[৮১৮] শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের নীতি হলো- শিক্ষা সকল মুসলিমের উপর ফরয। মহানবী (সা.) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) উপর অত্যাবশ্যক।"[৮১৯]

বাংলাদেশে পুষ্টি-হীনতা সংক্রান্ত ব্যাধিসমূহ, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের হার কমেছে। আবার লিঙ্গ বৈষম্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে পুষ্টি-হীনতার দরুন কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মের হার বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশ এবং স্থান ও আর্থ-সামাজিত অবস্থাভেদে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তস্বল্পতার পরিমাণ ৬০-৮০ শতাংশ।[৮২০] সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একমাত্র ইসলামী জীবন-বিধানের মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব। মানুষের মঙ্গলের জন্য মহান আল্লাহ খাদ্য-দ্রব্যের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।[৮২১] মহান আল্লাহ আরও বলেন,

---

৮১৭. RvZxq ¯^v¯’bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৮১৮. আল-কুরআন ৯৬ : ১-৫

৮১৯. ইবনে মাজা, cv¸ ³, কিতাবুল মুকাদ্দিমাহ, অধ্যায়: ১৭

৮২০. RvZxq ¯^v¯’bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৮২১. আল-কুরআন ৮০ : ২৪

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ তা ব্যতিত। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহর কাজ।[৮২২]

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন, তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।[৮২৩] মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

দু'টি সমুদ্র সমান হয় না-একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য অলংকার আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৮২৪]

اللَّـهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

আল্লাহ তোমাদের জন্যে চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোনটিকে ভক্ষণ কর।[৮২৫] যমিনে খাদ্য ও পুষ্টি তৈরি এবং চাষাবাদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এ গুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে।[৮২৬]

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

---

[৮২২]. আল-কুরআন ৫ : ৩

[৮২৩]. আল-কুরআন ৫ : ৪

[৮২৪]. আল-কুরআন ৩৫ : ১২

[৮২৫]. আল-কুরআন ৪০ : ৭৯

[৮২৬]. আল-কুরআন ৬ : ৯৯

আমি তাতে সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং সেখানে প্রবাহিত করি ঝর্ণাধারা।[৮২৭]

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ

এবং দন্ডায়মান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর।[৮২৮]

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ

সেখানে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ।[৮২৯]

কর্মকৌশল - ১১ : নারী স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ

লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে উত্তম শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মাতৃ মৃত্যু ও এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার কমানোর উপর জোর দিয়ে নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করতে হবে। নারীদের বিশেষত: গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য যৌনরোগ হতে রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নারী বান্ধব কাঠামো তৈরী করতে হবে।[৮৩০] এটি সরকারের একটি ভালো কর্মকৌশল। স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা[৮৩১] জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের সমতা ভিত্তিতে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার মতো ভাল উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নারী ও পুরুষের অধিকার সম্পর্কে মহান আল্লাহ কোন বৈষম্য সৃষ্টি করেন নি। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ

মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন।[৮৩২] ম্যাটারনাল হেলথ্ সার্ভিসেস ও মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীমের মাধ্যমে মহিলাদের বিশেষত: গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ প্রসবসহ পুষ্টির উন্নতিসাধন করা প্রয়োজন। এ সকল কার্যক্রম নারীদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বিধায় নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এইডস এস.টি.ডি.সহ সংক্রামক ব্যাধি ও অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় নারীর সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস পাচ্ছে। সংক্রামক ও অন্যান্য ব্যাধিতে নারীদের আক্রান্ত হওয়ায় ঝুঁকি বেশি বিধায় নারীরা তুলনামূলকভাবে অধিক উপকৃত হবে।[৮৩৩]

কর্মকৌশল - ১২ : মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুরোধ

মাতৃ মৃত্যুর হার ও প্রজনন হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমানোর জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গ্রাম ও শহর এলাকায় প্রান্তিক মানুষের কাছে এসব সেবা আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছাতে হবে। সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সমন্বিতভাবে দিলে তা জন-বান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি কার্যকরভাবে সমন্বয় করাতে হবে।[৮৩৪] মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার যদিও ক্রম হ্রাসমান তবুও প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত এখনও বেশি। প্রজনন-কালীন রুগ্নতা,

[৮২৭]. আল-কুরআন ৩৬ : ৩৪

[৮২৮]. আল-কুরআন ৫০ : ১০

[৮২৯]. আল-কুরআন ৫৫ : ১১

[৮৩০]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

[৮৩১]. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৮৩২]. আল-কুরআন ৪২ : ৮

[৮৩৩]. evrmwiK ev‡RU 2014-2015, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পৃ. ৬

[৮৩৪]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী মৃত্যুই এ উচ্চ হারের মূল কারণ। এছাড়া এ উচ্চহারের অন্যান্য প্রধান কারণ হলো: প্রাথমিক এবং মাতৃসেবার অপর্যাপ্ততা, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে সচেতনতার অভাব, শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর অপর্যাপ্ততা।[৮৩৫] ইসলামের সুমহান নীতি-পদ্ধতি পালনের মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবানে শুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নবজাতক ও প্রসূতিমৃত্যুর হারহ্রাস করা সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّـهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।[৮৩৬] সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে ২০০১ সালের ৩২২ থেকে কমে ২০১০ সালে ১৯৪ হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে সম্পাদিত সার্ভের ফলাফল অনুযায়ী প্রতি প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণকারীর হার (কমপক্ষে এক বার) ২০০১ সালের ৪৭.৬% থেকে ২০১১ সালে ৬৮% এ উন্নীত হয়েছে, দক্ষ সেবা গ্রহণকারীর সহায়তায় প্রসবের হার ২০০১ সালের ১২% থেকে ২০১১ সালে ৩২% এ উন্নিত হয়েছে, প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণকারীর হার ২০০১ সালের ১০.৬% থেকে ২০১১ সালে ২৭% এ উন্নীত হয়েছে, প্রসব সম্পর্কিত জটিলতার জন্য সেবা গ্রহীতার হার ২০০১ সালের ৫২.৭% থেকে ২০১০ সালে ৬৭.৯% এ উন্নীত হয়েছে এবং জন উর্বরতার হার (TFR) ২০০৭ সালের ২.৭ থেকে কমে ২০১১ সালে ২.৩ হয়েছে।[৮৩৭] মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।[৮৩৮] পবিত্র কুরআনের এ সকল জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার মাধ্যমে মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হারকে হ্রাস ও এ সকল বিষয়ে উন্নত সেবা প্রদান করা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি।

---

[৮৩৫]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৮৩৬]. আল-কুরআন ৩১ : ৩৪

[৮৩৭]. 2010-2011 I 2011-2012 A_© eQ‡ii Kvhv©ej mgwš^Z ewlK cwZ‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

[৮৩৮]. আল-কুরআন ৪৬ : ১৫

কর্মকৌশল - ১৩ : সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ

একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Intergrated Management Information System) এবং কম্পিউটার নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা সারাদেশে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মনিটরিং-এর জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।[৮৩৯] আধুনিক যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারের এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে দৈনন্দিন উপস্থিতি ও কাযকর্ম তদারকি ও সহজে তথ্য আদান প্রদান করতে পারবেন। প্রয়োজনে এ সকল প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজ অফিসে বসেই টেলি/ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব এবং এই প্রযুক্তির মাধ্যমে জরুরী তথ্য অল্প সময়ে দ্রুততার সঙ্গে অধিক লোকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব।

কর্মকৌশল - ১৪ : স্বাস্থ্য সেবার সকল স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন করতে হবে।[৮৪০] বর্তমানে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ২০১০; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮; জনস্বাস্থ্য (জরুরী বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৪৪; ম্যালেরিয়া নির্মূল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৬১; বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া নির্মূল বোর্ড (রিপিল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৭; ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮; মহামারী রোগ অ্যাক্ট ১৮৯৭; টিকা অ্যাক্ট ১৮৮০; আবশ্যিক সার্ভিসেস (দ্বিতীয়) অধ্যাদেশ, ১৯৫৮; মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৮০; মেডিকেল কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ১৯৬৩; বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩; ফার্মেসি অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬; ড্রাগস অ্যাক্ট, ১৯৪০; ড্রাগস (সংশোধন) আইন, ১৯৬৩; ড্রাগস (কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২; ড্রাগস (সাপ্লিমেন্টারি বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬; ড্রাগস (কন্ট্রোল) (সংশোধন) আইন, অধ্যাদেশ, ২০০৬; উদরাময় রোগ গবেষণা অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বাংলাদেশ; উদরাময় রোগ গবেষণা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮; পাকিস্তান অর্ডার অফ মেডিক্যাল সার্ভিস (রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৬৩; মেডিকেল প্রাকটিস ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও গবেষণাগার (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২; মেডিকেল প্রাকটিস ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও গবেষণাগার (রেগুলেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪; মেডিকেল কাউন্সিল আইন, ১৯৭৩; মেডিকেল কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬; মেডিকেল ডিপ্লোমা অ্যাক্ট ১৯৩৯; মেডিকেল কলেজ (সরকারি সংস্থা) অধ্যাদেশ, ১৯৬১; মেডিকেল ডিপ্লোমা (আইন রহিত) আইন, ১৯৬৬; মেডিকেল ডিগ্রী আইন, ১৯১৬; এলোপ্যাথিক সিস্টেম (অপব্যবহার প্রতিরোধ) অধ্যাদেশ; বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিস অধ্যাদেশ, ১৯৮৩; চিকিৎসক বাংলাদেশ কলেজ এবং সার্জন অর্ডার, ১৯৭২; বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রাকটিস অধ্যাদেশ, ১৯৮৩; ইউনানী, আয়ুর্বেদী ও হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬৬; মানব দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯; ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫; ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫; নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন, ২০০২; আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯; বুকের দুধের পরিপূরক (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪; মাতৃদুগ্ধ বিকল্প খাদ্য (বিপনন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৩; শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট

---

৮৩৯. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৮৪০. cÖv¸³, পৃ. ১১

আইন, ২০০২; এ সকল আইন প্রচলিত রয়েছে।[৮৪১] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটি স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ও পুষ্টিনীতির আলোকে কর্মকান্ড পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংস্কার, জনবল নিয়োগ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, কর্মীদের কর্মজীবন পরিকল্পনা, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা নীতিসহ, স্বাস্থ্যসেবার সঠিক উন্নয়ন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারে। সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজগুলো সম্পাদনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করে কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। সময়ে সময়ে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

কর্মকৌশল - ১৫ : স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা

স্বাস্থ্য খাতে ব্যাবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়ের উপর চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্য খাতে নিয়োজিত অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে।[৮৪২] বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান দূর্বল। বিশেষ করে জনসংখ্যা অনুপাতে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা কম হওয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ সকল বিষয়ের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণালয়, প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা ও দূর্বল ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে দায়ী। দক্ষ মানব সম্পদের সংখ্যা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ নার্স, প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। ইসলামে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান রূপে গঠন করা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমাদের রাসূলের মধ্যে।[৮৪৩] মূলত তিনি মানুষকে উন্নত নৈতিকতা শিক্ষাদানের শিক্ষক হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বাণী, 'আমি তোমাদের মধ্যে শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।'[৮৪৪] আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জটিল রোগসমূহের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা অপ্রতুল যা চিকিৎসাখাতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হচ্ছে ও উন্নত দেশসমূহে প্রয়োগ করা হচ্ছে। চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, প্যারামেডিক ও টেকনোলজিস্টদের শিক্ষা, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী, গণমুখী ও দেশের প্রয়োজনভিত্তিক করার জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে।

কর্মকৌশল - ১৬ : বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও-কে স্বাস্থ্য সেবায় সম্পৃক্তকরণ

বেসরকারি ও এনজিও সংস্থাগুলোকে স্বাস্থ্য সেবায় সম্পূরক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা হবে। বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা রোগীদের সঠিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি

[৮৪১]. http://mohfw.gov.bd/

[৮৪২]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৮৪৩]. আল-কুরআন ৩৩ : ২১

[৮৪৪]. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজা, mybvb Be‡b gvRv, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ.১২০

নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরী করা ও প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যায় সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে।[৮৪৫] সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ইসলামে অধিকার। স্বাস্থ্যখাতে এনজিওগুলোর কার্যক্রম ১৯৭০ থেকে শুরু হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া কিছু এনজিও সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে যক্ষা, কুষ্ঠ, টিকা ও পুষ্টিখাতে সহযোগীতা করছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (DFID), বিশ্ব ব্যাংক (World Bank), জাপান ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন এজেন্সি (JICA), সেভ দ্যা চিলড্রেন (WHO), United States Agency for International Development (USAID), German Government Owned Development Bank (kfw) এ সকল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারকে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে। বাংলাদেশ সরকার চিকিৎসা খাতে বাজেট বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার গুণগতমান বৃদ্ধি ও চিকিৎসা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ধরণের এনজিও এবং ব্যক্তিখাত স্বাস্থ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ধরনের প্রচেষ্টা বৃদ্ধির মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

<u>কর্মকৌশল - ১৭ : জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা জোরদার করা</u>

স্বাস্থ্য গবেষণার মান ও পরিধি বাড়াতে হবে। এ খাতে অর্থ বরাদ্ধ বাড়ানো হবে। জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতি, সামাজিক ও আচরণগত এবং প্রায়োগিক গবেষণার উপর জোর দেয়া হবে। বাংলাদেশে যে সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, সেগুলোর গবেষণা অগ্রাধিকার পাবে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।[৮৪৬] সরকারের এ ধরনের কর্মকৌশল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। 'সুস্থ জাতি উন্নত দেশ' এই মূলমন্ত্রকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এই খাতে বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও কর্মসূচি, সেবা প্রদান ও দরিদ্র-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নে স্বাস্থ্য গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ ও প্রমাণের ভিত্তিতে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে অবশ্যই দুটো ওষুধ রয়েছে, একটি হচ্ছে কুরআন আর অপরটি মধু।"[৮৪৭] ওষুধশাস্ত্রের জনক হিসেব পরিচিত Hippocrates প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে তার রোগীর চিকিৎসায় মধু ব্যবহার করতেন। অ্যারিস্টটলও "নিয়মিত মধু সেবনে স্বাস্থ্যর উন্নতি ও দীর্ঘায়ু লাভ হয়" বলে বিশেষ ধারণা পোষণ করতেন। মধু সম্পর্কে গবেষণায় বলা হয়েছে যে মধু immunity system develop করতে সাহায্য করে। মধুতে anti-aging principles বা বার্ধক্য প্রতিরোধের উপাদান রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম মধু সম্পর্কে যা বলেছেন বিজ্ঞান তা সত্যায়ন করেছে। অপর দিকে "কালোজিরা মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের ওষুধ।"[৮৪৮] কালোজিরা ও মধু নিয়ে উচ্চতর গবেষণার মাধ্যমে অনেক জটিল ও কঠিন রোগের ওষুধ আবিস্কার হতে পারে। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক ও

[৮৪৫]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৮৪৬]. cÖv¸³, পৃ. ১১

[৮৪৭]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৪৫২

[৮৪৮]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ-২১৫-২১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ প্রয়োগধর্মী জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণা ব্যবস্থার অভাবের ফলে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং গবেষণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিঘ্নিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য গবেষণার মান ও পরিধি বাড়াতে হবে। এ খাতে অর্থ বরাদ্ধ বাড়াতে হবে। জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনানীতি, সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন এবং প্রায়োগিক গবেষণার উপর জোর দিতে হবে। বাংলাদেশে যে সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, গবেষণায় সেগুলোর অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। বিশেষায়িত নার্সিং শিক্ষা (Specialized Nursing) যেমন- কার্ডিয়াক সার্জারি, নিউরো সার্জারি, করোনারি কেয়ার ও অন্যান্য বিশেষায়িত ডিসিপ্লিনে নার্সিং শিক্ষা শুরু করতে হবে। প্যারামেডিক ও টেকনোলজিস্টের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞানসহ দক্ষতা অর্জনের উপর জোর দিতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়টির বড় বড় কোম্পানির জন্য অতি আবশ্যকীয় ব্যবস্থা। নতুন নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের সূতিকাগার এটি। এজন্য বছরের পর বছর ধরে এই গবেষণা কার্যক্রমে প্রচুর অর্থ বরাদ্ধ করতে হয়।[৮৪৯] স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং কোন বিষয়ের সূক্ষ তথ্য জানতে স্বাস্থ্য বিষয়ক ইসলামী নীতি-পদ্ধতি মেনে গবেষণা প্রয়োজন। কুরআন মাজীদে গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও, না যমিনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।[৮৫০]

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডোলে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ-সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।[৮৫১] ইসলামে কর্মপ্রেরণা, কর্মস্পৃহা ও কাজের মর্যাদার আদর্শিক ভিত্তি রয়েছে। কাজ করার শক্তি মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর এক পরম দান। এ শক্তির বলে মানুষ সৃষ্টির অন্যান্য জীবের ওপর প্রাধান্য রেখেছে এবং নিজের জীবনকে করেছে সুন্দর ও মহান। শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রগতি নির্ভর করে গুণাত্মক শ্রমের মানের ওপর। মানব সন্তানের কর্মমুখরতা ও গবেষণা কার্যক্রম বিশ্বের শান্তিধারার অন্যতম উৎস। যদি মানুষকে যথাযথভাবে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করা না যায়, তবে কোন ব্যবস্থাই সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অথবা স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি তৈরি ও ব্যবহার সম্ভব হয় না। ব্যক্তি মানুষকে তার সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সীমিত সম্পদের সর্বাধিক দক্ষতার সাথে ব্যবহার নিশ্চিত করতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অপরিশিম। ইসলামী জীবনাদর্শনে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা সহকারে চেষ্টা সাধনা করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

[৮৪৯]. মজনু-নুল হক, C/, 3, পৃ. ৪২

[৮৫০]. আল-কুরআন ১০ : ৬১

[৮৫১]. আল-কুরআন ৩৪ : ৩

"মানুষের জন্য প্রাপ্য কিছুই নেই। আছে শুধু তা যা পাওয়ার জন্য সে প্রকৃত চেষ্টা করে।"[৮৫২] অতএব, স্বাস্থ্য গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনে ইসলামের আলোকে স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করা বর্তমান সময়ের দাবি।

<u>কর্মকৌশল - ১৮ : আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করা</u>

প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করতে হবে। সে লক্ষ্যে আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারকে যথাযথ সহায়তা প্রদান, অনুদান বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৮৫৩] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম Self medication অর্থাৎ নিজের চিকিৎসা নিজে করা পছন্দ বা সমর্থন করতেন না। তিনি অসুস্থ্য হলে চিকিৎসকের নিকট যেতে পরামর্শ দিতেন। ডাক্তার ডাকতে বলতেন। কারণ চিকিৎসাবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্র অতীব জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় যিনি তা অধ্যয়ন করেননি তার পক্ষে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা সম্ভব নয়।[৮৫৪] সমাজের কল্যাণের জন্য বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবায় জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করেছে। ইউনানী চিকিৎসক প্রখ্যাত হাকীম জালিনুস বলেন, যবের সমতুল্য আর কোনো খাদ্য সৃষ্টি করা হয়নি। কারণ এ খাদ্য সুস্থ্য-অসুস্থ দুই অবস্থায় কাজ করে। এজন্য রোগীকে যবের গুড়া খাওয়ানো হয়, গমের গুড়া খাওয়ানো হয় না। কারণ যবের গুড়া পিপাসা দূর করে, রক্তের চাপ কমায়, পিত্তাধিক্য দূর করে ও পাকস্থলী পরিস্কার করে। চিনির সাথে মেশালে এটি উত্তম খাদ্যে পরিণত হয়। মূলত সকল নবী-রাসূল (সা.) এর খাদ্য ছিলো যব বা বার্লি। আর এ জন্যই মুসলমানদের জন্য তা উত্তম খাদ্য। বর্তমানে বাজারে শিশুদের জন্য যেসব গুড়া খাদ্য পাওয়া যায় তাতে যবের গুড়া অন্যতম উপাদান।[৮৫৫] হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের কারো জ্বর হলে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য 'ডালিয়া' পাকানোর নির্দেশ দিতেন। সে অনুযায়ী তা তৈরি করা হলে তিনি অসুস্থ রোগীকে পরিবেশনের জন্য পরিবারের লোকদের বলেন। তিনি বলেন, এটি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করে, যেমন তোমাদের কোন মহিলা পানি দিয়ে তার চেহারার ময়লা দূর করে।"[৮৫৬] আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে জটিল ও কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করা সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশে যেহেতু চিকিৎসকের স্বল্পতা রয়েছে সেহেতু বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব প্রদান করে দ্রুততম সময়ে অধিক সংখ্যক জনগণকে চিকিৎসাসেবার

---

[৮৫২]. আল-কুরআন ৫৩ : ৩৯

[৮৫৩]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৮৫৪]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cv¸³, পৃ ৩৩১

[৮৫৫]. cv¸³, পৃ-২৩৮

[৮৫৬]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৪৪৫

আওতায় আনার জন্য আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা সময়ের দাবী।

কর্মকৌশল - ১৯ : জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনায় বাজেট বৃদ্ধি করা

স্বাস্থ্যসেবার পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতে অর্থ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে প্রতি বছর বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। গড়ে বাংলাদেশের জিডিপির মাত্র এক শতাংশ সরকার স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বরাদ্দ করে যা মোট বাজেটের সাত শতাংশ করা প্রয়োজন।[৮৫৭] এ জাতীয় কর্মকৌশল সরকারের উচ্চমানসিকতার পরিচায়ক। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে প্রতি বছর বাজেট বৃদ্ধি করে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা ও চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং পরিবার কল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ও ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি টাকার সরকারের নিজস্ব অনুদানসহ সর্বমোট ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "Health Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP)" শীর্ষক ৩য় সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতসমূহের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল জনগণ বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধা বঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারহ্রাস; রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহারহ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।[৮৫৮]

কর্মকৌশল - ২০ : স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্তন

স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন একটি বড় সমস্যা। যদিও এ খাতে ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশই জনগণ বহন করে, তারপরেও সম্পদের ঘাটতি থেকেই যায়। এটি সমাধানের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক (formal) প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরিজীবীদের জন্য স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর্থিকভাবে দুস্থ লোকদের জন্য দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতির অভাব রয়েছে। অতি দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত উপায়ে এসব জনগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে কার্ড দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।[৮৫৯] এ ধরণের উদ্যোগের ফলে সাধারণ জনগণের চিকিৎসা প্রাপ্তি সহজ হবে। 'জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন ২০১৪' আইনের মাধ্যমে সরকার উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে। আইনের ২৯ ধারায় বলা হয়েছে সকল কার্ডধারী প্রতি পঞ্জিকা বর্ষে তফসিলে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ চাঁদা তহবিলে প্রদান করবেন। সরকার নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক বাধ্যতামূলক চাঁদা ঠিক করবে।

(ক) দারিদ্রসীমার নীচে কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা সরকার প্রদান করবে;

---

৮৫৭. RvZxq ¯v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৮৫৮. 2010-2011 I 2011-2012 A_ eQ‡ii Kvhvewj m¤úwKZ ewlK cwZ‡e'b, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৮৫৯. RvZxq ¯v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

(খ) প্রন্তিক আয়ের কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা সর্বনিম্ন হবে;

(গ) মধ্য আয়ের কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা, প্রান্তিক আয়ের কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা হতে সর্বাধিক ৫০% বেশী হবে;

(ঘ) উচ্চ মধ্যম এবং উপরের আয়ের কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা, মধ্যম আয়ের কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা হতে সর্বাধিক ৫০% বেশী হবে।

কার্ডধারীদের সুবিধা সম্পর্কে আইনের ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, রোগী সেবা প্রদানকারীর অভ্যর্থনা কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীর প্রতি সেবা প্রদান শুরু হবে। প্রত্যেক সেবাপ্রদানকারী কার্ডধারী/সুবিধাভোগীদের তফসিলে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী সেবা প্রদান করবে, যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংশোধন করা যাবে।

(১) প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী একজন কার্ডধারী বহির্বিভাগের রোগীর জন্য নিম্নবর্ণিত ন্যূনতম সেবা প্রদান করবে-

(ক) অবিলম্বে মনোনীত ইউনিটের চিকিৎসা কর্মীর মনোযোগ;
(খ) ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ;
(গ) ব্যবস্থা পত্র (Prescrition);
(ঘ) ষ্টোরে থাকা সাপেক্ষে বিনামূল্যে ওষুধ;
(ঙ) রোগ নির্ণয়, পরীক্ষাগার ও অন্যান্য মেডিকেল পরীক্ষার সেবা;
(চ) উপযুক্ত সেবা প্রদানকারীর নিকট জরুরী স্থানান্তর।

(২) প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী একজন আন্ত:রোগী কার্ডধারীকে নিম্নবার্ণত ন্যূনতম সেবা প্রদান করবে-

(ক) বিনামূল্যে বাসস্থান এবং খাবার-দাবার;

(খ) অস্ত্রোপচার সুবিধা;

(গ) ২৪ ঘন্টা চিকিৎসা সুবিধা;

(ঙ) অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত বহির্বিভাগের রোগীদের জন্য প্রদেয় সেবা;

(ঙ) উপযুক্ত সেবা প্রদানকারীর নিকট জরুরী স্থানান্তর বা রেফারেল।

(৩) কর্তৃপক্ষ সময় সময় অনুচ্ছেদ ১ এবং ২ এ উল্লিখিত সেবা ছাড়াও কার্ডধারীদের প্রদেও সেবা নির্ধারণ করতে পারবে।[৮৬০]

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।[৮৬১]

---

৮৬০. RvZxq ¯^v¯’¨ mi¶v AvBb 2014, প্রাগুক্ত

৮৬১. 2010-2011 I 2011-2012 A_© eQ‡ii Kvh©ei¨j m¤ú©wKZ ewl©K cÖwZ‡e`b, প্রাগুক্ত, পৃ. iii

কর্মকৌশল - ২১ : স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারি-বেবসরকারি খাতের সমন্বয় সাধন

সর্বস্তরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণ, স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা হবে।[৮৬২] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় যদি এসব বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করতো তাহলে একদিকে যেমন অকারণে মানুষের জীবনীশক্তি দূর্বল হওয়া থেকে রক্ষা পেতো অপর দিকে অনেক ওষুধ ও অর্থের সাশ্রয় হতো। মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এ ধরণের কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করতে পারে। বিদ্যমান জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি, থানা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি, ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কমিটি এবং ওয়ার্ড পরিবার পরিকল্পনা কমিটিকে সক্রিয় করে পরিকল্পিত পরিবার গঠন কার্যক্রমকে গতিময়তা (Momentum) আনা সম্ভব। থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটিগুলোর সভা আয়োজন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকাগুলোতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করতে পারে।[৮৬৩] এ সকল সংস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমসহ পরিকল্পিত পরিবার গঠন করা সম্ভব। এছাড়াও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ধরণের এনজিও এবং ব্যক্তিখাত স্বাস্থ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কর্মকৌশল - ২২ : স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি সংগঠনগুলোর কার্যক্রম জোরদার করা

স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (BMA), বাংলাদেশ প্রায়ভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোসিয়েশন (BPMPA), আয়ুর্বেদিক মেডিকেল এসোসিয়েশন, ইউনানি মেডিকেল এসোসিয়েশন ও হোমিওপ্যাথি মেডিকেল এসোসিয়েশন নার্সিং এসোসিয়েশন ইত্যাদি পেশাজীবী সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করতে হবে।[৮৬৪] এটি সরকারের পক্ষ হতে একটি ভালো উদ্যোগ। মহান আল্লাহ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করা সম্পর্কে বলেন,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।[৮৬৫] এখানে রিযিক থেকে ব্যয় করার অর্থ হলো অভাবী লোকদের চিকিৎসা সেবায় ব্যয় করা। সরকারের নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সামগ্রিকভাবে দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করা ইসলামের রীতি-নীতিরই অন্তর্ভূক্ত।

কর্মকৌশল - ২৩ : হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী করা

সকল স্তরের হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত ও দেশব্যপী তার বিস্তার করতে হবে।[৮৬৬] সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। হযরত আবূ

---

[৮৬২]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৮৬৩]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৮৬৪]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৮৬৫]. আল-কুরআন ৪২ : ৩৮

[৮৬৬]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

মালিক আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ বা অর্ধেক।"[৮৬৭] স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে কমিউনিটি হেল্থ বা জনস্বাস্থ্য অটুট রাখার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অপবিত্রতা, অপরিচ্ছন্নতা, নোংরামী, পছন্দ করতেন না। সুতরাং আমাদের সকলকে সর্বদা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। বস্তুত সকল স্তরের হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও ব্যায় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত ও দেশব্যপী তার বিস্তার করতে ইসলামী আদর্শ মেনে চলতে হবে।

<u>কর্মকৌশল - ২৪ : স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ উন্নয়ন</u>

স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ থেকে জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ সুফল অর্জনের লক্ষ্যে সর্বস্তরে সঠিক ও চাহিদাভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্টসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মীর স্বল্পতা ও অসম বন্টন ব্যবস্থা, দক্ষতা সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভারসাম্যহিনতা, ন্যায়বিচার ও প্রণোদনার অভাব দূর করার ব্যবস্থা মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশলে রাখতে হবে। চাহিদা যাচাই করে অতিরিক্ত জনশক্তি (ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, প্যারামেডিক প্রভৃতি) তৈরির পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বাস্থ্য জনশক্তির সকল স্তরে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির স্বচ্ছ নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।[৮৬৮] এ ধরনের সিদ্ধান্ত বর্তমানে সময়ের দাবি। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ীত হলে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি পাবে। এ দেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান দূর্বল। বিশেষ করে জনসংখ্যা অনুপাতে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা কম হওয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ সকল বিষয়ের জন্য দূর্বল ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে দায়ী। আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের বিপুল ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে জনসংখ্যার বিরাট অংশ অজ্ঞ ও অদক্ষ লোকের স্বাস্থ্যসেবা নিতে বাধ্য হচ্ছে। দক্ষ মানব সম্পদের সংখ্যা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ নার্স, প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরি, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ নার্স তৈরির জন্য পর্যপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। ইসলামে শিক্ষাকে মানব সম্পদ উন্নয়নে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানুষকে তার নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে ইসলামের যে জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনে অত্যাবশ্যক তা অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীই হলো শিক্ষা তথা জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত। মহান আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন;"[৮৬৯] শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের নীতি হলো-শিক্ষা সকল মুসলিমের উপর ফরয। মহানবী (সা.) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) উপর অত্যাবশ্যক।"[৮৭০]

জ্ঞানগত ফরয পালনে জনসাধারণের পেশাগত দক্ষতা ও মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত

---

[৮৬৭]. ইমাম মুসলিম (র), C¦¸ ³, পাক-পবিত্র অধ্যায়, হাদীস নং ৪২৭

[৮৬৮]. R¦Z¨q ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৮৬৯]. আল-কুরআন ৯৬ : ১-৫

[৮৭০]. ইবনে মাজা, C¦¸ ³, কিতাবুল মুকাদ্দিমাহ, অধ্যায়: ১৭

দেশসমূহে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নূতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ হচ্ছে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জটিল রোগসমূহের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা অপ্রতুল যা চিকিৎসাখাতে বড় বাধা। এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি, রাষ্ট্রকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত, জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হলে সর্বপ্রথম এদেশের জনগণকে উন্নত মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। মানব উন্নয়ন মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ অর্থাৎ উৎপাদন কর্মে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে মানুষের কারিগরী দক্ষতা বা ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইসলামী নীতি ও শিক্ষা মেনে চললে জনসংখ্যা অনুপাতে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য সকল পর্যায়ের একাডেমিক ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে হবে।[৮৭১]

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নূতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হচ্ছে এবং উন্নত দেশসমূহে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জটিল রোগসমূহের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা দরকার। স্বাস্থ্য খাতে ব্যাবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়ের উপর চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যখাতে নিয়োজিত অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ থেকে জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ সুফল অর্জনের লক্ষ্যে সর্বস্তরের জন্য ইসলামী নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক ও চাহিদাভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্টসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মীর সল্পতা ও অসম বন্টন ব্যবস্থা, দক্ষতা সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভারসাম্যহিনতা, ন্যায়বিচার ও প্রণোদনার অভাব দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। চাহিদা যাচাই করে অতিরিক্ত জনশক্তি (ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, প্যারামেডিক প্রভৃতি) তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য জনশক্তির সকল স্তরে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির স্বচ্ছ নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, প্যারামেডিক ও টেকনোলজিস্টদের শিক্ষা, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী, গণমুখী ও দেশের প্রয়োজনভিত্তিক করতে হবে। চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় সেবার মান, রোগীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, মমত্ববোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আদর্শের মূল কথাই হলো- মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানানো, উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা। মোটকথা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং মানব সম্পদ থেকে যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মদক্ষতার সুফল পেতে হলে উন্নত নৈতিক চরিত্র অপরিহার্য। ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, প্যারামেডিক এ সকল পেশার লোকদের কর্মদক্ষতার পাশাপাশি ইসলামের আলোকে নৈতিক চরিত্র বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, মমত্ববোধ ইত্যাদির মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

[৮৭১]. evsjv‡`k RbmsL¨v bxwZ-2012, প্রগুক্ত, পৃ. ৯

<u>কর্মকৌশল - ২৫ : স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা</u>

চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, প্যারামেডিক ও টেকনোলজিস্টদের শিক্ষা, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করতে হবে এবং গণমুখী ও দেশের প্রয়োজন ভিত্তিক করতে হবে। চিকিৎসা জনশক্তির শিক্ষাদানে সেবার মান, রোগীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, মমত্ববোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।[৮৭২]

(ক) নার্সিং: ডিপ্লোমা পর্যায়ে দেশের চাহিদা পূরণ করার জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়াতে হবে। হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষার জোর দেয়া প্রয়োজন। দেশে গ্রাজুয়েট নার্সদের স্বল্পতা রয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বিশেষায়িত নার্সিং শিক্ষা (Specialized Nursing) যেমন- কার্ডিয়াক সার্জারি, নিউরো সার্জারি, করোনারি কেয়ার ও অন্যান্য বিশেষায়িত ডিসিপ্লিনে নার্সিং শিক্ষা শুরু করতে হবে। নার্সিং শিক্ষকদের স্বল্পতা দুর করতে হবে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট নার্সিং শিক্ষা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শুরু করতে হবে। বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের নির্মাণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশেষায়িত রোগের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ বাড়ছে, যা নারী পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক হবে।[৮৭৩]

(খ) প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্ট সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞানসহ দক্ষতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

(গ) ধাত্রী: সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষ জনশক্তি দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) গ্রাজুয়েট পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে আরো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। দেশের প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষাদান ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে। দেশে প্রচলিত পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা ও বিভিন্ন কোর্সসমূহকে সমমানের এবং সমন্বয় করতে হবে। এখানেও আধুনিক প্রযুক্তি ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে। চিকিৎসকদের পেশাগত মান বজায় রাখার জন্য দেশে ও বিদেশে Continuting Medical Education ও প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টার্নিশীপ বিদ্যমান এক বৎসরের পরিবর্তে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে দুই বৎসরে উন্নীত করে তার মধ্যে অন্ততঃ এক বৎসর গ্রাম পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে তাদের কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।[৮৭৪] চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, নার্স ও প্যারামেডিক্সদের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উপযোগী একটি দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাসকল্পে দক্ষ মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রশিক্ষিত

---

[৮৭২]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৮৭৩]. বাৎসরিক বাজেট ২০১৪-২০১৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৮৭৪]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

দক্ষ কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন সেবা নিশ্চিত করতে এ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা প্রয়োজন। চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, প্যারামেডিক ও টেকনোলজিস্টদের শিক্ষা, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও

যুগোপযোগী, গণমুখী ও দেশের প্রয়োজনভিত্তিক করতে চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় সেবার মান, রোগীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, মমত্ববোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আদর্শের মূল কথাই হলো- মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদানের মাধ্যমে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা। ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, প্যারামেডিক এ সকল পেশার লোকদের কর্মদক্ষতার পাশাপাশি ইসলামের আলোকে নৈতিক চরিত্র বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, মমত্ববোধ ইত্যাদির মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

কর্মকৌশল - ২৬ : স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যাবলী যথাযথভাবে তদারকি করা

মেডিকেল প্রাকটিশনাদের রেজিস্ট্রেশন, পেশাগত মান এবং এথিক্যাল প্রাকটিস সংক্রান্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে তদারক করার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আরো শক্তিশালী করতে হবে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলকেও পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করতে হবে। ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং অন্যান্য প্যারামেডিকদের সেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যথাক্রমে ফার্মেসি কাউন্সিল এবং স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টিকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে।[৮৭৫] এই কর্মকৌশলটি অতীব প্রয়োজনীয়। ইসলাম ভালো কাজকে সাধুবাদ জানায়। বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ, পরিচালন ব্যয় এবং নিয়ন্ত্রক পর্ষদসমূহ যথেষ্ট কার্যকর না থাকায় চিকিৎসা শিক্ষা, চর্চা এবং গবেষণা কাজে নৈতিকতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতি হয়। একজন চিকিৎসককে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি তাদের ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লেখার জন্য সবসময়ই প্রভাব বিস্তার করে। কেননা ওষুধ যত কার্যকরীই হোক তা ক্রয় করতে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র আবশ্যিক। যদিও সব মানুষের মতই চিকিৎসকেরও একই ধরনের ওষুধ হতে তার ইচ্ছেমত একটি ওষুধ পছন্দ করার স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। প্রায়শঃ দেখা যায় প্রচারাভিযান চিকিৎসকের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সুইজারল্যান্ডে এক গবেষণায় দেখা যায়, যে ওষুধ যত প্রবলভাবে প্রচার করা হয় সেই ওষুধ তত বহুল ভাবে প্রেসক্রাইব করা হয়।[৮৭৬] এ ছাড়াও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তিতে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে। এ সকল চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের পথ একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব। বর্তমান সময়ে ভূয়া ডাক্তারের কারণে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কোন সার্টিফিকেট না থাকলেও ডাক্তার পরিচয়ে চিকিৎসার নামে রোগীর ক্ষতি হচ্ছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[৮৭৭] মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

[৮৭৫]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৮৭৬]. *Journal Swiss de Medicine*, 109, No3, p-1194.

[৮৭৭]. আল-কুরআন ১৭ : ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে।[৮৭৮] মেডিকেল প্রাকটিশনাদের রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কোন প্রাকটিস করতে পারবে না। বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। চিকিৎসাসেবার পেশাগত মান এবং এথিক্যাল প্রাকটিস সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলকে সঠিকভাবে তদারকি করতে হবে। বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং অন্যান্য প্যারামেডিকদের সেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে এবং ফার্মেসি কাউন্সিল এবং স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টিকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন তৈরি করা প্রয়োজন। ব্রিটেনের কোনো হাসপাতালে যদি কোনো রোগীর অজ্ঞাত কারণে কিংবা ডাক্তারের অবহেলায় মৃত্যু ঘটে তখন ঘটনাস্থলে করোনারস কোর্ট (করোনার আদালতে) বসে। ব্রিটেনের সরকার ও বিরোধীদলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাণী কর্তৃক নিয়োজিত এই করোনার কোর্ট বিচারক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাঁরা এই ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার রোগীর ব্যাধি, তার চিকিৎসা কার্যক্রম প্রভৃতির আদ্যোপান্তে রিপোর্ট তৈরি করেন এবং তার সঙ্গে মৃতদেহের পোস্টমর্টেম রিপোর্টও যুক্ত করেন। করোনারস আদালতে পুরো ঘটনাটির দায়-দায়িত্ব অনুসন্ধান ও বিচার অনুষ্ঠানের দ্বারা রায় প্রদান করে। ফলে, সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের ভুল কিংবা চিকিৎসা তৎপরতায় অবহেলা, অদক্ষতা ধরা পড়লে সেই ডাক্তারকে ব্রিটেন আর চিকিৎসকের কাজ করতে দেয়া হয় না। অর্থাৎ ডাক্তার হিসেবে তিনি ঐ দেশে পুরো অযোগ্য ঘোষিত হন। একই ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু হলে দ্বায়িত্বশীলতা এবং স্বাস্থ্যসেবার মান অনেক বৃদ্ধি পেত। পৃথিবীর অনেক দেশেই এরকম ব্যবস্থা চালু রয়েছে।[৮৭৯] আমাদের দেশে করোনারস্ কোর্টের মতো এই ধরনের কোর্ট থাকলে এবং ইসলামের আলোকে নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে একজন চিকিৎসকের দায়িত্ববোধ, জবাবদিহিতা, অনুসন্ধিৎসা, সহমর্মিতা অনুশীলনের শুভ সূচনা হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

<u>কর্মকৌশল - ২৭ : মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করা</u>

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য মেডিকেল কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করতে হবে এবং সেগুলোর যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।[৮৮০] বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থ্যাপনার প্রধান বাধা কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। কেন্দ্রে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর অধিক নির্ভরশীলতা কিংবা জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে সকল স্তরে না পৌঁছানোর কারণে কার্যকর সিদ্ধান্ত পালন দীর্ঘায়িত হয়। সঠিকভাবে নেতৃত্বদান ও যোগ্য ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইসলামী নীতি ও শিক্ষা মেনে চললে জনসংখ্যা অনুপাতে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য সকল পর্যায়ে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান দূর্বল। বিশেষ করে জনসংখ্যা অনুপাতে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা কম হওয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সেবা

---

৮৭৮. আল-কুরআন ১০ : ৩৬

৮৭৯. মজনু-নুল হক, wZ ³ I la, iæMY wPwKrmv I wRw¤§ RbMY, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩৪

৮৮০. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

প্রদানকারী ও সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকা এবং বিশেষত: দরিদ্র, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সহজে সেবা প্রদানকারীর কাছে পৌঁছানোর ব্যর্থতা সেবার মানকে দূর্বল করে দিচ্ছে। সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ওষুধ-পত্র, সেবা প্রদানের স্থান ও সেবা প্রদানকারীর স্বল্পতা চিকিৎসা খাতে মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রদান ব্যহত করছে।[৮৮১] বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতালে যেতে মানুষ ভয় পায়। জনবলের স্বল্পতা, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবকে দরিদ্র, দূরবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানো যাচ্ছে না। মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যায়, তারা কোথাও সেবা পায় না, পায় সেবার পরিবর্তে অবজ্ঞা, অবহেলা। অন্যদিকে, রাজধানীর বড় বড় প্রইভেট হাসপাতালে গেলে দেখা যায় চিকিৎসা সেবার ভালো চিত্র। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসক-নার্সদের কর্তব্য পরায়ণতা, শিশুদের জন্য অজস্র খেলনার সমারোহ, ছিমছাম, ভীড়হীন একটি পরিবেশ মনে সুখী সুখী ভাব এনে দেয়। বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যে স্বাস্থ্যসেবা জনগণ পাচ্ছেন তা পরিসর ও গুণগত মানের দিক থেকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার জন্য উচ্চ ফি ও রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা ব্যয়বহুল হওয়ায় চিকিৎসা সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই রয়েছে।

<u>কর্মকৌশল - ২৮ : সার্বক্ষণিক ও জরুরি চিকিৎসাসেবায় নিয়েজিতদের বিশেষ ভাতা প্রদান</u>

সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে যে সমস্ত চিকিৎসক বা শিক্ষার্থী সার্বক্ষণিক ও আবাসিক পদে এবং জরুরি বিভাগে কর্মরত আছেন এবং যারা Non-clinical Subject এর শিক্ষক তাদের প্রাইভেট প্রাকটিস থেকে বিরত রেখে নন-প্রাকটিসিং ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।[৮৮২] চিকিৎসাসেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সরকারের পদ্ধতিগত অনেক ত্রুটিও রয়েছে। আমাদের চিকিৎসাপদ্ধতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় উপজেলা হাসপাতালে অথচ উপজেলা হাসপাতালে জরুরি বিভাগের জন্য কোন চিকিৎসক দেওয়া হয় না। যে কয়েকজন চিকিৎসক আছেন, তাঁদের দিয়েই চলে জরুরি সেবার কাজ। উপজেলা হাসপাতালগুলো আগে ছিল ৩১ শয্যার। সেগুলোর অধিকাংশই এখন ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। চিকিৎসকের সংখ্যা ৯ জনের স্থানে ২২ জন করার কথা থাকলেও সেই সংখ্যা ৯ জনই আছে। জেলা শহরের সবচেয়ে নিকটবর্তী উপজেলা ছাড়া কোন উপজেলায় পূর্ণসংখ্যক চিকিৎসক থাকেন না। কখনো কখনো আবাসিক চিকিৎসক এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ছাড়া মাত্র একজন মেডিকেল কর্মকর্তা দিয়েই চালানো হয় একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। পূর্ণসংখ্যক চিকিৎসক থাকলেও একেকজন মেডিকেল অফিসারকে দৈনিক গড়ে ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন চিকিৎসক নিয়মিত দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখন আর কোন কাজ করতে পারেন না, তখন তাঁরা ফাঁকির আশ্রয় নেন।[৮৮৩] প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থায় শুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। যতোদিন পর্যন্ত এই পদ্ধতি কার্যকর সম্ভব না হচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে যে সমস্ত চিকিৎসক সার্বক্ষণিক ও আবাসিক পদে এবং জরুরি বিভাগে কর্মরত

---

[৮৮১]. cÖv¸³, পৃ. ৮

[৮৮২]. cÖv¸³, পৃ. ১৩

[৮৮৩]. ‰`wbK c_g Av‡jv ১ জুলাই ২০১৪ পৃ. ১১

আছেন এবং যারা Non-clinical Subject এর শিক্ষক তাদের প্রাইভেট প্রাকটিস থেকে বিরত রেখে নন-প্রাকটিসিং ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

<u>কর্মকৌশল - ২৯ : সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়ন</u>

প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে রোগী পরিচর্যার ক্ষেত্রে মান সম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর একটি সহায়িকা তৈরী করতে হবে।[৮৮৪] এটি একটি ভালো উদ্যোগ। ইসলাম এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায়। গবেষণালব্দ বিভিন্ন পদ্ধতি পর্যালোচনার মাধ্যমে এমন একটি সহায়িকা তৈরী করা প্রয়োজন যা রোগীর রোগ ও ওষুধের বর্ণনাসহ বিভিন্ন সময়ে রোগীর বিভিন্ন বিষয়ে রেকর্ড রাখা যায়। ফলে, ফলোআপের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

রোগীর সেবা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, রোগী আপন কি পর, দেখার ব্যপারে তা কোন শর্ত নয়। রোগী যে কেউ হোক ধনী-গরীব, আত্মীয় অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত যে কারো রোগ শয্যায় তার পাশে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এতে বড় রকমের সওয়াব রয়েছে। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা কর এবং কয়েদীকে মুক্ত কর।[৮৮৫]

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা সকাল পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি সকালে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।[৮৮৬] সুবহানাল্লাহ, বান্দার খেদমত অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার মর্যাদা কত বড়। মহান আল্লাহ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার জন্য তাঁর প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বান্দাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞগণ খুবই তাগিদ দিয়ে বলেছেন, তোমরা নিজ নিজ রোগীর চিকিৎসা সেবার দ্বারা কর। কারণ, তোমাদের সেবা রোগীকে দ্রুত সুস্থতা দান করবে।[৮৮৭]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে মানব জাতিকে রোগী দেখার যে আদর্শ পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন, আধুনিক বিশ্ব ১৫০০ বছর পরে এসে তার উপকারিতা উপলব্ধী করতে সক্ষম হয়েছে। একজন রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফলে রোগীর মন সান্তনা লাভের মাধ্যমে রোগের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ ব্যাবস্থা গড়ে তোলে, ফলে সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। অন্য দিকে বিপদের সময় কাউকে সাহায্য করা বা দেখতে যাওয়ার মাধ্যমে সমাজে যেমন শান্তিদায়ক পরিবেশ বজায় থাকে তেমনি অন্তরও প্রশান্তি লাভ করে, ফলে মানুষের মন ও শরীর উভয়ই সুস্থ থাকে।

---

[৮৮৪]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৮৮৫]. ইমাম বুখারী (র), cÖv¸³, হাদীস নং ৫২৪৬

[৮৮৬]. Ave `vE` kixd, ৪র্থ খন্ড, কিতাবুল জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১৮৬, হাদীস নং ৩০৮৫

[৮৮৭]. ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, cÖv¸³, খন্ড ১ - ২ পৃ. ৩৪৪

কর্মকৌশল - ৩০ : স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত সকলের কর্মস্থলে উপস্থিতি ও সর্বোত্তম সেবা দান নিশ্চিত করা

সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তাদের কর্মস্থলে উপস্থিতি ও সর্বোত্তম সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।[৮৮৮] জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ইং তারিখে অফিসে যথাসময়ে ও নিয়মিত উপস্থিতি এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরিত একটি পত্র জারি করা হয়।[৮৮৯] উক্ত পত্রে সকলকে যথাসময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়। মানব সেবা মহৎ পেশা। ইসলামে রোগী দেখতে যাওয়ায় যে পরিমাণ সওয়াবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেই তুলনায় রোগীকে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করলে এই মহৎ কাজের জন্য মহান আল্লাহ তাকে আরো বেশী সওয়াব প্রদান করবেন। অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করা সৃষ্টির সেবা এবং মানবতা বোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কারণে অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করা ইসলামের চারিত্রিক ও নৈতিক বিধানে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা শুশ্রূষা করার ব্যাপারে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যেমন রোগী দেখার দু‘আ, রোগী দেখার আদব, রোগী দেখার প্রতিদান, রোগীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, রোগীকে কিরূপ সান্তনা প্রদান করতে হবে ইত্যাদি। বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাতটি জিনিসের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতিটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন, সোনার আংটি, মোটা ও পাতলা এবং কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং কাস্‌সী ও মিয়সারা কাপড় ব্যবহার করতে। আর তিনি আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন জানাযার অনুসরণ করি, রোগীর সেবা করি এবং বেশি বেশি করে সালাম করি।[৮৯০] শুধু রোগীর সেবা করা সওয়াবের কাজ আর যে ব্যক্তি রোগীর সেবা করার দায়িত্ব পেল সে তো ভাগ্যবান।

কর্মকৌশল - ৩১ : প্রতিবন্ধী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী প্রবর্তন

মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী সমূহের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এজন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।[৮৯১] বাংলাদেশ সরকারের এটি একটি ভালো উদ্যোগ। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, গরীব রোগীরা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিচ থাকে। যে সকল রোগী হাসপাতালে একাকী পড়ে থাকে, তাদেরকে উন্নত চিকিৎসা দান এবং তাদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও পুরোপুরি ফায়দা হয় না। অথচ যে সকল রোগীদের আত্মীয়-স্বজন ও সেবাকারী আসা যাওয়া করে, তাদের মধ্যে সুস্থতা অন্যদের তুলনায় দ্রুত আসে। এ পর্যবেক্ষণের পর নিউইয়ার্কের পাদ্রীগণ হাসপাতালে যাওয়া শুরু করলেন। তারা রোগীদের সাথে স্বাক্ষাত করতেন। তাদের কাছ থেকে অসুস্থতার বিবরণ শুনতেন। অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে তাদের সুস্থতার জন্য দু‘আ করতেন। অনেক রোগী চিকিৎসা ছাড়াই পাদ্রীদের সুদৃষ্টি পেয়েই ভাল হয়ে যেত।[৮৯২] অসুস্থতার সময় রোগীর মন বিষণ্ন থাকে। ইসলাম সর্বপ্রথম রোগীর মানসিক অবস্থাকে গুরুত্ব প্রদান করে। অতএব, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক

---

[৮৮৮]. RvZxq ¯^v¯’bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৮৮৯]. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বারক নং ৪৫.১৪২.১১৬.০০.০০.০০৩.২০১৫-৮৩২, তারিখ: ০৫.০৯.২০১৬ইং

[৮৯০] ইমাম বুখারী (র), প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ২২৫৩, হাদীস নং ৫২৪৭

[৮৯১]. RvZxq ¯^v¯’bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৮৯২]. প্রাগুক্ত, খন্ড ১ - ২ পৃ. ৩৪৪

জনগোষ্ঠী, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী সমূহের স্বাস্থ্য সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রোগী দেখার দ্বারা শুধু তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা উদ্দেশ্য নয় বরং আসল বিষয় হল রোগীকে সান্তনা ও শান্তি দেওয়া। আমরা কারো দূঃখ-বেদনা তো নিয়ে নিতে পারিনা, তবে সুন্দর ব্যবহার ও উত্তম আচরণ দ্বারা তার হৃদয় মন অবশ্যই প্রফুল্ল করতে পারি। এভাবে তার দুঃখ কষ্ট কিছুটা হলেও হালকা করতে পারি। রোগীর মাথায় বা তার হাতে হাত রাখার দ্বারা এক দিকে যেমন তার শরীরের অবস্থা অনুভব করা যায়। তেমনি তার প্রতি নিজের ঐকান্তিকতা এবং অকৃত্রিম সহমর্মিতার প্রকাশ ঘটে। আর এটা এমন একটি বিষয় যা একজন রোগীর জন্য খুবই প্রয়োজন। কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাবার সময় তার দীর্ঘ হায়াত সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করলে অবশ্য তকদীরকে রদ করতে পারে না, তবে এতে রোগীর মন অবশ্যই খুশী হয়। এ কারণে আমাদের অবশ্যই রোগীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং অশার বাণী শুনাতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে আমরা রোগী দেখা সম্পর্কিত হেদায়াত লাভ করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট গেলে তার সাথে ভাল ভাল কথা বলতে। যদি কোন রোগীকে তার দীর্ঘ জীবন লাভের দু‘আ করা হয় তাহলে রোগীর মন অবশ্যয় আন্দোলিত ও প্রফুল্ল হবে। রোগীকে যদি বলা হয় যে আল্লাহ চাহেন তো ভয়ের কোন কারণ নেই এবং যদি তার সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করা হয় তাহলে রোগীর মনে ভয় দূর হবে, মনে সাহস সঞ্চয় হবে এবং মানসিক শক্তি বেড়ে যাবে। ফলে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। তবে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা ঠিক নয়। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির নিকট বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে তার কষ্ট বেড়ে যেতে পারে। বিশ্রাম রোগীর জন্য খুবই প্রয়োজন। ইসলাম স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য একটি সর্বাধুনিক ধর্ম এটা তার একটা বাস্তব নমুনা।

অতএব, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী সমূহের স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।

কর্মকৌশল - ৩২ : সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী জোরদার করা

সংক্রামক রোগসমূহ যেমন- শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী জোরদার করতে হবে। যক্ষা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি জোরদার করতে হবে। সংক্রামক রোগসমূহের নিরাময়মূলক সেবা জোরদার করতে হবে।[৮৯৩] রোগীর সেবার জন্য যে কোন ভালো উদ্যোগকে ইসলাম সমর্থন করে। ইতিমধ্যে শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান, ওষুধপত্র সরবরাহ ও সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমের মাধ্যমে ধর্ম, বর্ণ ও নারী পুরুষ ভেদে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংক্রামক ব্যাধি ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের আওতায় আনা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্যসেবা লাভে দরিদ্রদের সুযোগ বাড়বে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ফলে, তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।[৮৯৪] বাংলাদেশের কতিপয় অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা, গোদ রোগ, কৃমি এবং কালাজ্বর, এইডসের হুমকি, জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইডসের ব্যাপারে যথাযোগ্য নজরদারি, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা, একাধিক ওষুধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মার জন্য

[৮৯৩]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৮৯৪]. বাৎসরিক বাজেট ২০১৪-২০১৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং কালাজ্বর প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয়ে অগ্রগতি উন্নত স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফাইলেরিয়া এবং মাটিবাহিত কৃমি রোগ বিস্তার প্রতিরোধে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।[৮৯৫] স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ইসলামী রীতি-পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সংক্রমক রোগ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।"[৮৯৬] ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নবী (সা.) বলেন, "সংক্রমক রোগ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কোনো উট চর্মরোগে আক্রান্ত হলে অন্য উট তার সংস্পর্শে এসে চর্ম রোগাক্রান্ত হয়। তখন তিনি বললেন, এটা তাক্‌দীর! তা না হলে প্রথম উটটিকে কে চর্ম রোগাক্রান্ত করেছে?"[৮৯৭] মহান আল্লাহ মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, মানুষকে ক্ষতিকর বস্তু থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। সঠিকভাবে জীবন-যাপন করা মানুষের বুদ্ধিরই পরিচায়ক। কিন্তু মানুষ যদি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক বিধাণাবলী সঠিকভাবে মেনে না চলে তাহলে তার জীবনীশক্তি ক্রমান্বয়ে দূর্বল হতে থাকে। জীবনীশক্তি দূর্বল হলে রোগ প্রতিরোধ শক্তিও দূর্বল হয়ে পড়ে। দূর্বল জীবনীশক্তি খুব সহজেই রোগ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। ফলে, যে কোন প্রাণীই খুব সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তার নিকটে যদি কোন রোগাক্রান্ত প্রাণী বা রোগ-জীবাণু অবস্থান করে তাহলে সে খুব সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। বস্তুত একেই আমরা ছোঁয়াচে রোগ বলি। একই পরিবেশে বসবাস করে জীবনীশক্তি সবল প্রাণী ছোঁয়াচে রোগে আক্রন্ত হয় না। রোগাক্রান্ত হওয়ার জন্য দুর্বল জীবণীশক্তি দায়ী। ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন-যাপন না করাই এর মূল কারণ।

অতএব, ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন-যাপন সংক্রামক ব্যাধি হতে রক্ষা পাওয়া আদর্শ পদ্ধতি।

কর্মকৌশল - ৩৩ : রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি

অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। সমন্বিত উপায়ে সকল পর্যায়ে প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান অসংক্রামক রোগগুলো যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, আর্সেনিকোসিস সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং জীবনধারা পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে।[৮৯৮] মহান আল্লাহ জীবন-যাপনের জন্য সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন। রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি সৃষ্টির সকল জীবকে বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাতে বলেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা ও খাদ্যসামগ্রীতে ভেজালের কারণে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারের ফলে মানুষ ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্নায়ু রোগ, ডায়াবেটিস, নিদ্রাহীনতা, পক্ষাঘাত, পেটের পীড়া, মাথাব্যাথাসহ অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। এতে দেশের জনসাধারণের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যই আশঙ্কাজনকভাবে হুমকির মুখে। বাংলাদেশে খাদ্যসামগ্রী এবং শাক-সবজিতে যে ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব দূষণযুক্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, জন্ডিস, মেদবহুলতা প্রভৃতি জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। হৃদরোগ, ক্যান্সার ও স্ট্রোক বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান

---

[৮৯৫]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

[৮৯৬]. Be‡b gvRvn, প্রাগুক্ত, অধ্যায় চিকিৎসা, হাদীস নং ৩৫৩৯

[৮৯৭]. cÖv¸³, হাদীস নং ৩৫৪০

[৮৯৮]. RvZxq ¯^v¯'¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

কারণ। বাংলাদেশে এসব রোগের মূল কারণ ভেজাল ভোজ্য-তেল ও খাদ্যসামগ্রী।[৮৯৯] ভেজাল ও বিষাক্ত খাদ্যসামগ্রী গ্রহণের ফলে খাদ্যের বিষক্রিয়ায় নানা প্রাণঘাতী অসংক্রামক রোগব্যাধি আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল গোটা জাতিকে তিলে-তিলে ধ্বংস করছে।[৯০০] পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

মহান আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর প্রতি তোমরা মু'মিন।[৯০১] মহান আল্লাহ বলেন,

يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

যারা আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয় কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না।[৯০২]

কর্মকৌশল - ৩৪ : জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ূ পরিবর্তনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মাঠ জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রোগগুলোর সংখ্যা কমাতে একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।[৯০৩] বিশ্বায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত ব্যাধি, শৈত্য ও উষ্ণ প্রবাহ সংক্রান্ত ব্যাধি, পানিবাহিত রোগ, পরজীবিবাহিত রোগ যেমন- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি এবং পুষ্টি-হীনতা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত রোগ-ব্যাধি থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সঠিকভাবে মহান আল্লাহর এবাদত পালন এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পথে জীবন-যাপনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৯০৪] দেশে প্রায়ই নতুন রোগ ও স্বাস্থ্য সমস্যার আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব লক্ষণীয় যেমনঃ এভিয়ান ফ্লু, ডেঙ্গু, নিপা ভাইরাস ইত্যাদি। এ সকল রোগের উপর নজরদারি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থ্যা যথোপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে জীববৈচিত্র বিলুপ্ত হচ্ছে, নতুন নতুন রোগের উদ্ভব হচ্ছে কিন্তু এ বিষয়ে কেউ সচেতন হচ্ছে না।[৯০৫]

অতএব, ইসলামী জীবন-যাপন পদ্ধতি মেনে চলার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রোগ-ব্যাধির আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

---

[৮৯৯]. শওকত হোসেন ও শারমিন নিশাত সম্পাদিত, (নাজমা শাহীন, "খাদ্যে ভেজাল",) nvjLvZv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[৯০০]. ড. মাসুদ আলম, c‡Y¨ †fRvj cwZ‡iv‡a Bmjvgx 'wó fw½ : cwi‡cÖ¶‡Z evsjv‡'k, ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

[৯০১]. আল-কুরআন, ৫: ৮৮

[৯০২]. আল-কুরআন, ২ : ০৯

[৯০৩]. RvZxq ¯v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৯০৪]. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১

[৯০৫]. http://*www.jugantor.com*/news

<u>কর্মকৌশল - ৩৫ : টিকাদান কর্মসূচী অধিকতর জোরদার করা</u>

টিকাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করে যত সংখ্যাক রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত করতে হবে।[৯০৬] রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে রোগ নিরাময়ের চেয়ে উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহি আলাহিওয়াসাল্লাম স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ নিরাময় ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি বিষয়েই তিনি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। ইসলাম রোগ প্রতিরোধের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিসে এমন সব দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। যেমন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে তাকে ওই দিন কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।"[৯০৭] এছাড়া রমযানের রোযা রাখা, নিয়মিত সালাত আদায় করা, পাঁচবার উযূ করা, পরিমিত পরিমাণে নিয়মিত হালাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা ও হারাম খাদ্য বর্জন করা, দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন বৈধ নিয়ম-নীতি মেনে চলা, ব্যক্তিগত জীবনে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।[৯০৮] হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারব (রা.) হতে বর্ণিত, "মানুষ পেটের তুলনায় নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করেনা। আদম সন্তানের জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট যা তার মেরুদন্ড সোজা রাখে। তবে যদি এর অতিরিক্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"[৯০৯] অর্থাৎ ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি মেনে সঠিকভাবে জীবন-যাপনের মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের টিকাদানের মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

<u>কর্মকৌশল - ৩৬ : সুস্থ্য জীবন-যাপন বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা</u>

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ স্কুল হেল্থ কার্যক্রম চালু করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ জীবন-যাপনের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।[৯১০] সারা দেশব্যাপী স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা মহৎ উদ্যোগ। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে জনসাধারণ অযাচিত রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে ফলে জীবন-যাত্রার মান উন্নত হবে। সারাদেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১ জন করে শিক্ষককে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। সারাদেশের প্রতিটি বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান ও কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা যেতে পারে।[৯১১]

<u>কর্মকৌশল - ৩৭ : শিল্প ও কৃষি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা</u>

শিল্প ও কৃষি খাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।[৯১২] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে এই

---

[৯০৬]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৯০৭]. mnxn eLvix, প্রাগুক্ত, অধ্যায় খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যগ্রহণ অধ্যায়, হাদীস নং ৫০৪২

[৯০৮]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cv¸³, পৃ-৭১

[৯০৯]. wZiwghx, প্রাগুক্ত, অধ্যায় অধিক আহার নিষেধ, হাদীস নং-২৩৮০

[৯১০]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৯১১]. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ewlK cwZ‡e'b, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২, পৃ. ৮৩

[৯১২]. RvZxq ¯^v¯'bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

কাজকে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। এ মন্ত্রণালয়াধীন সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষিকাজে নিয়োজিত জনগণকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক পরিবারের আয়-বৃদ্ধিকরণ ও দুই সন্তানের পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়া কাউন্সেলিং দ্বারা শহরমুখী গমন নিরুৎসাহিত করতে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[৯১৩] সকল ডাক্তারই রোগীদের ধূমপান করতে নিষেধ করে থাকেন, বিশেষ করে যারা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা ও ফুসফুসের সংক্রমণে ভোগেন তাদের ব্যপারে এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।[৯১৪] এ ছাড়াও শিল্প ও কৃষি খাতে শ্রমিকদের শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চা-বাগানের ক্লিনিকসমূহ এবং অন্যান্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে পরিকল্পিত পরিবার গঠন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী চালু করা যেতে পারে। এ ছাড়াও শিল্প ও কৃষি খাতে সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে গার্মেন্টসসহ শ্রমঘন (Labour intensive) কারখানাগুলোতে কর্মরত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পিত পরিবার গঠন ও প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে অবিবাহিত শ্রমিকদের উপযুক্ত বয়সে বিবাহে উৎসাহিত করা এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।[৯১৫]

কর্মকৌশল - ৩৮ : নিউক্লিয়ার মেডিসিনের প্রয়োগ সম্প্রসারিত করা

চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের প্রয়োগ সম্প্রসারিত করতে হবে। এজন্য দক্ষ জনবল তৈরী ও গবেষণার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।[৯১৬] আধুনিক বিজ্ঞানের আশির্বাদে চিকিৎসা বিজ্ঞান খুব সহজেই মানুষের জটিল কঠিন রোগ-ব্যাধিকে সনাক্ত করতে পারে। বর্তমানে চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের ব্যবহার হচ্ছে যা আরো সম্প্রসারিত করতে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিকে ইসলাম সাদরে গ্রহণ করে। যেমন- ইকোকার্ডিওগ্রাফ (Ecoho Cardiograph); এন্ডস্কোপ (Endoscope); ব্রঙ্কোস্কোপ (Brochoscope); ইসোফেগোস্কোপ (Oesophagoscope); ম্যাগনেটিক রেসোম্যাল ইমেজিং (Megnetic Resomale Imaging M.R.I.); ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফি (ElectroEncephalography E.E.G.) এ সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইসলাম আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের আশির্বাদকে সমর্থন করে।

কর্মকৌশল - ৩৯ : বিদেশ প্রত্যাগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা

বিদেশ হতে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে, বিশেষ করে মারাত্মক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এমন দেশ থেকে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে দেশে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটতে না পারে সে লক্ষ্যে জল, স্থল ও বিমান বন্দরসমূহে প্রত্যাগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।[৯১৭] যৌনরোগ এবং এইডস সংক্রামণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য আহরণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশ থেকে আগত শ্রমিকদের বিষয়ে বিমান বন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া

---

[৯১৩]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৯১৪]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ ১৭৩

[৯১৫]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৯১৬]. RvZxq ¯^v¯’¨bxwZ 2011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৯১৭]. cÖv¸³, পৃ. ১৩

বিদেশগামী শ্রমিকদের এসব রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ধর্মীয় নেতা ও ইমামদের মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং যৌন রোগ ও এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব। এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকাশনায় পরিকল্পিত পরিবার গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।[৯১৮] স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, নিরাময় ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং সহস্রাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে। এসব হাদীস আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে একটি হাদিসও আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় বরং সাদৃশ্যপূর্ণ।[৯১৯]

---

[৯১৮]. RvZxq RbmsL¨vbxwZ 2012, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
[৯১৯]. ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, cÖv¸³, পৃ ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল একটি দেশ। উন্নয়নশীল এ দেশটির সকল পর্যায়ের নাগরিক এখনও পূর্ণঙ্গ স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আসেনি। বহুবিধ কারণে দেশের আপময় জনসাধারণের সর্বাত্মক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মপরিধি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। সীমিত সম্পদ, দক্ষ মানব সম্পদের স্বল্পতা ও ব্যবস্থাপনাগত দূর্বলতার কারণে কাঙ্খিত, মানসম্মত ও সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা দুরুহ হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের পেশাগত উৎকর্ষতা, উৎসাহ, উদ্দীপনার অভাব গুণগত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কাঙ্খিত মান অর্জনে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে।

অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন মুসলিমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন জ্যোতি বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ভূগোল শাস্ত্রে কুরআন মাজীদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যা আধুনিক বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, এই কিতাবে আমি কোন কিছু লিখতে বাদ দেই নি। তিনি আরো বলেন, অনতিবিলম্বে আমি আমার নিদর্শন তাদেরকে দেখিয়ে দিব, বিশ্ব জগতে ও তাদের নফ্সের ভিতরে যাতে তাদের কাছে ফুটে উঠে যে, ইহা সত্য। মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমান বিজ্ঞানীদের জ্ঞান দিয়েছেন, শক্তি প্রদান করেছেন, সুযোগ দিয়েছেন, সামর্থ্য জুগিয়েছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন, এ কারণে তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক, আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন। এটা এ জন্য সম্ভব হয়েছে যে তাদের কাছে সুস্পষ্ট সত্য আল-কুরআন ও আল-হাদীস রয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, মানব শরীরের বৈচিত্রময় কার্যাবলী ও নিয়ম-শৃঙ্খলার নিশ্চয় একজন পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক রয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইউবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলল, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। তাতে গোসল করার জন্য শীতল ও পান করার জন্য ঝরণা নির্গত হল। উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁকে আদেশ করছেন যে, তিনি যেন তার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন অতঃপর জমিন থেকে ঠান্ডা তরল বের হবে। তা তিনি পান করবেন এবং তা দিয়ে তিনি তার শরীর ধৌত করবেন। আয়াতটি যদিও ছোট ও সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার মধ্যে অনেক গূঢ় রহস্য লুকায়িত রয়েছে। মহান করুণাময় আল্লাহ হযরত আইউব (আঃ) কে কোন কিছু ছাড়াই রোগ থেকে মুক্তি দিতে শক্তি রাখেন কিন্তু পায়ের আঘাত করার আদেশের মাধ্যমে মানব জাতিকে জানিয়ে দিলেন যে, চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তির জন্য ওষুধ অনুসন্ধান করা সুন্নাত ও আল্লাহরই নির্দেশ। চর্মরোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উক্ত আয়াতে সাধারণ নিয়ম নীতির প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। চর্ম রোগের সাধারণ নিয়ম খাবার ওষুধ সেবন করা এবং সাথে সাথে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন লোশন ও ক্রীম জাতীয় ওষুধ মালিশ করা। বর্ণনার মাধ্যমে ব্যবহারিক ক্রীমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে অনেক চর্ম রোগ নিরুত্তাপ ও ঠান্ডা লোশন ব্যবহারের মাধ্যমে আরোগ্য হয়, যার ইঙ্গিত উক্ত আয়াতে রয়েছে।

সুস্বাস্থ্য ব্যতিত কোন জাতিই উন্নত হতে পারে না। সুস্বাস্থের জন্য প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসাসেবা। চিকিৎসাসেবা বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন ভালো চিকিৎসক, প্রশিক্ষিত নার্স ও অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট।

ইসলামের দিক নির্দেশনা মূলতঃ এসব পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির চিকিৎসাসেবার উন্নতি সাধন করা। কোন রাষ্ট্রকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে তার জনগণকে উন্নত মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে স্বাস্থ্য সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১) অনুসারে চিকিৎসাসহ জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সার্বজনীন নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণার স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এছাড়া ২০১৬ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশে ব্যয়সাশ্রয়ী, আধুনিক, কার্যকর এবং টেকসই মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, চিকিৎসক ও চিকিৎসা অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপদ ওষুধ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ইসলামের আলোকে পর্যালোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ সঠিকভাবে বাস্তবায়নে নিম্ন বর্ণিত সুপারিশমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন:

1. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্টিং মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিকরণ

আজকের আধুনিক জগতে প্রচার মাধ্যম একটি শক্তিশালী যন্ত্র। ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্টিং মাধ্যমে জনগণকে অতি সহজে সচেতন করা যায়। ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্টিং মাধ্যমে অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে দেশের জনগণের নিকট স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক তথ্যাদি পৌঁছে দেয়া যায়। এছাড়া অন-লাইন/ইন্টারনেট/সোস্যাল মিডিয়া/ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ অতি সহজেই পৌঁছে দেয়া যায়। উল্লেখযোগ্য অন-লাইন/ইন্টারনেট/সোস্যাল মিডিয়া/ডিজিটাল মিডিয়াসমূহ নিম্নরূপ: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin, Youtube, Classified Website (bikroy.com, carmudi.com.bd, daraz.com), www.prothom-alo.com, Search engine Optimization, info.com, e-mail, ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু দেশেই নয় সারা বিশ্বে মূহুর্তের মধ্যে অসংখ্য লোকের নিকট স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য পৌঁছানো সম্ভব। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্টিং মিডিয়ার সুবিধা কাজে লাগাতে হবে।

রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ শ্রেয়। রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচিতে গণমাধ্যমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাধ্যমকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ কর্মসূচিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিটিভি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল, বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেল, এভি ভ্যানের মাধ্যমে নাটক, শর্ট ফিল্ম, টিভি স্পট, রেডিও বার্তা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও পল্লীগান, বিলবোর্ড, নিয়ন সাইন এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইসলামের আলোকে স্বাস্থ্যনীতি মেনে জীবন-যাপন ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন কার্যক্রম প্রচারের জন্য ইমাম ও শিক্ষকদের

সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীসমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ওষুধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ প্রতি বৎসর শত-শত কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এছাড়াও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আরো প্রায় সমপরিমাণ অর্থ ব্যায় হচ্ছে। অথচ ওষুধ ব্যতিত পরিকল্পিত পরিবার গঠন প্রক্রিয়ায় অযাচিত রোগ-ব্যাধি ও অর্থ ব্যয় উভয়ই হ্রাস পাবে। উক্ত অর্থ দ্বারা স্বাস্থ্যব্যবস্থাসহ সামগ্রীক জীবনমান উন্নত করা সম্ভব। ইসলামি স্বাস্থ্যনীতি অনুযায়ী জীবন-যাপন করলে স্বাস্থ্য কার্যক্রমে সফলতার সূচক আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং সেক্ষেত্রে সুস্থ ও উন্নত জাতি গঠন করা সম্ভব। গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজের মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক একটি সফল অধ্যায়ের নাম। এটি দেশের সর্বনিম্ন পর্যায়ে স্বাস্থসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসাবে কাজ করছে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি সাফল্যের সাথে পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র গ্রামীণ মানুষের কাছে জরুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার কল্যাণসেবা পোঁছে দিতে হবে। জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে রেফারেল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

2. যথাসময়ে রোগ প্রতিরোধকরণ ও জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধিকরণ

রোগ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়। আল-কুরআনের নির্দেশনায় রোগের উত্তম চিকিৎসা হলো রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। বাংলাদেশের কতিপয় অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা, গোদ রোগ, কৃমি এবং কালাজ্বর, এইচআইভি/এইডসের হুমকি, জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইচআইভি/এইডসের ব্যাপারে যথাযোগ্য নজরদারি, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা, একাধিক ওষুধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মার জন্য কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং কালাজ্বর প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয়ে অগ্রগতি ইত্যাদি উন্নত স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফাইলেরিয়া এবং মাটিবাহিত কৃমিরোগ বিস্তার প্রতিরোধে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। গতানুগতিক অসংক্রামক রোগ যেমন-ক্যান্সার, ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোক প্রভৃতির প্রকোপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়া গতানুগতিক নয় এমন রোগ যেমন-মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, সড়ক-রেল-নৌ দুর্ঘটনা, বিভিন্ন ধরণের দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্য-সমূহ, পানিতে ডোবা, পোড়া, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সমস্যা ইত্যাদি বর্তমানে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। বহু সংখ্যক মানুষ আর্সেনিক-দূষিত পানি ব্যবহার করছে এবং ফলশ্রুতিতে আর্সেনিক সংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এছাড়াও শৈশব-কালীন উন্নয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে মেধা উন্নয়নের কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে শিক্ষিতের হার ৬০ শতাংশের কম। জনগণ এখনও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি, অপুষ্টি, সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। রোগীকে পরামর্শদান (Counselling) আমাদের সমাজে পেশা হিসাবে স্বীকৃত নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। জীবনযাপন পদ্ধতিকে আরো স্বাস্থ্যসম্মত ও উৎপাদনশীল করার জন্য সামাজিকভাবে শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন নিশ্চিত করা এবং তাদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো। জরুরী চিকিৎসাসেবাকে

অগ্রাধিকারের মাধ্যমে রোগকে অগ্রসর হতে না দেয়া এবং চিকিৎসাকে দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগ না দেয়া। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টিকাদান (Immunization) কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা ও শক্তিশালী করা। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য বিপর্যয় ও রোগ-ব্যাধির গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য রাখা এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করা। ওষুধ বিহীন পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি গ্রহণ করলে অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধসহ অনাকাংঙ্খিত রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে এই নীতিমালা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়াও ইসলামের স্বাস্থ্য বিষয়ক অমূল্য নীতি যেমন, পরিমিত আহার, সাধারণ জীবন-যাপন পালন, সুতি কাপড় পরিধান, নিয়মিত ব্যায়াম, সকালে ঘুম থেকে উঠা, অজু, গোসল, মেসওয়াক, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নামায, রোযা, এশার নামাযের পর পর ঘুমিয়ে পড়া, ফযরের পর নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করলে রোগ-ব্যাধি অনেকাংশে কম হবে।

3. সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ

জনসাধারণ, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির জন্য মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেয়া এবং পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা, বিশেষ করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জনউর্বরতা অর্জন করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত পরিবার গঠণ পদ্ধতি অনুশীলন এবং প্রজনন ও স্বাস্থ্য সেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করা প্রয়োজন। সরকারি স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র ও হাসপাতাল সমূহে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল নিশ্চিত করাসহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসাধন ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। চিকিৎসাসেবাসহ স্বাস্থ্য খাতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। সকল চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা ও মেডিকেল টেকনোলজি ও স্বাস্থ্যসেবা সহায়কদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগোপযোগী করা। স্বাস্থ্য তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

4. সমতার ভিত্তিতে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ

দরিদ্র, সামাজিকভাবে বঞ্চিত, অশিক্ষিত, প্রান্তিক, দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, বিশেষত: গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং কলকারখানার শ্রমিকসহ যারা সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের জন্য সমতার ভিত্তিতে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদিও কিছু কর্মসূচী তাদের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কিন্তু এটা তাদের সামাজিক এবং

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রবেশ করতে পারছে না। কারখানার শ্রমিক, কৃষিখাত, পশুপাখি পালনে নিয়োজিত মানুষ, আদিবাসী, দুর্গম এবং দূরবর্তী এলাকাবাসীদের জন্য এবং নারীদের সমাজিক ও পারিবারিক সমস্যার সমাধানে, সহিংসতার বিরুদ্ধে এবং বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করণ, অতি দরিদ্র ও অল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের আলোকে পরিকল্পিত পরিবার গঠণ কর্মসূচিকে গ্রহণযোগ্য করা অতিব প্রয়োজন। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের সমতার ভিত্তিতে সেবার মান নিশ্চিত করা এবং সেবার ব্যয় জনসাধারণের নাগালের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। বিকল্প চিকিৎসা (ইউনানি, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথি) পদ্ধতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহিতা কেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যনীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

5. প্রজনন স্বাস্থ্য, মাতৃমৃত্যু, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন

যদিও ক্রম হ্রাসমান তবুও প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত এখনও বেশি। প্রজননকালীন রুগ্নতা, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী মৃত্যুই এ উচ্চহারের মূল কারণ। এছাড়া এ উচ্চহারের অন্যান্য প্রধান কারণ হলোঃ প্রাথমিক এবং মাতৃসেবার অপর্যাপ্ততা, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে সচেতনতার অভাব, শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর অপর্যাপ্ততা। সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা দানের লক্ষ্যে সেবার মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দেশে জন্মের প্রথম ৬দিনের মধ্যে এক হাজার নবজাতকের মধ্যে ১৯ জন মারা যায়। ৭ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে মারা যায় আরো ৬ জন নবজাতক। বয়স ২৯ দিন থেকে ৩৬৪ দিনের মধ্যে মারা যায় ৯ জন। ৭ জন মারা যায় বয়স ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে। জন্ম নেওয়া এক হাজার শিশুর মধ্যে ৪১ জন মারা যায় বয়স ৫ বছর হওয়ার আগে। বাংলাদেশ শিশুমৃত্যুর হার কমাতে সফল হলেও নবজাতক (০-২৮ দিন বয়সি) মৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে সফলতা তুলনামূলকভাবে কম। কম ওজন নিয়ে জন্ম (লো বার্থ ওয়েট), শিশুর জন্মকালীন শ্বাসকষ্ট (বার্থ অ্যাসফেক্সিয়া) ও সংক্রমণ- এই তিনটি কারণে বাংলাদেশে নবজাতকের মৃত্যু বেশি হয়। নবজাতকের মৃত্যু কমানোর জন্য এই তিনটি বিষয়ে জোর দিতে হবে। গর্ভধারণকালে অনেক মা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পান না। মা সুস্থ না থাকলে তার অপরিণত শিশু জন্ম দেওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। এখনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের দক্ষ দাই-এর চেয়ে বাড়িতে অদক্ষ দাই-এর হাতে অনেক বেশি প্রসব করানো হয়। হঠাৎ অসুস্থ হলে অনেক নবজাতক চিকিৎসা পায় না। এগুলোও নবজাতক মৃত্যুর কারণ। এ সকল কারণসমূহ রোধ করতে হবে। শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে গর্ভবতী ও শিশুদের প্রতি আরো বেশী সচেতন হতে হবে। সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া জন্মকালীন শ্বাসকষ্টের সমস্যা দূর করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে নবজাতকের মৃত্যু কমবে বলে আমরা আশাবাদী।

বাংলাদেশে ৫০ শতাংশ নারী ২০ বছর বয়স হওয়ার আগেই মা হয়। মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি ও বাধাগ্রস্থ প্রসব। প্রসব সংক্রান্ত অসুস্থতা অনেক সময় জটিল আকার ধারণ করে। অপুষ্ট শরীরে এরা অপুষ্ট শিশু জন্ম দেয়। ফলে, জরায়ু ফেটে যাওয়া, ফিস্টুলা, ইনফেকশনসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভোগে। নারী হাসপাতালে সন্তান প্রসব করলে তার ঝুঁকি কম থাকে, শারীরিকভাবে সমর্থ হলে মা হওয়ার পরিকল্পনা করতে হবে। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে। শহরাঞ্চলে ও

গ্রাম অঞ্চলে সবার কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে এনজিও, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে। নারীকে এগিয়ে এসে তার চাহিদার কথা বলতে হবে। মুঠোফোনে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পরামর্শ যেন সহজেই সবাই পেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাল্যবিবাহ সমস্যাটা যেহেতু কিশোর-কিশোরীদের, তাই এ সমস্যা রোধে তাদের আরো ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। এখন আমাদের বাল্যবিবাহ কমাতে হবে। অল্প বয়সে গর্ভধারণ কমাতে হবে। সমাজে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এ সকল কার্যক্রম সফলভাবে করতে পারলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ প্রজননস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও সফলতা লাভ করবে। সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার যে পরিকল্পনা হচ্ছে, সেখানে প্রজননস্বাস্থ্যকে অন্তভুক্ত করতে হবে। চিকিৎসকদের গ্রামের হাসপাতালে পাঠালে কিছুদিন পরই এর বড় একটি অংশ গ্রাম ছেড়ে চলে যায় এ ধারা বন্ধ করতে হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, মেটারনাল অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কেন্দ্র, জেলা ও টারশিয়ারি (অধিকতর উন্নত সেবা) হাসপাতাল ইত্যাদি সঠিকভাবে কার্যকর রাখলে স্বাস্থ্যখাতে আমাদের আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

6. সন্তানের পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন

গত দু'দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ধরণ ও জীবনযাপন পদ্ধতির বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। বয়স্ক জনসংখ্যা এবং নগরায়ন বৃদ্ধির সাথে বাড়ছে রোগ-ব্যাধি ও মানসিক সমস্যা। জীবনযাত্রার রীতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে, যেমন চর্বিযুক্ত খাবার, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, বিনোদন সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা, তামাকের ব্যবহার, মাদক এবং পানীয়ের প্রতি আশক্তি, বেপরোয়া ড্রাইভিং, সহিংসতা ইত্যাদি এগুলো নগর এলাকার চিত্রকে আমল বদলে দিচ্ছে। নগরায়নের ফলে পরিবার কাঠামোতে এবং বসবাস ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে, শিশুদের ও বড়দের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছে। যে সমস্ত পরিবারের পিতা-মাতা উভয়ই পরিবারের বাহিরে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকে এবং তাদের সন্তানদেরকে অন্যের মাধ্যমে লালন-পালন করে, তাদের সন্তানদের পরিপূর্ণ ভাবে মানসিক বিকাশ ঘটে না। পরবর্তীতে এরা মানসিকভাবে অন্যদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকে। তারা সব সময় হিনমন্যতায় ভোগে। তাদের মন সব সময় দূর্বল থাকে। অতএব, শিশুর মেধা বিকাশের জন্য শিশুর সংগে প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করতে হবে এবং তাদের সাথে সহজ ভাবে মেলামেশা করতে হবে। আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যত। শিশুর সার্বিক সুরক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। আগামী উন্নয়ন-ভাবনায় শিশুবিষয়ক লক্ষ্যগুলো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ ভাগই শিশু। অথচ বিশাল এই জনগোষ্টির জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন লক্ষ্য নির্ধারিত নেই। শিশুদের প্রতি সহিংসতার মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাল্যবিবাহ, যৌন নির্যাতন বা রাজনীতিতে শিশুর ব্যবহার দ্রুত বন্ধ করতে হবে। শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য সকল কার্যাবলীর সফল প্রয়োগ সত্ত্বেও মাতৃমৃত্যুর মত শিশু মৃত্যুর হারের পার্থক্য লক্ষ্যণীয় (শহরের বস্তি, পাহাড়ি এবং উপকূলবর্তী এলাকা, পরিবেশগত সংকটাপন্ন অঞ্চলে আরও বেশি)। সরকারি সেবাসমূহ সাধারণ জনগণের নিকট সার্বিকভাবে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো হলো: নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, পানিতে ডুবে

যাওয়া, বিষক্রিয়া এবং আঘাত; এ বিষয়গুলোতে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত স্তন্যপান এবং যথাসময়ে তোলা খাবার প্রদানের প্রতিও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সন্তান গ্রহণের পূর্বে সন্তান লালন-পালনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের সরকার পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করতে পারেন। দুই সন্তানের মাঝে যথেষ্ট সময় বিরতী দেয়া প্রয়োজন। স্কুল ও কলেজে কিশোর কিশোরীদের জন্য মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও বিবাহিত মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের বিষয়ে অবহিতকরণ সভা, রচনা এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির আয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ ধারাকে আরো আধুনিক ও যুগপোযোগী করতে হবে।

7. গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্যর উন্নয়ন

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্যর উন্নতিকল্পে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার উপরে গুরুত্ব দিতে হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবার প্রাথমিক স্তর। তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক-এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেফারেল ব্যবস্থার উন্নয়ন করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। চিকিৎসাসেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সরকারের জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। আমাদের দেশের চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয় উপজেলা হাসপাতালে। উপজেলা হাসপাতালে জরুরি বিভাগের জন্য কোন চিকিৎসক দেয়া হয় না। বর্তমানে অধিকাংশ উপজেলা হাসপাতালে ৩১ শয্যার স্থলে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। এ সকল হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসকের সংখ্যা ৯ জনের স্থানে ২২ জন করা প্রয়োজন। জেলা শহরের সবচেয়ে নিকটবর্তী উপজেলা ছাড়া কোন উপজেলায় পূর্ণসংখ্যক চিকিৎসক থাকেন না। অনেক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি প্রসূতিসেবা পদ্ধতি সরকার চালু করলেও তা বাস্তবে অকার্যকর হয়ে আছে। জরুরীভাবে এ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। ইউনিয়ন পর্যায়ের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে চিকিৎসকের থাকার অবকাঠামোগত এবং নিরাপত্তাগত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। জেলা পর্যায়ের হাসপাতালেও জরুরি বিভাগে কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকেন না। এমনকি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও জরুরি বিভাগে কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকেন না। দেশের সব চিকিৎসাকেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে আন্তঃবিভাগ এবং জরুরি বিভাগেও ২৪ ঘন্টা রাখার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসক-সংকট দূর করার জন্য নন-প্রাকটিসিং চিকিৎসকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা জরুরি।

8. বস্তি এলাকায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্যর উন্নয়ন

অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ আরো বেশি বস্তি, জনবসতি, দুর্বল বাসস্থান, অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং নিম্নমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সৃষ্টি করছে যা জীবনধারণ এবং স্বাস্থ্যের মানকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করছে। দ্রুত বর্ধনশীল দরিদ্র নগরবাসীর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ করা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ও বেসরকারি হাসপাতালে উচ্চ মূল্যের কারণে

Dhaka University Institutional Repository

গরিব জনগণ, বিশেষত: স্বল্প আয়ের জনগণ ও বস্তিবাসীরা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে, এখানে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশি। এ শহরের গর্ভবতী মায়েরা যাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, মুগদা হাসপাতাল ও আজিমপুর মেটার্নিটিতে আসতে পারেন, তার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। শহরের বস্তিগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে গর্ভবতী স্ত্রীকে রেখে স্বামী অন্য জায়গায় চলে যান। ফলে, এ নারীকে দেখাশোনার ও সেবাকেন্দ্রে আনার কেউ থাকে না। এই অবস্থায় বস্তিতে প্রসবের সময় এই নারী ও সন্তান দুজনেই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। এ সকল কারণে সরকারি ও বেসরকারিভাবে অথবা যৌথ উদ্দোগের মাধ্যমে বস্তি এলাকায় স্বাস্থ্য ব্যাবস্থ্যর উন্নতি করা প্রয়োজন।

9. খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন, পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার ও সার্বিক পরিবর্তন প্রয়োজন

অপরিকল্পিত খাদ্য অভ্যাসজনিত রোগের প্রকোপ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অব্যাহত নদীভাঙ্গন ও জলবায়ু বিপর্যয়জনিত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারজনিত সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাংলাদেশে নতুন রোগের আবির্ভাব, নগরমুখীতার ফলে, শহরের ক্রমবর্ধিষ্ণু দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত: বস্তিবাসীর মধ্যে নিরাপদ পানির অভাব, নিম্নমানের পয়:নিষ্কাশন ও অপুষ্টির ফলে সৃষ্ট রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব বিপ্রতীপ প্রতিকূল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যখাতে বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অবকাঠামোতে ব্যাপক উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থা সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার বদলে দিয়েছে দেশের স্বাস্থ্য সেবার চিত্র। দেশে ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে টেকসই, আধুনিক, স্থিতিশীল এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা। উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ও সেবার মান বৃদ্ধি, প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসব, মাদক দ্রব্য পরিহার, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি সাধারণ জনগণের জীবন-মান উন্নতির জন্য যথাযথ কার্য গ্রহণের মাধ্যমে জাতি; ধর্ম; গোত্র; শ্রেণি; লিঙ্গ; প্রতিবন্ধী; ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ সম্ভব। সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গ্রাহক কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিস্তৃতকরণ, মান উন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাধিকার পূনর্বন্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। পুষ্টি-হীনতা সংক্রান্ত ব্যাধিসমূহ, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের হার কমেছে। আবার লিঙ্গ বৈষম্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে পুষ্টি-হীনতার দরুন কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মের হার বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশ এবং স্থান ও আর্থ-সামাজিত অবস্থাভেদে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তস্বল্পতার পরিমাণ ৬০-৮০ শতাংশ। স্বাস্থ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রমকে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য নীতির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব।

10. স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন

সুস্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। হাত ধোয়া, সঠিক সময়ে পরিমিত আহার, বিশ্রাম, ঘুম, দাঁত মাজা, নখকাঁটা, গোসল, প্রস্রাব-পায়খানা, পোশাক-আশাক, ব্যায়ামের সবকিছুর অভ্যাস হওয়া চাই নিয়মিত ও স্বাস্থ্যসম্মত। প্রকৃতির বিধান অর্থাৎ ইসলামের বিধি-বিধান মেনে

চলতে হবে। সময়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে হবে। এশার নামাজের পর ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস এবং ফজরের পূর্বেই ঘুম থেকে জেগে উঠার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

11. মিস্ওয়াকের ব্যবহার

পাকস্থলীর রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে মিস্ওয়াক দ্বারা দাঁত পরিস্কার করা অপরিহার্য। দন্তরোগের কারণেই পাকস্থলীর প্রায় ৮০% রোগ হয়ে থাকে। দাঁতের মাড়ীর অথবা মুখের ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ খাদ্য-পানির সাথে মিলিত হয়ে অথবা লালার সংমিশ্রণে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে সমস্ত খাদ্যসমূহকে দূষিত ও দুর্গন্ধময় করে তোলে। ফলে এই পুঁজ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মিস্ওয়াক দাঁতের জন্য উপযোগী যার আঁশগুলো হয় কোমল, যা দাঁতের মধ্যে ফাঁকা বৃদ্ধি করে না এবং মাড়ীতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে, প্রতিবার খাবারের পরে এবং আছর ও মাগরিবের অজুর পূর্বে মেস্ওয়াক করা স্বাস্থ্য সম্মত। তবে যোহর এবং এশার নামাজের পূর্বে খাবার খেতে হবে, যাতে খাবারের পরের মেস্ওয়াক করা ওজুর পূর্বে হয়। এভাবে দৈনিক ছয়বার মেস্ওয়াক করা উত্তম। তিনটি গাছের ডাল মিস্ওয়াকের জন্য উপযোগী (১) নীম গাছের মিস্ওয়াক (২) বাবলার মিস্ওয়াক (৩) পীলু গাছের মিস্ওয়াক। এই তিনটি গাছের ডালে দাঁত গঠনের মূল উপাদান ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বেশী পরিমাণে রয়েছে। সে কারণে এই তিনটি গাছের মিস্ওয়াক উত্তম।

12. সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ

দিনে-রাতে তিনবার খাবার গ্রহণ, মধ্যে দু'বার সামান্য নাশতা খাওয়া উত্তম। অতিভোজন নয় কখনো। সারাদিনের খাবারে পরিমাণ মতো শর্করা, আমিষ, তেল, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি থাকতে হবে, যাকে বলে সুষম খাবার। খাদ্য-আঁশও থাকতে হবে খাবারে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়, কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরের ওজন কমাতে, মেদভূড়ি কমাতে, খাদ্যনালি ও স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমাতে খাদ্য-আঁশ উপকারী। বাইরের খাওয়া-দাওয়া করার সময়ও ভাবতে হবে খাবারটা স্বাস্থ্যসম্মত কি না। ধুলাবালি, মাছি, অপরিচ্ছন্নতা, বাসি, পচা বা নিম্ন মানের খাবার থেকে সতর্ক হয়ে খাবার গ্রহণ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধার অনুভূতি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া যাবে না এবং পরিপূর্ণরূপে পেটভরার পূর্বেই খাবার খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে, তাহলে প্রতিটি মানুষেরই সুস্থতা বজায় থাকবে। রাতের খাবার পরিত্যাগ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়। বর্তমান যুগে অনেক লোকই অজ্ঞতার কারণে অথবা অভ্যাসগত ভাবে রাতে খাবার খায় না। তাদের ধারণা এতে বদহজমী থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এটা তাদের ভুল ধারণা। তাদের এই অভ্যাস পরিবর্তন করা উচিত। ব্যক্তিগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা অন্য কোন সমস্যার কারণে পরিত্যাগ করলে ভিন্ন কথা। তা না হলে রাত্রের খাবার যৎসামান্য হলেও খাওয়া উচিত। রাত্রের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়া অথবা ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কারণ খাদ্য শরীরে ব্যয় না হতে পারলে রক্তে ও শরীরে চর্বি ও গ্লুকোজ বৃদ্ধি করে, ফলে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিক্স সৃষ্টি হয়।

13. রোগ নয়, রোগী চিকিৎসার জন্য গুরুত্ব প্রদান

আমরা যাকে রোগ বলি তা রোগ নয়, রোগের ফল মাত্র। এই ফলস্বরূপ রোগ আমাদের চিকিৎসার বিষয় নয়। প্রকৃত চিকিৎসার বিষয় হল রোগী। এই রোগীকে দ্রুততম উপায়ে তার বিশৃঙ্খল অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

হতে সুশৃঙ্খল অবস্থায় ফিরিয়ে আনাই সুচিকিৎসা। তখন উক্ত ফলস্বরূপ রোগ এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। এজন্য সর্ব প্রথমে রোগীর মানসিক লক্ষণ, অতপরঃ অন্যান্য লক্ষণ সংগ্রহ করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা একজন আদর্শ চিকিৎসকের কর্তব্য। রোগী চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগ নয় রোগীকে অর্থাৎ ব্যাক্তিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। প্রত্যেক রোগের ক্ষেত্রে, অন্যান্য শারীরিক লক্ষণের সাথে মনের ও প্রকৃতির অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করে রোগীর যন্ত্রণা দূর কল্পে, ওষুধসমূহের মধ্য হতে এমন একটি ওষুধ নির্ধারণ করতে হবে, যা রোগের অন্যান্য লক্ষণের সদৃশ লক্ষণ এবং মনের ও প্রকৃতির পরিবর্তনের সদৃশ অবস্থা উৎপাদন করতে পারে। তবেই আমরা প্রকৃতিসম্মতভাবে আরোগ্য লাভে সমর্থ হব। এরূপ আত্মিক ও স্নায়ূবিক শক্তি পারস্পরিক ধারণা বিনিময় করে নিজেদেরকে রোগমুক্ত করে তোলে এবং এই অবস্থায় রোগী দ্রুত রোগমুক্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ওষুধের রোগ নিরাময় লক্ষণ, রোগীর শারীরিক ও মানসিক লক্ষণের সঙ্গে সদৃশ হলে সে ওষুধদ্বারা রোগ নিরাময় সম্ভব হবে। এছাড়াও রোগীর সঙ্গে অন্তরিক ব্যবহার এবং সেবা প্রদান দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য সহায়ক।

14. রোগী দেখতে যাওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন ও প্রচলন

রোগী দেখতে গিয়ে তার সঙ্গে হাসি মুখে ভাল ভাল কথা বললে, দু'আ করে রোগ মুক্তির আশার বাণী শুনালে ও সেবা-শুশ্রুষার মাধ্যমে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। দেখতে যাওয়ার কারণে রোগীর মন সান্তনা লাভ করে, ফলে রোগের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। যে ব্যক্তির অন্তরঙ্গ ও সান্তনা দানকারী বন্ধু বা সাথী তার থেকে পৃথক রয়েছে, তার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মনোবেদনার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। সংসারে যারা একা, যাদের আপন কেহ নেই- এমন লোকদের একাকীত্বের অনুভূতি তাদেরকে দুর্বল করে দেয়। যাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন অথবা ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধু নেই তাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছা অনেক কমে যায় এবং নিজেকে রক্ষা করার কোন ইচ্ছাই তাদের থাকে না। যদি কোন রোগীকে তার দীর্ঘ জীবন লাভের দু'আ করা হয় তাহলে রোগীর মন অবশ্যই আন্দোলিত ও প্রফুল্ল হবে। রোগীকে যদি বলা হয় যে আল্লাহ চাহেন তো ভয়ের কোন কারণ নেই এবং যদি তার সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করা হয় তাহলে রোগীর মনের ভয় দূর হবে, মনে সাহস সঞ্চয় হবে এবং মানসিক শক্তি বেড়ে যাবে। ফলে, রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। এ সকল কারণে বৃদ্ধদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো একটি ভুল সিদ্ধান্ত। তবে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা ঠিক নয়। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির নিকট বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে তার কষ্ট বেড়ে যেতে পারে। বিশ্রাম রোগীর জন্য খুবই প্রয়োজন।

15. সঠিক পন্থায় অন্তর-রোগের চিকিৎসাকরণ

যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্থ তারা কখনও সঠিক চিন্তা-ভাবনা করতে পারেনা। তারা সব সময় ভুল চিন্তা করে কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। উপরন্তু তারা সব সময় নিজেদের চিন্তা ধারাকেই সঠিক বলে দৃঢ়তা পোষণ করে। তারা নিজেদের কাজকর্মকে সঠিক এবং এর বিপরীত কাজকে বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ মনে করে। কারণ তাদের চিন্তা, জ্ঞান ও বিবেক তাদেরকে ভুল তথ্য দেয়। সমাজে তারা বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি, ফেতনা-ফ্যসাদ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাদেরকে যখন বলা হয় তোমরা

অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরাই শান্তি স্থাপনকারী। তারা যা বলছে জেনে বুঝেই বলছে, যে তারা শান্তি স্থাপন কারী; আমরা অশান্তি সৃষ্টিকারী নই। কারণ, তাদের অন্তর রোগগ্রস্ত। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন ভাল এবং মন্দকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারে না, তেমনি অন্তরের রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও কোনটি সঠিক এবং কোনটি সঠিক নয় এ দুই-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। শুধু এদের অন্তর-রোগের চিকিৎসার মাধ্যমেই সঠিক জীবন ধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। অন্তর-রোগের এক মাত্র সঠিক চিকিৎসা হলো স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান 'আল-কুরআনের' বিধি-বিধান সঠিকভাবে মেনে চলা। অন্তর-রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে শুধু ব্যক্তি নয়, বরং সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্র এমনকি সমগ্র পৃথিবীবাসী পেতে পারে একটি সুন্দর জীবন ব্যবস্থা। অতএব সমাজের মঙ্গলের জন্য অন্তরে-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

16. বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবায় বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ
স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন:

(ক) বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহীতা সেবা নিশ্চিত করা;

(ক) অধিভুক্তিকৃত এনজিও (বেসরকারি সংস্থা) কে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সেবাবঞ্চিত এলাকাসমূহে কাজ করতে উৎসাহিত করা;

(গ) সরকারের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের সহায়তায় কিংবা যৌথ উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং যথাসম্ভব স্বল্প মূল্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;

(ঘ) সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের মধ্যে আলোচনা ও সমন্বয় জোরদার করা এবং সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বেসরকারি ও ব্যক্তিখাত প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর "ফোকাল পয়েন্ট" হিসেবে কাজ করা প্রয়োজন।

(চ) বিদ্যমান জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবাকেন্দ্রসহ স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা;

(ছ) সকল সক্ষম দম্পতি বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাড়ি বাড়ি সেবা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং মাঠ পর্যায় থেকে রেফারেল নিশ্চিত করা। এছাড়া ই-প্রজনন সেবা প্রচলন করা;

(জ) নব-দম্পতি, কিশোর-কিশোরী ও এক বা দুই সন্তানের দম্পতিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পিত পরিবার গঠণ পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ঝ) স্বাস্থ্য ও পরিকল্পিত পরিবার গঠণ পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য ও সেবার অপূর্ণ চাহিদা সম্বলিত দম্পতিদের চিহ্নিত করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;

(ঞ) প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সেবা প্রদানকারীদের সহায়তায় সকল প্রসব সেবা নিশ্চিত করা;

(ট) সকলের জন্য এবং বিশেষ করে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য যৌনরোগ, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রমন সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় তথ্য ও সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;

Dhaka University Institutional Repository

(ঠ) বসতবাড়ীতে ফলমূল ও শাক-সবজী উৎপাদনে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ভিটামিন এ এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সরবরাহ নিশ্চিত করা। শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের অপুষ্টি রোধ করা এবং এ বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম বৃদ্ধি করা;

(ড) সকল মহিলা ও শিশুকে টিকাদান নিশ্চিত করার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;

(ঢ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে দিবা-রাত্রি সেবা নিশ্চিত করা। সকল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার, ফার্মাসিস্ট, এমএলএসএস ও আয়া নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মিডওয়াইফ হিসেবে তৈরি করা;

(ণ) সকল সেবাকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও যন্ত্রপাতির নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবাদান কেন্দ্রে পরিকল্পিত পরিবার গঠণ পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(ত) অবহিতকরণ ও স্বেচ্ছায় সম্মতির (Informed choice and voluntarism) ভিত্তিতে সকল সক্ষম দম্পতিকে পরিকল্পিত পরিবার গঠণ পদ্ধতি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা;

(থ) দুর্যোগ বা জরুরি প্রয়োজনে বিশেষায়িত (Specialized) জরুরি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

17. রোগ নির্ণয় পরীক্ষাগারের দূর্নীতি রোধকরণ

আধুনিক বিশ্বে রোগ নির্ণয় পরীক্ষাগার (Diagnostic Centre) আবশ্যিক ও কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। কিন্তু এই কার্যকর ভূমিকা নির্ভর করে সৎ ও উপযুক্ত চিকিৎসক, পরীক্ষক, পরীক্ষাগারের কর্মকর্তা ও পরীক্ষাগারের মানের উপর। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের অনেক পরীক্ষাগারই অনুপযুক্ত এবং অনৈতিক ভূমিকা রাখায় রোগ নির্ণয়ে এক বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। তাদের সেবার মূল্যও অধিক যা দরিদ্র রোগীদের জন্য কষ্টকর। অন্যতম কারণ হিসাবে চিকিৎসকের অনৈতিক ভূমিকা দায়ী। পরীক্ষাগারে অর্জিত আয়ের ৩০% হতে ৬০% পর্যন্ত চিকিৎসকের কাছে পৌঁছাতে হয় ফলে বাড়তি ব্যয় রোগীকেই বহন করতে হয়। শুধু যে প্রাইভেট ক্লিনিক হতেই চিকিৎসকরা পরীক্ষাগারে রোগ নির্ণয়ের নির্দেশনা প্রেরণ করেন তাই নয় এমনকি সরকারী হাসপাতাল হতেও এই নির্দেশনা দিতে তারা সঙ্কোচ বোধ করেন না। সচেতন-মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে চিকিৎসকদের নৈতিক মান বৃদ্ধি করতে হবে এবং অতিশিগ্রই এ সমস্ত অনৈতিক কার্যক্রম বন্ধে সরকার ও সচেতন সমাজকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

18. চিকিৎসাসেবার গুণগত মান উন্নয়ন

প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার মান সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অনেকগুলো কারণের মধ্যে সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকা এবং সহজে সেবা প্রদানকারীর কাছে পৌছানোর ব্যর্থতা বিশেষতঃ দরিদ্র, প্রান্তিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। অন্যান্য কারণসমূহ হলো- সেবা প্রদান কারীদের দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ওষুধ-পত্র ও সেবা প্রদানকারীর স্বল্পতা। বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত মান ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এজন্য বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিকমানের তুলনায় বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের বিপুল ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অজ্ঞ ও অদক্ষ লোকের সেবা নিতে বাধ্য হচ্ছে অথবা চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য বিদেশে যাচ্ছে। দক্ষ মানব সম্পদের সংখ্যা ও বিশেষতঃ নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা ও মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নূতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হচ্ছে ও উন্নত দেশসমূহে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জটিল রোগসমূহের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা দরকার। নার্সিং পেশা সেরা পেশা হিসেবে একে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং নার্সিং পেশাকে সম্মান করতে হবে। একজন রোগী একজন চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা পান, তবে সেই রোগী একজন নার্সের হাতের কোমল ছোঁয়ায় দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। একজন নার্স রোগীর মনে প্রশান্তি এনে দেয় এবং তাকে উৎসাহিত করে। এসব কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতির সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে চিকিৎসক যখন নিজ পেশার মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে রাজনীতিবিদদের ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। নিজ পেশার এক উৎকর্ষতার আয়ত্বের চাইতে যখন রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যের কারণে ক্ষমতার মোহ একজন চিকিৎসককে বেশি আকর্ষিত করে তখনই কর্তব্য হতে তাঁর বিচ্যুতি ঘটে। ফলে আমাদের বিস্ময় আর হতাশার সঙ্গে দেখতে হয় কী করে DAB (Doctors Association of Bangladesh) এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সদস্যরা শুধু রাজনৈতিক বিভিন্নতার কারণে মারামারি, ভাঙচুরে লিপ্ত হন। প্রফেশনালিজম তখন রাজনীতির নির্মম প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হয়। সিবিএর নেতাদের মতো দলবাজি করা তাঁদের সাজে না। হাসপাতালের মধ্যে খোদ চিকিৎসকরাই যদি বিক্ষোভ-অবরোধের মতো হঠকারী আচরণ করে চিকিৎসা কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টির কারণ হয়, তাহলে জাতির দুঃখ ও লজ্জার সীমা থাকে না। "চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক দলে লেজুড়বৃত্তি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা অনেক সম্মানিত পেশার মানুষ, তাঁদের দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতা একান্তভাবে কামনা করে জনগণ।

যেহেতু প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ, পরিচালন ব্যয় এবং আইনি সহায়তার অভাবে নিয়ন্ত্রক পর্ষদসমূহ যথেষ্ট কার্যকর নয়, তাই চিকিৎসা চর্চা অথবা শিক্ষা এবং গবেষণায় নৈতিকতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতি হয়। এ সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা এবং যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

একটু যশ বা খ্যাতি আছে এমন শিক্ষককে ঢাকার বাইরে বদলি করা হলেও তারা প্রায়ই সেখানে থাকেন না। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ দিনের বেশি এমনকি কেউ কেউ ৪ দিনও ঢাকায় অবস্থান করেন। ঢাকার বাইরের কর্মস্থলের শিক্ষক-চিকিৎসকের প্রায় সবাই ঢাকায় এসে সারাদিনই প্রাইভেট প্রাকটিসে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। আবার কেউ কেউ ছুটি নিয়ে, নানা অজুহাত দেখিয়ে এমনকি কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঢাকায় থাকছেন প্রাইভেট প্রাকটিস করার জন্য। ফলে ঢাকার বাইরের জেলা শহরগুলোর সরকারি মেডিকেল কলেজগুলো কোন মতে শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর বেশির ভাগই নিয়মিত শিক্ষক নেই। এমনও অভিযোগ রয়েছে, কোন প্রকার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেই এমন ডাক্তাররাও এসব মেডিকেলে ক্লাস

করিয়ে থাকেন। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার জন্য নেই হাসপাতাল সুবিধা। বছরে ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হলে ২৫০ বেডের হাসপাতালের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ছাড়া বেশির ভাগ মেডিকেল কলেজে একজন ছাত্রের জন্য ৫টি হাসপাতাল বেড দূরে থাকুক কারো কারো একটিও নেই। এ ছাড়া হাসপাতালে রোগী নেই, ডাক্তার নেই। এমনকি ক্লাস করানোর মতো পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই বলেও অভিযোগ রয়েছে। অল্প কয়েকটি ছাড়া সব বেসরকারি মেডিকেল কলেজেই একই অবস্থা চলছে। এরা কেবল বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তাব্যক্তিদের ম্যানেজ করে চলে। সে কারণে কোনো ইন্সপেকশন টিম সেখানে যায় না। গেলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় না। ঢাকায় সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে শিক্ষক সঙ্কট নেই। ঢাকার বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোয়ও শিক্ষক আছে। ১০-১২টি ছাড়া অন্য কোন বেসরকারি মেডিকেল কলেজে কোয়ালিটি অ্যাডুকেশন হচ্ছে না। জেলা শহরগুলোর সরকারি মেডিকেল কলেজের অবস্থাও খারাপ। মেডিকেল কলেজগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য ‘অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল’ গঠনের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ ধরনের হাসপাতাল ‘প্রাইভেট-পাবলিক’ পার্টনারশিপে চালালে সমস্যার সমাধান হতে পারে। সরকার উদ্যোগ নিলে হাসপাতালগুলোও চলবে, শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে, আবার দরিদ্র মানুষ চিকিৎসাসেবা পাবে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে, শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন-ভাতা দেয়া হয় না বলে সেখানে কোন শিক্ষক বেশি দিন থাকেন না। সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

19. স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধিকরণে নিম্নোক্ত বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন

১) সরকার প্রধানের নেতৃত্বে জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজন। এ কাউন্সিলে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বেসরকারি খাতের স্টোকহোল্ডার ও এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কাউন্সিল স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ে কাউন্সিলের কাছে দিক-নির্দেশনা চাওয়া হবে।

২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ও পুষ্টিনীতির আলোকে কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবে। কমিটি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংস্কার, জনবল নিয়োগ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, কর্মীদের কর্মজীবন পরিকল্পনা, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনানীতিসহ স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

৩) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান উন্নয়ন করতে হবে এবং তা সার্বজনীন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের কর্মকান্ড জোরালো করতে হবে এবং স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর অংশীদারিত্বে পরিচালিত করতে হবে। প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করতে হবে। তবে বিশেষ ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত কম জনগোষ্ঠীর জন্যও (যেমন: চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল) কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা যেতে পারে। দ্রুত নগরায়ণের ফলে শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার সাথে সাথে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এদের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কার্যকর রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই জটিলতর রোগীদের পরবর্তী ধাপে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪) জরুরী স্বাস্থ্যসেবা জীবন বাঁচাতে পারে বিধায় সার্বজনীন জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এ মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যা বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আরোগ্যমূলক ও পুনর্বাসন সেবাসমূহের সন্তোষজনক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৬) রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ (Epidemiological Surveillance) পদ্ধতিকে বিস্তৃত করে রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

৭) স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের জন্য স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধ নীতিকে আরও গ্রহণযোগ্য এবং উন্নত করতে হবে। বর্তমান সময়ের চাহিদা, নিরাপত্তা, উপকারিতা, ক্রয়ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বস্তরে জরুরী ওষুধের সহজপাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

৮) জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ক্ষতিকারক দিক জনসম্মুখে তুলে ধরতে হবে এবং বিকল্প হিসাবে পরিকল্পিত পরিবার গঠণ পদ্ধতির প্রচার ও প্রসার জোরদার করতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিকল্পিত পরিবার গঠণ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি পুষ্টি এবং একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট গড়ে তুলতে হবে। এগুলোর কর্মকান্ড প্রত্যান্ত অঞ্চল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সমন্বিত ভাবে উপজেলা পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯) লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে উত্তম শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মাতৃমৃত্যু ও এক বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার কমানোর উপর জোর দিয়ে নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করতে হবে। নারীদের বিশেষত: গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য যৌনরোগ হতে রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নারী বান্ধব কাঠামো তৈরী করতে হবে।

১০) মাতৃমৃত্যুর হার ও প্রজনন হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গ্রাম ও শহর এলাকায় প্রান্তিক মানুষের কাছে এসব সেবা আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছাতে হবে। সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সমন্বিতভাবে কার্যকর করলে তা জন-বান্ধব ও ব্যায় সাশ্রয়ী হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি কার্যকরভাবে সমন্বয় করতে হবে।

১১) একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Intergrated Management Information System) এবং কম্পিউটার নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা সারাদেশে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মনিটরিং-এর জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

১২) স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১৩) স্বাস্থ্য খাতে ব্যাবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়ের উপর চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যখাতে নিয়োজিত অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে।

১৪) বেসরকারি ও এনজিও সংস্থাগুলোকে স্বাস্থ্যসেবায় সম্পূরক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করতে হবে। বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা রোগীদের সঠিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরী করা ও প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যায় সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫) স্বাস্থ্য গবেষণার মান ও পরিধি বাড়াতে হবে। এ খাতে অর্থ বরাদ্ধ বাড়াতে হবে। জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতি, সামাজিক ও আচরণগত এবং প্রায়োগিক গবেষণার উপর জোর দিতে হবে। বাংলাদেশে যে সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলোর গবেষণা করতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

১৬) প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করতে হবে। সে লক্ষ্যে আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারকে যথাযথ সহায়তা প্রদান, অনুদান বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭) স্বাস্থ্যসেবার পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতে অর্থ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গড়ে বাংলাদেশের জিডিপির মাত্র এক শতাংশ সরকার স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বরাদ্দ করে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের সাত শতাংশ করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে প্রতি বছর বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

১৮) স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন একটি সমস্যা। যদিও এ খাতে ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশই জনগণ বহন করে, তারপরেও সম্পদের ঘাটতি থেকেই যায়। এটি সমাধানের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক (formal) প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরিজীবীদের জন্য স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর্থিকভাবে দুস্থ লোকদের জন্য দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতির অভাব রয়েছে। অতি দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত উপায়ে এসব জনগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে কার্ড দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯) সর্বস্তরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণ, স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

২০) স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (BMA), বাংলাদেশ প্রায়ভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোসিয়েশন (BPMPA), আয়ুর্বেদিক মেডিকেল এসোসিয়েশন, ইউনানি মেডিকেল এসোসিয়েশন ও হোমিওপ্যাথি মেডিকেল এসোসিয়েশন নার্সিং এসোসিয়েশন ইত্যাদি পেশাজীবী সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

২১) সকল স্তরের হাসপাতালের বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও ব্যায় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত ও দেশব্যপী তার বিস্তার করতে হবে।

২২) স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ থেকে জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ সুফল অর্জনের লক্ষ্যে সর্বস্তরের জন্য একটি সঠিক ও চাহিদাভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্টসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মীর সল্পতা ও অসম বন্টন ব্যবস্থা, দক্ষতা সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভারসাম্যহিনতা, ন্যায়বিচার ও প্রণোদনার অভাব দূর করার ব্যবস্থা মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশলে রাখতে হবে। চাহিদা যাচাই করে অতিরিক্ত জনশক্তি (ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, প্যারামেডিক প্রভৃতি) তৈরির পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বাস্থ্য জনশক্তির সকল স্তরে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির স্বচ্ছ নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

২৩) চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, প্যারামেডিক ও টেকনোলজিস্টদের শিক্ষা, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করতে হবে এবং গণমুখী ও দেশের প্রয়োজন ভিত্তিক করতে হবে। চিকিৎসা জনশক্তির শিক্ষাদানে সেবার মান, রোগীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, মমত্ববোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(ক) নার্সিংঃ ডিপ্লোমা পর্যায়ে দেশের চাহিদা পূরণ করার জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়াতে হবে। হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষার উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। দেশে গ্রাজুয়েট নার্সদের স্বল্পতা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বিশেষায়িত নার্সিং শিক্ষা (Specialized Nursing) যেমনঃ কার্ডিয়াক সার্জারি, নিউরো সার্জারি, করোনারি কেয়ার ও অন্যান্য বিশেষায়িত ডিসিপ্লিনে নার্সিং শিক্ষা শুরু করতে হবে। নার্সিং শিক্ষকদের স্বল্পতা ও প্রকট দুর করতে হবে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট নার্সিং শিক্ষা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শুরু করতে হবে।

(খ) প্যারামেডিক ও টেকনোলজিস্টদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞানসহ দক্ষতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

(গ) ধাত্রীঃ সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষ জনশক্তি দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) গ্রাজুয়েট পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে আরো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। দেশের প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষাদান ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে। দেশে প্রচলিত পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা ও বিভিন্ন কোর্সসমূহকে সমমানের এবং সমন্বয় করতে হবে। এখানেও আধুনিক প্রযুক্তি ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে। চিকিৎসকদের পেশাগত মান বজায় রাখার জন্য দেশে ও বিদেশে Continuting Medical Education ও প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টার্নিশীপ বিদ্যমান এক বৎসরের পরিবর্তে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে দুই বৎসরে উন্নীত করে তার মধ্যে অন্ততঃ এক বছর গ্রাম পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে তাদের কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

২৪) মেডিকেল প্রাকটিশনাদের রেজিস্ট্রেশন, পেশাগত মান এবং এথিক্যাল প্রাকটিস সংক্রান্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে তদারক করার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আরো শক্তিশালী করতে হবে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলকেও পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করতে হবে। ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং অন্যান্য প্যারামেডিকদের সেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যথাক্রমে ফার্মেসি কাউন্সিল এবং স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টিকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

২৫) সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য মেডিকেল কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করতে হবে এবং সেগুলোর যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

২৬) সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে যে সমস্ত চিকিৎসক বা শিক্ষার্থী সার্বক্ষণিক ও আবাসিক পদে এবং জরুরি বিভাগে কর্মরত আছেন এবং যারা Non-clinical Subject এর শিক্ষক তাদের প্রাইভেট প্রাকটিস থেকে বিরত রেখে নন-প্রাকটিসিং ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২৭) প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে রোগী পরিচর্যার ক্ষেত্রে মান সম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর একটি সহায়িকা তৈরী করতে হবে।

২৮) সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তাদের কর্মস্থলে উপস্থিতি ও সর্বোত্তম সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২৯) মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী সমূহের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এজন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।

৩০) সংক্রামক রোগসমূহ যেমনঃ শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি জোরদার করতে হবে। যক্ষা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি জোরদার করতে হবে। সংক্রামক রোগসমূহের নিরাময়মূলক সেবা জোরদার করতে হবে।

৩১)অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। সমন্বিত উপায়ে সকল পর্যায়ে প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান অসংক্রামক রোগগুলো যেমনঃ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, আর্সেনিকোসিস সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং জীবনধারা পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৩২) জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ূ পরিবর্তনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মাঠ জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রোগগুলোর সংখ্যা কমাতে একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৩৩) টিকাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করতে হবে।

৩৪) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ স্কুল হেল্‌থ কার্যক্রম চালু করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ জীবন-যাপনের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৫) শিল্প ও কৃষি খাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৩৬) চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের প্রয়োগ সম্প্রসারিত করতে হবে। এজন্য দক্ষ জনবল তৈরী ও গবেষণার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৩৭) বিদেশ হতে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে, বিশেষ করে মারাত্মক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এমন দেশ থেকে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে দেশে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটতে না পারে সে লক্ষ্যে স্থল, জল ও বিমান বন্দরসমূহে প্রত্যাগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

20. আধুনিক ও যুগোপযোগী স্বাস্থ্য-গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও কর্মসূচি, সেবা প্রদান ও দরিদ্র-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নে স্বাস্থ্য গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ ও প্রমাণের ভিত্তিতে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা উত্তম। পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ প্রয়োগধর্মী জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণা ব্যবস্থার অভাবের ফলে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং গবেষণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিঘ্নিত হয়। স্বাস্থ্য গবেষণার জন্য প্রতিটি দেশের সরকার বিপুল অংকের বাজেট বরাদ্ধ করেন। এদেশের সরকারকেও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে চিকিৎসা গবেষণা দল গঠন করতে হবে। তাঁরা শুধু চিকিৎসাসেবার উন্নয়নের জন্য গবেষণা করবেন। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা উন্নত করার উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার এখনো যথেষ্ট নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য জনশক্তির আগ্রহ ও দক্ষতার অভাব এবং প্রয়াজনীয় অবকাঠামোর অপ্রতুলতা প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বিরাজ করছে। রোগ তাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ সামর্থ্য সত্ত্বেও নিয়মিত ভাবে করা হয় না। আচরণগত পরিবীক্ষণের কথা খুব কমই চিন্তা করা হয়। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ই-হেল্থ, টেলি-মেডিসিন এবং ই-তথ্যের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এখনও হয়নি।

21. সেবার মান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকরণ

সেবার মান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ইসলামী শাসনামল থেকেই ভ্রাম্যমান হাসপাতাল তৈরী শুরু হয়। মুলতঃ ইসলামের এসব ভ্রাম্যমান হাসপাতালই পরবর্তীকালে মূল হাসপাতাল স্থাপনের সুতিকাগার। বর্তমান সময়ে শহর থেকে দূরবর্তী এলাকায় চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য এ ধরনের ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। চিকিৎসা সচেতনতা, রোগ সচেতনতা ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতার জন্য হাসপাতালের আলাদা হলে বক্তৃতা মঞ্চের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গোসলখানাসমূহে রোগীদের উপযোগী ঠান্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক রোগীকে হাসপাতালে অবস্থানকালীন জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার পরিধেয় এবং তোয়ালের ব্যাবস্থা করা। রোগীদের প্রয়োজন এবং চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন হালাল পশু-পাখীর গোশত্ ফল-ফলাদিসহ বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য সরবরাহ। কুলীন-অকুলীন, গরীব-ধনী, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই হাসপাতালসমূহ হতে সমানভাবে সুবিধা লাভের ব্যবস্থা করতে হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকমন্ডলীর ব্যবস্থাপনায় এবং খুব মনোযোগ এবং হৃদ্যতা সহকারে চিকিৎসা হলে অতি দ্রুত রোগীরা আরোগ্য লাভ করে।

ইসলামী যুগে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় শুধু শাসকদেরই অবদান ছিল এমনটি নয় এ কাজে সমকালীন চিকিৎসকরা ক্ষমতাসীনদের সাহায্য সহযোগিতা দাবী করতেন। ফলে, বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠতো হাসপাতাল। শাসকরাও অকৃপণ হাতে সার্বিক সাহায্য দিয়ে হাসপাতালে স্থাপনের পৃষ্ঠপোষকতা

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। ইতিহাসের পাতায় সে কাহিনীসমূহ আজো সযত্নে রক্ষিত আছে। আজও যদি এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে বাংলাদেশের হাসপাতালসমূহ হতে পারে বিশ্বের মধ্যে সেবা ও মানের দিক দিয়ে বিশ্বসেরা। অতএব, শুধু সরকারই নয় চিকিৎসক, সমাজপতিসহ সর্বস্তরের জনগণ যদি এই মহান কাজে এগিয়ে আসেন তাহলে এক দিকে পাবেন সুনাম, সম্মান ও মানবসেবার জন্য পাবেন ইতিহাসের পাতায় গৌরবের স্থান। অপরদিকে মহান আল্লাহর নিকট থেকে আখেরাতের অফুরন্ত পুরস্কার ও মর্যাদাতো রয়েছেই। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে শুধু স্বাস্থ্যনীতিকে বাস্তবায়নই নয় আত্মমানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

22. সুস্বাথ্যের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম

সুস্থ থাকতে হলে নিয়মিত ব্যায়াম প্রয়োজন। যেমন, হাঁটা, জগিং, দৌঁড়ানো, সাইকেল চালানো, সাঁতারকাঁটা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা সহ আরো কত কী! হাঁটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। সহজ ও মোটামুটি ঝুঁকিহীন কিন্তু উপকার অনেক। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ প্রতিরোধ হবে; শরীরের মেদ কমবে। শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়, ফলে শরীর ও মন থাকে প্রফুল্ল। প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন একটু দ্রুত (মিনিটে ১০০ কদম) হাঁটলে শরীর থাকবে ফিট। সাঁতারকাঁটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। এর মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অঙ্গের ব্যায়াম হয়। শরীরের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, রক্তে চর্বির আধিক্য, উচ্চ রক্তচাপ, মহিলাদের স্তন ক্যান্সার ইত্যাদি অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সুতরাং শরীরের ওজন রাখতে হবে সঠিক। এ জন্য একদিকে যেমন চাই পরিমিত খাবার, অন্যদিকে এ খাবার ব্যবহারের জন্য তেমনি চাই পরিমিত ব্যায়াম। যাদের শরীর মোটা তারা একটু কম খেলে এবং বেশি পরিশ্রমের মাধ্যমে শরীরের ওজন কমানো সম্ভব। নিয়মিত ব্যায়াম করলে গ্যাস্ট্রিক, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ্বরোগ, মেদভূড়ি, হৃৎপিন্ডের রোগ, অনিদ্রা ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নিয়মিত হাঁটলে শরীর অন্যান্য রোগ-ব্যাধি থেকেও মুক্ত থাকে।

23. মনমেজাজ নিয়ন্ত্রণ

কিছু কথা বা কাজ আছে যেগুলো করলে মন ভাল থাকে। আবার এমন কিছু কথা বা কাজ আছে যেগুলো করলে মন খারাপ হয়। আমাদেরকে মন্দটা পরিহার করে ভালটা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে বর্ণিত কাজ সমূহ করলে মনমেজাজ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

- হাসুন প্রাণ খুলে। হাসলে 'এনডরফিন হরমোন' নিঃসরণ হয়, যা মস্তিষ্কে ভালো লাগার অনুভূতি জাগায়। হাসি খুশি মানুষ সুস্থ থাকে দীর্ঘ দিন। আপনার প্রিয় কাজগুলো করুন। প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান, গল্প করুন, আর প্রাণ খুলে হাসুন।
- ব্যায়াম করুন নিয়মিত। ব্যায়ামে, এমনকি কেবল উঠ-বস করলে, যৌবনের হরমোন 'গ্রথ হরমোন' এর নিঃসরণ বাড়ে। আর এই হরমোনের জন্য মন ভালো হতে পারে। ব্যায়ামের ফলে মস্তিষ্কে মন ভালো লাগার মতো কিছু 'নিউরোট্রান্সমিটার' নিঃসরণ হয়।
- হাতের পরশও ভালো করতে পারে মন। পরশেও নিঃসরণ হয় 'এনডরফিন', 'গ্রোথ হরমোন'। এগুলো স্ট্রেসের ক্ষতিকর দিক কমায়। নিয়মিত হাতের পরশ পাওয়া রোগীরা পরশ না পাওয়া রোগীদের চেয়ে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

24. রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ ও হৃদরোগ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

রক্তের কোলেস্টেরল পরিমিত পরিমাণ থাকা জরুরী। কোলেস্টেরল আমাদের শরীরকে সুস্থ সবল রাখে। প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে কোলেস্টেরল দুইশত মিলিগ্রামের মধ্যে থাকা উচিত। কোলেস্টেরলের আধিক্যের সমস্যা হচ্ছে অবচেতন ভাবে শরীরের রক্তনালীগুলো বিশেষ করে হৃৎপিন্ডের Coronary Artery তে চর্বির আস্তরণ পড়ে সংকীর্ণ হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপসর্গ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এটা ধরা পড়ে না। নিয়মিত রক্তের Lipid Profile চেক করা সবার জন্য জরুরী। কোলেস্টেরল হিসাব-নিকাশে যদি গরমিল থাকে তাহলে শারীরিক অনেক অসুবিধা হতে পারে। 'এইচ ডি এল' ভাল কোলেস্টেরল এবং 'এল ডি এল' মন্দ কোলেস্টেরল। 'এইচ ডি এল' কোলেস্টেরল রক্তের সব কোলেস্টেরলকে লিভারে নিয়ে যায় প্রসেসিংয়ের জন্য, নিষ্কাশনের জন্য। এতে রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে, রক্তনালির দেওয়ালে কোলেস্টেরল জমে কম। রক্তনালি ভাল থাকে। উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে। 'এল ডি এল' কোলেস্টেরল রক্তনালির দেওয়ালে জমা হয়। রক্তনালির দেওয়ালে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে পুরু ও শক্ত। কমে যায় রক্তের প্রবাহ। ফলে দিনে দিনে বাড়তে থাকে রক্তচাপ; পরিণতি উচ্চ রক্তচাপ। সম্ভাবনা বাড়ে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের। হার্টের অসুখ, হার্টের রক্তনালির অসুখ, এ সবই হৃদরোগ। হৃদরোগ মারাত্মক রোগ। মৃত্যুর অন্যতম কারণ। নানা কারণে হৃদরোগ হয়ে থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি। সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে খাবার না খাওয়া, চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া এবং ব্যায়াম না করা কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ার বড় কারণ। চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হবে কম, ব্যায়াম করতে হবে বেশি। ব্যায়াম করলে হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়ক। প্রতিদিন ৩০ (ত্রিশ) মিনিট করে সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন ব্যায়াম করলে রক্তচাপ কমবে প্রায় ৪ থেকে ৯ মিলিমিটার। মাত্র কয়েক সপ্তাহেই এরূপ ফল পাওয়া যাবে। নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে রক্তচাপ গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকবে। ইসলামী জীবন-যাপনে দৈনন্দিন ব্যায়াম হয়। একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার ফলে কিয়াম, রুকু, সিজদাহ, বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের অনেক ব্যায়াম হয়। আর জামাতে নামায পড়ার সময় মসজিদে যাওয়া-আসার সময় হাঁটার মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়াম শরীরের জন্য উপকারি, হাড়ের প্রতিটি জোড়া, চোখ, ঘাড়, রক্তনালি ও হৃৎপিন্ডের জন্য ভালো। হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে হলে খাবার হতে হবে হৃদবান্ধব ও পরিমিত। ফলমূল, শাকসবজি আর আশযুক্ত খাবার খেতে হবে বেশি। তেল-চর্বি খেতে হবে অবশ্যই কম। বিশেষ করে, স্যাচুরেটেড তেল। মাছের তেল ভাল, মাছ খাওয়া যাবে বেশি। খাবার খেতে হবে কম, কারণ বেশি খেলে রক্তে চিনি ও চর্বির পরিমাণ বাড়ে। শরীরে মেদ জমে, শরীর বেশি মোটা হয়ে যায়। মোটা শরীরে ডায়াবেটিক্স, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগ বেশি হয়। এরূপ শরীরে হৃদরোগের ঝুঁকিও বেশি। ইসলাম ক্রোধ পছন্দ করে না। রাগান্বিত হওয়ার দুই ঘন্টার মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্য সময়ের চেয়ে মুটামুটি দুই গুণ বেশি। ধৈর্য-ধারণ ও অত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে হৃদরোগের হঠাৎ অক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

ওষুধ ব্যাতিত নিম্ন পন্থা সমূহের মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

- শরীরের ওজন কমানো।
- দৈনন্দিন কার্যাবলীতে কায়িক পরিশ্রম না থাকলে ব্যায়াম করা।

- সকল প্রকার নেশা ও ধূমপান ত্যাগ করা।
- ঘরের তাপমাত্রায় জমে যাওয়া রান্নার তেল অর্থাৎ সম্পৃক্ত তেল পরিহার করা। এগুলোর বদলে অসম্পৃক্ত রান্নার তেল যেমন : যয়তুন, সরিষা, বাদাম, সূর্যমুখী, ভুট্টা ও সয়াবিন তেল ব্যবহার করা।
- আঁশযুক্ত খাবার বেশী খাওয়া। যেমন : সব ধরনের শাক-সবজী, ফল ও ডাল খাওয়া।
- রসুন ও ইছুপগুল ব্যবহার করা।
- মাছ, বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ বেশী খাওয়া।
- কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাদ্য পরিহার করা। যেমন : লাল গোশত, ডিমের কুসুম, কলিজা, মাছের ডিম, চর্বি, হাঁস-মুগীর চামড়া, হাড্ডি, মজ্জা, ঘি, মাখন, ডালডা, গলদা চিংড়ি, নারিকেল ইত্যাদি।
- সর্বোপরি ডায়াবেটিস থাকলে তা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

25. জন্মনিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ব্যাধির উৎস

জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম বিনামূল্যে ও সস্তায় অতি সহজলভ্য করার কারণে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে দায়িত্বহীন যৌন সম্পর্কের সকল সুযোগ সৃষ্টির পর জন্মরোধ পদ্ধতি এক শ্রেণীর নারীকে ব্যভিচারীনী হতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে অবাধ যৌন মিলনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। জন্মরোধ পদ্ধতি নারীকে অবৈধ মিলনের সাহস যুগিয়েছে। ফলে, সমাজে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। এক পুরুষের বহু নারী এবং এক নারীতে বহু পুরুষের অবৈধ মেলামেশার কারণে সমাজে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সোনার সংসার আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও তার ক্ষতিকর দিক থেকে ফিরে আসতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। পুরুষ এবং নারী উভয়েরই দৃষ্টিকে নিম্ন ও সংযত করে রাখাতে হবে এবং লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করতে হবে। মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বেড়ায়। তারা যেন তাদের বক্ষদেশকে মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে। মহান আল্লাহর এই নির্দেশ না মানার কারণে আমাদের সমাজে যিনা-ব্যভিচারে ভরে গেছে। মানুষের শরীরে নানা প্রকারের রোগ-ব্যাধি বাসা বেঁধেছে। মানুষের জীবনী শক্তি ও রোগ প্রতিরোধ শক্তি দূর্বল হতে দূর্বলতর হচ্ছে। মানুষ নতুন নতুন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। সিফিলিস, গনোরিয়া, এইড্স, জরায়ুর ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, ওভারীর টিউমার, বেদনা পূর্ণ ঋতুস্রাব, বন্ধাত্ব, কিডনী রোগ, লীভারের রোগ ইত্যাদি রোগে আমাদের সমাজ জরাগ্রস্ত। এ ধরণের মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মানব সন্তান আজ অকালে মৃত্যুবরণ করছে। যারা বেঁচে থাকছে তারাও নানা প্রকার দূরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। বর্তমান সময়ে এমন একটি পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না যাদের মধ্যে শারীরিক অথবা মানসিক ব্যাধি গ্রস্ত ব্যক্তি নেই। সমস্ত সমাজই আজ অশান্তিতে ভরপুর। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের রীতিনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধি-বিধান মেনে চলা শরীর ও মন উভয়ের জন্যই উপকারী। আর এই বিধি-বিধান না মেনে চললে শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ হয়। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে আজ সমাজে ঘটছে নানা প্রকারের অপরাধ। এর প্রভাবে বাড়ছে অবাধ মিলন, হচ্ছে অবৈধ গর্ভধারণ। ফলে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন যুবক যখন নিজেই নিজের

যৌবনের অপব্যবহার করছে, তার শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। অবাধ যৌনাচারের ফলে মানুষের বিবেক আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আবার যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে আমাদের সমাজ হচ্ছে ক্ষত বিক্ষত। এক পুরুষ বহু নারীতে এবং এক নারী বহু পুরুষে মেলামেশার কারণে একজনের শরীরের রোগ বহুজনের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে। এভাবে শত শত বছর ধরে রোগ-ব্যাধি ছড়ানো এবং এর সঙ্গে 'জিনেটিক' প্রভাবে গোটা বিশ্বে নির্মল চরিত্রের পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, ঘরের প্রশান্তি বিদূরিত হচ্ছে, অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোটা পরিবেশকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। অতএব, জন্মনিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ব্যাধির উৎস হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় সুস্থতার জন্য আমাদেরকে এর থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

26. জন্মনিয়ন্ত্রণ উচ্চমেধাসম্পন্ন জনসংখ্যা কমিয়ে দেয়

প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে অর্থনৈতিক মানদন্ড, নৈতিক মান, স্বাস্থ্যগত অবস্থা ইতিমধ্যে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। সমাজে উচ্চ মেধাসম্পন্ন জনসংখ্যা এবং সভ্য লোকদের সংখ্যা শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং অসুস্থ্য ও অনুর্বর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজ থেকে উত্তম অংশ হ্রাস পাচ্ছে, আর যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তারা বোধশক্তি, দৈহিক শক্তি, বিচক্ষণতা, চিন্তাশক্তি এবং জ্ঞানের আধুনিকতায় অধোগতি। এরা নির্বুদ্ধিতায়, নিষ্ক্রিয়তায় চিন্তাশক্তিহীনতায় এবং আসক্তিতে সকলের উর্ধে। এর ফলে সমাজে নিম্ন মেধাশক্তির জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং যারা অধিক বুদ্ধি ও বিবেচনার অধিকারী, যাদের কর্ম পরিচালনা ও নেতৃত্বদানের যোগ্যতা রয়েছে তাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কোন জাতির এ ধরণের অবস্থা অত্যন্ত বিপদজনক। কারণ, এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে নেতৃত্বদানকারী লোকের অভাব। আর নেতৃত্বদানকারী লোকের অভাব দেখা দিলে কোন জাতিই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। অতএব, বর্তমান অবস্থার থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গতিরোধ করতে হবে এবং পরিকল্পিত পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

27. পরিকল্পিত পরিবার গঠন পদ্ধতি

যৌবনাগমণের পর থেকেই পুরুষের Testis এর Seminiferous Tube এ স্পারমেটোজোয়া (Spermatozoa) বা শুক্রকীটের সৃষ্টি হয় এবং নারীদের ওভারীর Matured Graffian Follicle থেকে Ova বা Egg সৃষ্টি হয়। এই সময় তাদের মধ্যে যৌনমিলন ঘটলে ফ্যালোপিয়ান টিউবের Ampulla-তে একটি শুক্রকীট ও একটি Ova মিলিত হয়ে Zygote সৃষ্টি করে। এটি নির্ভর করে নারীর Menstruation বা ঋতুচক্রের উপর। ডিম্ববাহী নালীতে পূর্ণ ডিম্বটি এসে নির্দিষ্ট সময় ধরে অবস্থান করে। ঐ সময়ে নারীর সঙ্গে পুরুষের যৌনমিলন হলে তার গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে। কিন্তু তা না হলে এ ডিম্বটি বিনষ্ট হয় ও বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর যে Endometrium-টি তৈরী হয়েছিল সন্তান ধারণের জন্যে তার কিছু অংশ ও রক্ত, মিউকাস প্রভৃতিসহ বেরিয়ে আসার নামই ঋতুস্রাব। প্রতি ২৮ দিন অন্তর চক্রাকারে হতে থাকে বলে একে ঋতুচক্র বলা হয়। একটি আদর্শ ঋতুচক্রকে সাধারণত ৪টি স্তরে ভাগ করা হয়।

৫. Bleeding Phase বা প্রথম স্তর (1st-4th) দিন। গর্ভসঞ্চার না হলে এই সময় Ova টি ফেটে যায় এবং রক্ত, মিউকাস পভৃতি বের হয়। সাধারণত ১-৪ দিন এই অবস্থা থাকে। অনেক সময় এই অবস্থা ৫-৬ দিন পর্যন্ত চলতে পারে।

৬. Resting Phase বা দ্বিতীয় স্তর (5th-7th) দিন। রক্তপাত বন্ধ হবার পর এই স্তর শুরু হয়। জরায়ুর Endometrium ধীরে ধীরে গঠিত হয় ও তা মাত্র ১ মিলিমিটার মোটা হয়। এদিকে ডিম্বাশয়ে Primordial Follice থেকে আবার একটি Graffian Follicle গঠন শুরু হয়। এই সময় Oestrone এর ক্রিয়া চলতে থাকে।

৭. Proliferative Phase বা তৃতীয় স্তর (8th-14th) দিন। এন্ডোমেট্রিয়াম আরও মোটা হয় প্রায় ৩ মিলিমিটার। গ্রন্থিগুলি ক্রমশঃ কর্ক স্ক্রুর আকার ধারণ করতে থাকে। ক্রমশঃই সেলগুলি ফোলা ফোলা ও লম্বা হতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে Graffian Follicle পূর্ণ ও Mature হয় ও ঠিক ১৪ দিনের দিন পূর্ণ ডিম্ব ওভারি থেকে ডিম্বাহী নালীতে বেরিয়ে আসে।

৮. Progestational Phase বা চতুর্থ স্তর (15th-28th) দিন। এই সময় এন্ডোমেট্রিয়াম খুব বেশি ফুলে ওঠে ও প্রায় ৬ মিলিমিটার মোটা হয়। সঠিক সময়ে শুক্রাণুর সহিত মিলিত না হলে ২৮ দিন পর ফেটে যায়। এভাবে চক্র চলতে থাকে।

Graffian Follicle পূর্ণ ও Mature হয় ও ঠিক ১৪ দিনের দিন পূর্ণ ডিম্ব ওভারি থেকে বেরিয়ে এসে শুক্রাণুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ডিম্বাহী নালীতে অপেক্ষা করে। এই ১৪তম দিন (২৪ ঘন্টার মধ্যে) যদি স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয় তাহলেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়। প্রতি ২৮ দিন অন্তর একটি করে পরিপক্ক ডিম্ব ওভারি থেকে ডিম্বাহী নালীতে বেরিয়ে আসে এবং ২৮ দিন পর ফেটে যায়। এভাবেই ঋতুচক্র চলতে থাকে। ১৪তম দিনের ২৪ ঘন্টাকে পাওয়ার জন্য ১৩তম, ১৪তম, এবং ১৫তম দিনে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলে গর্ভবতী হওয়ার সুযোগ থাকে এবং এই তিন দিন মিলন থেকে বিরত থেকে ঋতুচক্রের অন্যান্য দিনগুলি স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলেও গর্ভধারণ হয় না (ঋতু গোলযোগের কারণে যাদের চক্র ২৪ দিনের কম অথবা ৩২ দিনের বেশী ব্যবধানে হয় চিকিৎসা ব্যতিত তাদের গর্ভধারণ সাধারণত হয় না)।

এই পদ্ধতি কাজে লাগানো গেলে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা বা ওষুধপত্রের প্রয়োজন হয় না। ফলে, একদিকে যেমন পৃথিবীব্যাপি সাশ্রয় পাবে কোটি কোটি ডলারের খরচ, অন্যদিকে অযাচিত রোগ-ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা পাবে কোটি কোটি মানুষ। এই পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে অবৈধ যৌন-মিলনের ফলে ক্ষতিকর রোগ-ব্যাধির ব্যপক প্রচার করতে হবে যাতে পদ্ধতির অপপ্রয়োগ না হয়।

28. নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা

যে কোন প্রকারের নেশাই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপান ও মদপান তার অন্যতম। ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপানের কারণে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ফুসফুস, মুখ, গলা ও পাকস্থলির ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, হাঁপানিসহ নানা রোগ হতে পারে। মদপান মানুষকে ধ্বংশের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়। মদপানের মাধ্যমে লিভার, ফুসফুস, হার্ট, কিডনীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে, নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং ধূমপান, মদপানসহ যাবতীয় নেশা ত্যাগ করা প্রয়োজন।

29. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করণ

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অপরিমিত ব্যবহার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হুমকি স্বরূপ। অধিক ফসল প্রাপ্তির আশায় ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি ও ফসলকে পোকা-মাকড়ের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এই রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বৈজ্ঞানিকরূপে করা হলে খাদ্যদ্রব্য এবং পরিবেশের উপর কম ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আমাদের দেশের কৃষকেরা কীটনাশকের মত প্রাণঘাতী বিষের যত্র তত্র ব্যবহার করছে। আঁখ এবং বিভিন্ন প্রকারের সবজিতে যেভাবে কীটনাশক ব্যবহার করছে তা রীতিমত শরীর শিউরে উঠার মতো। যে পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় তাতে সমস্ত ফসলই বিষাক্ত হয়ে যায়। ব্যবহৃত প্রতিটি কীটনাশকের কার্যক্ষমতা অন্তত ৭ থেকে ১৪ দিন। তবে ব্যবহৃত বেশির ভাগ কীটনাশকের মেয়াদ প্রায় ১৪ দিন। নিয়ম অনুযায়ী কীটনাশকের কার্যকারিতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন আখ বা সবজি খাওয়া উচিত নয়। কিন্ত নির্মম বাস্তবতা, ক্ষেতে ওষুধ প্রয়োগের পরের দিনই ক্ষেত থেকে সবজি সংগ্রহ করা হয়, যা সম্পূর্ণ বিষ যুক্ত। এই বিষ যুক্ত সবজিই আমরা খেয়ে থাকি। এছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য যেমন, ভাত বা রুটি, সবজি, কলা বা ফল-মুল, দুধ, মাছ, পোল্ট্রি মুরগী, ডিম ইত্যাদি যে সমস্ত দ্রব্য আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি এর বেশির ভাগই বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল দ্বারা বিষাক্ত। আমরা যে কোমল পানীয় পান করছি তা কিডনীর জন্য ক্ষতিকর। এ সমস্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে আমাদের লিভার, কিডনী, পাকস্থলী, প্যানক্রিয়াস, হার্ট, ফুসফুস এমনকি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে, বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যেমন, প্লাস্টিকের পাত্র, এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র স্বাস্থ্য সম্মত নয় (এর চেয়ে মাটির পাত্র, কাঁচের পাত্র, চিনামাটির পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার স্বাস্থ্য সম্মত)। ফলে, বিষযুক্ত খাদ্যের প্রভাবে জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে আপামর জনগণ ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। যাদের জীবনী শক্তি দুর্বল তাদের প্রায় সারা বছরই লিভার এবং পাকস্থলীর বিভিন্ন পীড়া লেগেই থাকে। অতএব, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে আমাদেরকে তার সঠিক ব্যবহার অথবা বিকল্প চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।

30. স্বাস্থ্য খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ দূরীকরণ

স্বাস্থ্য খাতে উন্নতি সত্ত্বেও অনেক চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা এবং তা ভোগের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান। এ সকল বৈষম্য সমষ্টিগতভাবে দেশের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে তার মধ্যে চাহিদা ও সরবরাহ উভয় ধরণেরই সমস্যা রয়েছে। রোগী, চিকিৎসক ও রোগ নির্ণয়কেন্দ্র বা হাসপাতালের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে চিকিৎসা ব্যবস্থা। চিকিৎসকের পরামর্শে সুন্দর পরিবেশে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে চলে চিকিৎসা সেবা। দক্ষ চিকিৎসক, কর্তব্যপরায়ণ নার্স ও যোগ্য ফার্মাসিস্টের অভাবে এবং ওষুধনীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়ীত না হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার করে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির বাস্তবায়ন করতে হবে।

31. ওষুধ সম্পর্কিত নীতিসমূহ মেনে চলা

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ইসলামের আলোকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে ওষুধ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নীতিসমূহ মেনে চলা প্রয়োজন।

- এক এ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে অন্য কোনো এ্যান্টিবায়োটিক বা করটিকস্টিরয়েড বা অন্য কোনো দ্রব্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ করে ওষুধ তৈরি করা নিষিদ্ধ করতে হবে।
- শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক এ্যান্টিবায়োটিক যেমন টেট্রাসাইক্লিন, তরল আকারে তৈরি করা যাবে না।
- এনালজেসিকসের কোন প্রকার সংমিশ্রণ তৈরি করা যাবে না, কেননা এর কোনো থেরাপিউটিক সুবিধা নাই। বরঞ্চ এটা বিষক্রিয়াতে সাহায্য করে যা বিশেষ করে কিডনির জন্য ক্ষতিকারক। লৌহ, ভিটামিন বা মদের সঙ্গে সংমিশ্রণ করে এনালজেসিক ওষুধ তৈরি নিষিদ্ধ করতে হবে।
- কোডিন কোনো সংমিশ্রণে ব্যবহার করা যাবে না, কেননা এটা নেশা সৃষ্টি করে।
- সাধারণভাবে কোনো সংমিশ্রণওষুধ তৈরি করা যাবে না, যদি না কোনো প্রকারেই কোনো একক উপাদানের ওষুধ পাওয়া না যায় অথচ চিকিৎসার জন্য কোনো একক উপাদানের ওষুধ মূল্যের দিক দিয়ে যৌক্তিক কিছু নয়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম থাকবে, যেমনঃ চোখ, চর্ম, শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত ওষুধ, ম্যালেরিয়ার জন্য ওষুধ এবং ভিটামিন ও সালফার ড্রাগ ইত্যাদি।
- একমাত্র ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ব্যতীত সব ধরনের ভিটামিন একক উপাদানে আলাদাভাবে তৈরি করতে হবে। অবশ্য বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন বি^{১২} সংমিশ্রণ করা যাবে না। বি^{১২} সব সময়েই একক উপাদানে ইঞ্জেকশন হিসাবে তৈরি করতে হবে। বি-কমপ্লেক্সের উপাদানগুলি পৃথকভাবেও তৈরি করা যাবে। কিন্তু বি-ভিটামিন এর সঙ্গে অন্য কোনো উপাদান, যেমন খনিজ বা এ ধরণের দ্রব্যর সংমিশ্রণ করা যাবে না। এসব ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইঞ্জেকশনরূপে তৈরি করা যাবে। ভিটামিন তরল আকারে তৈরি করা যাবে না, কেননা এতে খরচ বেশি পড়ে এবং ওষুধের অপব্যবহার হয়। তবে শিশুদের জন্য তরল মাল্টিভিটামিন তৈরি করা যাবে। কিন্তু এতে কোনো ভিটামিন যেমনঃ বি^{১২}, ই, কে অথবা খনিজ মেশান যাবে না।
- কোনো কাশির সিরাপ, কাশির লজেন্স, গ্রাইফাইড ওয়াটার, এ্যালকালিস ইত্যাদি তৈরি করা বা আমদানি নিষিদ্ধ করতে হবে। কেননা এইসব ওষুধে খুব অল্প পরিমাণে ওষুধিগুণ থাকে। এইসব ওষুধ আমদানিতে শুধু আমাদের বৈদেশিক টাকার অপচয় হয়।
- টনিক, এনজাইম সিরাপ এবং তথাকথিত শক্তিবর্ধক ওষুধ প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হয় মূলতঃ ক্রেতার অজ্ঞতার কারণে। 'প্যানক্রিয়াটি' এবং ল্যাকটজ ব্যতীত অন্য ওষুধের কোন কার্যকারিতা নেই। কাজেই এখন হতে এ ধরনের ওষুধের আমদানি বা তৈরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য 'প্যানক্রিয়াটি' এবং 'ল্যাকটজ' একক উপাদান হিসাবে আমদানি বা তৈরি করা যাবে।
- কিছু কিছু ওষুধ গঠনের দিক দিয়ে অন্য ওষুধের তুলনায় খুব অল্প পরিমাণে ভিন্ন, কিন্তু রোগ নিরাময় ক্ষমতা একইরূপ। এর ফলে ডাক্তার ও রোগী উভয়েই বিভ্রান্ত হয়। এ ধরণের ওষুধ তৈরি নিষিদ্ধ।
- যে সমস্ত ওষুধে অতি অল্প মাত্রায় কিংবা আদৌ কোনো ওষুধিগুণ নেই, বরঞ্চ কখনো কখনো তা ক্ষতিকারক এবং যা অপব্যবহারে ক্ষতি হয়, সে সমস্ত ওষুধ তেরি বা আমদানি নিষিদ্ধ।
- সমস্ত প্রেসক্রিপশন রাসায়নিক ও গ্যালেনিক্যাল (Galenical) মিশ্রণ যা ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া বা ফার্মাসিউটিক্যাল কডেক্স এর সাম্প্রতিক সংস্করণে উল্লেখিত নাই, তা নিষিদ্ধ হবে।

- নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ, যদিও তাদের গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং অপব্যবহারের সম্ভাবনা অজানা নয়, তবুও ঝুঁকি সত্ত্বেও তাদের নিরাময় করার ক্ষমতার জন্য, নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবহারের জন্য স্বল্প পরিমাণে তৈরি করার অনুমতি দেয়া প্রয়োজন। এই ওষুধগুলি শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ-ডাক্তাররাই প্রেসক্রাইব করতে পারবেন।
- সমপ্রকৃতির কিংবা প্রায় কাছাকাছি কোন বিকল্প ওষুধ যা এদেশেই তৈরি করা যায় দেশীয় শিল্পকে রক্ষার স্বার্থে এ ধরনের কোনো ওষুধ আমদানি করা যাবে না। অবশ্য যদি কোনো ওষুধ চাহিদার তুলনায় স্বল্প মাত্রায় উৎপাদিত হয় তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নিষেধের ব্যত্যয় ঘটতে পারে।
- ওষুধ তৈরির মৌল কাঁচামাল যদি যথেষ্ট পরিমাণে দেশেই উৎপাদিত হয় তবে সেটা বা তাঁর বিকল্প কাঁচামাল আমদানি করা যাবে না।
- বহুজাতিক কোম্পানিগুলি যারা এদেশে ওষুধ সরবরাহ করছেন তাদেরকে প্রশংসা করতেই হয়। তাদের উন্নতমানের মেশিনপত্র ও কারিগরী জ্ঞান যাতে গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন ধরণের ওষুধ তৈরিতে নিয়োজিত থাকতে পারে, সেজন্য এন্টাসিড ও ভিটামিন এর মতন সাধারণ ওষুধগুলি তৈরির দায়িত্ব কেবলমাত্র দেশী কোম্পানিদের হাতেই থাকবে। বহুজাতিক কোম্পানিকে অবশ্য একক উপাদানে ভিটামিন ইঞ্জেকশন তৈরির অনুমতি দেয়া হবে।
- কোনো বিদেশী ব্র্যান্ড ওষুধ লাইসেন্সের মাধ্যমে এদেশে কোন কারখানায় উৎপাদন করা যাবে না, যদি সেই ওষুধ বা সেই ধরনের ওষুধ এদেশে তৈরি বা সহজলভ্য হয়। কেননা এই নিয়মের ফলে ওষুধের অহেতুক মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং বিদেশে রয়েলিটিও পাঠাতে হয়। এই নীতির আলোকে সমস্ত চালু লাইসেন্স চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। যেসব বহুজাতিক কোম্পানির নিজস্ব কোনো কারখানা এদেশে নাই, কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো কারখানায় টোলের বিনিময়ে ওষুধ তৈরি করতে চায়–সে সমস্ত কোম্পানিকে অনুমতি দেয়া যাবে না।
- বিজ্ঞাপনের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন যাতে ওষুধ ও স্বাস্থ্য বিষয়াবলির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের দ্বারা সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নকল, ভেজাল, নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত, বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা এবং অনুরূপ কাজসমূহের দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ওষুধ প্রস্তুতকারীগণকে তাদের সকল ওষুধ উৎপাদনের সর্বোত্তম পরিচয় প্রদানের উপযোগী জেনেরিক বা ফর্মুলারী নামে এবং পণ্য অথবা ব্রান্ড নামে ওষুধের উৎপাদন, বিতরণ ও বিক্রয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- সরকার কর্তৃক সময়ে তালিকাভুক্ত ও হালনাগাদকৃত সাধারণভাবে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধসমূহের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- সাধারণ মানুষ যাতে ক্রয়সাধ্য মূল্যে উপকারী, কার্যকর, নিরাপদ ও ভাল মানসম্পন্ন অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য ওষুধ সহজে পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যবস্থাপত্র প্রদানকারী (Prescriber) এবং প্রান্তিক ব্যবসায়ীদেরকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে দেশের ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়াসমূহের ADR (Adverse Drug Reaction) উপযুক্ত পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

32. সরকারি হাসপাতালের পরিবেশের মান উন্নয়ন

বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালে যেতে মানুষ ভয় পায়। হাসপাতাল শব্দটি মনে হলেই ভীড়, নোংরা পরিবেশ, কোলাহল, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, নার্সের সময় নেই, দুর্গন্ধ, দুর্নীতি ইত্যাদি অনুষঙ্গ মনের কোণে এক কুশ্রী ছবি অঙ্কিত করে। হাসপাতালগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবল অপর্যাপ্ত। যে জনবল আছে, তাদের দিয়েও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ ঠিকভাবে করানো সম্ভাব হয় না, যার দায় বর্তায় চিকিৎসক কর্তাদের ওপর। হাসপাতাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বেসরকারি সংস্থাকে দ্বায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও বারডেম হাসপাতালে এই পদ্ধতি চালু আছে। হাসপাতালগুলোয় রোগীদের অপেক্ষা করার মতো কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে চিকিৎসা নিতে এসে তারা অপেক্ষা করতে চায় না। সে জন্য রোগীরা একটুতেই উত্তেজিত হয় এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। হাসপাতালগুলোয় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা রাখা জরুরি। বর্তমান চিকিৎসা-সংকট কাটাতে চিকিৎসকদের যেমন নৈতিকতায় ফিরতে হবে, তেমনি সরকারি সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে রোগীবান্ধব চিকিৎসার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এরই বিপরীতে রাজধানীর বড় বড় প্রইভেট হাসপাতালে গেলে দেখা যায় অন্য চিত্র। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসক-নার্সদের কর্তব্য পরায়ণতা, শিশুদের জন্য অজস্র খেলনার সমারোহ, ছিমছাম, ভীড়হীন একটি পরিবেশ যা মনে সুখী সুখী ভাব এনে দেয়। চিকিৎসাসেবার সর্বস্তরে এমন পরিবেশই সকলের কাম্য। সরকারি হাসপাতালের রোগীদের ওষুধ পত্র এবং খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য আরামাদির জন্য যাবতীয় খরচ বিনামূল্যে সরবরাহ করা প্রয়োজন। দক্ষ পরিচালনা, শৃংখলা, পরিচ্ছন্নতা, অনাবিল স্বাস্থ্যকর স্থান, উন্নত চিকিৎসা এবং রোগীদের প্রতি সার্বক্ষণিক খেদমতের জন্য সরকারি হাসপাতালের দ্বার সবসময় খোলা রাখতে হবে। প্রতিটি শহর, লোকালয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ সম্প্রসারিত করতে হবে। রোগীদের সুবিধার প্রতি সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রাখা এবং আন্তরিকভাবে চিকিৎসা করায় হবে হাসপাতালগুলোর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। প্রাতিষ্ঠানিক হাসপাতাল ছাড়াও বিশেষত গ্রামাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করতে হবে। যে সব অঞ্চলে ছোঁয়াচে এবং মহামারী ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে সে সব অঞ্চলে ভ্রাম্যমান চিকিৎসকদলের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। আর সকল যুগে এটাই হল সহজ এবং ত্বরিত গতিতে চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর সর্বাধুনিক পন্থা। মোটকথা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, হৃদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার, রোগ প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা, হাসপাতালে রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনাতা সৃস্টি, হাসপাতালয়ে পাঠাগার, বিশ্রামাগার ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা, চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং উদ্ভাবনের ব্যাপারে সরকার ও সমাজসেবকদের সচেষ্ট হতে হবে।

33. বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা হ্রাসকরণ

আমাদের দেশের চিকিৎসা সেবার মান, চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সামগ্রীক ব্যবহার ও চিকিৎসা খরচ এই বিষয়সমূহ প্রতিবেশি দেশসমূহ হতে অনেক বেশি। ফলে, সেবা গ্রহণকারিগণ এদেশে নিরাপত্তা ও সাচ্ছন্দ বোধ করেন না। এদেশে ডাক্তাররা রোগির প্রতি প্রয়োজনীয় সময় দেন না, রোগীর কথা সঠিক ভাবে শোনেন না, তাদেরকে আশান্বিত করার পরিবর্তে হতাশামূলক ব্যাবহার করেন। এমনকি এদেশে অনেক রোগীকে বাঁচবেনা বলে দেওয়ার পর তারা প্রতিবেশি দেশ হতে

চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ সুন্দর জীবন-যাপন করছেন। এসব ঘটনা আমাদের চিকিৎসাসেবার মানকে অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তিরা সামান্য চেকআপের জন্য উন্নত রাষ্ট্রে ছুটে যান। তাহলে এদেশে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবার নিশ্চয়তা কোথায়? দেশে আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। দেশের কর্তাব্যক্তিরা যদি চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো উন্নত করেন এবং এদেশেই চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন তাহলে সাধারণ জনগণ আস্বস্থ হতে পারে এবং এটা প্রয়োজন।

34. চিকিৎসাসেবা নিয়ন্ত্রণে বিধি প্রণয়ন

চিকিৎসাসেবা জনবান্ধব করতে সব সরকারই সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিধি ও নীতির প্রচলন করেন। ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কোম্পানি কর্তৃক চিকিৎসককে অযৌক্তিক প্রভাবন্বিত না করা, অযথা এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করা, চিকিৎসক ফি নিয়ন্ত্রণে রাখা, পরীক্ষাগারের ফি নির্ধারণ করা, চিকিৎসক, সরকারী চিকিৎসকদের অফিস সময়ে প্রাইভেট প্রাকটিস নিষিদ্ধ করণ, বেসরকারী ক্লিনিক, রোগ নির্ণয় পরীক্ষাগার স্থাপন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিধি ও নীতির প্রচলন করেন। কিন্তু আমরা উপজেলা, জেলা হাসপাতালে এর ব্যত্যয় দেখি। চিকিৎসকদের ইচ্ছেমত দেরীতে আসা বা না আসা এখন অনেকটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার সময় রোগীকে ফি গ্রহণের রিসিট দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তা দেওয়া হয় না। চিকিৎসক ও পরীক্ষাগারের ফি, সেবামূল্য এর অর্থের পরিমাণ টাঙ্গিয়ে দেয়ার কথা থাকলেও বেশি ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে উপেক্ষিত। উদ্দেশ্য চিকিৎসা সেবাকে উন্নত, শৃঙ্খলা সম্মত, এবং জনবান্ধব করা।

এতদ সঙ্গে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ গুরুত্বের সাথে মেনে চললে চিকিৎসা পেশার সম্মান সমুন্নত থাকবে বলে আমরা আশা করিঃ

- একজন চিকিৎসক আচার আচরণে হবেন সংযত ও নম্র এবং ব্যবহার ও পোশাকে অতিরঞ্জন বা বিলাসিতা পরিহার করবেন।
- রোগীর স্বার্থ এবং সুস্বাস্থ্য কামনাই একজন চিকিৎসকের রোগীর প্রতি তাঁর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে। যেহেতু চিকিৎসকের পেশার প্রতি রোগীদের বিশ্বাস অতি প্রবল সেহেতু তাদের স্বার্থ রক্ষা করার দায়বদ্ধতাও চিকিৎসকের এবং এক্ষেত্রে একটি বিচ্যুতি কারো কাম্য নয়।
- কোনো চিকিৎসক যদি এমন কোনো সনদ (Certificate) দেন যা অসত্য, অযৌক্তিক বা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বা অনৈতিক তাহলে তাঁকে সাময়িক বরখাস্তের বিধান রাখা প্রয়োজন।
- রোগীর প্রতি পেশাগত দায়িত্বে চিকিৎসকের গুরুতর অবহেলাকে অসদাচরণ (Misconduct) হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তাঁকে সমায়িক বরখাস্ত বা তাঁর নিবন্ধীকরণ বাতিলের বিধান আইনে সংযোজন করতে হবে।
- কোনো চিকিৎসক কোনো গোপন আরোগ্য লাভের পন্থাকে (Remedy) বাণিজ্যীকীকরণ অথবা অন্য কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কোনো পেশাগত ফি'র অংশ কমিশন হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন না।

এ ধরনের নিয়ম-নীতি মেনে চললে চিকিৎসা কার্যক্রমকে যৌক্তিক, সৎ এবং নিয়মতান্ত্রিক রূপে গড়ে তোলা সম্ভব।

35. চিকিৎসকের জবাবদিহিতা

বর্তমান নিয়মে ডাক্তারের অবহেলার কারণে কোন রোগীর মৃত্যু ঘটলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করার সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর কার্যক্রম সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে। চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার কারণে বা কর্তব্যে অবহেলার কারণে প্রায়ই রোগীকে জীবন দিতে হচ্ছে। অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত লোক দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংবেদনশীল রোগের রিপোর্ট দেয়া হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে। এ ধরনের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রিপোর্টের ফরমে আগেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সই ও সিল দেয়া থাকে। অনভিজ্ঞ প্যাথলজিস্ট মনগড়া রিপোর্ট লিখে রোগী বা তার আত্মীয়দের হাতে তুলে দেয়। সম্প্রতি ড্রিল মেশিন দিয়ে ভুয়া চিকিৎসার কথা ধরা পড়ার পর দেশ-বিদেশে এ নিয়ে হইচই পড়ে যায়। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একাধিক তদন্ত দলের কাছেও বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিকের চাঞ্চল্যকর অনিয়ম ধরা পড়েছে অথচ সুনির্দিষ্ট কোন আইন না থাকায় সহজেই পার পেয়ে যাচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা। বেশির ভাগ উদ্যোক্তা প্রভাবশালী। চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে 'সেবা' শব্দের পরিবর্তে 'বাণিজ্য' শব্দটি এখন প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসা নামক পণ্যের কারবারি যাঁরা, তাঁরা অনেক সময় রোগীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য সব রকম নির্মমতা প্রয়োগ করেন। একজন সাধারণ মানুষ যখন রোগী হয়, তখন সে চিকিৎসকের অর্থ উপার্জনের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। কিছু কিছু চিকিৎসক অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ওষুধ লেখেন ব্যবস্থাপত্রে। অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপাচারেরও শিকার হতে হয় রোগীকে। কোনো উপায় থাকে না বলে একজন রোগী অনেক অবিশ্বাস-অনিশ্চয়তা জেনেও চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। সব চিকিৎসকই যে এই অনৈতিক কাজ করেন, তা নয়। অনেক চিকিৎসক আছেন, যাঁরা মেডিকেল ইথিকস মেনে চিকিৎসা সেবা দেন। রোগীরা তাঁদের ফেরেস্তাতুল্য জ্ঞান করেন। কিন্তু চিকিৎসা পদ্ধতি দুষ্টচক্রে পরিণত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে এ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা ধীরে ধীরে বর্তমান আস্থাহীনতার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

অতএব চিকিৎসার নামে এ ধরনের অনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য সমাজপতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিএমডিসি এবং সর্বোপরি সরকারকে অবশ্যই জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে, চিকিৎসককে জবাব-দিহিতার মধ্যে থাকতে হবে এবং এদের প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

36. চিকিৎসকের আচরণ বিধি প্রণয়ন

চিকিৎসা পেশা অন্যান্য সকল পেশা হতে মহৎ পেশা। একজন মানুষের জীবন মরণ, সুস্থ হওয়া না হওয়া অনেকাংশেই তার উপর নির্ভর করে। তাই চিকিৎসা পেশায় অনেক সতর্কতা, অনেক দায়িত্বশীলতার প্রয়োজন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের এক সাধারণ সভায় চিকিৎসকদের জন্য নিম্নোক্ত শপথ বাক্যগুলি গৃহীত হয়:

"চিকিৎসা পেশার সদস্যরুপে অন্তর্ভূক্ত হবার পর আমি ভাবগম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

(ক) নিজের জীবন মানব সেবায় ন্যস্ত রাখব;

(খ) আমি আমার শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাব যা তাদের প্রাপ্য;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) আমি আমার পেশাকে বিবেক এবং মর্যাদার সাথে অনুশীলন করব;

(ঘ) আমার রোগীর স্বাস্থ্যই হবে আমার প্রধান বিবেচ্য;

(ঙ) আমি গোপনীয়তাকে শ্রদ্ধা করব;

(চ) আমার সহকর্মীরা হবেন আমার ভাই;

(ছ) আমি আমার কর্তব্য এবং রোগীর মধ্যে ধর্ম, জাতীয়তা, শ্রেণী, দলীয় রাজনীতি অথবা সামাজিক অবস্থানকে প্রতিবন্ধকরুপে অবস্থান করতে দিব না;

(জ) আমি জীবনের সূচনালগ্ন হতে মানব জীবনের জন্য সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা বজায় রাখব, এমনকি হুমকির মুখেও আমি আমার চিকিৎসা জ্ঞানকে মানবিক আইনের বিরুদ্ধে পরিচালিত করব না;

(ঝ) আমি এসব প্রতিজ্ঞা ভাবগম্ভীরভাবে, স্বাধীনভাবে, এবং নিজের উপর শ্রদ্ধা রেখেই করছি।

উপরে উল্লিখিত এই শপথবাণী আক্ষরিক ও ভাবগতভাবে চিকিৎসকগণ মেনে চললে স্বাস্থ্যসেবার মান গণমানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আমাদের সর্বদা সচেষ্ট হতে হবে যাতে দরিদ্ররা, প্রয়োজন মত সুচিকিৎসা পান। একজন রোগী চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসাসেবা এবং একজন নার্সের হাতের কোমল ছোঁয়ায় দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। একজন চিকিৎসক ও একজন নার্স রোগীর মনে প্রশান্তি এনে দেয় এবং তাকে উৎসাহিত করে বেঁচে থাকার জন্য।

37. স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষদ গঠণ করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সচিব, বিভাগীয় প্রধান, নেতৃস্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ এ পরিষদের সদস্যকে এই পরিষদের সদস্য করা যেতে পারে। জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষদ, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন, আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয়, অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং এর প্রভাব মূল্যায়ণে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। এ পরিষদ প্রয়োজনে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে যে কোন ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের নির্দেশ প্রদান করবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে যা জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত দিক নির্দেশনা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করবে এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সহযোগিতা নিয়ে পরিষদের সুপারিশ ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করবেন। এ পরিষদকে সহযোগিতা প্রদান, নীতি সম্পর্কিত কারিগরি দলিল প্রস্তুতকরণ এবং পরিষদ কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় সচিবালয়কে সাহায্য করার জন্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টাস্ক ফোর্স স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব/অতিরিক্ত সচিব এর দপ্তরের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে উল্লিখিত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে প্রধান ভূমিকা পালন করবে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা,

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাথে সমন্বয় জোরদার করার মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে উল্লিখিত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে এবং কর্মসূচির সকল স্তরে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যনীতি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি বিস্তারিত সময়ভিত্তিক সুসমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে, যাতে অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্য নির্দেশক থাকবে।

38. মহানবী (সা.) এর চিকিৎসা ব্যবস্থা (Prophetic medical practices) স্বাস্থ্যনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করণ

মহানবী (সা.) এর চিকিৎসা ব্যবস্থা (Prophetic medical practices) স্বাস্থ্যনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করলে জনগণের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং সাধারণ মানুষ অসুখ-বিসুখ থেকে দূরে থাকবে এবং স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বরাদ্দকৃত বাজেট অনেক সাশ্রয় হবে। রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা বেশি কার্যকর। আরব দেশে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত স্বাস্থ্য ও পানাহার বিষয়ক বিধি-বিধান মেনে চলার কারণে দু'বছরে কোন লোক অসুস্থ না হয়ে থাকে, তাহলে এ দেশেও তা সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহর দেয়া অক্সিজেন ও আলো-বাতাস যেমন সমগ্র মানব জাতির উপকার ও কল্যাণের জন্য, তেমনি স্বাস্থ্য বিষয়ক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক-নির্দেশনাও সকল মানুষের কল্যাণের জন্যই। যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তা থেকে উপকার লাভ করতে পারেন।

39. সুস্থ থাকার সহজ উপায়সমূহ

সাধারণ জীবন-যাপন শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পুরুষ ও মহিলা উভয়ে কাজের ধরণ অনুপাতে সংসারে নিজেদের কাজ নিজেরা করলে দিনের প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের অনেকাংশই হয়ে যায়। যেমন: কাপড় ধোয়া, নিজেদের ঘর বাড়ি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, পানি আনা, খাবার রান্না করা, শিশুদেরকে খাবার খাওয়ানো, সেলাই করা, কাপড় বুনোনো ইত্যাদি। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে নারী-পুরুষ অগণিত রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পায়। ফলে শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকে। নারী-পুরুষের মধ্যে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, মূত্র পাথরী, কিডনী পাথরী, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, মেদ, শিরা-উপশিরার খিঁচুনি, বিভিন্ন ধরনের স্ত্রী রোগ, স্নায়ুবিকদূর্বলতা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, আত্মহত্যা ও মানসিক রোগের মতো কঠিন কঠিন রোগের প্রকোপ কমে যাবে। ঢিলে-ঢালা সুতি কাপড় পরিধান করা, পরিমিত আহার এবং পায়ে হেঁটে চলার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে সুস্থ জীবন-যাপন পালন করা সম্ভব। খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও সচেতনতার মাধ্যমে অতি সহজেই পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা যায়। দৈনন্দিন জীবন-যাপনের জন্য খাদ্য হিসাবে আমরা কি গ্রহণ করবো? কখন (কোন্ সময়ে) গ্রহণ করবো? কতটুকু পরিমাণ গ্রহণ করবো এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান এবং পরিকল্পনা থাকতে হবে। খাদ্য দ্রব্য রান্নার সময়ে পুষ্টির অপচয় রোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র পরিবারের ভূমিকায় যথেষ্ট নয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। ইসলামের প্রতিটি বিধানই স্বাস্থ্য সম্মত। অতএব, ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করাই সুস্থ থাকার সহজ উপায়।

উপসংহার

আধুনিকতা মানুষকে বস্তুগত উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করলেও সুস্বাস্থ্যময় সুখের জীবন সৃষ্টি করতে পারেনি বরং সৃষ্টি করছে বহুবিধ রোগ-ব্যাধি। জীবনী শক্তিকে করেছে দুর্বল, স্বাভাবিক মৃত্যুকে ঠেলে দিয়েছে বহুদূরে, অপমৃত্যুকে করছে আমন্ত্রণ। যথাযথ চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি ও স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রত্যাশা রাষ্ট্রের নিকট জনগণের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় হ্রাস ও বিপর্যয়কর রোগ-ব্যাধি হতে জনগণকে সুরক্ষার জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মকৌশল নির্ধারণ, রোগ প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও ইসলামের দিক-নির্দেশনা পালন আজ বাস্তবতার দাবী। ইসলাম নির্দেশিত জীবন-যাপন, শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামের নীতি-পদ্ধতি মেনে চললে আমরা রোগ-ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের আশা করতে পারি। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত বহুবিধ তথ্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সময়োপযোগী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি আজও কার্যকর হয়নি। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রথম স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হলেও বিবিধ কারণে তা কার্যকর করা যায়নি। পরবর্তীতে ২০০০ সালে এবং ২০০৬ সালে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির খসড়া প্রণীত হয়। যদিও এই দুই স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে অভিযোগ যে, উভয় স্বাস্থ্যনীতিতে সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষা হয়নি। সরকারী চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের ব্যাপারে কোনো সুপারিশ তাতে ছিল না। উভয় স্বাস্থ্যনীতিতে কেবল চিকিৎসকদের স্বার্থ বিবেচনা করা হয়েছে। এতদ্‌সত্তেও এই দুই স্বাস্থ্যনীতিও আলোর মুখ দেখেনি। ২০০৮ সালে পুনরায় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির খসড়া প্রস্তাব প্রণীত হয়। ২০১১ সালে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত হয়, যার অধিকাংশই বর্তমান সময় পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশে ডাক্তারের অবহেলায় রোগীর মৃত্যু বা ক্ষতি হলে ডাক্তারের কোন জবাবদিহি নেই। বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে চিকিৎসক ও নার্সসহ চিকিৎসার সহিত জড়িত সকলের জবাবদিহিতা থাকা অপরিহার্য। শুধুমাত্র বইপুস্তক পাঠে রোগ ও ওষুধ সম্পর্কে শিক্ষা নয়, মানবিক আচরণও রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের সম্পর্ক হতে হবে প্রকৃত সহমর্মিতার। তা না হলে হাসপাতালের পর হাসপাতাল হবে, যন্ত্রপাতি থাকবে সব আধুনিকতম, কিন্তু সত্যিকার চিকিৎসাসেবা পাবে না রোগীরা কোনোদিনই। একজন ওষুধ নির্মাতা ও একজন চিকিৎসক দায়িত্ব ও কর্তব্যের কারণে সমাজে তাঁরা উচ্চ আসনে আসীন। বাণিজ্যই যেন তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য না হয় সে প্রত্যাশাই আমাদের সবার। বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আশানুরূপ নয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য দক্ষ লোকের অভাব, চিকিৎসক-নার্স-টেকনিশিয়ানের অপ্রতুলতা, অনিয়ম, প্রতিষ্ঠানসমূহের নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগী সেবার প্রতি আন্তরিকতা ও সহানুভূতির অভাব, পানি-বিদ্যুৎ সংকট, ওষুধ চুরি, নিম্নমানের খাবার, হাসপাতালে দালাল-টাউট-সন্ত্রাসীদের অবস্থান, কোথাও কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের দৌর্দণ্ড প্রতাপ, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার অভাব এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক দূর্বলতা পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। ইসলাম নির্দেশিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মাধ্যমে অত্র অভিসন্দর্ভে এ সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ ইসলামের আলোকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে আমরা অযাচিত রোগ-ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের আশা করতে পারি। "বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে ইসলামের চিকিৎসা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধি-বিধান তুলে ধরা হয়েছে। অতপর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ইসলামী

জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। অত্র গবেষণার প্রথমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে স্বাস্থ্য পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও সুস্থতার গুরুত্ব কত বেশী তা বুঝানোর জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বেশ কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে, ইসলামে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা জীবনঘনিষ্ট একটি বিষয় এবং ইসলাম এ বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। পর্যালোচনায় দেখানো হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি, ইসলামী নীতি পদ্ধতি অনুসরণে পরিচালিত হলে আপামর জনসাধারণ বহুবিধ রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে মহান আল্লাহর দয়ায় সুন্দর ও সুস্থ জীবন-যাপনের প্রয়াস পাবে। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রে রোগীর ওষুধের শক্তি ও মাত্রা এবং ওষুধ সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য ফার্মেসি পেশার লোক নির্দিষ্ট থাকে। ফলে সে সকল দেশে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্টরা প্রধানত হাসপাতাল বা কমিউনিটি ফার্মেসিতে যোগদানের মাধ্যমে রোগ ও ওষুধ ব্যাবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। দেশ ও জনগণের উন্নয়নের জন্য দরকার একটি সুস্থ ও সুশিক্ষিত জাতি। একটি সুস্থ জাতি গঠন তখনই সম্ভব হবে যখন দেশের সব মানুষ সঠিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা পাবে এবং ওষুধের সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। বলা হয়, একজন ডাক্তার একজন ফার্মাসিস্ট ও একজন নার্সের সমন্বয়ে তৈরি হয় একটি সুগঠিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী দল। ডাক্তার রোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ, ফার্মাসিস্ট ওষুধ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ এবং নার্স সেবা ব্যবস্থাপনায় দক্ষ। একটি সুশিক্ষিত সুস্থ জাতি গঠনে এই তিন পেশায় প্রয়োজনানুপাতিক দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা অপরিহায্য।

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে অত্র গবেষণায় এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশসহ বর্তমান বিশ্বে আজও যদি স্বাস্থ্যনীতি ইসলামের আলোকে পরিচালিত হয় তাহলে মানবজাতি অগণিত রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত থেকে সুস্থ-সবল জীবন লাভ করতে পারবে। সেই সাথে অনাকাঙ্খিত রোগ-ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ-সুন্দর জীবন-যাপনের সুযোগ পাবে। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে আশা করি, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি একদিন জনবান্ধব, বাস্তবসম্মত পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে ইসলামের আলোকে আত্মপ্রকাশ করবে। পর্যালোচনায় এটাও দেখানো হয়েছে যে, সঠিকভাবে জীবন-যাপন পদ্ধতি পালন না করা অসুস্থতার মূল কারণ। অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায়ে সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে যৌক্তিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখানো হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ইসলামী নীতি-পদ্ধতি ও আদর্শের অনুসরণে পরিচালিত হলে বহুবিধ রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ তথা বিশ্ববাসী মহান আল্লাহর নেয়ামত 'সুন্দর ও সুস্থ জীবন' লাভ করতে পারে এবং চিকিৎসা খাতের কোটি কোটি ডলার সাশ্রয় হতে পারে। 'ওষুধ ব্যতিত আদর্শ পরিবার গঠন পদ্ধতি' অনুসরণের মাধ্যমে সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠন সম্ভব বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। রোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ডাক্তার, ওষুধ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ফার্মাসিস্ট এবং সেবা ব্যবস্থাপনায় দক্ষ নার্স এবং ওষুধের সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সম্ভব।

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে অত্র গবেষণায় এটা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ইসলামের আলোকে গঠনের মাধ্যমে রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত থেকে সুস্থ-সবল জীবন-যাপন সম্ভব হবে। আমরা দৃঢ় প্রত্যায়ের সাথে আশা করি ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ইসলামী নীতি ও আদর্শের আলোকে গঠনের মাধ্যমে আধুনিক, উন্নত ও জনবান্ধব স্বাস্থ্যনীতিতে পরিণত হবে। সেইসাথে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার মান বিশ্ব-দরবারে সম্মানের আসনে স্থান

পাবে। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ইসলামী নীতি ও আদর্শের আলোকে বাস্তবায়ণের জন্য অভিসন্দর্ভের শেষ অধ্যায়ে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের পরিধিভুক্ত তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভকে গবেষণার স্তরে উন্নীত করার যথার্থ চেষ্টা করা হয়েছে। অত্র গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের গণমানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন ও জানার পরিধিকে যেমন বিস্তৃত করবে তেমনি জ্ঞানের জগতে এটি একটি নতুন সংযোজন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি আরো বিশ্বাস করি যে, ইসলামের নীতি ও দর্শনের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ পরিচালিত হলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে। অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর সফল বাস্তবায়ন এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ইসলামী নীতি ও দর্শনের আলোকে স্বাস্থসেবা সম্পর্কিত এমন কিছু বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে যা অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসাধারণ শারীরিক ও মানসিক রোগসহ বহুবিধ রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ, সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করছি, তিনি যেন বাংলাদেশের গণমানুষের খেদমতে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন। সেই সাথে এ কামনা করছি যে, দয়াময় মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা বাংলাদেশের সর্বসাধারণ ও বিশ্ববাসীকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমীন।

সহায়ক গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত তালিকা

আল-কুর’আন ও তাফসীর

- আল-কুর’আন
- আল জাসসাস, AvnKvgj KiÔAvb, কায়রোঃ দারুল মা‘আরিফ, ১৪০১ হি.
- ইসমাঈল ইব্‌ন কাছির, Zvdmxiæj KiÔAvwbj Avhxg, বৈরুতঃ দারুল মা‘আরিফ, ১৯৮৩ খ্রি.
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, Avj-KiÔAvbj Kixg, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২২তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রি.
- মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, Zvdmx‡i biæj KiÔAvb, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৮৮ খ্রি.
- মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আল-কুরতুবী, Avj-Rvwgwj AvnKvwgj KiÔAvb, কায়রোঃ তাহকীকুত তুরাস, ১৯৮৭ খ্রি.
- মুহাম্মদ ইব্‌ন জরীর আত-তাবায়ী, RvwgDj eqvb AvZ-Zvevwji AvÔBj KiÔAvb, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪৫ হি.
- মাইকেল এইচ. হার্ট, (অনুবাদঃ সামছুল ইসলাম হায়দার), BwZnv‡mi †kô kZ gbxlxi RxebK_v, ঢাকাঃ মিতা বুক সেন্টার, আগস্ট ২০১২ খ্রি.
- রাগিব আল-ইস্পাহানী, Avj-gdiv‘vZ dx Mvwiwqe Avj-KiAvb, কায়রোঃ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩২৪ হি.
- সাইয়েদ কুতুব শহীদ, Zvdwmi wd whjwjj †KviAvb, (অনুবাদ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ), লন্ডনঃ আল কোরআন একাডেমী, সেপ্টেম্বর ২০১০ খ্রি.
- হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফি’ (র), cweÎ †KviAvbj Kixg (gj:Zvdmxi gvÔAv‡idj ‡KviAvb), অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারাঃ খাদেমূল-হারমাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.
- হাফেজ আল্লামা ইমামুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (রহঃ), (বঙ্গানুবাদ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান), Zvdmxi Be‡b Kvmxi, ঢাকাঃ হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, জুলাই ২০১০ খ্রি.

আল-হাদীস

- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল আল বুখারী আল-জুফী (র), Avm-mnxn, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩ খ্রি.
- আবূ আব্দুলাহ্‌ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্‌ আল কাযবীনী, (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুলাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক), mbvb Be‡b gvRvn, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রি.
- আবূ আব্দুলাহ মালিক ইব্‌ন আনাস, gqvËv, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৫ খ্রি.
- আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, gmbv‡‘ Avng‘, বৈরুতঃ দারুল মা‘আরিফ, ১৪০৯ হি.

- আব্দুলাহ ইব্ন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী, mbv‡b ‘v‡igx, বৈরুতঃ দারুল মা‘আরিফ, ১৪১২ হি.
- আবূ জাফর আহমদ আত-তাহাবী, kviû gvÔAwbj Avmvi, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, ১৩৯৯ হি.
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী, gIqvËv Bgvg gnv¤§‘ (in), (অনু. মুহাম্মদ মূসা), ঢাকাঃ ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৮৮ খ্রি.
- ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), (অনুবাদ মাওলানা আফলাতুন কায়সার), mnxn gmwjg, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৯৯ খ্রি.
- ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইব্ন শু‘আয়ব আন-নাসাঈ (র), (অনুবাদ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী), mbvb bvmvC kixd, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৮ খ্রি.
- ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহম্মাদ আশ-শামী আত-তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, Avj-gÔRvgm mvMxi, কায়রোঃ দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হিজরী, ১৯৮৩ খ্রি.
- ইমাম আবুল কাশেম সুলাইমান ইবনে আহম্মদ আশ-শামী আত-তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৬০-৩৬০ (হিজরী), Avj gÔRvgj Kvexi, মিশরঃ মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া, ১৪০৪ হিজরী, ১৯৮৩ খ্রি. ও দারুত তুরাসিল আরাবী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪০৩ হিজরী, ১৯৮২ খ্রি.
- মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু‘মানী (র), (অনুবাদ মাওলানা সাঈদুল হক), gvÔAwidj nv‘xm ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তা. বি.
- মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-খতীব, wgkKvZj gvmvexn, ৩য় খন্ড, দিল্লীঃ কুতুবখানা রশিদীয়া, ১৩৮৭ হিজরি
- সম্পাদনা পরিষদ কতৃক সম্পাদিত, ZvRix‘m wmnvn (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ্ হাদীস) ঢাকাঃ ১ম খন্ড, ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭ খ্রি.

<u>ফিকহ</u>

- আবুল হাসান আল-বালাযুরী, dZûj ej‘vb, বৈরুতঃ দারুল মাকতাবাতিল হিলাল, ১৯৮৮ খ্রি.
- আব্দুল্লাহ যায়ল‘ঈ, bvmei ivqvn, কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৩০৫ হি.
- আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, Kvbhj D¤§vj, বৈরুতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খ্রি.
- আহমাদ শারাবী, Avj-ûKgvZj Bmjwgqv, কায়রোঃ দারুল আরব, ১৯৯১ খ্রি.
- আবূ মুহাম্মদ বদরুদ্দীন আল-আইনী, Dg‘vZj Kvix, দিল্লীঃ মাকতাবাতে রশিদীয়া, ১৯৮১
- ইমাম আবূ ইউসূফ, wKZvej LvivR, লাহোরঃ দারুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, ১৯৮৬ খ্রি.
- জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৮৪৯-৯১১ (হিজরী), Avj RwgDm mvMxi dx Avnv‘xwmj evkxwib bvhxi, বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২৫ (হিজরী), ২০০৪ খ্রি.
- ড. আবদেল রহীম উমরান, ZvbwRg Avj DmivZ dxZ wZiwmj Bmjvgx, কায়রোঃ জামেয়া আল-আযহার, ১৯৯৪ খ্রি.

- ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, Avj-wdKûj Bmjvwg Iqv Aw‘jvZû, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৯ খ্রি.
- ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, Bmjv‡gi Av‡jv‡K wPwKrmv weÁvb, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ১০ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি.
- সাইয়েদ সাবিক, wdKûm mbvn, কায়রো: দারুল ফাতহ লিল ইলমিল আরাবী, ১৯৯০ খ্রি.

বিশ্বকোষ

- GbmvB‡KøvwcwWqv Ae ‘¨v Iqvi, ঢাকা: প্রকাশনায় দি ইউনিভার্সেল একাডেমী ৪০/৪১ বাংলাবাজার, অক্টোবর ২০১৩ খ্রি.
- সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, evsjvwcwWqv, (evsjv‡`k RvZxq Ávb‡Kvl), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ ২০০৩ খ্রি.
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, msw¶ß Bmjvgx wek¦‡Kvl, ঢাকা: প্রথম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ, মে ২০০৭ খ্রি.
- Wikipedia, the free encyclopedia, *en.wikipedia.org/wiki/Disease*

অভিধান

- ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), evsjv GKv‡Wgx e¨enwiK evsjv Awfavb, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত সংস্করণ, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১১ খ্রি.
- Define *Disease* at Dictionary.com, *dictionary. reference.com/ browse/ disease*
- Prof. Md. Nurnobi, *Oxford Dictionary of contemporary English,* Joneki prokashani, Dhaka: March 2012.
- Professor Mohammad Ali and others (editors), Bangla Academy *Bengali-English Dictionary*, Dhaka: First edition, June 1994, Thirtieth reprint, November 2012.
- Zillur Rahaman Siddiqui (editors), *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, Dhaka: Second edition, January 2002, Fifth reprint, January 2012.

আইন/বিধান/নীতিমালা

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, gvbe‡`‡ni A½-cÖZ¨½ ms‡hvRb (ms‡kvwaZ) AvBb-2014, ঢাকা: বাংলাদেশ সচিবালয়, হাসপাতাল-২ শাখা, নং-৪৫.১৫৫.১৪৪.০০.০০.০০৮.২০১১.৭৮৬, ০৮-১২-২০১৪ খ্রি.
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ‡ivMx mi¶v AvBb, 2014, ঢাকা: বাংলাদেশ সচিবালয়, হাসপাতাল-২ শাখা, নং ৪৫.১৫৫.১৪৪.০০.০০.০০৩.২০১২.৭৮৪, ০৮-১২-২০১৪ খ্রি.

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, †emiKvix †gwW‡Kj K‡jR ¯vcb I cwiPvjbvi bxwZgvjv 2011 (ms‡kvwaZ), ঢাকাঃ চিকিৎসা শাখা-২, নং স্বাপকম/ চিশিজ-২/আইন ও বিধি-৩/(অংশ-২)/২০০৮/১৬২, ২২-০৬-২০১১ খ্রি.
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, †emiKvix chv‡q †nvwgIc¨vwZK †gwW‡Kj K‡jR (wW‡cøvgv) ¯vc‡bi bxwZgvjv, ঢাকাঃ চিকিৎসা শিক্ষা শাখা, সং স্বাপকম/বিশিতা/বেসমেক-০১/২০০৪- ৫৭০, ৩১-০৭-২০০৪ খ্রি.
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, †emiKvix †W›Uvj K‡jR ¯vcb I cwiPvjbvi bxwZgvjv 2009 wL. ঢাকাঃ চিকিৎসা শিক্ষা শাখা, নং স্বাপকম/চিশিজ/ বেসমেক-২/২০০৯, ১৫-১১-২০০৯ খ্রি.
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ¯v¯¨ †mev ‘vbKvix e¨w³ I cwZôvb mi¶v AvBb, 2014 wL. ঢাকাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, RvZxq ¯v¯¨ mi¶v AvBb 2014 wL. ঢাকাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, RvZxq ¯v¯¨bxwZ 2000 wL. ঢাকাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, RvZxq ¯v¯¨bxwZ 2011 wL. ঢাকাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, gvbe‡‘‡ni A½-cZ¨½ ms‡hvRb (ms‡kvwaZ) AvBb-2014 wL. ঢাকাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার evsjv‡‘k RbmsL¨v bxwZ 2012 wL. ঢাকাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, evsjv‡‘k RvZxq RbmsL¨v bxwZ-GKwU i/c‡iLv, ঢাকাঃ জুন ১৯৭৬ খ্রি.
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 2009-2010 A_ eQ‡ii Kvhvewj m¤úwKZ ewlK cwZ‡e‘b, ঢাকাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 2010-2011 I 2011-2012 A_ eQ‡ii Kvhvewj m¤úwKZ ewlK cwZ‡e‘b, ঢাকাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 2012-2013 A_ eQ‡ii Kvhvewj m¤úwKZ ewlK cwZ‡e‘b, ঢাকাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাৎসরিক বাজেট, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর, ঢাকাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণাল
- evrmwiK wi‡cvU, ড্রাগ প্রশাসন, ১৯৮৮ ও ১৯৯২ খ্রি.
- evrmwiK wi‡cvU, বাংলাদেশ ওষুধ প্রশাসন, ১৯৯২ খ্রি.

বিবিধ

- অধ্যাপক খুরশীদ আলম, Bmjvgx wk¶vi gjbxwZ, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০ খ্রি.
- অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, m¯v‡¯'¨i Rb¨, ঢাকা: ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি.
- অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ্, Bmjvg I ¯v¯', ঢাকা: ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি.
- আহমাদ মুহাম্মদ আস্সাফ, Avj-nvjvj Iqvj nvivg wdj Bmjvg, বৈরূত: দারুল ইহয়া'ইল 'উলূম, ১৯৮৮ খ্রি.
- আব্দুল মতিন, gv'K'e¨ wbqšY AvBb 1990, ঢাকা: মাদল প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি.
- আব্দুল খালেক, RbmsL¨v we‡õviY I evsjv‡'k, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮১ খ্রি.
- ইউসুফ আলহাজ্ব আহমাদ কর্তৃক সংকলিত, (হুদা খাত্তাব সম্পাদিত), BmjwgK †gwWwmb, সৌদি আরব: দারুসসালাম, ২০১০ খ্রি.
- এ.কে. নাজিবুল হক, gb I g‡bweÁvb, (সম্পাদনা: এ খালেক ও এ.ইউ. আহমেদ), ঢাকা: ১৯৮৯ খ্রি.
- এ.কে. নাজিবুল হক, gb I g‡bwеÁvbx, ঢাকা: সৃজনী প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রি.
- এ.কে.এম. নাজির আহমেদ, Bmjvgx wk¶v I ms¯wZ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ফেব্রুয়ারী ২০০৫ খ্রি.
- এ.কে.এম. সিরাজুল ইসলাম, Bmjvg †bkv, ঢাকা: মা প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি.
- এ.কে.এম. মনিরুজ্জামান, gv'K'e¨ wbqšY AvBb, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৯ খ্রি.
- ড.ইউসুফ আল-কারযাভী, Bmjv‡g nvjvj nvivi‡gi weavb, (অনু: মুহাম্মদ আবদুর রহীম), ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি.
- ড.আহমাদ আলী, Bmjv‡gi 'wó‡Z †cvkvK, চট্টগ্রাম: পাইওনিয়ার ট্রাস্ট, ২০০৫ খ্রি.
- ড.আহমদ আলী, Bmjv‡gi 'wó‡Z †cvkvK c'v I mvSm¾v, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০ খ্রি.
- ড.তোফাজ্জল হোসেন, RbmsL¨v we‡ùviY I AvMvgx cw_ex, ঢাকা: বইমঞ্চ, ১৩৯৫ বাংলা
- ড.দেওয়ান আব্দুর রহীম, ¯v¯' weÁv‡b Bmjvg, ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশনস, ২০০৬ খ্রি.
- ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, †gŠwjK cwó cwiwPwZ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ২০০৩ খ্রি.
- ড. মরিস বুকাইলি, অনুবাদ আখ্তার-উল্-আলম, evB‡ej †KviAvb I weÁvb, ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, সপ্তম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৬ খ্রি.
- ড. মাসুদ আলম, 'c‡Y¨ †fRvj cwZ‡iv‡a Bmjvgx 'wó fw½ : cwi‡cw¶‡Z evsjv‡'kÕ, ঢাকা: ইসলামী আইন ও বিচার (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা), বর্ষ : ১০, সংখ্যা : ৩৭, জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৪ খ্রি.
- ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, Bmjv‡gi Av‡jv‡K wPwKrmv weÁvb, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, ১০ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি.
- ডাঃ আবুল খায়ের মোহাম্মদ কফিলউদ্দিন, †ivM Z_¨ weÁvb I msµvgK e¨wa, ঢাকা: মিতা মুদ্রায়ণ, ১৯৭৬ খ্রি.

- ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদ, হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, mbv‡Z ivmj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg I AvaywbK weÁvb, c_g I wØZxq LÛ, ঢাকাঃ আল-কাওসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯ খ্রি.
- ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদ, হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, mbv‡Z ivmj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg I AvaywbK weÁvb, ZZxq I PZ_ LÛ, ঢাকাঃ আল-কাওসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯ খ্রি.
- ডাঃ এ.এন.এ. হোসেন, AvaywbK G¨v‡jvc¨w_K wPwKrmv, বগুড়াঃ পপি পাবলিকেশন্স, জানুয়ারী ১৯৯৩ খ্রি.
- ডাঃ এম.আর. মোল্লা, wkïi hZ I ¯v¯¨ mgm¨v, ঢাকাঃ চাইল্ড ফ্রেন্ডলী পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রি.
- ডাঃ চন্দ্রশেখর দাশ, দiv‡ivM¨ e¨wa wPwKrmv, চট্টাগ্রামঃ শান্তি সৈকত, দক্ষিন আগ্রাবাদ, অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রি.
- ডাক্তার এম. এ. ওয়াহেদ P¶ wPwKrmvi weKv‡k Bmjv‡gi Ae'vb, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮০ খ্রি.
- ডাঃ ইবনে আখতার, h‡M h‡M wPwKrmv weÁvbx, ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ খ্রি.
- ডাঃ জি. দীর্ঘাঙ্গী, AM¨vbb, কলিকাতাঃ রায় পাবিশিং হাউস, ১৯৯৯ খ্রি.
- ডাঃ নীলমণি ঘটক, cvPxb cxovi KviY I Zvnvi wPwKrmv, কলিকাতাঃ দি হ্যানিম্যান হোমিও ফার্মেসী, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০১ খ্রি.
- ডাঃ এস.এন.পান্ডে, wdwRIjRx wk¶v, কলিকাতাঃ আদিত্য প্রকাশালয়, পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৯ খ্রি.
- ডাঃ এস.এন.পান্ডে, G¨vbvUwg wk¶v, কলিকাতাঃ আদিত্য প্রকাশালয়, চতুর্দশ সংস্করণ মাঘ ১৪০১ ব.
- প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহ্মদ, Bmjvg I DbZ Rxeb e¨e¯v, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.
- প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, Bmjv‡g †cvIvK : cv_wgK mÎ I kZmgn, ঢাকাঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০৩ খ্রি.
- প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল হক ও ডাঃ সারওয়াত জাবীন, KiAvb I nv'x‡mi Av‡jv‡K Rb¯wbqšY, MfcvZ, eÜ¨vZKiY I Mfvkq fvov LvUv‡bv, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০১১
- প্রফেসর জর্জ ভিথোলকাস, (অনুবাদ মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া ও প্রিন্সিপাল ডাঃ মহিউদ্দিন খান), G‡mÝ Ae †gwUwiqv †gwWKv, ঢাকাঃ আলীগড় লাইব্রেরী, ১৫৮ নিউ মার্কেট এপ্রিল ২০১১ খ্রি.
- প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নজর আহমদ, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুয্যমান, wZ‡eŸ beex (m.), ঢাকাঃ হক লাইব্রেরী, বাইতুল মুকাররম, মার্চ ২০০২ খ্রি.
- ফুয়াদ আল খতীব, Bmjvg GKwU cYv½ Rxeb e¨e¯v, ঢাকাঃ বাংলাদেশ-সৌদিআরব মৈাত্রী সমিতি, জুলাই, ১৯৮০ খ্রি.
- বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম, ¯v¯¨ Lv‡Z mvd‡j¨i cvP eQi, ঢাকাঃ ২০১১ খ্রি.

- মজনু-নুল হক, wZ³ I la, iæMY wPwKrmv I wRw¤§ RbMY, ঢাকাঃ সংহতি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রি.
- মাওলানা আফলাতুন কায়সার, Rb¯^bqšY I Bmjvg, ঢাকাঃ এমদাদিয়া কুতুবখানা, ১৯৮৩ খ্রি.
- মুহাম্মদ নূরুল আমীন, weÁv‡b gmjgvb‡`i Ae`vb, ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারী ২০০৮ খ্রি.
- মুহাম্মদ ওয়াজিদুর রহমান ও মোঃ সাহাব উদ্দীন, Bmjvgx wk¶v cwiwPwZ, ঢাকাঃ পূর্বদেশ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬ খ্রি.
- শওকত হোসেন ও শারমীন নিশাত সম্পাদিত, nvjLvZv, (বিষয় ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া এবং এর পরিণতি) আশরাফ সিকান্দার মোহ, Ò‡fRvj `e¨- †fRvj gvblÓ, ঢাকাঃ ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ও ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১০ মার্চ ২০১১ খ্রি.
- সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ˆ`bw›`b Rxe‡b Bmjvg, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি.
- সম্পাদনা পরিষদ Lv`¨, cwó †ivMe¨wa, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খ্রি.
- সুকুমার সাহা, gv`K`e¨, mgvR I AvBb, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১ খ্রি.
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, nhiZ ivm‡j Kixg (mv) : Rxeb I wk¶v, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.
- সামীম মোহাম্মদ আফজাল সম্পাদিত (মেহাম্মাদ আরিফুর রহমান, Lv`¨`‡e¨ †fRvj I Kv‡jvevRvwi‡iv‡a agxq gj¨‡eva : †cw¶Z evsjv‡`k), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বর্ষ : ৫১, সংখ্যা : ৩য়, জানুয়ারি-মার্চ ২০১২ খ্রি.
- “British National Formulary” 1981, *Common Cause, Report.*
- *Dhaka Courier, Pharmaceutical Merchant of Health,* 31.04.84.
- Diana Melrose- *Ditter pills,* Oxfam, 1982.
- Donald Drake Marian Uhlam, *Making Medicine, Making Money,*1993.
- Dr. A. Herxheimer, *To Prof. N.Islam,* 26.1.84.
- Dr. Bibile, *Case Studies in tranasfer of technology:Pharmaceutical policies in srilanka*, Unctad.
- Dr. Hari Singh Gaur, *Penal Law of India,* Vol-2, 1924.
- Dr. Rath Foundation, *The Pharmaceutical Business with disease.*
- Dr. Richard Bresser, *Of The CDC.*
- *Drug Ordinance was a deterrent to healthy growth of Industry,* The Pulse, 24th June -7 July, 1992.
- Francis Rot: *pills policies & Profits,* 1985.
- Freedman, Whelpton and Compbell, *Family Planning, Sterility and Population Growth*, New York: 1969.
- Huxley, Hldous, *Brave New World Revisited,* 1959.
- *Issue Advertising in 1999-2000 election cycle”Annenberg policy center of the university of Pennsylvania,* Feb 2001.

- Josph Di Masi & others- *The cost of Innovation in the Pharmaceutical Industry Journal of Health and Economic Review*-1991.
- Jon E.Rohde, *Learning to Reach Health for all Thisrty Years of Instructive Experience at BRAC*, The University Press Limited, Red Crescent Building, 114 Motijheal Dhaka: 2005.
- Liz Kowalczyk, *Drug Compnay push on Doctors Disclosed,* Boston: Globe, May 19, 2002.
- Liz Kowalczyk, *Use of Drug soars,* Boston: Globe, NOV, 14, 2002.
- Mary Ann Miller & Dorothy A. Brooten, *The childbearing Family A Nursing Perspective,* Little, Brown and company, Boston/Toronto: 1977.
- M. Bhagat-*Aspects of the drug industry in India*-1981.
- Muller. *The Health of Nations: A North-South Investigation, Faber & Faber,* London, 1982.
- *ÒMedicines for the year 2000"* office of the Health Economics London.
- *Pear, "Research cost for new drugs"* PharmaBiz.com, 18 March, 2005.
- *Pharmaceuticals Looking Abroad, Dhaka: Courier*, April 1992.
- *Population & Housing Census, Preliminary Results* July 2011.
- *Population Project of Bangladesh:* BBS, 2007.
- *Price Water house Coopers, "Pharma 2005 Silicon Rally: The race to e-R&D,"* Parexel's Pharmaceutical R&D Statistical Source Book, 2000.
- *Public Citizen, Congress Watch,* July 2001.
- Professor Adler W.D. Armstrong & Others, *Fluorides and Human Health,* World Health Organization (WHO), Geneva: 1970.
- Profrssor Abdel Rahim, *Family Planning in the legacy of Islam,* UNDP. 1985.
- Professor Teisi Thou, *Health Psychology,* ABD Publishers, Rasasthan, India: 2011.
- Professor Dr. I.G. Davies, *Modern Pubhlic Health for Medical Students,* Edward Arnold Ltd. London: 1955.
- Professor Harry S. Mustard, *Rural Health Practice,* The Commonwealth Fund 41 New York: 1936.
- Professor Dr. Gordon Mclachlan, *Problems and Progress in Medical care,* Nuffield Provincial Hospital Trust by the Oxford University Press, London: 1968.

- Professor Brown, Alison Bass, *Drug Companies Enrich,* Boston: Globe, 4 Otc 1999.
- Rashid H.U. Chowdhury, S.A.R & Islam N. 1986, *Pattern of antibiotic USA in two teaching Hospitals.* Tropical Doctor, Vol-16, October.
- *Report by the D.G Twenty-eight World Health Assembly, N.D..*
- Russel Bertrand, *Principles of Socoal Reconstruction*, London: 1951.
- S. Dheer, Dr. Mitra Basu, *Indruction to Health Education,* Frends publications, 6, Mukherjee Tower, Mukherjee Nagar, com. Complex, Delhi-110009, India: N.D.
- S.M.Khaliur Rahman, *Prescription of Drug by the Physicians in the context of Drug Policy in Bangladesh.* (Mimco) Dhaka: 1989.
- Sorkin Pitirm A, *The Amirican Sex Revolution*, Boston 1956.
- *The Bangladesh Standard and Testing Institution Ordinance 1985*.
- *The meaning of Health for all by the year 2000,* World Health forum, Vol-2-No-1, WHO, 1981.
- Thompson Warren, s. *Population Problem,* New York : 1953.
- *TI Report 2006*.
- *US Dpeartment of Justice*, Press Release, 10 October 2001.
- *Use and Abuse of children's Medicine,* Ubinig, 1990.
- *Washington Legal Foundation,* 2003.
- *WHO Proposed Programmer Budget,* Geneva: 1980.

পত্রিকা:

- Fortune Magazine, 17 April 2003, Fortune 500, pp, F 26, and F 59.
- ICG, PLC's shares sold to local Management, *The Daily Star,* 26 Feb 1992.
- *Journal of the American Medical Association,* April, 15, 1998.
- *Journal Swiss de Medicine,* 109, No3, p-1194.
- Missing Data on Celebrex: Full Study Altered picture of Drug, *Washington Post,* August, 5, 2001.
- *The Daily Star* 13 October 2005.
- The Nation (Thailand), 2 November 2004.
- *The New Nation,* 10th June, 1982.
- Subverting US Health, *Loss Angeles Times*, December 7, 2003
- *World Street Journal*, 2001.

- ‰'wbK c_g Av‡jv, টিআইবি প্রতিবেদন, ঢাকা: ৩০ অক্টোবর ২০০৬ খ্রি.
- ‰'wbK ‡fv‡ii KvMR, ঢাকা: ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ খ্রি.
- ‰'wbK RbKÉ, ঢাকা: ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ খ্রি.
- ‰'wbK RbZv, ঢাকা: ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি.
- ‰'wbK c_g Av‡jv, ঢাকা: ১৬ই মার্চ, ২০০৭ খ্রি.
- ‰'wbK hMvšÍi, ঢাকা: ১২ আগষ্ট ২০০৬ খ্রি.
- ‰'wbK msev', ঢাকা: ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি- ২০১১

সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের হাতিয়ার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ মাঘ ১৪১৮
২৩ জানুয়ারী ২০১২

বাণী

স্বাস্থ্য মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) এবং ১৮(১) এ চিকিৎসাসেবা এবং জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান সরকার দেশের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সূচকগুলোর উন্নয়ন আজ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ' এ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি যুগোপযোগী করা, ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু; পুষ্টি, শিশু ও মাতৃমঙ্গল নিশ্চিত করা; জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা; মানসম্মত ওষুধ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওষুধনীতি যুগোপযোগী করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা এবং ভেষজ ওষুধের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; এইচআইভি/এইডস, কুষ্ঠ, যক্ষাসহ সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করাসহ রোগ নিরাময়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে।

নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। এরই ধারাবাহিকতায় প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি।

আমি আশা করি, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে। হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ আরও বেশি উপকৃত হবেন।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।
শেখ হাসিনা

মুখবন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের নিকট জনগণের মৌলিক চাহিদার অন্যতম একটি হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা। স্বাস্থ্যসেবাকে রাষ্ট্রের অন্যতম করণীয় চিহ্নিত করার মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন প্রকৃত জননায়ক হিসেবে মানুষের এ আকাঙ্ক্ষাটি বাংলাদেশের সংবিধানে রূপদান করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অপরিমিত প্রজ্ঞার আলোকে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) অনুসারে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এবং অনুচ্ছেদ ১৮ (১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা এবং গবেষণা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালে স্থাপন করেছিলেন 'আইপিজিএমআর' যা এখন দেশের একমাত্র চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়'। চিকিৎসা সেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি জেলা, তৎকালীন থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের যুগান্তকারী উদ্যোগ নেন। কিন্তু ৭৫ এর ঘাতক চক্র ১৫ ই আগস্টের শোকাবহ ঘটনার মাধ্যমে জাতির এই অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন, প্রণীত হয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০০; গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারার অনুসরণে স্থাপন করেন ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ২০০১ সালে ক্ষমতার পালাবদলের পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে বন্ধ করে দেওয়া হয় কমিউনিটি ক্লিনিক। স্থগিত হয়ে যায় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়ন। তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর কার্যক্রম থেমে যায়।

বর্তমান অনুমোদিত স্বাস্থ্যনীতি হলো ১৯৯৬ সালের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার কর্তৃক প্রণিত স্বাস্থ্যনীতি ২০০০; বিগত সরকার ২০০৬ সালে স্বাস্থ্যনীতির খসড়া প্রণয়ন করলেও তা চুড়ান্তভাবে অনুমোদন করতে পারেনি। ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের সরকার গঠন করলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার অনুসরণে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের কাজে হাত দেয়া হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত হয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন কমিটি। কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় দলমত নির্বিশেষে এ বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা এবং বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ও আন্তরিক ইচ্ছায় সম্ভব হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন। এ স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইডের মাধ্যমে মতামত আহবান, বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয় এবং স্বাস্থ্যনীতিতে তা প্রতিফলিত করায় নিঃসন্দেহে এটি একটি গণমুখী স্বাস্থ্যনীতিতে পরিণত হয়েছে।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে: সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহীতাকেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্রতা বৃদ্ধি ও বিস্তার করা; রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। জনগণের নিজ পকেট হতে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় কমিয়ে আনা এবং বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় হতে জনগণকে সুরক্ষা

দেয়া। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাও এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করে জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশে বর্তমান শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা, ২০২১ সালের প্রতিস্থাপন পর্যায়ে জনউর্বরতা (Replacement leval of Fertility) অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করে তা লক্ষে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা, তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার, চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবার মান নিশ্চিত করা, চিকিৎসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ইত্যাদি মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়েছে।

দেশের স্বাস্থ্য খাত ও আপামর জনগণের প্রয়োজনের নিরীখে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এবং রুপকল্প ২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশের বর্ণিত প্রস্তাবনার আলোকে এবং সে সঙ্গে সারা বিশ্বে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ধারার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের উপযোগী স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা, ই-গভর্নেন্স, ই-হেল্‌থ, ই-জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম ও টেলিমেডিসিন সেবা গড়ে তোলাই এ স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম প্রয়াস।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের অন্যতম একটি লক্ষ হচ্ছে আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি সুসংগঠিত, টেকসই ও সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা গড়ে তোলা। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশের মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে কাংখিত অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সেই সাথে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ও রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এ স্বাস্থ্যনীতির মাধ্যমে সম্ভব হবে বলে আশা করি।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের সকল প্রয়াস ছিল এটিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বা শুধুমাত্র বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্যনীতি হিসেবে নয়, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় একটি চিরায়ত স্বাস্থ্যনীতি হিসেবে প্রণয়ন। আমরা আমাদের এ লক্ষ্যে নিবেদিত থেকে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিকে সর্বপ্রকার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে সমুন্নত রেখেছি।

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রস্তাবনা

স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ অবস্থা; শুধুমাত্র রোগব্যাধি বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার। মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে স্বাস্থ্য সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) অনুসারে চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এবং অনুচ্ছেদ ১৮ (১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২৫(১), আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলনের অনুচ্ছেদ ১২, শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ২৪, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২ এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আগামী ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এক অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের রূপকল্প (ভিশন ২০২১) অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দৈনিক নূন্যতম ২১২২ কিলো ক্যালরির উর্ধ্বে খাদ্যের সংস্থান, সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূলকরণ, সকলের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোঠায় উন্নীতকরণ, শিশু মৃত্যুর হার বর্তমানে হাজারে ৫৪ থেকে ক্রমান্বয়ে ১৫তে হ্রাসকরণ, মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে ১.৫ শতাংশে হ্রাসকরণ এবং ২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সুস্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগ চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ পানি, যথাযথ খাদ্য, দূষণমুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় রোগ চিকিৎসা ও কিছু প্রতিরোধমূলক কাজসহ চিকিৎসা শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্বাস্থ্যের অন্যান্য উপাদান নিশ্চিতকরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইত্যাদির সম্পৃক্ততা রয়েছে।

দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো সমাধান করে স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান অবস্থাকে আরো সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী খাত ও সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্ম-উদ্দীপ্ত ও আশান্বিত করার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয় এমন একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০০০ পুনর্মূল্যায়নপূর্বক যুগের চাহিদা অনুযায়ী নবায়ণ করে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া বিভিন্ন স্তরের জনগণের মাঝে বিশেষত স্বাস্থ্য খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুশীল সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন, বিশেষজ্ঞসহ সমাজের সকল স্তরের জনগণের মতামতের জন্য উপস্থাপন করা হয়। খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি চুড়ান্ত করার জন্য সরকার কতৃক গঠিত কমিটি বিভিন্ন পর্যায় হতে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শসমূহের আলোকে খসড়াটি সংশোধন,

পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ চুড়ান্ত করে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ এর উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের আলোকে কর্মকৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হলে এ দেশের মানুষের প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে সমন্বয় ঘটবে। স্বাধীনতার সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্রত নিয়ে দিন বদলের লক্ষ্যে জনগণের ঐতিহাসিক রায়ে নির্বাচিত বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার স্বাস্থ্য খাতের গণমুখী উন্নয়ন অর্জিত হবে।

প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশব্যাপী সরকারি স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অবকাঠামো প্রশংসনীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। তবে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ওষুধ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা, জনবলের অভাব, যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা ও প্রশাসনিক জটিলতা এবং সুসংগঠিত রেফারেল পদ্ধতি না থাকায় স্বাস্থ্য অবকাঠামোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না।
বাংলাদেশে ১লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের মধ্যে প্রায় ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বসবাস করে। ঘনবসতির দিক থেকে যা নগর রাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বে সর্বাধিক। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭৬ শতাংশ গ্রামে এবং ২৪ শতাংশ শহরে বসবাস করে। ৪৩ শতাংশ জনগণের বয়স ১৫ বছরের নীচে; প্রতিবছর দেশে প্রায় ২০ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করছে যা দেশের খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের উপর বাড়তি চাপ এবং প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তবে এ সংক্রান্ত জাতীয় লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হলে এ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সূচকসমূহে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রতি হাজারে ছিল ৮২.২, ২০০৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৫২-তে। ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯৬-৯৭ সালে ছিল ১১৫.৭, ২০০৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৬৫ তে নেমে এসেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শিশু মৃত্যু হ্রাসকরণ সংক্রান্ত ৪ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব হবে। অনুরূপভাবে মাতৃমৃত্যুর হার ও হ্রাস পাচ্ছে। বিএমএসএস জরিপ ২০১০ অনুযায়ী মাতৃমৃত্যুর হার ২০০1 সালের তুলনায় প্রতি লাখে ৩২২ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০1০ সালে ১৯4-তে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এই হার অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রেও সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে।

বিগত বছরগুলোতে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত অতীতের প্রবণতা ভেঙ্গে বর্তমানে পুরুষের চেয়ে মহিলাদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে টিকা প্রদানের ক্রমবর্ধমান উচ্চহার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে এখনো সন্তান প্রসবকালে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর অপ্রতুলতা সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে ওজনের স্বল্পতা এবং খর্বতা কমেছে, কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নয়। ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের ভিটামিন এ (ক্যাপসুল) খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা পুরোটাই অর্জিত হয়েছে। এর ফলে রাতকানা রোগ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। লিঙ্গ বৈষম্য ও অন্যান্য

বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। কিন্ত বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পোলিও নির্মূল করা হয়েছে। বাংলাদেশে এইচআইভি-র প্রকোপ অন্য দেশের তুলনায় এখনো অনেক কম। তবে এর বিস্তারের আশংকা রয়েছে, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আচরণগত কারণে এক্ষেত্রে ঝুঁকি বিদ্যমান।

গ্রামবাসীর শহর অভিমুখী হওয়া এবং শহরের বস্তিসমূহে অধিক সংখ্যক লোকের বসবাসের ফলে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে যা শহরে স্বাস্থ্যসেবার যথার্থ প্রয়োগকে জটিল করে তুলেছে। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রামের গরীব মানুষের জন্য এখনও সহজলভ্য নয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতি এবং যথাযথ ব্যবস্থ্যাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন, লবণাক্ততা এবং খরা, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহকে বাধাগ্রস্ত করেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর নতুন নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা এবং ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।

বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যে স্বাস্থ্যসেবা জনগণ পাচ্ছেন তা পরিসর ও গুণগত মানের দিক থেকে আরও উন্নীত করা প্রয়োজন। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার জন্য উচ্চ ফি এবং অধিক রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষাকে ব্যয়বহুল চিকিৎসার একটি বড় কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়েও জনগণ সন্তুষ্ট নয়। জনবলের স্বল্পতা, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবাকে দরিদ্র, দূরবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানো যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা জনবলের ক্ষেত্রে সংকটাপন্ন ৫৭টি দেশের একটি। ডাক্তার ও নার্সের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত অনুপাত যেখানে ১:৩ সেখানে বাংলাদেশে সে অনুপাত ১:০.৪৮ যা অনাকাঙ্খিত। ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য জনশক্তির স্বীকৃত অনুপাত ১:৩:৫ হলেও আমাদের দেশে চিত্র তার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ফলে অদক্ষ সেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকেই রোগীদের প্রথম সেবা গ্রহণ করতে হয়। সরকারি বেসরকারি সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র জনগণের সার্বিক চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়। তার উপরে অনেক ক্ষেত্রে পেশাজীবীদের যোগ্যতাও কাঙ্খিত মানের নয়। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীগণ অতৃপ্ত থেকে যায়।

সরকারি স্বাস্থ্যখাতে চিকিৎসা সামগ্রী এবং উপকরণ সংগ্রহের জটিল ও সময় সাপেক্ষ ক্রয় প্রক্রিয়া বাজেট বরাদ্দের অপরিণত ব্যবহারের অন্যতম কারণ। প্রায়ই অনিয়মিত এবং অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এছড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট ও ব্যয় অপ্রতুল। দেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সৃষ্ট বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা পরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার দিক দিয়ে সন্তোষজনক নয়।

স্বাস্থ্যসেবার পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি খাতে অর্থের সংকুলান ও ব্যবস্থাপনা অপর্যাপ্ত। বাজেটের মাত্র ৭ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, যা জিডিপি-র মাত্র এক

শতাংশ এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায়ও কম। বর্তমানে সরকরি খাতে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়ের পরিমাণ মাথাপিছু ৫ ডলার মাত্র। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্যসেবায় মাথাপিছু ৩৪ মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ড অনুসরণ করে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ বছরে অন্তত ২৪ ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

রূপকল্প

স্বাস্থ্য একটি স্বীকৃত মানবাধিকার। জনগণের সার্বিক সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সেবা প্রাপ্তিতে সাম্য, লিঙ্গ সমতা, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। জনগণের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন দারিদ্র নিরসান অত্যাবশ্যক।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

৪. সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৫. সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহিতা কেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তার করা।

৬. রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্যঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর মূল লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রথম : সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেয়া এবং পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা।

দ্বিতীয় : জনসাধারণ, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

তৃতীয় : প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন নিশ্চিত করা।

চতুর্থ : জরুরী চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া।

পঞ্চম : শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা, বিশেষ করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা।

ষষ্ঠ : আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা (Replacement level of Fertility) অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্য সেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করা।

সপ্তম : মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা।

অষ্টম : অতি দরিদ্র ও অল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গ্রহণযোগ্য করা ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।

নবম : স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।

দশম : চিকিৎসা সেবাসহ স্বাস্থ্য খাতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

একাদশ : সরকারি স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র ও হাসপাতালসমূহে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল নিশ্চিত করা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনপূর্বক সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

দ্বাদশ : বেসরকারি মেডিকল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের সেবার মান নিশ্চিত করা এবং সেবা ও শিক্ষার ব্যয় জনসাধারণের নাগালের মধ্যে রাখা।

ত্রয়োদশ : সকল চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, মেডিকেল টেকনোলজি ও স্বাস্থ্যসেবা সহায়কদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগোপযোগী করা।

চর্তুদশ : জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা নিশ্চিত করা।

পঞ্চদশ : রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা এবং এ লক্ষে টিকাদান (Immunization) কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা ও শক্তিশালী করা।

ষষ্ঠদশ : স্বাস্থ্য তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা।

সপ্তদশ : অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।

অষ্টদশ : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য বিপর্যয় ও রোগ-ব্যাধির গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য রাখা এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করা।

ঊনবিংশ : বিকল্প চিকিৎসা (ইউনানি, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথি) পদ্ধতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত মূলনীতি ও কর্মকৌশলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

মূলনীতি:

১. জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের এবং বিশেষ করে শিশু ও নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতার ভিত্তিতে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করতে প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় সচেতন ও সক্ষম করে তোলা ও সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাত্রা গ্রহণের জন্য আচরণের পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া।
২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসমূহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের যে কোন ভৌগলিক অবস্থানের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৩. স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুবিধা বঞ্চিত, গরিব, প্রান্তিক, বয়স্ক ও শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী জনগণের অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া এবং এ লক্ষ্যে বিরাজমান সম্পদের প্রাধিকার, পূর্ণ বন্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দ্বায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় তহবিল গঠন, ব্যয়ন, পরিবীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পদ্ধতি পর্যালোচনাসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

৫. সবার জন্য কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রয়াসের সুযোগ সৃষ্টি ও সহযোগিতা প্রদান করা এবং অংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে সরকারি স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহে উচ্চমূল্যের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি বেসরকারি অংশীদারিত্বে স্থাপনের বিষয়টি পরীক্ষা করা।

৬. স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, সেবা দান পদ্ধতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা।

৭. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সেবাগুলোকে আরো জোরদার ও সেগুলোর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর, ফলপ্রসূ ও সুদক্ষ প্রযুক্তি গ্রহণ ও যথাযথ ব্যবহার, পদ্ধতি উন্নয়ন ও গবেষণাকর্মকে উৎসাহিত করা।

৮. জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে স্বাস্থ্যের সাথে কার্যকর সমন্বয় করা।

৯. পুষ্টি কার্যক্রমকে স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় করা।

১০. স্বাস্থ্যসেবার সাথে সর্ম্পকিত বিষয়ে সকল নাগরিকের অধিকার, সুযোগ, দায়িত্ব, কর্তব্য ও বিধি-নিষেধের ব্যাপারে সচেতন করা।

১১. জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সার্বিক সুস্থতা ও সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্চা ও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার অন্তর্নিহিত মূলনীতি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করা।

১২. স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল স্তরে প্রয়োজনীয় ও মানসম্পন্ন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সহায়ক প্রশিক্ষিত পেশাজীবী কর্মী-বাহিনী গড়ে তোলা।

১৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উদ্ভাবনী প্রয়োগ এবং ই-হেল্থ ও টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

১৪. অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ (Essential Drugs) এর তালিকা হালনাগাদ করা ও সর্বত্র সেগুলোর যথাযথ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। দেশীয় ওষুধ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৫. দূর্যোগ কবলিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের শিকার জনগণের কাছে জরুরী ত্রাণ হিসাবে স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি বিকল্প স্বাস্থ্য সেবা পদ্ধতিসমূহ (যেমন- হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, আয়ুর্বেদীয় ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা।

চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য খাতে উন্নতি সত্ত্বেও অনেক চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা এবং তা ভোগের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান। এ সকল বৈষম্য সমষ্টিগতভাবে দেশের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে চাহিদা ও সরবরাহ উভয় ধরণেরই সমস্যা রয়েছে। এহেন অবস্থায় বাংলাদেশের বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(১) সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে

(ক) দুর্বল ব্যবস্থাপনা
(খ) সম্পদের সীমাবদ্ধতা
(গ) সেবার দুর্বল গুণগত মান।

(২) সেবা গ্রহীতার তথা চাহিদার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে

(ক) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সামর্থহীনতা

(খ) জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ না করা।

(ক) মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার

বাংলাদেশে যদিও ক্রম হ্রাসমান তবুও প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত এখনও বেশি। প্রজনন-কালীন রুগ্নতা, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী মৃত্যুই এ উচ্চহারের মূল কারণ। এছাড়া এ উচ্চহারের অন্যান্য প্রধান কারণ হলো: প্রাথমিক এবং মাতৃসেবার অপর্যাপ্ততা, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে অসচেতনতা শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর অপর্যাপ্ততা।

(খ) শিশু মৃত্যুর হার

বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য সকল কার্যাবলীর সফল প্রয়োগ সত্ত্বেও মাতৃমৃত্যুর মত শিশু মৃত্যুর হারের পার্থক্য লক্ষ্যণীয় (শহরের বস্তি, পাহাড়ি এবং উপকূলবর্তী এলাকা, পরিবেশগত সংকটাপন্ন অঞ্চলে তা বেশি)। এর ফলে সরকারি সেবাসমূহ সাধারণ জনগণের নিকট সার্বিকভাবে পৌঁছানো যাচ্ছে না। শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো হলো: নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, পানিতে ডুবে যাওয়া, বিষক্রিয়া এবং আঘাত; এ বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত স্তন্যপান এবং যথাসময়ে তোলা খাবার প্রদানের প্রতিও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

(গ) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা, গোদ রোগ, কৃমি এবং কালাজ্বর, এইচআইভি/এইডসের হুমকি, জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইচআইভি/এইডসের ব্যাপারে যথাযোগ্য নজরদারি, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা, একাধিক ওষুধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মার জন্য কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং কালাজ্বর প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয়ে অগ্রগতি ইত্যাদি উন্নত

স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফাইলেরিয়া এবং মাটিবাহিত কৃমি রোগ বিস্তার প্রতিরোধে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

(ঘ) অসংক্রামক রোগসমূহ

বাংলাদেশে গতানুগতিক অসংক্রামক রোগ যেমন- ক্যান্সার, ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোক প্রভৃতির প্রকোপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়া গতানুগতিক নয় এমন রোগ যেমন- মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, সড়ক-রেল-নৌ দুর্ঘটনা, বিভিন্ন ধরণের দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্য-সমূহ, পানিতে ডোবা, পোড়া, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সমস্যা ইত্যাদি বর্তমানে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। বহু সংখ্যক মানুষ আর্সেনিক-দূষিত পানি ব্যবহার করছে এবং ফলশ্রুতিতে আর্সেনিক সংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। শৈশব-কালীন উন্নয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে মেধা উন্নয়নের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

(ঙ) নতুন রোগের আবির্ভাব এবং পুনরাবির্ভাব

দেশে প্রায়ই নতুন রোগ ও স্বাস্থ্য সমস্যার আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব লক্ষণীয় যেমনঃ এভিয়ান ফ্লু, ডেঙ্গু, নিপা ভাইরাস ইত্যাদি। এ সকল রোগের উপর নজরদারি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথোপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন।

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন

বিশ্বায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে সৃষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত ব্যাধি, শৈত্য ও উষ্ণ প্রবাহ সংক্রান্ত ব্যাধি, পানিবাহিত রোগ, পরজীবীবাহিত রোগ যেমন-ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি এবং পুষ্টি-হীনতা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার ব্যাপারে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ।

(ছ) খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশে পুষ্টি-হীনতা সংক্রান্ত ব্যাধিসমূহ, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের হার কমেছে। আবার লিঙ্গ বৈষম্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে পুষ্টি-হীনতার দরুন কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মের হার বাংরাদেশে ৪৩ শতাংশ এবং স্থান ও আর্থ-সামাজিত অবস্থাভেদে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তস্বল্পতার পরিমাণ ৬০-৮০ শতাংশ।

(জ) নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শহরগুলোতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ও বেসরকারি খাতে উচ্চ মূল্যের দরুন গরিব জনগণ, বিশেষতঃ বস্তিবাসীরা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন আরো বেশি বস্তি, জনবসতি, দুর্বল বাসস্থান অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং নিম্নমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সৃষ্টি করছে যা জীবনধারণ এবং স্বাস্থ্যের মানকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করছে। দ্রুত বর্ধনশীল দরিদ্র নগরবাসীর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ করা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঝ) গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্যকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কমিউনিটি ক্লিনিক হবে স্বাস্থ্য সেবার প্রাথমিক স্তর। তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক-এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেফারেল ব্যবস্থার উন্নয়ন করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

(ঞ) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ধরণ ও জীবন-যাপন রীতির পরিবর্তন

গত দু'দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ধরণ ও জীবন-যাপন পদ্ধতির বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। বয়স্ক জনসংখ্যা এবং নগরায়ন বৃদ্ধির সাথে বাড়ছে রোগ-ব্যাধি ও মানসিক সমস্যা। জীবনযাত্রার রীতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে, যেমন চর্বিযুক্ত খাবার, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, বিনোদন সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা, তামাকের ব্যবহার, মাদক এবং পানীয়ের প্রতি আশক্তি, বেপরোয়া ড্রাইভিং, সহিংসতা ইত্যাদি এগুলো নগর এলাকার চিত্রকে আমল বদলে দিচ্ছে। নগরায়নের ফলে পরিবার কাঠামোতে এবং বসবাস ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে, যা শিশুদের ও বড়দের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছে।

(ট) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের বিপুল ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অজ্ঞ ও অদক্ষ লোকের সেবা নিতে বাধ্য হচ্ছে। দক্ষ মানব সম্পদের সংখ্যা ও বিশেষতঃ নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা ও মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত দেশসমূহে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নূতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ হচ্ছে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জটিল রোগসমূহের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

(ঠ) গুণগত মান

প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার মান সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অনেকগুলো কারণের মধ্যে সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকা এবং সহজে সেবা প্রদানকারীর কাছে পৌঁছানোর ব্যর্থতা বিশেষতঃ দরিদ্র, প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। অন্যান্য কারণসমূহ হলো- সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ওষুধ-পত্র ও সেবা প্রদানকারীর স্বল্পতা।

বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এজন্য বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

(ড) কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার এবং এর দক্ষ ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থ্যাপনার প্রধান বাধা হলো কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। কেন্দ্রে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর অধিক নির্ভরশীলতা কিংবা জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে সকল স্তরে না পৌঁছানোর কারণে কার্যকর সিদ্ধান্ত পালন দীর্ঘায়িত হয়।

(ঢ) স্বাস্থ্য-গবেষণা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচি, সেবা প্রদান ও দরিদ্র-বান্ধব স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণয়নে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ ও প্রমাণের ভিত্তিতে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা উত্তম। পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ প্রয়োগধর্মী জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণা ব্যবস্থার অভাবের ফলে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং গবেষণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিঘ্নিত হয়।

(ণ) তথ্য, যোগাযোগ প্রযুক্তি ও রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা উন্নত করার উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার এখনো যথেষ্ট নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য জনশক্তির আগ্রহ ও দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অপ্রতুলতা প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বিরাজ করছে। রোগ তাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ সামর্থ্য সত্ত্বেও নিয়োমিতভাবে করা হয় না। আচরণগত পরিবীক্ষণের কথা খুব কমই চিন্তা করা হয়। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ই-হেল্থ, টেলি-মেডিসিন এবং ই-তথ্যের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এখনও হয়নি।

(ত) সমতা ভিত্তিক সেবা

বাংলাদেশে দরিদ্র, সামাজিকভাবে বঞ্চিত, অশিক্ষিত, প্রান্তিক, দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, বিশেষত: গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকরা সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও কিছু কর্মসূচী তাদের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কিন্তু এটা তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রবেশ করতে পারছে না। কারখানার শ্রমিক, কৃষিখাত, পশুপাখি পালনে নিয়োজিত মানুষ, আদিবাসী, দুর্গম এবং দূরবর্তী এলাকাবাসীদের জন্য এবং নারীদের সমাজিক ও পারিবারিক সমস্যার সমাধানে, সহিংসতার বিরুদ্ধে এবং বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(থ) চিকিৎসা পেশায় নৈতিকতা

বাংলাদেশে যেহেতু প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ, পরিচালন ব্যয় এবং আইনি সহায়তার অভাবে নিয়ন্ত্রক পর্ষদসমূহ যথেষ্ট কার্যকর নয়, তাই চিকিৎসা চর্চা অথবা শিক্ষা এবং গবেষণায় নৈতিকতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতি হয়। এ সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা এবং যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

(দ) জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সংক্রান্ত জ্ঞান

বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে শিক্ষিতের হার ৬০ শতাংশের কম। জনগণ এখনও বিভিন্ন ব্যাধি, সমস্যা অপুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। রোগীকে পরামর্শদান (Counselling) আমাদের সমাজে পেশা হিসাবে স্বীকৃত নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভ্যাস ও

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। জীবন-যাপন পদ্ধতিকে আরো স্বাস্থ্যসম্মত ও উৎপাদনশীল করার জন্য সামাজিকভাবে শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কর্মকৌশল:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠন করা হবে। এ কাউন্সিলে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বেসরকারি খাতের স্টেকহোল্ডার ও এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কাউন্সিল স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ে কাউন্সিলের কাছে দিক-নির্দেশনা চাওয়া হবে।

২. বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ও পুষ্টিনীতির আলোকে কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবে। তাছাড়া কমিটি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংস্কার, জনবল নিয়োগ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, কর্মীদের কর্মজীবন পরিকল্পনা, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনানীতিসহ, স্বাস্থ্যসেবার সঠিক উন্নয়ন পরামর্শ প্রদান করতে পারে। সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

৩. বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজগুলো সম্পাদনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করে কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। এ কারণে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান উন্নয়ন করতে হবে এবং তা সার্বজনীন করা হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নে কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের কর্মকান্ড জোরালো করা হবে এবং স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর অংশীদারিত্বে পরিচালিত হবে। প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। তবে বিশেষ ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত কম জনগোষ্ঠীর জন্যও (যেমন-চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল) কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা যেতে পারে। দ্রুত নগরায়নের ফলে শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার সাথে সাথে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। কার্যকর রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই জটিলতর রোগীদের পরবর্তী ধাপে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৫. জরুরী স্বাস্থ্য সেবা জীবন বাঁচাতে পারে বিধায় সার্বজনীন জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

৬. বাংলাদেশে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এ মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আরোগ্যমূলক ও পুনর্বাসন সেবাগুলোর সন্তোষজনক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

৭. রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ (Epidemiological Surveillance) পদ্ধতিকে বিস্তৃত করে রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

৮. স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের জন্য স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধ নীতিকে আরও গ্রহণযোগ্য এবং উন্নত করতে হবে। বর্তমান সময়ের চাহিদা, নিরাপত্তা, উপকারিতা, ক্রয়ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বস্তরে জরুরী ওষুধের সহজপাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন, সহজপ্রাপ্যতা, ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

১০. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি পুষ্টি এবং একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট থাকবে। এগুলোর কর্মকান্ড প্রত্যান্ত অঞ্চল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত করা হবে। স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সমন্বিত ভাবে উপজেলা পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

১১. লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে উত্তম শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হবে। মাতৃ মৃত্যু ও এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার কমানোর উপর জোর দিয়ে নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা হবে। নারীদের বিশেষত: গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য যৌনরোগ হতে রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নারী বান্ধব কাঠামো তৈরী করতে হবে।

১২. মাতৃ মৃত্যুর হার ও প্রজনন হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশের গ্রাম ও শহর এলাকায় প্রান্তিক মানুষের কাছে এসব সেবা আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেয়া হবে। সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সমন্বিতভাবে দিলে তা জন-বান্ধব ও ব্যায় সাশ্রয়ী হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি কার্যকর ভাবে সমন্বয় করা হবে।

১৩. একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Intergrated Management Information System) এবং কম্পিউটার নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা সারাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মনিটরিং-এর জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

১৪. স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন করা হবে।

১৫. বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে ব্যাবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়ের উপর চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্য খাতে নিয়োজিত অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে।

১৬. বাংলাদেশে বেসরকারি ও এনজিও সংস্থাগুলোকে স্বাস্থ্য সেবায় সম্পূরক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা হবে। বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা রোগীদের সঠিক ও মান সম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরী করা ও প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৭. দেশের স্বাস্থ্য গবেষণার মান ও পরিধি বাড়ানো হবে। এ খাতে অর্থ বরাদ্ধ বাড়ানো হবে। জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতি, সামাজিক ও আচরণগত এবং প্রায়োগিক গবেষণার উপর জোর দেয়া হবে। বাংলাদেশে যে সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, সেগুলোর গবেষণা অগ্রাধিকার পাবে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়ানো হবে।

১৮. বাংলাদেশের প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করা হবে। সে লক্ষ্যে আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। এ লক্ষ্যে সরকার যথাযথ সহায়তা প্রদান, অনুদান বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯. বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতে অর্থ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গড়ে বাংলাদেশের জিডিপির মাত্র এক শতাংশ সরকার স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বরাদ্দ করে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের সাত শতাংশ। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে প্রতি বছর বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হবে।

২০. বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন একটি সমস্যা। যদিও এ খাতে ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশই জনগণ বহন করে, তারপরেও সম্পদের ঘাটতি থেকেই যায়। এটি সমাধানের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক (formal) প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরিজীবীদের জন্য স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর্থিকভাবে দুস্থ লোকদের জন্য দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতির অভাব রয়েছে। অতি দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত উপায়ে এসব জনগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে কার্ড দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

২১. দেশের সর্বস্তরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণ, স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা হবে।

২২. দেশের স্বাস্থ্য সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (BMA), বাংলাদেশ প্রায়ভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোসিয়েশন (BPMPA), আয়ুর্বেদিক মেডিকেল এসোসিয়েশন, ইউনানি মেডিকেল এসোসিয়েশন ও হোমিওপ্যাথি মেডিকেল এসোসিয়েশন নার্সিং এসোসিয়েশন ইত্যাদি পেশাজীবী সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করা হবে।

২৩. দেশের সকল স্তরের হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও ব্যায় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। দেশব্যপী তার বিস্তার করা হবে।

২৪. স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ থেকে জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ সুফল অর্জনের লক্ষ্যে সর্বস্তরের জন্য একটি সঠিক ও চাহিদাভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা হবে। চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্টসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মীর সল্পতা ও অসম বন্টন ব্যবস্থা, দক্ষতা সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভারসাম্যহিনতা, ন্যায়বিচার ও প্রণোদনার অভাব দূর করার ব্যবস্থা মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশলে থাকবে। চাহিদা যাচাই করে অতিরিক্ত জনশক্তি (ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, প্যারামেডিক প্রভৃতি) তৈরির পদক্ষেপ নেয়া হবে। স্বাস্থ্য জনশক্তির সকল স্তরে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির স্বচ্ছ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে।

২৫. বাংলাদেশে বিদ্যমান চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, প্যারামেডিক ও টেকনোলজিস্টদের শিক্ষা, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করা হবে এবং গণমুখী ও দেশের প্রয়োজন ভিত্তিক করা হবে। চিকিৎসা জনশক্তির শিক্ষাদানে সেবার

মান, রোগীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, মমত্ববোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

- নার্সিং: ডিপ্লোমা পর্যায়ে দেশের চাহিদা পূরণ করার জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানো হবে। হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষার জোর দেয়া হবে। দেশে গ্রাজুয়েট নার্সদের স্বল্পতা রয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সংখ্যা বাড়ানো হবে। বিশেষায়িত নার্সিং শিক্ষা (Specialized Nursing) যেমন- কার্ডিয়াক সার্জারি, নিউরো সার্জারি, করোনারি কেয়ার ও অন্যান্য বিশেষায়িত ডিসিপ্লিনে নার্সিং শিক্ষা শুরু করা হবে। নার্সিং শিক্ষকদের স্বল্পতাও প্রকট। পোষ্ট গ্রাজুয়েট নার্সিং শিক্ষা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শুরু করা হবে।
- প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্ট সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো হবে। আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞানসহ দক্ষতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হবে।
- ধাত্রী: সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষ জনশক্তি দেয়া হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
- গ্রাজুয়েট পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে আরো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। দেশের প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষাদান ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হবে। দেশে প্রচলিত পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা ও বিভিন্ন কোর্সসমূহকে সমমানের করা হবে এবং সমন্বয় করা হবে। এখানেও আধুনিক প্রযুক্তি ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হবে। চিকিৎসকদের পেশাগত মান বজায় রাখার জন্য দেশে ও বিদেশে Continuting Medical Education ও প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।
- গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টার্নিশীপ বিদ্যমান এক বৎসরের পরিবর্তে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে দুই বৎসরে উন্নীত করে তার মধ্যে অন্ততঃ এক বৎসর গ্রাম পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে তাদের কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করা হবে।

২৬. মেডিকেল প্রাকটিশনাদের রেজিস্ট্রেশন, পেশাগত মান এবং এথিক্যাল প্রাকটিস সংক্রান্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে তদারক করার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আরো শক্তিশালী করা হবে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলকেও পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করা হবে। ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং অন্যান্য প্যারামেডিকদের সেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যথাক্রমে ফার্মেসি কাউন্সিল এবং স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টিকে পুনর্বিন্যাস করা হবে।

২৭. সুষ্ঠু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করা হবে এবং সেগুলোর যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

২৮. সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে যে সমস্ত চিকিৎসক বা শিক্ষার্থী সার্বক্ষণিক ও আবাসিক পদে এবং জরুরি বিভাগে কর্মরত আছেন এবং যারা Non-clinical Subject এর শিক্ষক তাদের প্রাইভেট প্রাকটিস থেকে বিরত রেখে নন-প্রাকটিসিং ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২৯. দেশের প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে রোগী পরিচর্যার ক্ষেত্রে মান সম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর একটি সহায়িকা তৈরী করা হবে।

৩০. দেশের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য-কর্মীদের তাদের কর্মস্থলে উপস্থিতি ও সর্বোত্তম সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

৩১. মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী সমূহের স্বাস্থ্য সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে। এজন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি তৈরি করা হবে।

৩২. সংক্রামক রোগসমূহ যেমন- শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি জোরদার করা হবে। যক্ষা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি জোরদার করা হবে। সংক্রামক রোগসমূহের নিরাময়মূলক সেবা জোরদার করা হবে।

৩৩. অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। সমন্বিত উপায়ে সকল পর্যায়ে প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান অসংক্রামক রোগগুলো যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, আর্সেনিকোসিস সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে এবং জীবনধারা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩৪. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ূ পরিবর্তনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মাঠ জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রোগগুলোর বোঝা কমাতে একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৩৫. টিকাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করে যত সংখ্যাক রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত করতে হবে।

৩৬. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ স্কুল হেল্থ কার্যক্রম চালু করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ জীবন-যাপনের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৩৭. শিল্প ও কৃষি খাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

৩৮. চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের প্রয়োগ সম্প্রসারিত করা হবে। এজন্য দক্ষ জনবল তৈরী ও গবেষণার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৩৯. বিদেশ হতে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে, বিশেষ করে মারাত্মক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এমন দেশ থেকে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে দেশে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটতে না পারে সে লক্ষ্যে স্থল, জল ও বিমান বন্দরসমূহে প্রত্যাগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হবে।